বৈশাখ, ১৩৩৯ [৪র্থ বর্ষ

রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিকতা'

…ঙ্গের প্রারম্ভেই একটা কথা মনে হইতেছে; কথাটা প্রাসঙ্গিক …বু এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না,—কেন যে তাহা …া বুঝিয়া লইবেন। সে দিন তর্ক উঠিয়াছিল—Intellectualityর …nestyর কোনও সম্পর্ক আছে কি না। অর্থাৎ, যাহা সত্য …জ্ঞান-বিচারে মানিয়া লই, Ideaর ক্ষেত্রে যাহাকে স্বীকার …হিরের আচার ব্যবহারে তাহা পালন করা অত্যাবশ্যক কি না। …ntellectual honesty বলিয়া একটা ধর্ম্ম আছে, যথা, …িয়া গেলে তাহা স্বীকার করা; নিজের মত যদি ভুল বলিয়া …য় তবে তাহা সংশোধন করিয়া লইতে দ্বিধা না করা। কিন্তু

ঐ পর্য্যন্ত ; intellect এর ক্ষেত্রেই উহা সীমাবদ্ধ, উহার সঙ্গে
জীবনের কর্ম্মনীতির কোন সম্পর্ক নাই ; কারণ, চিন্তার রাজ্যে,
রাজ্যে যাহা বিশ্বাস করি, বাস্তবে তাহার অবকাশ কোথায় ?
কথায় ও কাজে যে ঐক্য রক্ষা করার নাম—honesty, তাহা ধর্ম্ম
অন্তর্গত ; তাহাতে Ideaর স্বাধীনতা নাই, আছে বিশ্বাসের
আধুনিক মানসিকতার যুগে এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত
জীবনের সর্ব্ব কর্ম্মে একটা কিছুকে ধরিয়া থাকা, কায়মনে
কোনও একটা সত্যকে জয়যুক্ত করার প্রয়াস নিতান্তই কুসং
এই মানসিক উৎকর্ষের অভাবেই মধ্যযুগের মানুষ একনিষ্ঠার প
ছিল। তাহারা সত্যকে শুধু মনে মনে স্বীকার করিয়াই সন্তুষ্ট
পারিত না, জীবনে তাহাকে উপলব্ধি করিতে চাহিত :
আনন্দকেই তাহারা চরম বলিয়া বুঝিত না, বরং যেটুকু জীবনে
করিতে অক্ষম হইত সেইটুকুই তাহাদের নিকট সত্য ছিল।
Ideaকে তাহারা আচার অনুষ্ঠানে জীবন্ত করিতে চাহিত,
প্রদক্ষিণ করিয়া স্পর্শ করিতে চাহিত, তাহাকে সাধনার দ্বা
মাংসের রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে বা সৃষ্টি করিয়া তুলিতে ব্যাকু
কিন্তু এখন সে সব কিছু করিতে হয় না ; সুর করিয়া দুই চা
বলিবার ক্ষমতা জন্মিলেই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, ঘ
ঘণ্টামাফিক চক্ষু বুঁজিলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। প্রাচীন ব
মানসিকতার উৎকর্ষ হয় নাই বলিয়াই মানুষ অনর্থক অ
পাইয়াছে। বুদ্ধের কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছিল ! যে কথাটা
ভাবনা-কল্পনা থাকিলেই চট্ করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায় তার
নিজের কি কৃচ্ছ্রসাধন ! এবং পরের জন্য কত ধ্যান-ধারণা
পদ্ধতির ব্যবস্থা ! বুদ্ধের সেই তপস্যালব্ধ নির্ব্বাণ, এখন কেম

শনি... হইয়া উঠিয়াছে ! আধুনিক Intellectual বুদ্ধপন্থীরা তাহা কত
...উপলব্ধি করিতেছেন ! কেহ কেহ তাহার নূতন নাম দিয়াছেন,
...doir Nirvana'। কোনও হাঙ্গাম নাই, কোনও রূপ কৃচ্ছ্র সাধনের
...ঙ্গন নাই সুসজ্জিত কক্ষে আরাম-কেদারায় বসিয়া একটু ভাবের
...প্র্যাকটিস্ করিলেই হইল, দুই চারিটি মনোরম বাণী-বিন্যাস
...তে পারিলেই উপলব্ধির চরম হইল ! এমনি করিয়া প্রাচীনেরা
...দ বহু কষ্টে অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আমরা বুদ্ধিবলে তাহাকে
...শয় মোলায়েম করিয়া লইয়া ভোগ করিতেছি—মানসিক উৎকর্ষের
...ই মুখ্য ফল। সেকালে যাহাকে সাধনা বলিত তাহা asceticism
...onasticism নামক মধ্যযুগীয় প্রেতলীলার আনুষঙ্গিক ব্যাধি।
...জন্যই বোধ হয়, আমাদের দেশে যে নূতন ভারতীয় কাল্‌চারের
...ন হইয়াছে, তাহাতে এই মধ্যযুগের পৌত্তলিক কুসংস্কার বর্জ্জন
...। একেবারে আদি অকৃত্রিম উপনিষদের বাণীকে আশ্রয় করা
...ছে। ভগবান জানেন, উপনিষদের ঋষিরা সেকালের জীবন-
... ও তথা সাধনসমস্যার কতটুকু ধার ধারিতেন ; সম্ভবতঃ তাঁহারা
...য় স্বতন্ত্র স্বাধীন জীবন যাপন করিতেন। শূল্যপক্ক গোমাংস
...া, নরনারীর স্বচ্ছন্দমিলন এবং অপরিমিত সোমরসপান এ
...া মধ্যেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্ফুরিত হইত। সেই মুক্ত পুরুষদের বাণী
যখন উচ্চারণ করি তখন হিন্দুর সাধন ভজনের নানা দুর্গন্ধ
...র বিভীষিকা উৎপাদন করে না। যাহা শাশ্বত সত্য তাহার সঙ্গে
...্যাপারের যে কোনও সম্বন্ধ নাই, তার একটা বড় প্রমাণ এই যে,
...দের যুগে সমাজ যেমন ছিল, এখন অবশ্য তাহা নাই, তথাপি
...ত্যের এমনই মহিমা, তাহা এমনই শাশ্বতভাবে আধুনিক যে
...র সমাজে বরং উপনিষদের মন্ত্রই অধিকতর উপাদেয়, মধ্যযুগের

যাহা কিছু তন্ত্র তাহা নিতান্তই অচল—সেই অচলায়তনের ভিত্তিমূল উৎখাত করাই একমাত্র শ্রেয়ঃ পন্থা। এই আধুনিকতা এই Intellectual মুক্তি-মন্ত্র বিশেষ করিয়া বাংলা দেশেরই গৌরব। কারণ ভারতের নব যুগাবতার গান্ধী ভারতের সর্ব্বকালের সাধনার সারবস্তুকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন হইতে মধ্যযুগের বোটকা গন্ধ ঘুচে নাই। তিনি কৌপীনবস্ত ; তিনি নিরামিষভোজী ; আবার তিনি গীতার গুরুমন্ত্র জীবনে উপলব্ধি করিবার সাধনা করিয়াছেন ; তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী নহেন ; তিনি, কেবল উপনিষদ্ নয়, মহাভারতের বাণীকেও প্রার্থনা-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এক কথায়, তিনি intellectual honesty লইয়াই তৃপ্ত নহেন ; তিনি বিশ্বাসী সাধক। তাঁহার জীবনে মতের সঙ্গে পথের, সত্যের সঙ্গে আচারের—অর্থাৎ, ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের সঙ্গতি রক্ষার সাধনা আছে ; যে কেহ তাঁহার আত্মজীবনচরিত পড়িয়াছেন, তিনিই এই সাধনার পরিচয় পাইবেন। আমাদের দেশে এরূপ বর্ব্বরতার স্থান নাই। আমাদের নবধর্ম্মের নাম 'কাল্‌চার', অতিআধুনিক সমাজের আদর্শ স্থানীয় যাঁহারা তাঁহারাই ইহার চর্চ্চা ও প্রচার করিয়া থাকেন। এই intellectual মাখন টুকু আমাদের বহু যত্নের সামগ্রী। গান্ধীর সাধন-তত্ত্ব এই 'কুলচুর'এর নিকট নিতান্তই হেয়, এমন কি বালসুলভ অশ্লীলতা বলিলেও হয়। তাই গান্ধীর পরিবর্ত্তে, প্রমথ চৌধুরীই আমাদের গুরুস্থানীয়, আদিগুরু অবশ্য রবীন্দ্রনাথ। ইতিপূর্ব্বে সম্প্রদায় বিশেষের যেমন যুগ্ম নাম দেওয়া হইয়াছিল 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ', এই নব সম্প্রদায়ের সেইরূপ 'রবীন্দ্র-প্রমথ' দেওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। ইহারা শাশ্বত-পন্থী—যে সত্যের দেশ-কাল বন্ধন নাই, বাস্তবের সঙ্গে যাহার কোনও সম্পর্ক

যাহা intellectual মুক্তি, বা বিশ্বাস-বন্ধনচ্ছেদের অস্ত্র, যাহা ভাব-চিন্তা বা চিন্তা-ভাবের উদার অধিকারে সকলকেই মহিমান্বিত করে ইহারা সেই সত্যের উপাসক। এই মানস-মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে, ত্যাগের কোনও মূল্যই থাকে না—জীবনের কোনো কিছুতেই seriousness থাকে না! সত্য যাহা তাহা জ্ঞান-বিচারের বিষয় মাত্র, কোন কিছুকে বিশ্বাস করাটাই মূঢ়তা। যাহা সত্য তাহাই যে মিথ্যা, এবং মিথ্যাও যে সত্য; ইহা প্রমাণ করিতে কতক্ষণ লাগে? তার কারণ, মানুষ যাহা বিশ্বাস করে অর্থাৎ প্রাণে উপলব্ধি করে, তাহা খণ্ড সত্য মাত্র, ইতিহাসের ধারায় যুগবিশেষের প্রভাবে, যাহা প্রকাশ পায়, যাহাদের মন ছোট তাহারাই প্রতারিত হয়, বিশ্বাস-নামক ভূত তাহাদিগকে পাইয়া বসে। যাহাদের মনের উৎকর্ষ ঘটিয়াছে তাহারা সেই শাশ্বতকে উপলব্ধি করিতে পারে—যাহা কোনও যুগের অধীন নয়; যাহা সত্যও বটে, মিথ্যাও বটে, অথবা সত্যমিথ্যার অতীত; যাহার আশ্বাসে মানুষের কোনও দায়িত্ব-জ্ঞান আর থাকে না, জীবনটাকে কেবল বচনের বুক্‌নি ও তুড়ি দিয়া ফুঁকিয়া দেওয়া যায়।

* *

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক কাব্য' এই নামে একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন—বাংলা সাহিত্যের হাটে 'বিশ্ব-পরিশীলন'-এর সোল্ এজেন্ট যাঁহারা তাঁহাদেরই সখের পত্রিকায়। প্রবন্ধটির মধ্যে যে গুরুতর ও গভীর তত্ত্বকথা আছে তাহা শুধুই কাব্যবিচারে নয়, শাশ্বতবস্তু সম্বন্ধেও খাটে। তাই এই প্রবন্ধে এক ধরণের কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ভুলিয়া উহাতে 'আধুনিকতা' সম্বন্ধে যে দার্শনিক বুকতা আছে, তাহারই চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম; কাব্য

ছাড়াইয়া, যাহা সর্ব্বাশ্রয়ী শাশ্বত, তাহারই ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলাম। কথাটা সহসা অযুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে, তাই আরও দুইচারিটি কথা বলিয়া প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিব। ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা, আধুনিক যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ, যে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি, তাহার গুরু রবীন্দ্রনাথ; এবং রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি ঋষি ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ যাহা রচনা করেন তাহা নিছক 'নন্দন-তত্ত্বে'র এলাকাভুক্ত নয়, তাঁহার কাব্যমন্ত্র অতি গভীর সত্য-মন্ত্রও বটে; তাঁহার কাব্যদৃষ্টির অন্তরালে উপনিষদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আছে, বুদ্ধের ব্রহ্মবিহারও আছে; এক কথায় তাঁহার কোনও উক্তি একটা খণ্ড বিষয়ের গণ্ডিমধ্যে আবদ্ধ নয়; তিনি যখন যে বিষয়ে যাহা কিছু বলেন, তাহা ব্যাপকতর ও গভীরতর অর্থেই গ্রহণ করা উচিত; কারণ, এ সকল উক্তি অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বস্তুতঃ বাংলার আধুনিকগণ যে কুলচুর-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহার মূলে একটা মহা কবিমনোভাব বিদ্যমান আছে, একটি ভাবময় তুরীয় অনুভূতিই তাহার বিশেষ লক্ষণ। অতএব কাব্য সম্বন্ধে আলোচনায় এই মূল ভাব-তত্ত্বের কিছু অধিকার থাকিবেই, বরং তাহা না থাকিলে কাব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এজন্য "আধুনিক কাব্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিকতা'র যে শাশ্বত-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন উহাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাই আমি এই 'আধুনিকতা'র একটু ভাষ্য রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি—কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে 'আধুনিকতা'র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা Intellectual শাশ্বতপন্থীদের কি পরিমাণ উপকারে লাগিবে কাব্যবিচারের ব্যপদেশে রবীন্দ্রনাথ যে শাশ্বত-আদর্শের উত্তর মীমাংসা

রচনা করিয়াছেন তাহা আধুনিকগণকে কতখানি আশ্বস্ত করিতে পারে, আমি তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি।

* * *

উক্ত প্রবন্ধে, আধুনিক কাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার যে অর্থ করিয়াছেন তাহা যেমন সূক্ষ্ম তেমনই গভীর। কথাটা মৌলিক নয়, কারণ আমাদের দেশে আধুনিকতা বলিয়া কোনও তত্ত্ব কেহ স্বীকার করেন নাই, রবীন্দ্রনাথও করেন নাই। আমরা সনাতনপন্থী, ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায় তাহা লইয়া আমরা কখনও চিন্তা করি নাই, আমাদের সংস্কারই অন্যরূপ। য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার ইতিহাসে 'আধুনিক' কথাটা একটা বড় কথা; মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিকতার অভ্যুদয় সে দেশের ইতিহাসে একটা মহা যুগান্তর। এই আধুনিকতার প্রভাবে সমগ্র জগৎ ক্রমশঃ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে—আমরাও গত একশত বৎসর ধরিয়া আধুনিকতার সাধনা করিতেছি; কিন্তু সে সাধনা আমাদের রক্তগত সংস্কারের এমনই বিরোধী যে, তাহা আজ পর্য্যন্ত মর্কট-বৃত্তির অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না; অথচ সে আধুনিকতা জীবনের দিক দিয়া এতই সত্য যে তাহাকে অস্বীকার করিবার যো নাই। এই আধুনিকতাই এ যুগে আমাদের জাতির পক্ষে সেই পুরা-কথিত Sphinx-এর সমস্যা, তাহার সমাধান করিতে না পারিলে আমরা বাঁচিয়া থাকিব না। অতএব এই আধুনিকতাকে সনাতন সত্যের আদর্শে ব্যাখ্যা করিলে উচ্চ ভাবুকতার পরিচয় দেওয়া হয়, বাস্তবের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "পাঁজি মিলিয়ে মডার্ণের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা"—তখন আমরা ইহাই লক্ষ্য করি যে রবীন্দ্রনাথ এখানেও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট

হন নাই; তাঁহার ভাবস্বর্গে আধুনিকতার বাস্তব-উপদ্রব নাই। তিনি 'পাঁজি', অর্থাৎ ইতিহাস মানেন না; তাঁহার নিকট কালচক্র শাশ্বত ভাব-বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এক স্থানেই ঘুরিতেছে। এই জন্যই বোধ হয় তিনি হিন্দু-সাধনার ঐতিহাসিক বিকাশধারার প্রতি শ্রদ্ধাহীন; উপনিষদের ঋষিরাও তাঁহার সমকালবর্ত্তী; কিন্তু হিন্দু সমাজের পরবর্ত্তী ইতিহাসে যে মনীষা ও সাধনার সোপান-পরম্পরা বা তরঙ্গ-প্রবাহ রহিয়াছে তাহাকে তিনি গ্রাহ্যই করেন না। ইহা আমরা জানি, জানি বলিয়াই আধুনিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণায় বিস্মিত হই নাই। কোনও তত্ত্ব শাশ্বত বা সনাতন হইতে পারে, ইতিহাসের ধারার অন্তরালে কোনও একটা একই বুদ্ধির প্রেরণা হয়ত নিহিত আছে। কিন্তু সেই অন্তর্গত প্রেরণা বা শাশ্বত ভাব-সত্যকেই স্বীকার করিয়া তাহার ইতিহাসগত যুগপ্রবৃত্তিকে অস্বীকার করিলে সৃষ্টিকেই অস্বীকার করা হয়; ব্রহ্মার মানস-নিহিত সৃষ্টি-কল্পনার বীজ; এবং তাহার এই বিচিত্র রূপ-পরিণাম—যার সৃষ্টি হয় দেশে ও কালে—এই দুই তত্ত্বকে পৃথক বলিয়া স্বীকার না করিলে, বাস্তব উবিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক' কথাটি স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আধুনিকের আধুনিকতাই লোপ পায়। জানি না, এই মনোভাব তাঁহারও আধুনিক মনোভাব কিনা এবং তাহা কোন্ অর্থে। এককালে তিনি দেশকালকে অস্বীকার করিতেন না, শাশ্বত বা বিশ্বমানব এমন করিয়া তাঁহার ভাবকল্পনাকে আচ্ছন্ন করে নাই, তাই ভাগবতী সৃষ্টির লীলারসে মজিয়া তিনি উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি করিয়াছেন। আজ তাঁর নিকট কাল বড় নয়, ভাব বড়; অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ ভাবের হিসাবে একই; মানুষও এখন বিশ্ব-মানব, তার জীবন-নদীর ধারা-বৈচিত্র্য নাই—কালে তাহার গতি-

বৈশিষ্ট্য নাই, দেশে তাহার খাত-চিহ্ন নাই; নদী নাই, আছে সাগর; মানুষ নাই—আছে বিশ্বমানব।

*　　　*　　　*

রবীন্দ্রনাথ বলেন, কাল-নিরপেক্ষ শাশ্বত যাহা তাহাই প্রকৃত আধুনিকতা; যুগে যুগে যাহা আধুনিক বলিয়া সম্মান পায়; সেই সাধনার মূলে আছে শাশ্বত ভাব-দৃষ্টির প্রেরণা—"বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা"। তিনি বলেন—

"আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী তা হ'লে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদ্‌গত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।"

সমগ্র প্রবন্ধটির মধ্যে এই উক্তিটিই সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক ও গভীর—ইহার দ্বারাই 'কাব্য' ও 'আধুনিকতা'—দুয়েরই চূড়ান্ত বিচার হইয়া গিয়াছে। 'শাশ্বতভাবে আধুনিক'—অর্থাৎ কিনা, সহজ বুদ্ধিতে যাহার নাম 'সোনার পাথর বাটি'। বোধ হয় এই জন্য এই প্রবন্ধেই উক্ত বাক্যের বিরুদ্ধবাদ আছে। কাব্যের ইতিহাস ও কাব্যরসের সার্ব্বভৌমিক ধারণা এক নহে, তাহা আমরা জানি। তথাপি কাব্যের ইতিহাস আছে—যুগান্তরে কাব্যপ্রবৃত্তির একটা স্পষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। সেই পরিবর্ত্তনের সকল লক্ষণকেই যদি একের পর এক—'এহ বাহ্য' বলিয়া ক্রমাগত ভিতরেই প্রবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে কাব্যজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় কোনও পার্থক্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথ এই শাশ্বত আধুনিকের ধারণা কাব্যে প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন—'আধুনিক কাব্য নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে'। এটা

ইতিহাসের কথা নয়; কাব্যসৃষ্টির actual factএর কথা নয়—একটা তত্ত্বকথা মাত্র। কারণ, 'নিরাসক্ত চিত্ত' 'সমগ্রদৃষ্টি' প্রভৃতির দ্বারা যে absolute objectivityর ইঙ্গিত তিনি এখানে করিয়াছেন—প্রথমতঃ, তাহা এ পর্য্যন্ত খুব অল্প কাব্যেই ঘটিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, কবিমানসের objectivity বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি নয়; বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতা বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম হইতে পারে, কবির নহে। তারপর, কবিকে বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি ও সমগ্রদৃষ্টি এই দুয়েরই অধিকারী হইতে হইবে, অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিকভাবে কবি হইতে হইবে—তাহারই নাম শাশ্বতভাবে আধুনিক হওয়া; কারণ এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিটাই আধুনিক, অথচ, কবি-মনোভাব শাশ্বতকালের! কিন্তু আধুনিকতা হিসাবে ইহা নিতান্তই এ যুগের; এ পর্য্যন্ত আর কোনও যুগের কাব্যে এই অপূর্ব্ব আধুনিকতার লক্ষণ দেখা যায় নাই; সেই জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন চীনা কবিতার শরণাপন্ন হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি; ঐ চীনা কবিতার নমুনা পড়িয়া আমাদের গায়ে জ্বর আসে—এই গৃহী-অবস্থাতেই লোটা-কম্বলের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করি; কারণ দুইটি মাত্র বালাই তখন থাকে—জল-পিপাসা আর কম্প। বাপ—কি ভাবুকতা! কি আধ্যাত্মিক সমগ্রদৃষ্টি! কি নিরঞ্জনা কবি-কল্পনা! নিরাসক্ত চিত্তই বটে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, এই যে আধুনিকতা ইহা ইউরোপ বিজ্ঞানের মধ্যে লাভ করিয়াছে, কাব্যে এখনও পায় নাই, কিন্তু প্রাচ্য চীন তাহাকে কাব্যেই লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ করিয়াছে কি? না, বোধ হয়। হায় ভারতবর্ষ! ধন্য চীন!—কবে তুমি আমাদের এবং সারা জগতের—কাব্য-গুরু হইবে? যদি দাড়ী না থাকে, আমরা ধার দিব।

* * *

রবীন্দ্রনাথ কাব্যের যে ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায়, এ পর্য্যন্ত কাব্যে সমগ্র দৃষ্টি অথবা বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি কোথায়ও দেখা দেয় নাই। ক্লাসিক্যাল যুগ হইতে রোমান্টিকযুগ, রোমান্টিকযুগ হইতে মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ—এই যে সব যুগান্তর, তাহাতে কবি-প্রবৃত্তি যে বাঁক বা মোড় ফিরিয়াছে—কই, তাহার মধ্যে শাশ্বত-আধুনিকতার সে ছাপ ত নাই? এ সকল যুগের কোনটাতেই কবিগণ একেবারে নিরাসক্ত চিত্তে, নির্ব্বিকার ভাবে বিশ্বকে দেখেন নাই ত? তিনিই বলিয়াছেন, প্রাচীন কালের কবিগণ গোষ্ঠী পরিবার ও সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কাব্যরচনা করিতেন, তাঁহাদের ভাব ছিল সমষ্টিগত। রোমান্টিক যুগে ব্যক্তি-মনোভাবই প্রধান হইয়া দাঁড়াইল, কল্পনায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা আত্ম-মোহ ফুটিয়া উঠিল। মধ্য ভিক্টোরীয় যুগে 'বিশ্ব-বিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাই" কবিকল্পনার বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তির মধ্যেই কবি-কল্পনা কোথায়ও নিরাসক্ত নহে; বরং সেই আসক্তির বিভিন্ন ভঙ্গিই এক-এক যুগের আধুনিকতা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। তথাপি রবীন্দ্রনাথ বলেন কাব্যের আধুনিকতা একটা শাশ্বত বস্তু, তিনি আধুনিক ও শাশ্বত, এই দুইকে এক বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন, প্রকৃত আধুনিকতা কালগত নয়, ভাবগত, সে ভাব শাশ্বত; তাই আধুনিকতার মূলে আছে শাশ্বতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। ভাবের উপরে কালের যদি কোনও প্রভাব না থাকে, ভাবের সঙ্গে কালের যদি কোনও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ না থাকে; তবে বলিতে হয়; এই ভাবের সঙ্গে জাগতিক ব্যাপারের কোনও সম্পর্ক নাই, ভাব যদি কাল-সম্পর্ক-শূন্যই হয় তবে সৃষ্টিই মিথ্যা হয়; এবং সেই, কারণে কাব্যেরও বিশিষ্ট প্রেরণার কোনও অর্থ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সোজা চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ণ্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে।"

'সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে'—এই মর্জ্জিটা কার? সময়ের প্রভাবমুক্ত কোনও ভাবুক ব্যক্তিবিশেষের? না উহা উপযুক্ত ব্যক্তির আধারে কাল-প্রভাবের অভিব্যক্তি? এরূপ দার্শনিক সমস্যার সমাধানে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা ইহাই জানি যে, কাব্যের মূল্য তাহার অন্তর্গত ভাব হিসাবেই বটে; তথাপি, যে-রূপে তাহা মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করে তাহাতে জগৎ ও জীবনের ছায়া আছে—আছে বলিয়াই সে-রূপের বিবর্ত্তনও আছে। যাহা শাশ্বত তাহার মূল্যবৃদ্ধি হয় কালের বিশেষণে—যুগবিশেষের 'আধুনিকতা'য়; সেই আধুনিক যখন আমাদের চেতনাকে আঘাত করে, তখন যদি তাহার শাশ্বত ভাব-রূপটিকেই চিনিয়া লইয়া আমরা আশ্বস্ত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা একটি আধ্যাত্মিক নিশ্চেষ্টতার সুখ উপভোগ করিতে পারিতাম; কাব্য সৃষ্টিতেও কোনও অভিনব ভঙ্গির বিকাশ হইত না।

* * *

রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে আধুনিকতার যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারই ব্যাখ্যা অনুসারে যে বিরুদ্ধবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তার সম্বন্ধে কিছু বলিব। তিনি বলিয়াছেন (আমরা যেমন বুঝিয়াছি) যে, কাব্যের বিশুদ্ধ আধুনিকতা নির্ভর করে একটি বিশেষ গুণের উপর, সে গুণটি এই—'ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে নিরাসক্তভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা'। প্রশ্ন উঠে, এইরূপ আধুনিকতা ইতিপূর্ব্বে কোনও কালের কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে? ইহার উত্তরে তাঁহার কয়েকটি কথা

প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'এ আধুনিকতা কোনো বিশেষ কালের নয়', এটা 'সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে'। মূল প্রশ্নের সোজা উত্তর পাওয়া গেল না, কেবল ইহাই জানা গেল যে, যে-কোনো যুগেই এই আধুনিকতার অভ্যুদয় হইতে পারে; কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা সে প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না পাওয়া গেলেও তাঁহার অন্যান্য উক্তি হইতে অনুমান হয়, তাহা হয় নাই। কারণ এই বিশুদ্ধ আধুনিকতার লক্ষণ যদি 'নিরাসক্ত চিত্ত' 'নির্ব্বিকারভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে জগৎকে দেখা' প্রভৃতি হয়, তাহা হইলে কি প্রাচীন কি আধুনিক বা অতিআধুনিক, কোনও কাব্যেই তাঁহার প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে এই সকল লক্ষণ নাই। ক্লাসিক্যাল, রোম্যাণ্টিক, মধ্যভিক্টোরীয় প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের কাব্য সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, এই বিজ্ঞানসুলভ 'নিরাসক্তচিত্ত' বা 'সমগ্রদৃষ্টি' সেই সকল কাব্যে নাই। অতি-আধুনিক কাব্য সম্বন্ধেও তিনি সে লক্ষণ স্বীকার করেন না। এই আধুনিক কাব্যের একটা লক্ষণ ইহা নৈর্ব্যক্তিক, impersonal; ইহাতে মোহ নাই—ইহাই তাঁহার মত; তথাপি এ কাব্যে সেই শাশ্বত বিশুদ্ধ আধুনিকতা নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিলেই আমাদের সংশয়ের কারণ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তিনি বলেন, "কাব্যে বিষয়ীর (কবির) আত্মতা ছিল উনিশ (?) শতাব্দীতে, বিশ (?) শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা"। আরও বলেন, এ কালে "আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে"। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল—সেটা একটা মোহ, অতএব তাহা বিশুদ্ধ বা শাশ্বতভাবে আধুনিক ছিল না। আবার

এ যুগের কাব্যে ব্যক্তিগত আসক্তভাব একেবারেই নাই, বস্তুর প্রতি মোহ নাই, আছে তার সমগ্রতার আত্মঘোষণা। তবু এ কাব্য 'আধুনিক' নয়; কেন?—রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে বলিতেছেন—

"কিন্তু আধুনিকতার যদি কোন তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি, এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার।

এসকল উক্তির পূর্ব্বাপর যুক্তির সঙ্গতি সম্বন্ধে কিছু বলিব না, কিন্তু অর্থ কতকটা এইরূপ দাঁড়ায় না কি?—উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে মোহ ছিল, তবে সেটা চিত্তবিকার নয়, কারণ তাহাতে বিশ্বকে সুন্দর করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি আছে। আর, আধুনিক কাব্য এই অর্থে মোহমুক্ত যে তাহা নৈর্ব্যক্তিক, তাহাতে বিষয়ীর আত্মতা নাই, বিষয়ের আত্মতা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কাব্যও বিশুদ্ধ আধুনিকতা দাবী করিতে পারে না, কারণ মোহ না থাকিলেও ইহাতে চিত্তবিকার আছে। প্রভেদটা অনেকটা Tweedledum ও Tweedledeeর মত নয় কি? একটাতে ব্যক্তিগত ভাব আছে, আর একটা নৈর্ব্যক্তিক—তথাপি, এ-পিঠ আর ও-পিঠ; একটায় যেমন মোহ, অপরটায় তেমনই চিত্তবিকার। তাই যদি হয় তবে এই আধুনিক কাব্য নৈর্ব্যক্তিক হয় কি করিয়া? এ দার্শনিক বিচার বড়ই সূক্ষ্ম!

* * *

আসল গোল বাধিয়াছে ওই সংজ্ঞাটি লইয়া। সংজ্ঞাটি চমক লাগাইবার মত বটে, কিন্তু আমরা আরও চমকিত হইতেছি এই ভাবিয়া যে এই সংজ্ঞা অনুসারে একমাত্র চীনা কবিতাই টিকিয়া গেল—উনবিংশ শতাব্দীর ত' কথাই নাই—রবীন্দ্রনাথের নিজের

কবিতাও বিশুদ্ধ বা শাশ্বতভাবে আধুনিক হইতে পারিল না! একি সহজ আধুনিকতা! এই জন্য অন্ততঃ কাব্য সম্বন্ধে এ সংজ্ঞা অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে; গ্রাহ্য করিতে গেলে সকল কাব্যই আদর্শচ্যুত হইয়া পড়ে। যাহাকে কাব্যের Objectivity বলে, আমি এখানে তাহার আলোচনা করিব না, যদিও তাহাকেই আমি কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা বলিয়া মনে করি,—কারণ, এযুগে কাব্যের যে রস উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে খাঁটি Objectivityর যেমন কোনও মূল্য আর নাই, তেমনই তাহাকে কেহ স্বীকারই করিবে না। রবীন্দ্রনাথ যে 'ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখা'র কথা বলিয়াছেন তাহা এই Objectivity সম্পর্কে খাটে! কিন্তু তিনি যে বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিরাসক্তচিত্তের কথা ঐ সঙ্গে বলিয়াছেন, শাশ্বত ও আধুনিক, এই দুয়ের যে অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কাব্য একেবারে metaphysics হইয়া উঠিয়াছে। এইবার আমরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি পর পর উদ্ধৃত করিব; তদ্দ্বারা এই প্রবন্ধে কাব্য সম্বন্ধে তিনি যে ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা যে কত সুসঙ্গত ও সুস্পষ্ট সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। এই উক্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই যুক্তিপ্রণালীটি আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে—যথা, মোহ, মায়া, অনুরাগ, নৈর্ব্যক্তিক, নিরাসক্তচিত্ত, শাশ্বত ও আধুনিক।

(১) কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপনার নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে। বাইরের সে সজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না।

(২) সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ, সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু বিজ্ঞান তার নাড়ি-নক্ষত্র বিচার ক'রে দেখেছে,

বলচে মূলে মোহ নেই, আছে কার্ব্বণ, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এই গুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকে জানতুম মুখ্য।

(৩) আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হ'লে আমি বলব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদ্‌গত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

(অর্থাৎ, বিজ্ঞান যে মনোভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করে, কাব্যেও ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে 'সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে'। মনোভাব হইবে একই, কিন্তু কাজটা হইবে সম্পূর্ণ বিপরীত—ফরমাসটা খুব সঙ্গত বটে !)

(৪) দেখা যাচ্চে উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে ইংরেজী কাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তীকালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হোলো আধুনিকতা।

(৫) আমরা যখন ইংরেজী কাব্য পড়া সুরু করলুম তখন সেই আচারভাঙা ব্যক্তিগত মর্জ্জিকেই সাহিত্য স্বীকার করে নিয়েছিল।...আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্ত কাল।

(৬) পাঁজি মিলিয়ে মডার্ণের সীমানা নির্ণয় করবে কে ? এটা কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা।...এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে।

(৭) বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয়সম্বন্ধ বন্ধনে নয়। আমি কি ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড় নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিষটা স্বয়ং ঠিকমত কি সেইটেই বিচার্য্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

(৮) সে (আধুনিকতা) বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে।

(৯) একেই (একটি আধুনিক কবিতার ভঙ্গীবৈশিষ্ট্যকে, বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক) impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদদার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখতে হোলো, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না।...তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিসির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা।...কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তো আর কোনো জবাবদিহি নেই, যদি না হয়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে শুধু থাকে ভাবলালিত্য, তা' হলে সেটা বর্জ্জনীয়।

(১০) এই জন্যে আজকের দিনে যে সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম্ম মেনেচে, সে সাবেক কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই।

(১১) যদি বলা হয় আগেকার কবিরা বাছাই করে কবিতা লিখতেন, অতি আধুনিকেরা বাছাই করেন না সে কথা মানতে পারি নে; এঁরাও বাছাই করেন... অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিষ খায়।...কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, তা' হলে শুচি জিনিষে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়?

(১২) কিন্তু আধুনিকতার যদি কোন তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায় তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই।

(১৩) ব্যাপারখানা (বিশ্ববিষয়ের প্রতি গায়ে পড়া বিরুদ্ধতা) স্বাভাবিক নয়, অতএব শাশ্বত নয়। সায়ান্সেই বলো আর আর্টেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বাহন, য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েচে কিন্তু সাহিত্যে পায়নি।

* * *

উপরি উদ্ধৃত উক্তিগুলির উপর পৃথক মন্তব্য করিবার প্রয়োজন নাই—বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন এগুলির মধ্যে কতখানি চিন্তার ঐক্য আছে। তথাপি আমরা

দুই একটি কথা বলিব। রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা অনুসারে আধুনিকতার দাবী প্রায় কোনও যুগের কাব্য করিতে পারে না, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আধুনিকতম কাব্যের আধুনিকতাও খাঁটি নহে, তাহাতেও চিত্তবিকার বা মোহ আছে। এই উক্তিগুলি হইতে আর একটা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে না যে, "নির্ব্বিকার নিরাসক্ত চিত্তে"র নৈব্যক্তিকতাই বিশুদ্ধ আধুনিকতা, ও তথা বিশুদ্ধ কাব্যের লক্ষণ হইলেও রবীন্দ্রনাথ নিজে শেষ পর্য্যন্ত কাব্যে এক ধরণের মোহকে অত্যাবশ্যক মনে করেন; আধুনিকদের বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তি এই যে তাহাদের এই মোহ অশ্রদ্ধার মোহে পরিণত হইয়াছে—হওয়া উচিত ছিল শ্রদ্ধা বা সুন্দর-প্রীতি। ইহা সত্ত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিকের মনোভাবকেই শ্রেষ্ঠ attitude বলিয়া বরণ করিয়াছেন। বুঝা যাইতেছে এই মনোভাবকেই তিনি খাঁটি আধুনিকতা বলিয়া স্বীকার করেন, অথচ কাব্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে যত কিছু গোল বাধাইয়া বসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই 'আধুনিকতা' যে কি বস্তু, আশা করি, বহু আলোচনাতেও তাহা কাহারও বোধগম্য হইবে না। অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক ভাষ্য রচনা করিয়া হয় ত তাহা জলের মত পরিষ্কার করিয়া তোলা সম্ভব—কিন্তু সে শক্তি আমাদের নাই! "যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা" যদি কেহ থাকেন, তিনিই এই 'হিং টিং ছটে'র সমস্যা পূরণ করিতে পারিবেন। তখনও যদি আমরা বুঝিতে না পারি, তবে অবশ্য আমাদের আর আশা নাই।

* * *

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের এই দ্বিধা ভাবের কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ঘোরতর আধুনিক—'সবার আমি সমান-বয়সী যে, চুলে আমার যতই ধরুক পাক"। কালের সঙ্গে পাল্লা দিয়া আধুনিকতা

বজায় রাখিতে হইলে এবং সেই সঙ্গে আত্ম-ভাবের ঐক্য বজায় রাখিতে হইলে, 'শাশ্বত-আধুনিকে'র দোহাই দিতে হয়। ইহার ফলে চাপিয়া ধরিলে, বলিতে হয়, আধুনিককে মানি এবং মানিও না। বড় মুস্কিলের কথা! সাধারণ মানুষ এই সত্য-মিথ্যার সমন্বয়মূলক অতি উচ্চ ভাব-মন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, কাজেই intellectual honestyর কথা পাড়িয়া বসে, নানা গোলযোগের সৃষ্টি করে। আধুনিক কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অরুচি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই—অথচ তিনি দেশী আধুনিকদের মধ্যে একজন বড় মুরুব্বি তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। আধুনিক কাব্যের রসে যাহারা ডুবুডুবু, তাহাদেরই অনুরোধে, তাহাদের পত্রিকায় তিনি আধুনিকতার যে ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন—প্রশ্নের যে উত্তর লিখিয়াছেন, তাহা এই সব গুরুমারা চেলাদের অপ্রিয় হইলেও তিনি এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন নিশ্চয়; যেমন, শিষ্যগণ যতই অনাচার করুক, গুরুর স্মিতহাস্যের আশীর্ব্বাদ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে না, ইহাও নিশ্চিত। অতিআধুনিক অঘোরপন্থীদের সঙ্গে এমনই একটা বনি-বনাও করিয়া লইয়াই ত রবীন্দ্রনাথ টিঁকিয়া আছেন, এবং টিকিয়া থাকাটাই সব চেয়ে বড় কথা। একদিন কবি যে বলিয়াছিলেন—"কালিদাস ত নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে"—সেটা কেবল লঘু পরিহাসের উক্তি নয়, তাহা মর্ম্মান্তিক ভাবে গুরুতরও বটে। "আমি আছি"—এইটাই সব চেয়ে বড় কথা, ইহাই শাশ্বত সত্যের আত্মঘোষণা। এই 'আমি আছি'র লীলায় যত বিঘ্ন আছে তাহাই মিথ্যা। "আমি আছি"র সঙ্গে "তুমিও আছ" মানিতে হইবে। প্রত্যেক 'আমি' অপর 'আমি'র বিরোধী—এ বিরোধ বাহ্যিক, ইহাই মোহ: বরং বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই যে ঘনিষ্ঠতার ভাব ইহাই

আধুনিক Intellect-ধর্ম্মীর মূল মন্ত্র। অতএব রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিকতার সমর্থন না করিলেও, সাহিত্যিক বিশ্বামিত্রগণ যে তাঁহারই আশিস-অভিনন্দনে নন্দিত হইয়া দলবৃদ্ধি করিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এই জন্যই আধুনিকেরা রবীন্দ্রনাথকে অধিকতর শ্রদ্ধা করে, কারণ ধর্ম্মবিশ্বাসের মত কোনও বিশ্বাসের দাসত্ব করাকে তাহারা মধ্যযুগের কুসংস্কার বলিয়াই মনে করে। সত্য জিনিষটাই একটা আপেক্ষিক তত্ত্ব; কোনও কিছুকে নিঃসংশয়ে ধরিয়া থাকা নিদারুণ মূঢ়তা বই ত' নয়! রবীন্দ্রনাথ কোনও একটা আদর্শের পক্ষপাতী হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যদি উল্টা আদর্শকে বরদাস্ত করিতে না পারেন, সেইটাই হইবে তাঁহার মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয়। যে faith একদিন মানুষকে যুদ্ধ করাইত, যে একনিষ্ঠা একদিন মানুষকে তাহার জীবনের সর্ব্ব আচরণে একই নীতির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিত, তাহা যদি রবীন্দ্রনাথকেও বাঁধিয়া রাখে,—তাঁহার মত মনীষী যদি কোনও তত্ত্বকে নিরাসক্তভাবে উপলব্ধি না করিয়া, তাহাতে এমন ভাবে আসক্ত হইয়া পড়েন যে সেটা একটা বিশ্বাস হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার ফলে, তিনি তাঁহার মনকে ছাড়িয়া দিবার মত কোনও খানে কোনও সংশয়ের অবকাশ না রাখেন, তবে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা কোথায়? হয় ত ইহাই সত্য, আমরা তাহা বুঝি না বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের অযথা নিন্দা করি।

* * *

কিন্তু সে কথা থাক। 'আধুনিকতা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মনোভাব যাহাই হউক, আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা উদাহরণ সহযোগে তিনি বলিয়াছেন, তাহা এক হিসাবে যেমন মৌলিক, তেমনই যথার্থ। কেবল, কথাটা আর একটু সোজা, অর্থাৎ দার্শনিক

পরিভাষা-মুক্ত করিয়া বলিলে আরও উপাদেয় হইত। তিনি বলিয়াছেন,

"এখনকার কাব্যের যা বিষয় তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তা' হলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়? তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে; ইংরেজীতে যাকে বলে ক্যারেক্‌টার।"

এই ধরণের আরও অনেক কথা তিনি বলিয়াছেন। এ সকল উক্তির অর্থ এই যে,—এ কাব্যে ব্যক্তি নাই আছে বিষয়; সেই বিষয়ের রূপটি আমাদের মন ভোলায় না, তার বিশিষ্ট সত্তা, তার ক্যারেক্‌টার আমাদের মনে খোঁচা দেয় মাত্র। এই টুকু তার কাব্যত্ব! অন্যত্র বলিয়াছেন—

"এখনকার আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মান্‌লে না, মান্‌লে ক্যারেক্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে।"

ইহাও কাব্য-আলোচনার ভাষা নয়, ইহা দর্শন-সূত্রের ভাষা। এজন্য এরূপ উক্তির গভীরতর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে এই আধুনিক কাব্যের এক প্রকার গৌরব-বৃদ্ধি হয়। দর্শনের ইদং তত্ত্বকে যদি এই আধুনিক কাব্য এমন করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে কাব্য চুলায় যাক, এইটাই যে একটা মহাকীর্ত্তি! কিন্তু সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন, আধুনিক কাব্যে মোহ বা চিত্তবিকার আছে, অর্থাৎ ইদং-এর বিশুদ্ধ রূপ তাহাতে নাই; তাহা হইলে পূর্ব্বের উক্তি অনর্থক হইয়া পড়ে। আধুনিক কাব্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া তাহার কয়েকটি লক্ষণ অতি সুন্দরভাবে নির্দ্দেশ করিলেও, অতিরিক্ত দার্শনিকতার মোহে তিনি কতকটা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের মনে হয় এই 'আত্মতা' বা ক্যারেক্টারের উপর জোর না

দিয়া, তিনি যদি আধুনিক কাব্যে কল্পনার একান্ত অভাবের কথাটাই আরও স্পষ্ট করিয়া সহজ ভাষায় বলিতেন তাহা হইলে আলোচনা এত জটিল হইত না। কথাটা আর কিছু নয়, আধুনিক কাব্যে বিষয়-বস্তুর যে প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় তার কারণ লেখকদের ভাব-কল্পনার দৈন্য ; ইহাদের ভাবও নাই, আছে কাঁচা sensation মাত্র। যে মানসিকতা অলস ইন্দ্রিয়ানুভূতি মাত্র ; যাহা কল্পনার উচ্চতর মনোভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না—সেইটুকু মানসিকতাই ইহাদের সম্বল। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে 'বিষয়ের আত্মতা' বলিয়াছেন, তাহা আর কিছুই নয়—সর্ব্বপরিবেশমুক্ত একটা খণ্ড সত্তা মাত্র। সমগ্রের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। এই sensation তীব্র হইতে পারে—যেমন, এমি লোয়েলের কবিতায় চটিজুতার আঘাত, কিন্তু তাহা মূঢ় চৈতন্যের অবস্থায় তপ্ত লৌহশলাকাস্পর্শের মত ; শরীরে তীব্র সাড়া জাগে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ইহাদের এই অনুভূতিমাত্র আছে, পশুর মত শিহরিয়া উঠে, চীৎকারও করে ; কিন্তু বস্তুসকলের সম্বন্ধজ্ঞান নাই, এক একটা sensation এই এক এক বস্তুর শেষ। এই অনুভূতি, এই অতিবিচ্ছিন্ন খণ্ড ইন্দ্রিয়চেতনা, মানুষের পক্ষে যতটুকু বোধযুক্ত বা বুদ্ধিসম্পন্ন না হইয়া পারে না, ইহাদের কাব্যে তাহারই পরিচয় আছে। ইহাদের রাগদ্বেষ sensation-গত, ভাব-গত নয় ; যে মোহ কল্পনার জননী, সে মোহ ইহাদের নাই, কারণ, এই মোহই ত' সৃষ্টিপ্রতিভার মূল—বাহিরের খণ্ড বিষয়গুলাকে অন্তরের ভাবসূত্রে গাঁথিয়া জগৎকে পুনঃ সৃষ্টি করে। এ সৃষ্টি-প্রতিভা তাহারা পাইবে কেমন করিয়া? তাহাদের যে সেই অন্তর নাই, আছে কেবল বাহিরের খণ্ড-সমষ্টি। রবীন্দ্রনাথ যদি এই খণ্ড-জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির নিদান বলিয়া, এবং বৈজ্ঞানিক মনই বিশেষভাবে আধুনিক মন বলিয়া এই কাব্যকে এক অর্থে আধুনিক আখ্যা দিয়া থাকেন, তবে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কেবল ওই সঙ্গে আর একটি কথা যোগ করা দরকার তাহা এই যে, এ সকল রচনা 'আধুনিক' হইতে পারে, কিন্তু কোন অর্থেই তাহা 'কাব্য' নয়।

প্রসঙ্গ-কথা

গত সংখ্যার মাসিক 'বসুমতী'তে 'সাহিত্যিক মোরগের লড়াই' নামে একটি লেখা আমরা পড়িয়াছি। আসরে মোরগের লড়াইএর জন্য আমরা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথও সে প্রসিদ্ধি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অতিশিষ্ট শ্লেষের ভঙ্গিতে কতকটা বাড়াইয়া দিয়াছেন; সেই সূত্র ধরিয়া 'বসুমতী'র লেখক এই মোরগের লড়াইএর ইতিহাসকে আরও পূর্ব্বকালে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাহাতে আমাদের এই ক্ষতি হইয়াছে যে, আমরাই সেই নাটের আদি গুরু হওয়ার গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি. লেখকের সহিত আমাদের এমন কি শত্রুতা ছিল যে, ঐ টুকু গৌরবও তিনি আমাদিগকে দিতে রাজী নহেন? যাই হোক, তাহাতে কোনও দুঃখ ছিল না, কিন্তু তিনি ঐ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে বাড়াইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-প্রতিভার প্রতি যে কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তার জন্য বিস্তর দুঃখ করিয়াছেন, এবং রবীন্দ্রনাথের এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাতে আমরা লেখকের সহৃদয়তার প্রশংসা করিলেও সুবুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমরা কিঞ্চিৎ আমোদও না পাইয়াছি এমন নয়। ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে রক্ষা করিতে গিয়া বার বার শরৎচন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছেন, তাই পুনঃ পুনঃ শরৎচন্দ্রের প্রতিভাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মামলাটা চালাইয়াছেন; পাছে লোকে এমন ভাবে যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক শরৎচন্দ্রের প্রশংসায় অসহিষ্ণু হইয়াছেন। বড় সাবধানে

চলিতে হইয়াছে, পাছে এ যুদ্ধে তাহার নিশিত শরজাল কোনও ফাঁকে শরৎচন্দ্রের উপরে পতিত হয়। আমরা বুঝিয়া দেখিলাম যে লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রতি রূঢ় হইতে সঙ্কুচিত নহেন, সে সৎসাহস তাঁহার আছে ; কিন্তু শরৎচন্দ্রের মহিমা এতটুকু ক্ষুণ্ণ করিতেও তাঁহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

* * *

লেখক যখন বঙ্কিমের পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তখন দুইটি কথা তাঁহার মনে রাখা উচিত ছিল। প্রথম, বঙ্কিমচন্দ্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন এমন ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথেরও নাই ; বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার জবান যদি সত্যই বেঠিক হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রতিবাদ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য কান্নাকাটি করা আদৌ শোভন নয়। দ্বিতীয় কথাটি এই যে বঙ্কিমের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনাই হইতে পারে না, একজন giant, আর একজন pigmy। একথা বুদ্ধিমান বাঙ্গালী মাত্রেই জানে—ইহার জন্য তর্ক করিবার প্রয়োজন হয় না। সাহিত্যরসজ্ঞান যাহার এতটুকু আছে, প্রতিভার সাধারণ পরিমাপও যাহার অসাধ্য নহে, সেই বিনা দ্বিধায় এ কথা স্বীকার করিবে। বাংলা সাহিত্যের দেব-সভায় বঙ্কিমচন্দ্র বজ্রপাণি ইন্দ্র ; তাঁর সেই বিদ্যুৎ-বলয়িত রাজ-মহিমার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মহিমা যে নিতান্তই তুলনার অযোগ্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কি উকীল খাড়া করিতে হইবে? শরৎচন্দ্র সুলেখক ঔপন্যাসিক মাত্র—তিনি একজন কথা-শিল্পী, তিনি কবি-মনীষী নহেন ; বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবেও অতি উচ্চ কবিদৃষ্টির অধিকারী, সে কবি-প্রতিভার সঙ্গে যে মনীষা যুক্ত হইয়াছিল, তাহা আধুনিক কালে কয় জন বাঙ্গালী দাবী করিতে পারে? আজ যদি কথাশিল্পের নূতন

আদর্শ বা ফ্যাশন অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি বাতিল হইয়া যায়, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার গৌরবহানি হয় না—সেকস্‌পীয়ার মিলটন, গেটে, হিউগো এ কালের রসিকসমাজে বাতিল হইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বকালের রসিকসমাজে তাঁহাদের আসন কি অচল অটল হইয়া নাই ? একালের বাঙ্গালী বড় দরদী হইয়া উঠিয়াছে, কাব্যে উপন্যাসে যে লেখকের যত 'দরদ' সে-ই তত জনপ্রিয় ; তাই রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রের আড়ালে পড়িয়াছেন। যেমন ধর্ম্মে তেমনই সাহিত্যে, এই জাতিগত Sentimentalism আমাদের মাথা খাইয়াছে —সাহিত্যেও 'ন'দে ভেসে যাওয়া' চাই, যে যত ভাসাইতে পারে সেই তত মনের মানুষ। শুধুই আধুনিক কালের মনোভাব বলিয়া নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে শরৎচন্দ্রকে স্থান দিবার প্রবৃত্তি এ জাতির স্বভাবধর্ম্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মূল্য বুঝিতে হইলে সে ধরণের রসবোধ, ভাব-কল্পনাতেও যে পৌরুষ ও চারিত্র-প্রীতির প্রয়োজন তাহা এ জাতির সংস্কারে নাই। আমাদের দেশে সাহিত্যবিচারের বালাই একালে প্রায় নাই বলিলেই চলে, অধুনা যে নেড়ানেড়ীর মেলা বসিয়াছে, তাহাতে সাহিত্য-বিচারের নামে বিদ্বম্মন্য আপ্‌রুচিওয়ালাদের নিন্দা-প্রশংসার নাগরদোলায় কে কখন উঠিতেছে ও পড়িতেছে, তার হিসাব রাখিয়া কোনও লাভ আছে ?

* * *

উক্ত প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অনুযোগ করিয়াছেন—এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন, যে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার এই মত-পরিবর্ত্তনের মূলে আর কোনও কারণ আছে। কিন্তু, আমরা জানি, সে কারণ অতিশয় সঙ্গত। লেখক বোধ হয় জানেন না, শরৎচন্দ্র নিজে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন না ; তাঁর গুরু রবীন্দ্রনাথ; একমাত্র

রবীন্দ্রনাথের নিকটেই এই সাহিত্য-বীর নিজ প্রতিভার বিন্ধ্যগিরিকে অবনমিত করিতে রাজী আছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শরৎচন্দ্রের এই মনোভাব হয় ত' আত্মগৌরবজনিত নয়; তাহা আন্তরিক। আমরাও তাহা অবিশ্বাস করি না, কারণ শরৎচন্দ্রের পক্ষে তাহাই সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শুধুই 'দরদী' লেখক হইলে হয় না—আরও যাহা হওয়া দরকার, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-বোধ ও বিচারশক্তির যে পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি তাহাতে সে লক্ষণ দেখি নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমের কবি-প্রতিভাকে পূর্ব্বের মত শ্রদ্ধা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন কেন? সম্ভবতঃ তিনিও অতি মাত্রায় আধুনিক হইয়া পড়িয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার একটা বিরাগের কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বমানবতার অতি উদার কাল্‌চার আয়ত্ত করিতে পারেন নাই; তিনি জাতির ধর্ম্ম ও জাতির ইতিহাসকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করিতেন। তা' ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই যেভাবে মানুষ হইয়াছিলেন তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁহার একটা সুগভীর অশ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইবার কথা; একদিকে 'তত্ত্ববোধিনী' এবং অপরদিকে 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' হিন্দুর হিন্দুত্ব লইয়া যে বিবাদ-বিতর্ক চলিয়াছিল তাহার কিছু আভাস এই প্রবন্ধ-লেখকও দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা সেকালে রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করিলেও, কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইলেও আর এক দিকে একটা বিরোধমূলক বক্রতা চিরদিনই প্রচ্ছন্ন থাকিবার কথা। রবীন্দ্রনাথের তখন কাঁচা বয়স, রক্তের স্বাভাবিক উষ্ণতা সে বয়সের ধর্ম্ম। তাই আজ যিনি ঋষি, তিনি সে বয়সে ভবিষ্যৎ ঋষিত্বের খাতিরে সাধারণ আত্মসংযমের পরিচয়ও দিতে পারেন নাই। প্রবন্ধ-

লেখক তাঁহার প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে রবীন্দ্রনাথের যে আক্রমণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যাহার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উক্তিটি 'রবির পশ্চাতে ছায়া'র কথা—অনেকেরই স্মরণ আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন সেই লেখাটি সভায় পাঠ করিয়াছিলেন, তখন তিনি নাকি বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া 'মুখ্য লেখক'এর স্থলে পড়িয়াছিলেন—'মূর্খ লেখক'! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিবাদ-প্রবন্ধে এ কথারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই রবীন্দ্রনাথই, মিথ্যাচারকেও জয়যুক্ত করার অপরাধে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপরাধী করিয়াছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রকে অতি ধীর ভাবে সে কলঙ্কভঞ্জন করিতে হইয়াছিল। ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই; বঙ্কিমচন্দ্র নিজ দেশ জাতি ও ধর্ম্মকে ভালবাসিয়া তৎকালীন কুসংস্কারমুক্ত বিচারপন্থী নবজ্ঞানবিজ্ঞানগর্ব্বিত সমাজের নিরতিশয় অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি এ সমাজের মনোভাব বুঝিতে হইলে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের প্রথম যৌবনের রচনা New Essays in Criticism নামক পুস্তক হইতে কিছু উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহামনস্বী আচার্য্যদেব এ পুস্তক আর পুনর্মুদ্রিত করেন নাই, ভালই করিয়াছেন; কারণ এ যুগে তাঁহাদের সমাজই বাঙ্গালীর ভাবজীবনে নেতৃত্ব করিতেছে; বাঙ্গালীর বরপুত্র রূপে রবীন্দ্রনাথই আমাদের সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের—সেই বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত নব্য হিন্দুমনোভাবের উপরে আধিপত্য করিতেছেন; ইহারই নাম অদৃষ্টের পরিহাস। উক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে শীল মহাশয়, সেই বয়সেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় স্বরূপ লিখিয়াছেন—

The successive waves of revival and transfiguration of the old régime in Europe traced above will prepare

us for a study of the parallel movement in Bengal known as neo-Hinduism, or the Hindu revival......

* * *

Said Chateaubriand, the leader of the third movement in France, "I am a Bourbonist in honour, a monarchist by conviction, and a republican by temperament and disposition"; and in this country, in need of an equally comprehensive plea stands, no doubt, the thinker who contributed to its literature of Illumination an article entitled 'Mill, Darwin and the Hindu Religion', another headed 'Miranda, Desdemona and Sakuntala', an exposition of the Sankhya Philosophy, and a pamphlet on Samya ('Egalite'), once the leader of the vanguard of emancipation and deliverance, now the Balaam of the Children of Moab, and, we may say too, of Philistia!

* * *

"NAVAJIBAN (the New Life), a journal which was started as the organ of neo-Hinduism, suggests by its very title, the working of that impulse which led Hardenberg, the rhapsodist of the fourth European movement of romantic revival, to call himself Novalis. Many of the articles in this journal on the Puranic gods and goddesses, on Hindu Pantheism and Ethics, on Hindu festivals, ceremonials and customs, illustrate that grotesque and incongruous blending of the physical with the spiritual which in Germany reached its apex in Novalis's Disciples at Sais. A hopeless sterility, a blank stunned stare, an incongruous mysticism, a jelley-fish

structure of brain and heart are the characteristic features of this hybrid literature of impotence, as we may call it, in distinction from the literature of power and the literature of knowledge."

এ প্রসঙ্গে আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯০৩ সালে, তার পরে আর পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয় নাই। আজ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের মূল কারণ সন্ধান করিতে গিয়া সেকালের 'মোরগের লড়াই'এর কিঞ্চিৎ কাহিনী উদ্ধার করিতে হইল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অতুলনা কাব্য-প্রতিভা ও মনীষার বলে একদিন এ জাতির আত্ম-সম্মান প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই যে সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন, তাহাকে যে সম্প্রদায় কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই, আজ সেই সম্প্রদায়েরই গৌরবস্থল রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তাঁহার সেই সাধনাকে আমরা অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছি। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ এ জাতির কেহ নয়, আজ আমরা সকলেই নাকি রামমোহন রায়ের মানস-পুত্র!

* * *

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেম ও কবি-প্রতিভা এই দুয়ের মধ্যে ভাবের বিচ্ছেদ ছিল না, ইহাই তাঁহার সব চেয়ে বড় কলঙ্ক—সাহিত্যিক হিসাবেও! আজিকার এই বিশ্বমানবতা ও মানসমুক্তির দিনে বঙ্কিমচন্দ্র অচল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা যেভাবে ধরিয়া দিয়াছেন, তাহাতে শরৎচন্দ্রেই তাহার চরম পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁহার দুইটি অভিযোগ, একটি—তাঁহার উপন্যাসে Realism নাই, তিনি রোমান্সের পৈঠার উপরে উঠিতে পারেন নাই; দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, তিনি উপন্যাসে

ধর্ম্মতত্ত্ব ও সঙ্কীর্ণ স্বদেশপ্রেমের সুলভ উচ্ছ্বাসের দ্বারা কবিকল্পনার মর্য্যাদা হানি করিয়াছেন। দ্বিতীয় অভিযোগটির সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; রবীন্দ্রনাথ আজ যে বিশ্বমানবতার মহাভাবে বিভোর, তাহার মূল কোথায়—আমের পোকা যে মুকুলেই জন্মায়—তাহা আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সংস্কার জিনিষটা অতি অল্প বয়সেই গড়িয়া উঠে, তারপর বয়সে মানুষের প্রতিভা ও মনীষা যত বড় হইয়াই দেখা দিক, তার মনে সেই সংস্কারই প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অতিশয় মৌলিক ও অসাধারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহা যে কোনও সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; এমন কথা অযথার্থ। আনন্দমঠ, সীতারাম বা দেবী-চৌধুরাণীর যে দোষই থাক, সেই দোষ সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে যে কবিশক্তির পরিচয় আছে, যে প্রতিভার প্রমাণ আছে, তাহা যদি সুলভ হইত, যদি সেই জাতীয় আরও বিশ পঁচিশখানা উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত; এক কথায়, ঐ সকল উপন্যাসেই যে শক্তি যে মাত্রায় সফল হইয়াছে তাহাই যদি আর পাঁচজন লেখকের মধ্যে আমরা পাইতাম, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধ হইত না তাহা কে অস্বীকার করিবে? যদিও ধর্ম্ম-সমস্যা ও স্বদেশপ্রেমের সম্পর্ক থাকায় উহা খাঁটি সাহিত্য হইয়া না থাকে, অর্থাৎ কবিকল্পনা যেমনই হউক, তাহার বিষয় লইয়া যদি আপত্তি উঠে, উপন্যাসে যদি সাইকলজিক সাদা জলের পরিবর্ত্তে, যুগ, জাতি ও সমাজের রং লাগিয়া থাকে, এবং সেই জন্যই যদি তাহা অপাংক্তেয় হয়, তবে সাহিত্যের ইতিহাসে এই আধুনিক যুগ ছাড়া আর কোনও যুগের প্রতিভাকেই গ্রাহ্য করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের এক শ্রেণীর উপন্যাসে তাঁহার কবিকল্পনা যে খানিকটা মোচড় খায়

নাই, আমি সে কথা বলিতেছি না; কিন্তু রসিকমাত্রেই জানেন যে এই অবান্তর অভিপ্রায় সত্ত্বেও সেই সকল উপন্যাসে যে পরিমান রস-সৃষ্টির পরিচয় আছে তাহা তাঁহার প্রতিভার অসাধারণত্বই প্রমাণ করে; রবীন্দ্রনাথও যে তাহা বুঝেন নাই বা বুঝিতে সম্মত নহেন, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি।

*　　*　　*

এখন প্রথম অভিযোগটির কথাই বলিব। রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কল্পনার সত্তা নাই, তাহা নিছক রোমান্স জাতীয় অপরিপুষ্ট সাহিত্য। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠতা একেবারে অস্বীকার করা হইয়াছে। এক কালে যখন রবীন্দ্রনাথ মাত্র কবি ছিলেন, যখন কাব্যকে কাব্য হিসাবেই উপভোগ করিবার ও তাহার রসবিশ্লেষণ করিবার শক্তি, কবিশক্তির মতই তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল, তখন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার পূজা করিয়াছিলেন—এক 'রাজসিংহে'র সমালোচনাতেই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আজ তিনি সাহিত্যের আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর আধুনিকতার আদর্শে আকৃষ্ট, তাই কাব্য-সৃষ্টিতেও যেমন, কাব্যসমালোচনাতেও তেমনই, তাঁহার সে শক্তি আর নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে, তাঁহার উপন্যাস-কাব্যগুলির সৃষ্টিনৈপুণ্য সম্বন্ধে, এ প্রসঙ্গে কোনও বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই; কেবল দুই চারি কথা এখানে বলিব। সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এক যুগের রসকল্পনা হইতে অপর যুগের রস-কল্পনার পার্থক্য নির্দ্দেশ ও তাহার হেতু নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে; কবিগণের সমসাময়িক যশ ও প্রতিপত্তির মূল্য নির্দ্ধারণও হইয়া থাকে; কিন্তু কাব্যসৃষ্টির নানা form ও ভঙ্গির যে বৈচিত্র্য যুগে যুগে প্রকাশ পায়—

তাহার তুলনামূলক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ-বিচার কি রসিকের কাজ? যে যুগে যে ভঙ্গির প্রাদুর্ভাব হউক, শক্তিশালী লেখকের হাতে সেই ভঙ্গির প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সাহিত্যে তাহা অমর হইয়া থাকে। যুগে রুচির পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সাহিত্যে যাহা classic বা 'চিরন্তন', তাহা চিরদিনই স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে; যুগধর্ম্মী গড্ডলিকার দল তাহাকে অরুচিকর মনে করিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা সাহিত্যরসপ্রমাতা তাঁহারা তাহার অন্য সম্বন্ধে কখনও ভুল করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স লিখিয়া কিছুমাত্র অপরাধ করেন নাই; রোমান্স লিখিবার শক্তি তাঁহার ছিল, গল্প রচনা করিবার অসাধারণ সৃষ্টি-প্রতিভা তাঁহার ছিল, তাঁহার নিজের কবিধর্ম্ম তিনি পালন করিয়াছিলেন; বাংলাসাহিত্যে সে ধরণের শক্তি আর কাহারও হয় নাই, আমরা ইহাই জানি। রোমান্স রোমান্স বলিয়াই যদি নিকৃষ্ট কাব্য হয়, এবং রিয়ালিষ্টিক উপন্যাস যদি রিয়ালিষ্টিক বলিয়াই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য আজকালকার অনেক রিয়ালিষ্টিক লেখক, রাম, শ্যাম, হরিও বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপরে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই জানেন যে আরব্য উপন্যাসও বিশ্বসাহিত্যের একটি ক্লাসিক; তিনি যদি বলেন তাহার মধ্যে 'আষাঢ়ে' গল্প বলিবার যে শক্তি আছে তাহাই তাহার মূল্য—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে Real ও Romanceএর একটা জগাখিচুড়ী আছে, তাহাতে কবিশক্তির সাফল্য নাই, তবে অবশ্য আমরা নাচার। কিন্তু রোমান্স বলিয়াই তাহা হেয়, এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যে এই রোমান্স ঝরিয়া গিয়া যখন Real প্রকাশ পাইল তখনই আমরা প্রকৃত উপন্যাসের আস্বাদ পাইলাম—ইহা সাহিত্যিক রস-বিচার নহে—ইহা রুচিবিবর্ত্তনের কথা; ইহাকে বলা যায়,—আর্টেও ক্রমবিকাশ নীতির সমর্থন। যদি তাহাই হয়, তবে অজন্তার

চিত্রলিখন পদ্ধতি এখনও এত মূল্যবান কেন? কালিদাসের 'শকুন্তলা' আজিকার এই নব্যনাটকীয় রীতির যুগে অপাংক্তেয় নয় কেন? 'শকুন্তলা'র কথাই ধরা যাক। উক্ত নাটকে হিন্দুসমাজের একটা বিশিষ্ট আদর্শ, হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের একটা বিশেষ নীতির সমর্থন আছে; তা' ছাড়া রোমান্সের ত ছড়াছড়ি; তথাপি কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যতখানি সদয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তার অর্দ্ধেকও নহেন কেন? রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে ইদানীং যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথেরই একটা নূতন পরিচয় আমরা পাইলাম, সে উক্তির দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কবিযশের বিন্দুমাত্রও লাঘব ঘটিবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স রোমান্স হইলেও তাহার মধ্যে যে বাঙ্গালী-দুর্ল্লভ পুরুষ-প্রতিভার পরিচয় আছে—যে প্রতিভা মহাকাব্য ও নাটক-সৃষ্টি-প্রতিভার সমজাতীয়, যাহা এ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আর কোনও লেখকের ভাগ্যে ঘটে নাই, তাহার মূল্যনির্ণয় এ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখক করিবেন; এ যুগে তাহা হইবে না, কারণ এখন সাহিত্যে একেশ্বরবাদের যুগ, যাহারা সাহিত্যেও 'একমেবাদ্বিতীয়ং'-মন্ত্রের উপাসক, তাহারা এককে লইয়াই উন্মত্ত হয়; তাহাদের রসবোধ কোথায়? কিন্তু, "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়"—বেচারী শরৎচন্দ্র!

---

(২)

আজকাল মাসিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে 'পত্রধারা' শ্রাবণ-ধারার মত অবিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা কিছু মন্তব্য করিয়াছি। মন্তব্য করিবার দুঃসাহস আমাদের আছে এইজন্য

যে, আমরা অতিশয় অজ্ঞান, আমরা রবীন্দ্রনাথের অতি উচ্চ ভাবুকতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি না, এবং সে কথা স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করি না। প্রবাসীর গত দুই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একজন 'কল্যাণীয়া'কে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর যে মতামত জানাইয়াছেন, তাহাতে আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নূতন কিছু জ্ঞানলাভ করিলাম না; কেবল উক্ত কল্যাণীয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলাম। তাঁহার পত্রগুলিতে কি ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই—এক তরফা উক্তিই আছে, যদিও এই পত্রগুলিতে যে উত্তর-প্রত্যুত্তরের ভঙ্গি রহিয়াছে একজনের বিশেষ জিজ্ঞাসাতৃপ্তির জন্যই লেখার মধ্যে যে একটি বিশেষ পক্ষাবলম্বনের ঝাঁজ রহিয়াছে তাহাতে অপর পক্ষের প্রশ্নগুলিও এই সঙ্গে জানিতে পারিলে ভালো হইত। রবীন্দ্রনাথের উত্তরগুলি হইতে অনুমান হয়, এই 'কল্যাণীয়া' মহিলাটি রবীন্দ্রনাথকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিলেও তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু ভিন্ন ভাবাপন্না; অথচ তাঁহার চিন্তাশীলতা ও আন্তরিকতা দুই-ই আছে। রবীন্দ্রনাথ এই মহিলাটিকে তাঁহার ধর্ম্মমতের সংকীর্ণতা ও অন্ধসংস্কার এককথায় তাঁহার হিঁদুয়ানীর অজ্ঞানতা সম্বন্ধে সচেতন করিতে উৎসুক, অন্ততঃ আমাদের এইরূপই অনুমান হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের কোনও বুদ্ধি, বিদ্যা, উৎসাহ বা উপলব্ধি নাই, অতএব মাথাব্যথাও নাই; কিন্তু কথাটা রূঢ় হইলেও বলা প্রয়োজন মনে করি যে, রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি এবং যতবড় ভাবুকই হউন, আমাদের যদি কোন দিন ধর্ম্মপিপাসা জাগে, যদি কখনও আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনের আগ্রহ হয়, তবে তাহার পথ বাৎলাইয়া লইতে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকটে কখনও যাইব না; তার প্রথম কারণ, রবীন্দ্রনাথ ঋষি, আমরা ঋষি মানুষকে ভয় করি; দ্বিতীয় কারণ, রবীন্দ্রনাথের মত ভাব-সাধনা করিবার মত কবি-প্রতিভা আমাদের নাই; তৃতীয় কারণ, 'ক সূর্য্য-

প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ'—রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম হইবে কেমন করিয়া ? What is sauce for the gander is no sauce for the goose। সে প্রয়োজন যখন বোধ হয় কাহাকেও জানাইয়া দিতে হইবে না।

* * *

ধর্ম্ম বুঝি না, কিন্তু বাক্য-অর্থ কিছু কিছু বুঝি তাই বাচালতা সম্বরণ করিতে পারি না। পাঁঠা-বলির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নূতন কথা কিছুই বলেন নাই ; ও কথা বড় বেশী পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে দোষ নাই, সত্য যাহা তাহা অতি পুরাতন, তাহা জীবন্ত-নূতন হইয়া উঠে বক্তার জীবন-সত্যের আলোকে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'পাপটা যেখানকার সেখানেই থেকে যায়, বরঞ্চ কিছু বেড়ে ওঠে। মাঝে থেকে হতভাগা প্রতীকটা পায় দুঃখ'। অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান হিসাবে পাঁঠাবলিটা জীবহত্যা বই আর কিছুই নয় এবং তাহা নিষ্ঠুর বলিয়া সেটা একটা পাপই। বেশ কথা, অতি সত্য কথা ; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাহিরেও জীবহত্যা পাপ কি না ; পাঁঠাটিকে যখন প্রতীকরূপে বলি দেওয়া হয়, কেবল তখনই কি সে 'হতভাগা দুঃখ পায়' ? না, কসাইখানাতেও পাইয়া থাকে ? তাহা হইলে এই উক্তি হইতে আমরা কি অনুমান করিতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ মাংসাশী নহেন ? হয় ত' সে অনুমান ঠিক নহে, কারণ ওখানে আর একটা বৃহত্তর সত্যের উপলব্ধি করিতে হইবে। খাওয়ার সম্পর্কেও যাহারা কোনও সংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়, তার মধ্যেও যাহারা বন্ধন স্বীকার করে, তাহারা আচার অনুষ্ঠানের শুচিতা মানিয়া চলে—তাহারা নিজেরাই যে যূপবদ্ধ পশু! প্রাচীন ভারতের ঋষিরা যে মাংসাশী ছিলেন না, তার কোনও প্রমাণ আছে ? বর্ত্তমান কালে যে-ভূখণ্ডে ঋষির সংখ্যা

সব চেয়ে বেশী, সেই য়ুরোপ ত' খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না, তাহারা ঘোরতর মাংসাশী। তা' ছাড়া 'যারা জ্ঞানী তাদের ত কোনো ভাবনা নেই, তারা সকল ক্ষেত্রে স্বতই ঠিক পথ চেয়ে চলে।' রবীন্দ্রনাথের মতে "যাঁরা আচারে অনুষ্ঠানে সারাজীবন অত্যন্ত শুচি হয়ে কাটালেন, ভাবরসে মগ্ন হয়ে রইলেন, তাঁরা ত' নিজেরই পূজো করলেন—তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার, তাঁদের রসসম্ভোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত, আর মুক্তি বলে' তাঁরা যদি কিছু পান তবে সেটা তো তাঁদেরই পারলৌকিক কোম্পানির কাগজ"। বড় খাঁটি কথা—রবীন্দ্রনাথ একেবারে সিদ্ধপুরুষ, তাই আচার অনুষ্ঠানের উপর তাঁহার এতই অশ্রদ্ধা। আমাদের দেশে পুরাকালে এবং একালেও যে সকল ব্যক্তি আচার অনুষ্ঠানে শুচিতার পক্ষপাতী তাহাদের কোনও আশাই নাই; যেহেতু তাহারা আচার অনুষ্ঠান পালন করে, অতএব তাহারা ধার্ম্মিক আখ্যা পাইবার, অথবা মুক্তিলাভের উপযুক্ত নহে, তাহারা ভাল লোক নহে। তাহাদের মুক্তি ইহলৌকিক কোম্পানীর কাগজ না হইয়া পারলৌকিক কোম্পানীর কাগজ হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা 'নিজেরই পূজা করে' 'তাদের রসসম্ভোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত'; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম তাহা নয়, তাঁর আদর্শ য়ুরোপ যথা—

"য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যারা বিশ্বমানবের উপলব্ধির দ্বারা তাঁদের কর্ম্মকে মহৎ করে তোলেন,—তাঁরা দুর কালের জন্যে প্রাণপণ করেন; সর্ব্বদেশের জন্যে। তাঁরা যথার্থ ভক্ত।"

দূরকাল ও সর্ব্বদেশ না হইলে বিশ্বমানবের উপলব্ধি সম্ভব হয় না, যদি কেবল মাত্র নিজের দেশ, নিজের জাতি ও বর্ত্তমান কাল লইয়াই থাকিতে হয়, তবে তাহা বিশ্বমানবের সেবা নয়। কারণ বিশ্বমানব একটা খুব বড়, খুব মহান্, নাম-গোত্রহীন রহস্যময় সত্তা; কবি

নিজের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিয়াছেন—"তিনি কে?—

—জানি না কে, চিনি নাই তারে—
শুধ্ এইটুকু জানি তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব-যাত্রী………"

চমৎকার! চমৎকার! হায় গান্ধীজী! তুমি কেবল চোখ-ঢাকা বলদের মতই ঘুরিয়া মরিলে! এই বিশ্বমানবের মহিমা তুমি বুঝিলে না, বুঝিলে কত সহজে অমৃতকে লাভ করিতে! রবীন্দ্রনাথ তাহা করিয়াছেন, যথা—

"চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আমার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি—নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিতে চাই, তাঁর মধ্যে অনুভব করতে চাই, আমার মধ্যে সত্য যা-কিছু জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমি আমার ছোট-আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড়-আমি, মহান আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি।"

এ সব কথা তিনি লিখিয়াছেন একজন 'কল্যাণীয়া'কে। কিন্তু এ সাধনার করণ ও উপকরণ কি কি তাহা তিনি বলিয়া দেন নাই; একটা কথা বলিয়াছেন বটে—"আমি গোড়া থেকেই একঘরের দলে ভিড়েছি, ঘরের কোণ-বিহারীদের মাঝখানে যারা বেগানা—আমি সেই হা-ঘরেদের খাতায় নাম লিখিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লুম—ঘোরো যারা তারা মারতে আসবে, মারতে এসেই বেরোতে শিখবে"। একথা ঠিক, তবু এই যে বেরিয়ে-পড়া, এর রাহা খরচের হিসাবটা জানাইলে ভালো হইত না কি? এ-মুক্তির মূল্য কত পরিমাণ কোম্পানীর কাগজ তাই ভাবিয়াই যে আমরা 'ঘরের কোণবিহারী' হইয়া আছি। নহিলে "ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিয়ে"

আমার মধ্যে "সেই যিনি বড়-আমি, মহান আত্মা"—সেই বিশ্বমানবের ধ্যান করিয়া, তাঁর স্পর্শ পাইয়া, ধন্য হইতে, অমৃতকে উপলব্ধি করিতে কার না সাধ যায়। কিন্তু বিধি যে বাদী—সম্বলের মধ্যে সেই প্রাচীন ভারতের লোটা আর কম্বল; তেমন ভালো আলখাল্লা নাই, মোটর এয়ারোপ্লেন নাই, তেমন খানার আয়োজনও নাই। য়ুরোপীয় ঋষিদের মত আমাদের সে রাষ্ট্রীয় তপস্যা-ফল কোথায়? বিশ্বমানবকে শোষণ করিবার বিরাটযন্ত্র একদিকে চালনা করার ব্যবস্থা না থাকিলে অপর দিকে সেই শোধন-রসের অমৃতগন্ধটুক্ উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটিবে কেমন করিয়া? রসে যাহাদের পেট ভরিয়াছে, তাহাদের আর পান করিবার প্রবৃত্তি থাকে না—তাহারা তখন 'ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং' করিতে স্বতই ইচ্ছুক হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"যে য়ুরোপ শক্তিপূজার বীভৎস আয়োজনে বিজ্ঞানের খপরে নররক্তের অর্ঘ্য রচনা করেছে সেই য়ুরোপ জানে না বাহিরের যন্ত্র মনের দৈন্য তাড়াতে পারে না, মন্ত্রযোগে শান্তি গড়বার চেষ্টা বিড়ম্বনা।"

—যদিও আবার সেই সঙ্গেই ইহাও বলিয়াছেন যে—

"যে য়ুরোপ জ্ঞানকে সংস্কার-মুক্ত ক'রে কর্ম্মকে বিশ্বসেবার অনুকূল করেছে সেই য়ুরোপ উপনিষদের মন্ত্রশিষ্য, তা সে জানুক বা না জানুক"।

অর্থাৎ, য়ুরোপ শক্তিপূজাও করে, আবার উপনিষদও মানে—য়ুরোপের আত্মার দুইটা ভাগ আছে। রবীন্দ্রনাথ একটাকে স্বীকার করেন, আরেকটাকে করেন না। কিন্তু এমন হইতে পারে না, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি; আত্মার দুই তলা থাকিতে পারে—নীচের তলায় শক্তিপূজার আয়োজন হয়; উপরের তলায় উপনিষদ-চর্চ্চা হইয়া থাকে, একটা নীচে না থাকিলে অপরটি উপরে থাকিতে পারে না।

কাজেই য়ুরোপকে যদি এতই ভালো লাগিয়া থাকে, তবে কাঁটা বাদ দিয়া শুধুই তাহার ফুল শুঁকিলে চলে কি? কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ফুলই ভালবাসেন, কাঁটা সহ্য করিতে পারেন না। তাই য়ুরোপের গুণ্ডাদের ত্যাগ করিয়া ঋষিদের সঙ্গে গুরুভাই পাতাইয়াছেন।

*　　*　　*

এই ঋষিদের কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়া শেষ করিতে পারেন না; কি বর্ত্তমানে কি অতীতে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ কোনও ঋষির সাক্ষাৎ পান নাই—এক সেই উপনিষদ ছাড়া। Theology শিখাইতে যেমন Medville Collegeএ ছাত্র পাঠাইতে হয়, তেমনি ঋষি বা সাধুসঙ্গমের জন্যও য়ুরোপেই তীর্থযাত্রা করা উচিত; অন্যত্র আর কোথাও এত ঋষি ত নাই!—

"সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাদের বেশী দেখলুম, কিন্তু তারা যে দেশে থাকে সে দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্ব্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক এই আমার কামনা।"

এর চেয়ে স্পষ্ট করিয়া নিজ দেশের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ বোধ করি আর কোথায়ও প্রকাশ করেন নাই। এত উচ্চভাবের snobbery আমরা আর কোথাও দেখি নাই। ইহারই নাম বিশ্ব-মানবপূজা, ইহারই সাধন-পন্থা বিশ্বপরিশীলন-চর্চ্চা! সেই বিশ্বমানব য়ুরোপেরই এক অংশে প্রকাশ পাইয়াছেন, সেইখানেই তিনি তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন; দেশে কোথাও তাঁহার প্রকাশ রবীন্দ্র-নাথ দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই—দেশে তাঁহার অপ্রকাশের দিকটাই তিনি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং সেজন্য দেশ তাঁহাকে অতিশয় পীড়া দেয়।* তাই বার বার দেশ ছাড়িয়া তিনি বিদেশে ছুটিয়া যান। তিনি বলেন—

"য়ুরোপে যে অংশে তিনি সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েচেন সেখানে আমি আনন্দ করি, আমাদের দেশে যে অংশে তিনি মুগ্ধ আচারে আচ্ছন্ন সেখানে আমার মন অত্যন্ত পীড়িত।"

বাছাই করিবার কি অসাধারণ ক্ষমতা! আনন্দ করিবার জন্য য়ুরোপের অংশবিশেষ, এবং পীড়া-বোধের জন্য দেশের অংশবিশেষ তিনি বাছাই করিয়া লন! হে ভারতের ঋষিকল্প কবি! হে জাতি-প্রেমমোহমুক্ত বিশ্বমানবের পূজারী! তোমাকে আমরা বড় ভয় করি। প্রভু! তোমার বিশ্বরূপের জ্যোতি আমরা সহ্য করিতে পারি না। তুমি য়ুরোপে গিয়া বাস কর, এ দেশে আর কেন দেব! ক্ষমা দাও, কৃপা কর,—এ দীন, দরিদ্র, অধঃপতিত সমাজ তোমার ঐ অমৃতসালসা হজম করিতে পারিবে না। তোমার উপনিষদের দোহাই, আমরা ঋষিত্ব চাই না।

* * *

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, যে উপনিষদকে একদা বাংলাদেশের নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিলেন রামমোহন রায়ের জাল-করা, যে উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার······যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব" ইত্যাদি।

আরও যোগ করা যায়—যে উপনিষদের 'কবি-প্রাণনা'য় রবীন্দ্রদেব বিশ্বমানব হইয়াছেন, এবং য়ুরোপের সেই ঋষিদের আধুনিক সংস্করণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বড় ভাল কথা, বড় যথার্থ কথা। কিন্তু বাংলাদেশ ত উপনিষদ কখনও মানে নাই, এখনও মানে না। এই বর্ব্বর-অনার্য্য-অধ্যুষিত দেশে উপনিষদের বাণী প্রচার করিয়া রামমোহন রায় জাতির যে উপকার করিয়াছেন তাহা ত এখনও আমরা চাক্ষুষ করিতেছি

না; কয়েকজন সমাজত্যাগী সৌখীন বাবু মাৰ্জ্জিত চশমার আড়াল হইতে উপনিষদের জ্যোতি-বিচ্ছুরিত স্তিমিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন বটে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত জাতির জীবনে, তাহার রাষ্ট্রচেতনায়, তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠানে, তাহার সমাজ-জীবনে কোথায়ও উপনিষদএর মন্ত্র-প্রভাব ত আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। বরং এ জাতির ধর্ম্মেকর্ম্মে, প্রাণের প্রবৃত্তি ও মনের উৎসাহে, যদি কোনও নবজীবনের সাড়া জাগিয়া থাকে তবে তাহার উৎস সন্ধান করিতে হয় অন্যত্র—অন্য মহাপুরুষের অনুপ্রাণনায়। বাংলাদেশে উপনিষদের আবিষ্কার না হয় রামমোহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের অন্যান্য দেশে উপনিষদের চর্চ্চা নিশ্চয় একেবারে লোপ পায় নাই, তাহারা উপনিষদের মন্ত্রে কতখানি সাড়া দিয়াছে? ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিভিন্ন যুগে যে নব-নব ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্ম-গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে উপনিষদ কি কাজ করিয়াছে? বাংলাদেশ উপনিষদকে যদি গ্রহণ না করিয়া থাকে, তবে ভালোই করিয়াছে, কারণ, ধর্ম্ম পুঁথিগত ভাব-সাধনা নয়; জাতির জীবনগত ধর্ম্ম-সাধনা। ভারতবর্ষে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও তৎ সমুদয়ের আদর্শমূলক যে ধর্ম্ম-সাধনার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার মন্ত্র পরবর্ত্তী বহু জাতির রক্তধারা ও ভাবধারার সমন্বয়-সাধন প্রসূত। স্বভাব ও স্বধর্ম্মের গতি-প্রকৃতির নিয়মে যে ধর্ম্ম স্বতঃপ্রবর্ত্তিত ও স্বতঃনিয়ন্ত্রিত হইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা প্রতিপদে জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়াছে—তাহা কখনও জাতির ঐতিহ্য বা লোকধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করে নাই। জাতির সেই জীবন-ধর্ম্মী আত্মাকে কোনও নিছকভাববাদ বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-দর্পিত বিশ্বমানববাদ কখনও পুষ্ট বা তৃপ্ত করিতে পারে না। রামমোহন রায় কর্ত্তৃক উপনিষদ আবিষ্কার বাংলার যে সম্প্রদায়েরই মহাগৌরবের বস্তু হউক, কয়েকজন জাতি-ধর্ম্মহীন

কুলচুর-বিলাসী অন্তঃসারশূন্য অপদার্থ বাবু তাহা লইয়া যতই আস্ফালন করুক, এ যুগেও উপনিষদ কাহারও প্রাণকে সঞ্জীবিত করে নাই। যদি সত্য কথা বলিতে হয়, তবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই কর্ম্ম-সাধনার যুগে, কেবল বাংলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে যে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ধর্ম্মপিপাসু গৃহী অথবা জাতিপ্রেমিক কর্ম্মী ও মনীষীর প্রাণে-মনে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, সে গ্রন্থ 'গীতা'। এ যুগে ইহার পঠন-পাঠন, টীকাভাষ্য এবং প্রচার-প্রচেষ্টার অন্ত নাই। ভারতে যে বিশেষ ধর্ম্ম এখন লোকধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহার প্রভাবে ভারতের নানা স্থানে নরদেবতার অসংখ্য আবির্ভাব দেখিতেছি—প্রেমে কর্ম্মে ও ত্যাগে মানুষের জীবনে যে মহাকাব্যের মহিমা দেখিতেছি—সেই ধর্ম্মের যাঁহারা গুরু তাঁহারা এই গীতাকেই সুগীতা করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলাদেশে এই গীতার আদর অনেক দিন হইতে দেখা দিয়াছে, কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষ তাহাকে লইয়া বহু বিদ্রূপ করিয়াছে—বাংলাসাহিত্যে তাহার প্রমাণ আছে। 'গীতা' হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া তাহা এখনও অস্পৃশ্য হইয়া আছে; অন্তত এই উপনিষদ্-ধ্বজীরা কখনও গীতার নামোল্লেখ করেন না—তাহার আলোচনা বা চর্চ্চা ত দূরের কথা। সত্যকথা বড়ই অপ্রিয় হয় জানি—কিন্তু সত্যকে চোখ বুজিয়া অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মুখে আমরা কখনও গীতার শ্লোক শুনি নাই। তাহাতে দুঃখ করি না, কারণ 'গীতা'কে যাঁহারা মাথায় করিয়া লইয়াছেন তাঁহারাই আজ এ জাতির ইহ-পরতন্ত্রের কাণ্ডারী—সমগ্র ভারত আজ তাঁহাদের চরণে মাথা রাখিয়া ধন্য হইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিরদিন মাথায় করিয়া রাখিব—কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারক রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায় তাহা আমরা ভালো রূপই জানি।

আর একটা কথা। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ হইতে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, এবং প্রাচীন ভারতের সেই বাণীকে শ্রদ্ধা করেন বলিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করেন। কিন্তু ঐ শ্লোকগুলির যে ব্যাখ্যা তিনি করিয়া থাকেন, তাহা কি সেই ঋষিদের মনের কথা, না নিজের মনোমত করিয়া সেগুলির তিনি নূতনতর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন? উপনিষদের যে আসল তত্ত্বকথা, তাহা কি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানববাদের সমর্থন করে? তাঁহার মৌলিক কবি-কল্পনার সাহায্যে, তাঁহার নিজেরই আত্মগত ভাবসাধনার রূপে তিনি উপনিষদ্‌কে আত্মসাৎ করিবার অধিকারী হইতে পারেন; কিন্তু সে ক্ষেত্রে উপনিষদের শ্লোক নয়, রবীন্দ্রকৃত ভাষ্যই আসল বস্তু—তাহার ঋষি রবীন্দ্রনাথ নিজেই, তাহা আসলে রবীন্দ্রোপনিষৎ। তাঁহার নিজের ভাবসাধনার পক্ষে যাহা উপাদেয় তাহাকে উপনিষদের শ্লোকে মণ্ডিত করিয়া স্বপক্ষে উপনিষদের সাক্ষ্য এমন ভাবে খাড়া করিয়া, অজ্ঞ জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার এই অধ্যবসায় কি তাঁহার মত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেও উচিত? উপনিষদের আত্মতত্ত্ব যে এইরূপ বিশ্বমানবতার মন্ত্র নয়, য়ুরোপীয় ঋষিগণ যে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষপাতী নহেন, তাহা য়ুরোপীয় চিন্তা ও সাধনার ইতিহাস যাঁহারা এতটুকু জানেন এবং ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কি অপূর্ব্ব মনস্বিতা!—তাঁহার হাতে পড়িয়া আজ উপনিষদ্‌কে কবুল করিতে হইতেছে যে বুদ্ধও তাহারই ভক্তিমান শিষ্য এবং আধুনিক য়ুরোপের বিশ্বপ্রেমিকেরা তাহারই বিশ্ব-ব্রহ্মবাদের তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞাতসারে আত্মসাৎ করিয়াছে। উপনিষদের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়ের কারণ

আছে—যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকারী, তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই আমি এ কথার উল্লেখ করিলাম। উপনিষদ্, রবীন্দ্রনাথ বা সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি নয়; ভারতীয় ভাবসাধনা ও তত্ত্বসন্ধানের যে মৌলিক প্রতিভা তাহাকে এত মূল্যবান করিয়াছে—ব্যক্তিবিশেষের আত্মভাবসাধনার দলীল-রূপে তাহার সেই গৌরব হ্রাস হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

(৩)

প্রসঙ্গকথা বড়ই একঘেয়ে হইয়া উঠিতেছে—আলোচনা আদৌ সরস নহে; একঘেয়ে হইবার কথাই যে! সাহিত্যের প্রসঙ্গে যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি রবীন্দ্রনাথ। এ যজ্ঞের দেবতা এক—আমরাও একেশ্বরবাদী, কাজেই যা কিছু হবি আয়োজন করি তাহা ঐ এক দেবতার উদ্দেশ্যেই নিবেদন করিতে হয়। তথাপি এবার একটু রসালাপের প্রসঙ্গ করিব। প্রসঙ্গটি যোগাইয়া দিয়াছেন সুরসিক বিচিত্রা সম্পাদক। বৈশাখের সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় 'ছন্দের দ্বন্দ্ব' নামে একটি 'One minute' চুরুটিকার মত অতি সুখসেব্য নিবন্ধিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে দেখা যাইতেছে সম্পাদক মহাশয় ছন্দোবন্ধের গোলকধাম খেলায় সাত কড়িই চিৎ করিয়াছেন। 'ছন্দের দ্বন্দ্ব' যে এমন মধুর রসাত্মক হইতে পারে তাহা আমাদেরও ষ্ট্রাইক করে নাই! স্বর্গীয় দ্বিজু রায় 'প্রিয়ার সনে দ্বন্দ্ব রণে'র কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আদিরস উছলিয়া উঠিয়াছিল—সেই অবধি 'দ্বন্দ্ব' কথাটিকে বড়ই মিঠা লাগিত, কিন্তু এপর্য্যন্ত আর কোনও 'দ্বন্দ্বে'

তাদৃশ মিষ্টতার সন্ধান পাই নাই—অবশ্য, কটুতিক্ত কষায় অম্ল প্রভৃতি রস তাহাতে পাইয়াছি বৈকি! এই 'ছন্দের দ্বন্দ্ব' উপলক্ষ্যে বিচিত্রা-সম্পাদক প্রথমেই আদিরসের সুমধুর ব্যঞ্জনায় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি'র উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি তাঁহার 'বিচিত্রা'র মুখে যে সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা বড়ই স্বাভাবিক। 'শনিবারের চিঠি'র নামের পরিবর্ত্তে প্রতিবারেই 'চিঠি'র ঠিকানাটি দেওয়া হইয়াছে, যথা—'৩২।৫।১ নং প্রবোধচন্দ্রের যজ্ঞ নষ্ট করবার ভূমিকায় বলেচেন' ইত্যাদি। পাঠক ইহার কারণ বুঝিলেন কি? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে 'বিচিত্রা'র মত সাহিত্যরসবাহী পত্রিকার পাঠক হইয়া লাভ কি? বিচিত্রা শুধু ছন্দশাস্ত্র নয়, অলঙ্কার শাস্ত্রেও কম বিদ্যাবতী নয়, কাব্যের যত কিছু কৌশল সকলই ইহার নখাগ্রে। বিচিত্রা নাম করে নাই বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে কাব্যরসের চূড়ান্ত হইয়াছে। এ সেই সনাতন রীতি—"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। জানহ পতির নাম নাহি ধরে নারী॥" শুধু তাহাই নয়, ব্রীড়াবেপথুমতীর নবলাজ-ব্যঞ্জনারসে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। কারণ 'চিঠি'র ঠিকানা যেরূপ ঘন ঘন পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে নব নব বিশেষণের প্রয়োজন হইবেই।

এই ছন্দের দ্বন্দ্বে বিচিত্রা সম্পাদকও যোগ দিয়াছেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে হয় এই দ্বন্দ্বের পক্ষ-প্রতিপক্ষ কাহারা? সম্পাদক ত উপমার কালিদাস—তাঁহার মতে ছন্দশাস্ত্রী প্রবোধচন্দ্র বাংলা ছন্দের যে বারিধি খনন সুরু করিয়াছেন তাহা একটি সাহিত্যিক যজ্ঞ—সে

যজ্ঞের হোতা তিনিই, এবং দেবতা রবীন্দ্রনাথ। কেমন আহা মরি উপমা! ছন্দ-বিজ্ঞান যে খাঁটি সাহিত্য, তাহা না হয় মানিলাম—না মানিলে বিচিত্রার সাহিত্যরস-পিপাসু পাঠকেরা মুখভার করিতে পারেন, সম্পাদককে বিব্রত করা হয়; তেমন কাজ করা কোনও ভদ্রলোকেরই উচিত নয়; বিশেষতঃ যে দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে পরস্পরে Live and let live ভাবে বাস না করিলে, কাহারও মঙ্গল নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি যজ্ঞেশ্বর হন, তাহা হইলে দ্বন্দ্ব কাহার সঙ্গে? 'শনিবারের চিঠি' ত প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; সম্পাদকের 'কালিদাসস্য' উপমায় শনি প্রবোধচন্দ্রের রাহু; অর্থাৎ তার সঙ্গে সম্বন্ধ ভক্ষ্য ভক্ষকের। 'রাহুর ত' কাণ্ডজ্ঞান নাই, সে একেবারে গোটা চাঁদটাকেই গ্রাস করিয়া বসে, সেখানে দ্বন্দ্বের অবকাশ কোথায়? সম্পাদক মহাশয়ের উপমার বাহাদুরী আছে—সেটাও এখানে দেখাইয়া না দিলে রস ভালোরূপ জমিবে না। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রবোধচন্দ্র (রাহুর গ্রাস হইতে) মুক্তিলাভ করিলে আমরা ছন্দমন্দাকিনীর জলে স্নান করে পুণ্যার্জ্জন করব"। প্রবোধচন্দ্র রাহুমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ছন্দমন্দাকিনীতে স্নান করা বিধেয় নয়, চন্দ্র রাহুযুক্ত হইলে গঙ্গা স্নান-যোগ্য হয়, অথবা, গ্রহণকালজনিত কলুষ গঙ্গায় ক্ষালন করিতে হয়। প্রবোধচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া বিচিত্রা সম্পাদক কি অশৌচ অবস্থায় আছেন? না, উক্ত চন্দ্রদেব রাহুমুক্ত না হইলে ছন্দমন্দাকিনী তর তর রবে প্রবাহিত হইতে পারিবে না? কিন্তু প্রবোধচন্দ্র যাহাতে মুক্তিলাভ করেন তার জন্য ছন্দমন্দাকিনীর তীরে সকলে ভিড় করিয়া সমস্বরে মোচন-মন্ত্র পাঠ করুন—কিন্তু তাহাতেও কি রাহু ছাড়িবে? এ রাহু যে ম্লেচ্ছ—পুণ্যবিঘ্ন, কুক্কুটধ্বজ!

তাহা হইলে দ্বন্দ্ব কাহার সঙ্গে? বিচিত্রা-সম্পাদক বলিতেছেন, "আমার সঙ্গে।" তিনি চার সিলেবল ও পাঁচ সিলেব্‌লের সঙ্গে এক প্যাঁচ কষিয়া প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবেন—সেই মহাযুদ্ধের সংবাদটি বিচিত্রার পাঠকগণের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য, এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। সে যে কত বড় কাণ্ড, বিচিত্রা-সম্পাদকের এই কয়টি কথা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইবে—'অদূর ভবিষ্যতে ছন্দের যে দ্বন্দ্বটি অনিবার্য্য মনে হচ্ছে, তদ্বিষয়ে পাঠক-চিত্তকে অবহিত রাখবার উদ্দেশ্যে এ ঘটনাটি প্রকাশ করলাম। পূর্ব্বাহ্ণে বিষয়টির সূচনা জানা থাকলে যথাকালে রসোপভোগের সুবিধা হবে।" বলিতে কি, আমরা বিষয়টির সূচনা জ্ঞাত হওয়া মাত্রেই রসোপভোগ করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু সাধারণ পাঠকগণের জন্য বিজ্ঞাপনটি আরও বড় অক্ষরে বেশ কায়দা মাফিক ছাপা হইলে আরও ভালো হইত, যেমন—"ছন্দের লড়াই! ছন্দের লড়াই! বিচিত্রা-সম্পাদক vs. প্রবোধচন্দ্র! রোমহর্ষণ, ধাত্রধর্ষণ গাত্রঘর্ষণ ব্যাপার! রেফারী রবীন্দ্রনাথ! ব্যাপারী বেঙ্কটনাথ! আর্টের মছলন্দ! দৃশ্যের গোয়ালন্দ! জাঁকজমকের বাহারবন্দ! এমনটি আর হইবে না। তারিখ দেখুন! তারিখ দেখুন!"—তাহা হইলে আগামী সংখ্যার বিচিত্রা পঞ্চাশ হাজারের কমে কুলাইত না। তবু বিজ্ঞাপন মন্দ হয় নাই—কুলচুরী-সম্প্রদায়ের মুখরোচক হইয়াছে; "অদূর ভবিষ্যতে" পড়িলেই মনটা যেন মেঘদর্শনে ময়ূরের মত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে; "পাঠক-চিত্তকে অবহিত রাখবার উদ্দেশ্য" কথায় ও কাজে সমান সাধু, তাহাতে সন্দেহ কি? "রসভোগের সুবিধা"—সে আর বলিতে? রসিকেই রসিকের ব্যথা বোঝে। তাই বলিয়া পাছে কেহ মনে করে যে এ ব্যাপারে তাহার কোন স্বার্থ আছে, (দুষ্ট লোকে কি না মনে করে

কিম্বা প্রবোধচন্দ্রকে আক্রমণ করার মধ্যে কোনও জিগীষার ভাব আছে, তাই রসিকরাজ বলিতেছেন—"আমার তাঁকে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যের মধ্যে এই সরল (?) স্বার্থটি নিহিত আছে যে আমাকে উপলক্ষ্য করে একটি ছন্দের দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হোক, এবং তার দু' চারটি মধুময় ফল আমি বিচিত্রার পাঠক পাঠিকাদের পাতে পরিবেষণ করি।" আসলে এটা mock fight—অজাযুদ্ধ! ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য পাঠকগণকে 'মজা' দেখানো। পরহিতার্থে দধীচি নিজ অস্থি দান করিয়াছিলেন; পাঠক-হিতার্থে মাসিকের সম্পাদক তাহার অধিক করিতে প্রস্তুত আছেন—অজাযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেও রাজি! স্বার্থটি কি 'সরল'! এমন সরলতাকেও যাহারা পরিহাস করিতে পারে তাহাদের মত মন্দবুদ্ধি আর কেহ আছে? কবি সত্যই বলিয়াছেন—"এমন পাঠার নাম যে রেখেছে বোকা। একা সেই বোকা নয়, ঝাড়ে-বংশে বোকা॥"

ভ্রম সংশোধন

বৈশাখের বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত সুশীলপ্রিণ্টিং-এর শ্বশুর মহাশয় লিখিয়াছেন ৩২।৫।১—— এই ঠিকানা আমরা অনেক দিন বদলাইয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান ঠিকানা ৫ সি, রাজেন্দ্রলালা ষ্ট্রীট্। সুতরাং ভবিষ্যতে সুশীলপ্রিণ্টিং-এর শ্বশুর মহাশয় ৩২।৫।১ না লিখিয়া ৫ সি লিখিলে বাধিত হইব।

মন-জুয়ান

স্কট টমসন লিখিত

[বায়রণের 'ডন জুয়ানে'র সহিত এই কাব্যের কোনই সংশ্রব নাই]

দ্বিতীয় স্বর্গ

কেমনে আরম্ভ করি ভাবিতে ভাবিতে
অত্যুৎসাহী কলমের কালি যে শুখায়,
একবার বন্ধ ঘড়ি হঠাৎ চাবিতে
চমকিয়া ওঠে তবু চলিতে না চায়।
কল্পনার পারা স্থরু করিলে নাবিতে
বহু চুরুটের ধূমে নাহি ওঠে হায়।
তিন বস্তু বাড়ে শুধু না পেলেও রস,
চক্রবৃদ্ধি স্থদ আর আগাছা, বয়স॥

তারুণ্য সে পত্নী যেন তৃতীয় পক্ষের
ছু দিনেই পতি হয় শ্মশানমুখীন্
পত্নীতে ডাকিলে বান নব যৌবনের,
পতি বলে—'তারো তারা, গেল গেল দিন।'
তারুণ্য তেমনি থাকে—কিন্তু লেখকের
লোভ থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধা হয় ক্ষীণ!
হায়রে বয়স তুই থাকিতিস্ যদি
ত্রিশের কোঠায় থেমে, আহা, নিরবধি॥

আর নহি ভীত আমি বার্দ্ধক্যের ডরে
সেথাও রয়েছে এক নব প্রলোভন।
পঞ্চাশে জয়ন্তীস্বর্ণ, হীরক সত্তরে!
আশী ও নব্বই, শত হইবে যখন,
আরো মূল্যবান্ ধাতু জমা আছে ঘরে,
প্ল্যাটিনাম রেডিয়াম যায় ইলেকট্রন্।
ইহাতেও না শানালে আছে তেহেরাণ,
সমাগত বাহাত্তর, রবীন্দ্র বেড়ান॥

বন্দি তোমা মহা বৃদ্ধ! আমাদের ঘাড়ে
সিন্ধবাদ-স্কন্ধ ত্যজি সুখে সমাসীন,
শুক্লপক্ষে শশি সম পলে পলে বাড়ে
তব সনাতন দাড়ি—যায় যত দিন।
আমাদেরি দাড়ি ব'লে ভেবে আজি তারে
হাত বুলাইয়া ভাবি, মোরাও প্রবীণ।
তরুণেরা ত্যজিয়াছে তোমা সোজাসুজি
—সেই সঙ্গে আপনার মুণ্ডটাও বুঝি!

মাথা মুণ্ড নাই তাই কাব্যে তরুণের
কেবল হৃদয় ভরা কবন্ধ শরীরে;
না হয় মস্তক আছে—কিন্তু মস্তিষ্কের
নাম গন্ধ নাই আজো শূন্য সেই নীড়ে,
রুচি ভাবে দেখা নেই এখনো শাঁসের—
আগা গোড়া ভরা শুধু লবণাশ্রুনীরে।

ঘুরায়ে বলিতে গেলে—হত ইতি গজ,
আকারে করে না পশু—করে সে মগজ ॥

বসিয়াছি বটে আমি কাহিনী লিখিতে,
কিন্তু হে পাঠক মোর নাই কোনো plot,
আধি চাষ করি আমি পরের জমিতে
লাঙলের ফালে করি উলট পালট।
নাগালে যা পাই আমি হাতের ছড়িতে—
তারেই আঘাত করি চটপটাপট।
গোরা পুলিশেরা যথা প্রবল প্রতাপ—
কাজ নাই উপমাটা, সময় খারাপ ॥

একদিন, কবে ঠিক্, কোনো ইতিহাসে
লেখে না তারিখ ; সরকারী দফ্তর
ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যদি হাতে কভু আসে
জানিয়ে ব্রজেনদাদা, দেবে অতঃপর।
পীতাম্বর সাহিত্যিক পরিণয়-পাশে
এম্, সি সর্কার সনে যিনি স্বয়ম্বর—
'এরণ্ডোপি দ্রুমায়তে' যাঁর টাক-দেশে
গোটাছয় রোঁয়া—তাই পরিণত কেশে ॥

সেই তিনি একদিন বসি 'দেলখোসে'
আরো তাঁর মত বহু Protin-পিয়াসী
চপ্ কট্‌লেট আদি পরম সন্তোষে
গিলিছেন—; অকস্মাৎ দেয়ালে উদ্ভাসি

ওঠে আচার্য্যের ছবি—চক্ষু দৃপ্ত রোষে ;
রহিল হাতের চপ—পাত্রে রাশি রাশি;
'দেলখোস' আর তাঁর না খুসিল 'দিল'—
পালান—অবশ্য দাদা না শুধিয়া Bill।

সর্ব্বভুক্ জাতি মোরা—করেছি স্থাপন
বিশ্বখাদ্য সমাবেশে বিশ্বপ্রেম ভিত্তি।
মাদ্রাজী, বার্ম্মিজ, চীনা, ইংরাজী, জার্ম্মন্,
রেস্তোঁরা ও হোটেলেতে ধাই মোরা নিত্যি।
সার্ব্বভৌম ভোক্তা মোরা, অমিত-ভোজন,
বিশ্ব-কাল্‌চারের মোরা, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি।
'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী'
দিয়েছ একটি মুখ, অধিক দাওনি॥

সেই তিনি, অবিলম্বে ছাড়ি কলিকাতা
ট্রামযোগে চলিলেন হাওড়া ষ্টেশন,
সঙ্গে নিয়া খানকয় কবিতার খাতা,
কি জানিরে কাব্য-বৃষ্টি নামিবে কখন্!
আর এক পরচুলা, ঢাকিবারে মাথা
দূরে বিদেশিনী মাঝে ভ্রমিবে যখন!
কলিকাতা—কল, মিল, মনুমেণ্ট, কুঠী—
ধরণীর পৃষ্ঠে যেন বসন্তের গুটি।

ভগ্নহৃদি প্রেমিকের নৈরাশ্যের মত
ধায় ট্রেন কাঁপাইয়া কানন প্রান্তর,
কাঁপাইয়া তালে তালে নিদ্রায় নিরত,

দাদার বিপুল বপু ; কত না নগর
পড়িল ডাহিনে বামে ; এড়ি দীর্ঘপথ
প্রাতঃকালে পৌঁছে ট্রেন তীর্থ দেওঘর।
প্রথম দিনেই তিনি দেওঘরে নেমে
পড়িলেন অকস্মাৎ, গর্ত্তে নয়—প্রেমে॥

উত্থান পতন দেখ নিয়ম বিশ্বের,
কতনা সাম্রাজ্য হায় উ ল পড়িল !
কি ভীষণ পতন সে ফল আপেলের
ব্যাখ্যায় ধাক্কায় যার ন্যুটন ঘামিল !
সবচেয়ে ভয়ানক গহ্বর প্রেমের
যাহাতে পড়িয়া কত লোকে প্রাণ দিল,
পতন তাহারো চেয়ে আছে ভয়ঙ্কর
বাজারে পাটের যবে পড়ে যায় দর।

সেই প্রেমে পড়িলেন দাদা ; সে তখন
মেদীর বেড়ার ধারে মাথা করি হেঁট
কি জানি পড়িতেছিল, রোমান্স-মগন
কবির গভীর চোখে, ওফি, জুলিয়েট,
মিরান্দা জুলেখা. রাণি, কত কি স্বপন
ভেসে ওঠে পরে পরে—একশত সেট।
মোরা শুধু সংক্ষেপেতে বলিবারে পারি—
একমাত্র গুণ তার তিনি হন নারী॥

তরুণের প্রেম আর শার্দ্দূল দারুণ
একলাফে পড়ে দোঁহে শিকারের ঘাড়ে,
বাঘ সে শোণিতে তুষ্ট ; কিন্তু রে তরুণ
হৃদয়টি না কাড়িয়া কভু নাহি ছাড়ে।
প্রেমতত্ত্ব যথা গূঢ় তেমনি করুণ
কবি গোবর্দ্ধন কিছু জানিতেও পারে।
প্রথম দৃষ্টির প্রেম দমে বটে ভারি
দ্বিতীয় দৃষ্টিতে তবে হয় ছাড়াছাড়ি।

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য বটে ! বিচিত্র সংসার !
নহিলে কি সুখে বল, এইখানে থাকা !
ডিনামাইট্ আবিষ্কর্ত্তা দেয় পুরস্কার
শান্তির লাগিয়া দেখ সোয়া লক্ষ টাকা।
শান্তির বৈঠক হ'তে হইয়াই বা'র
বারুদের দোকানেতে যায় Sam কাকা।
নিরস্ত্রী-করণ, শুধু ভেবে দেখিলাম
কম্‌তি খরচে লোক মারিবার নাম ॥

একা একা ভ্রমে দাদা যখন তখন
দোকা হইবারে তাঁর মনে সখ ভারি।
তরুণীর প্রতি অঙ্গ করি বিশ্লেষণ
বাসনা-ছুরিতে—যেন মানস-Surgery !
(মাপ করো হে পাঠিকা) হে পাঠকগণ
সব চেয়ে বড় ধাঁধাঁ রূপময়ী নারী !

তারো চেয়ে সুগভীর আছে এক ধাঁধা
তরুণের কাব্যগ্রন্থ ! ঠিক কিনা দাদা ?

"বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনি বিকশি"
ফুটিয়াছে তরুণের কাব্যগ্রন্থচয়,
পড়িতে বসিলে, অকস্মাৎ যাবে খসি
সরমের গ্রন্থি আর ব্যাকরণ-ভয়।
বাধাবন্ধহীন দিব্য পুষ্পকেতে বসি
ডিঙ্গাইয়া চলে যাবে তদ্ধিত প্রত্যয়।
এ যেন বাণীর দুর্গে ভাবের বুরুজ—
স্বয়ং বাণীর পৃষ্ঠে কিম্বা এক কুঁজ।

মনে হবে পৌরাণিক বামনের মত
তৃতীয় চরণে তার, কচি গ্রন্থকার
বুড়া ভগবানটারে করি লজ্জানত
ঢাকিয়া ফেলেছে এই বিচিত্র সংসার !
কেন তিনি তরুণের না লইয়া মত
সৃষ্টি করিলেন এই অনাসৃষ্টিটার।
তাইতো সৃষ্টিতে ভুল দেখি এটা, সেটা
তরুণের কাব্যগ্রন্থ বিশ্বের Errata ॥

প্রেমময় ভগবান্ ! তাই যদি হবে
তরুণের প্রেমে কেন পদে পদে বাধা
রাত্রি অন্ধকারে যদি সব ঢেকে রবে

অভিসারিকার কেন বস্ত্রখানি শাদা !
অকারণে দেখা যায় কেনই বা তবে
এমন অসামঞ্জস্য, বল দেখি দাদা,
ক্ষুধা কেন মেটায় না—কে বলিবে ইহা
উদরস্থ হইয়াও চুম্বন ও প্লীহা !

টাকের সাহারা ঢাকি পরচুলাটায়
একা একা ভ্রমে দাদা 'নন্দন' পাহাড়ে—
নব বৃন্দাবন-লীলা জাগে কল্পনায়
বালুতে চিক্কণ ক্ষীণ 'দারোয়ার' পারে।
অচিন অজানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়
সেই মূর্ত্তিখানি নেত্রে জাগে বারে বারে।
নিতান্ত ভুলিলে পথ যেথা চক্ষু যায়
সেইদিকে ধায়—নব্য নবেলের প্রায় ॥

[ক্রমশঃ

———

Communalist's conception of India

Before Swaraj

Communalist's conception of India

বিধির বিড়ম্বনা
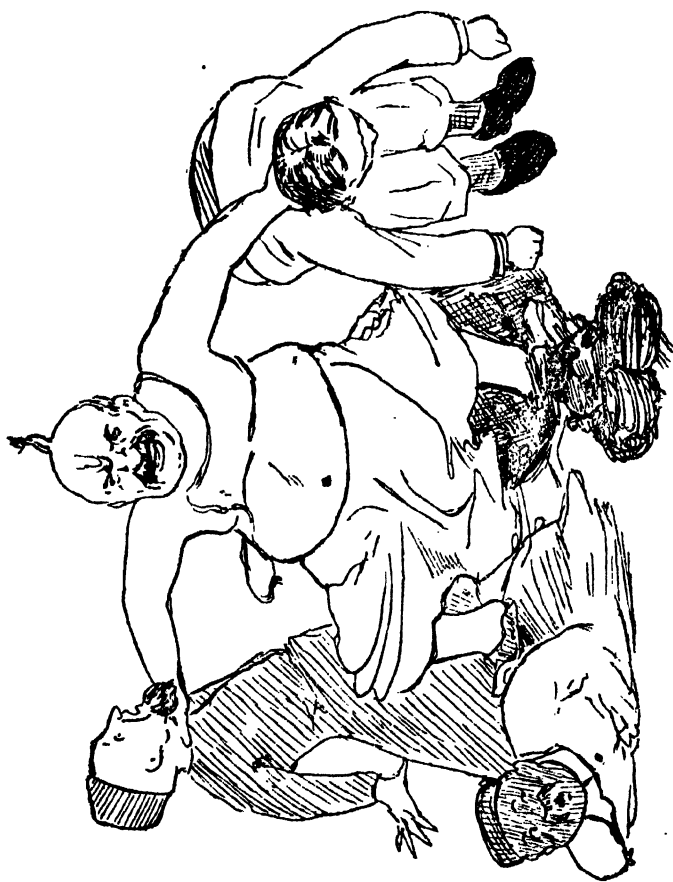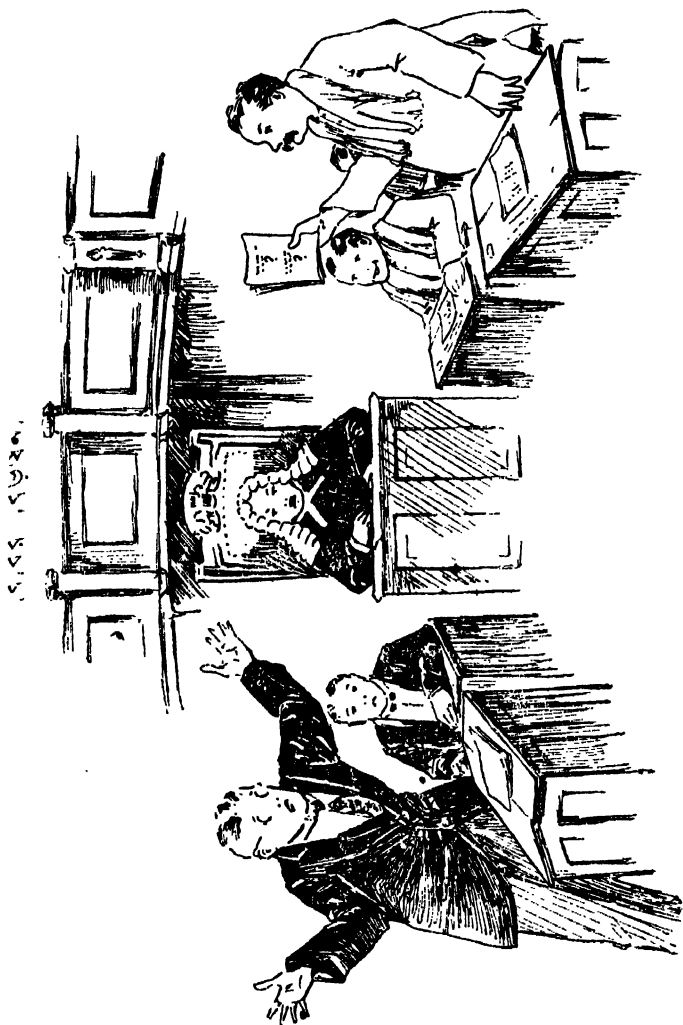
—আমার ছেলে দারোগা, দোহাই তোর আর মারিস নে।

মিস্‌ মেয়োর দেশ !

Lindberg Mystery

"Truth is stranger than even the films !"

The New Statesman.

ময়রা

('উত্তরা'র "স্যাকরা"র ভায়রা-ভাই)

ফাটা কড়ায় ভিয়ান চড়াও
কি মৎলবে ?
ময়রা বলে, কাব্য-দেবীর
শ্রাদ্ধ হবে।
শুধাই তারে, কাব্য-দেবীর
কি রোগ হল ?
ময়রা বলে, বয়স-দোষে
শুকিয়ে মল।
আমি বলি, কেহ এ মাল
করে যাচাই ?
ময়রা বলে, প্রিয়াই আমার
করে বাছাই।
আমি শুধাই, ঢাক কিসে
ভেজাল ঘী-টা ?
ময়রা বলে, সে মুখ-মদের
ছিটায় মিঠা।
শুধাই তারে, কাটাও এ মাল
কেমন করে ?
ময়রা বলে, বিকায় দরে
নামের জোরে !

সংবাদ-সাহিত্য

সম্প্রতি একটা বড় খবর আমরা পাইয়াছি, যাঁহারা বাংলাসাহিত্যের গৌরব করেন, তাঁহারা এ খবর পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইবেন। খবরটি এই, বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি খাজা গোলাম মুস্তাফা নূরউল মুল্‌ক্‌ মহোদয়কে তাঁহার অসামান্য কাব্যকীর্ত্তির জন্য, হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে একটি সম্মান-পত্র দিবার আয়োজন হইতেছে। মুস্তাফা মহোদয় বহুদিন যাবৎ বাংলার অনুর্ব্বর ভূমিভাগে কাব্যের হলচালনা করিতেছিলেন, ফলে যথেষ্ট fodder-শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে তাহার সংবাদ রাখেন না জানি, কিন্তু যাঁহারা বাংলাসাহিত্যের জোত-জমি অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহারা জানেন ইহাতে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা কতখানি। তাই রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে এই সম্বর্দ্ধনা কার্য্য সম্পন্ন হইবে শুনিয়া আমরা বাংলাসাহিত্যের কৃষিবিভাগের উন্নতির আশায় উৎফুল্ল হইয়াছি।

* * *

মুস্তাফা-সাহেবের এই সম্বর্দ্ধনা অতিশয় সময়োচিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'গর্ভবতী' নামক একটি কবিতা লিখিয়া বাঙ্গালী সাধারণের একটি অতি সুকোমল মর্ম্মস্থানে ঘা দিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার কবিযশ দিক্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছিল। তখনই ভাবিয়াছিলাম এই গর্ভ-যন্ত্রণাপীড়িত সমাজে তিনি 'গর্ভবতা'র মত কবিতা লিখিয়া যে আনন্দ বিতরণ করিলেন তাহাতে রসলোলুপ বাঙ্গালী মাত্রেরই অবিলম্বে তাঁহার 'কদমবুথি' করা উচিত। কিন্তু কি জানি কি সঙ্কোচ

বশতঃ তাহা করা হয় নাই। কবিবর তাহাতে কিছুমাত্র হতাশ না হইয়া আদিরস ছাড়িয়া বীররসের শরণাপন্ন হইলেন—আজ কাল বীররস ছাড়া আর কিছুই জমে না। অতঃপর বাঙ্গালী জাতির প্রাণ-উন্মাদন 'বঙ্গবিজয়'-কবিতা লিখিয়া তিনি একেবারে জাতীয় মহাকবির আসন দখল করিয়া ফেলিলেন। মনে হয়, সেই কবিতাটির মহাভাবে বিভোর হইয়াই এ জাতি আর স্থির থাকিতে পারিল না—এত বড় প্রতিভার আদর না করিয়া থাকিবার জো আছে? তাই হিন্দু ও মুসলমান একযোগে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

আমরা সে কবিতাটি পড়িয়াছি। জগতের সাহিত্যে যত বীরগাথা আছে, জাতির প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করিবার, অতীত গৌরব উদ্বুদ্ধ করিবার যত কবিতা আছে, তাহার মধ্যে এই কবিতাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট একথা অকুতোভয়ে বলিতে পারি। এমন কবিতা যে-কবির লেখনী-মুখে আবির্ভূতা হইয়াছে, তাঁহাকে আমরা কি বলিয়া প্রাণের পুলক নিবেদন করিব ভাবিয়া পাই না; সে পুলকের ভাষা নাই; তাই আমরা এই সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে পূর্ব্বাহ্ণেই তাঁহাকে 'খাজা' উপাধিতে ভূষিত করিলাম, 'নূর-উল্-মুলক' চলিতে পারে কিনা, তাহা ভক্তবৃন্দ ভাবিয়া দেখিবেন। এ উপলক্ষ্যে ঐ কবিতাটির একটু পরিচয় দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে।

*　　　*　　　*

কবিতাটির নাম 'বঙ্গবিজয়'। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি আজ যে গৌরবে গৌরবান্বিত তাহার অধিকাংশই যে মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের ফল, তাহা কে না জানে? সেই যে সপ্তদশ মাত্র অশ্বারোহী

লইয়া একদা এক তুরুক যোদ্ধা একটি সমগ্র দেশ জয় করিয়াছিলেন, ইতিহাসে এমন কাহিনী আর কুত্রাপি নাই ;—বাঙ্গালী হইলেও কবি গোলাম মুস্তাফা বঙ্গভারতীর সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ জাগাইয়া সেই কাহিনী শুধুই বিশ্বাস করানো নয়—তাহার গৌরব-রোমাঞ্চ এই কবিতাটিতে রণদুর্ম্মদ ছন্দে সঞ্চারিত করিয়াছেন। সতেরো জন অশ্বারোহীর আক্রমণে মুস্তাফাসাহেবের পূর্ব্বপুরুষগণ যে ভাবে কাপড়ে চোপড়ে বেসামাল হইয়াছিলেন, তাহারই কাহিনী কহিবার কালে কবিবরের ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইয়াছে ; বাংলা ভাষায় বাংলা ছন্দে কবিতাকারে তাহা বর্ণনা করিয়া যে জাতীয়তার মন্ত্রে তিনি আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালীজাতি নবজীবন লাভ করিবে সন্দেহ নাই, তাই এই গোলাম-কবির অপূর্ব্ব কবিত্ব ও অসামান্য ধীশক্তির তারিফ করেতেই হয়।

* * *

একটু উদ্ধৃত করি,—পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কোন্ মহাভাবের অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালী কবির কাব্যোন্মাদ ঘটিয়াছে—

বিহারের সীমা পার হয়ে তারা পৌছিল আসি' বাংলাদেশ,
মুগ্ধ সবাই হেরি' বাংলার শ্যাম-কুন্তলা স্নিগ্ধ বেশ ;
কহে মনে মনে বখ্‌তিয়ার—
"হইলে খোদার এখ্‌তিয়ার,
মুস্‌লিম-ভূমি হ'বে এ বাংলা, সন্দেহ তাহে নাহিক লেশ !"

* *

হেথায় এদিকে প্রভাত বেলায় মহাবীর বিন্‌-বখ্‌তিয়ার
ভীম বিক্রমে হুঙ্কার দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল দুর্গ-দ্বার,

দেখিল—রাজার সৈন্যগণ
দিল নাক' বাধা, দিল না রণ,
বরণ করিয়া লইল তাহারে, কুর্ণিশ করি' বারম্বার !

*   *

পূর্ব্ব তোরণে অরুণ তখন হাসিয়া উজল করেছে, দিক্,
আকাশের নীল নয়ন মেলিয়া চাহিল সে যেন নির্ণিমিখ ;
আজি যেন কার পুণ্য নূর
আশীর্ব্বাণীর আনিল সুর,
যত ফেরেশ্‌তা খিল্‌জীর শিরে বর্ষিল শুভ-মাঙ্গলিক !

*   *

এ কবিতা বাঙ্গালীর জাতীয় বীর-গাথাই বটে। যে জাতি বিদেশীর পদতলে এমন করিয়া আত্মবিক্রয় করে, সেই জাতির মধ্যে ইস্‌লাম প্রচার করিলে ইস্‌লাম ধর্ম্মেরও যে মহিমা-বৃদ্ধি হয় তাহা আজ কে অস্বীকার করিবে ?—সেই জাতির মধ্যেই যে এমন কবি প্রতিভার উদয় হইবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ? কবিতাটির মধ্যে এই যে পরম তত্ত্বটি পরিস্ফুট হইয়াছে, ইহার জন্যই কবি সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাই আমরা তাঁহাকে পূর্ব্বাহ্নেই সম্বর্দ্ধনা করিয়া 'খাজা' উপাধিতে ভূষিত করিলাম; তার পর রায় বাহাদুর মিত্র প্রমুখ 'যত ফেরেশ্‌তা গোলামের শিরে বর্ষুন শুভ-মাঙ্গলিক'।

*   *   *

বৈশাখের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র দাশগুপ্ত যুবতীর 'বাহু' বন্দনা করিতে গিয়া একেবারে মস্তানা হইয়া পড়িয়াছেন। 'কবিরাজ' উপাধিটি যাঁহারা একচেটে করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই অধিকার

সম্বন্ধে এতদিন আমাদের যে সংশয় ছিল, এই কবিতা পড়িয়া সে সংশয় ঘুচিয়াছে। যাঁহারা নানাবিধ 'মোদক' প্রস্তুত করেন তাঁহারাই যে কবিদের রাজা ইহা এতদিন বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু মোদকই যে উৎকৃষ্ট কবিতা, এবং উৎকৃষ্ট কবিতাই যে মোদক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; বিশ্বাস না হয়, দেখুন—

ও মৃণাল বাহু দুটি স্বর্গ-সুখ-সুধা
ঢালি দিবে স্পর্শে স্পর্শে শিহরে শিহরে
পূর্ণ করি যত মোর তৃপ্তিহীন 'ক্ষুধা'!

—ক্ষুধামান্দ্য হইলেই, এ কবিতা ভীষণ ক্ষুধার উদ্রেক করে; তারপর—

'তব বক্ষোবদ্ধ হয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে'

—একেবারে বুঁদ হইয়া যাইতে হয়, তখন—

শ্রবণে আঘ্রাণে স্পর্শে—সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া
যে রক্তিম আভাটুকু উঠিবে ফুটিয়া
শ্রান্ত তব বরাঙ্গের প্রতি রোমকূপে—

"শ্রান্ত বরাঙ্গের প্রতি রোমকূপে" যে রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিবে, সে অবস্থায় তাহা চাক্ষুষ করা—এইটাই এ কবিতার আসল 'কবিত্ব'। আবার 'এ রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিবে—উষার আভাস সম অপরূপ রূপে!' ইহার পর উষার আভাসকে কোনও রক্তিমাভার উপমান করিতে আর কেহ সাহস করিবেন? বিচিত্রা-সম্পাদক রসিক বটেন, পায়ের ধূলা লইতে ইচ্ছা হয়। দাদার বয়স কত?

*　　　*　　　*

'ভারতবর্ষে'ও এক নবীন কবির অভ্যুদয় হইয়াছে। 'ভারতবর্ষে'র বাহার লেখকগণের উপাধি-সঙ্কলনে। এই নবীন কবিটিও বোধ হয়

উপাধির জোরেই ভারতবর্ষে কবিতা ছাপিতে সমর্থ হইয়াছেন? কবিতাটি যদিও 'অভিশাপ', তথাপি আমরা অকাতরে তাহা বহন করিয়াছি কবির উপাধির খাতিরে। কবির এমন উপাধি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না, যথা—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র শীল, বি-কম্। বাংলাদেশে দু-চারি জন ভালো রোজা না হইলে আর চলিবে না দেখিতেছি—এ ত' কাব্য-সরস্বতী নয়; এ যে অপদেবতা! কাহাকেও করিয়া খাইতে আর দিবে না দেখিতেছি! এ দেবতা যদি বাণিজ্যেও বসতি করেন, তবে ঝাড়াইতে হইবে বৈ কি? এক দিকে ডাক্তারী, অপর দিকে বাণিজ্য—তবু রক্ষা নাই! 'অভিশাপ' বটে!

* * *

অভিজাত-সমালোচনার একটু নমুনা দিব। 'কবি-পরিচিতি' নামক পুস্তকের সমালোচনায় সুবিখ্যাত পরিশীলন-পত্রিকা 'পরিচয়ে'র পৃষ্ঠায় আধুনিক সমালোচক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল এই কয়টি কথা লিখিয়াছেন—

"(এই গ্রন্থের লেখকগণের মধ্যে) শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নাম সাহিত্যিক হিসাবে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য"।

ইহারই নাম সমালোচনার অপক্ষপাত; রচনা উল্লেখযোগ্য না হইতেই লেখক উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠেন।

"তাঁর প্রবন্ধের নাম 'চিত্রাঙ্গদা'। কিন্তু প্রবন্ধের বিষয় চিত্রাঙ্গদা নয়, চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে Thompson সাহেবের মতামত।"

—বিষয়টি কেমন Serious। ইহা হইতেই অনুমান হয়, এ রচনার সারবত্তা কতটুকু। লেখক তাহাও একরূপ স্বীকার করিয়াছেন—

"চৌধুরী মহাশয় যে আলোচনা-জাল বিস্তার করিয়াছেন তাহাতে Plato, Aristotle, কালিদাস, বামনাচার্য্য (দণ্ডীর কি হইল?)

Croce, Rollo, ভারতচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি···অনেকে আসামী Thompson এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইয়াছেন।"

অর্থাৎ রচনাটিতে আর কিছু না থাক যথেষ্ট বাক্‌তাল্লি আছে। ইহাতে চাট আছে, বুক্‌নির টাক্‌না আছে—আসল বস্তু নাই; চৌধুরীজীর ত' ইহাই কেরামতী। কিন্তু সমালোচক মহাশয় তাহাতেই মুগ্ধ—

"ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে Thompson ত' কাবু হইয়াছেনই উপরন্তু এমন একটি প্রবন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা রসিক পাঠক মাত্রই উপভোগ করিবেন।"

—বাহবা! সমালোচক বলিয়াছেন রচনাটিতে মূল 'চিত্রাঙ্গদা'র সম্বন্ধে কিছু নাই; অথচ ইহাও সত্য, যে Thompson সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা 'চিত্রাঙ্গদা'র সম্বন্ধে; তথাপি কেবল মাত্র Plato Aristotle প্রভৃতির সাক্ষ্যের জোরেই Thompson কাবু হইলেন! এ কেমন আলোচনা? এ কোন্ জাতীয় রসিকতা? সমালোচক মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন—

"কিন্তু তবু রচনাটি পড়িয়া মন তৃপ্ত হয় না। সমগ্র প্রবন্ধটি যেন একটি বৃহৎ গৌরচন্দ্রিকা, আসল কথাটি বাদে সবই যেন তাহাতে বলা হইয়াছে।"

প্রমথ চৌধুরী নিশ্চয় গুণ করিতে জানেন। লেখায় কিছু না থাকিলেও তাঁহার লেখা উচ্চদরের হয়। তাই রচনা যেমনই হোক, তাঁর নাম সর্ব্বত্রই "সাহিত্যিক হিসাবে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য"।

* * *

আমরাও উক্ত রচনাটি পড়িয়াছি। উহা একটি "বৃহৎ গৌর-চন্দ্রিকা"এর একটি সুবৃহৎ কদলী-চন্দ্রিকা বটে! কাব্যসমালোচনা

হিসাবে উহা Idiotic ও imbecile। প্রমথ চৌধুরীর নিকটে তাহার বেশী আমরা আশাও করি নাই। Thompsonএর অভিযোগ যতই অসঙ্গত হউক, তাহার জবাব উহাতে নাই, আছে কেবল চোখ বুঁজিয়া নিজের কথাই শত কাহন, আর কস্ বাহিয়া 'রসে'র গাঁজানি। তা ছাড়া, Thompsonএর মত একেবারে উড়াইয়া দিবারও নহে। চিত্রাঙ্গদার যথার্থ সমালোচনা—'গৌর' 'গৌর' করিয়া গৌরচন্দ্রিকা নয়—করিতে হইলে, এইরূপ অভিযোগের সম্মুখীন হইতে হইবে, ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া গেলে চলিবে না। সমালোচনার ক্ষেত্রে সমালোচনা চাই, শুধু রসিকতায় চিঁড়া ভিজিবে না। কিন্তু এ হইল কি? যেমন সমালোচনা, তেমনই সমালোচনার সমালোচনা! তাই বলিতেছিলাম, প্রমথ চৌধুরী নিশ্চয়ই গুণ করিতে জানেন! 'কি মোহিনী জানো বন্ধু, কি মোহিনী জানো, তরুণের প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন!'

* *

এবারকার 'পরিচয়ে'র একটি কবিতার নাম 'দুটো কাজল আঁখি'—'দুটো!' গোটা-পাঁচেক হইলেই বা ক্ষতি কি? লেখকের নাম—শ্রীসান্ত্বনা গুহ, বুঝিলাম না; 'কাঁজল আঁখি'র জন্য 'কাজল-আঁখি' বাউরা হইয়াছে? Sex-Psychologyর মতে কিছুই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। তবু?—সান্ত্বনা গুহ (পুং)-এর ত?

* *

উক্ত পত্রিকায় শ্রীরবীন্দ্রনাথের 'গৌড়ীরীতি' কবিতাটি পড়িয়া মনে হইল, ইতিপূর্ব্বে যেন আর কোথায় উহা পড়িয়াছি। হইবে বা! কবির যে জ্বালা ধরিয়াছে!

একটি কথা আমরা আমাদের ভাষায় 'লাভ' করিয়াছি। কাগজখানির নাম করিব না—স্থান যেমনই হৌক, কাঞ্চনটাই আসল কথা। কথাটি আর কিছু নয়—'ভুঁড়িভোজন'। বেশ গোলগাল মোটাসোটা নয়? কথাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের বেশী মাথা ঘামাইতে হইবে না। Phoneticsএর নিয়মে আমরা এমন কত সুন্দর সুন্দর শব্দ ভাষায় লাভ করিয়াছি, ইহাও সেইরূপ একটি। 'ভূরিভোজন' শব্দটি ঠিক বাংলা নয়; অন্তত উহাতে বাঙ্গালীর প্রাণ ভরে না। কিন্তু এইবার উহা খাঁটী বাঙ্গালীর ভাষায় পরিণত হইল—একেবারে খাঁটি বাংলা। ভাষাকে হৃষ্টপুষ্ট করিতে হইলে পদ্মাপারের হাওয়ার মত এমন দাওয়াই আর নাই।

* *

'পরিচয়ে'র পাঠকগোষ্ঠীতে বেশী পাঠকের ভিড় নাই; ইহা অবশ্যই সুলক্ষণ। এবারে আছেন শ্রীঅনিন্দিতা দেবী ও শ্রীমান দিলীপকুমার। দিলীপকুমার উভচর, পাঠক ও লেখক—দুই গোষ্ঠীতেই যাওয়া আসা করেন; বরের ঘরেও আছেন কনের ঘরেও আছেন। 'অনিন্দিতা'টি সম্ভবত এখনও এক গোষ্ঠীতেই বিরাজ করিতেছেন। যাই হোক, ইঁহাদের লইয়াই 'পরিচয়ে'র পাঠকগোষ্ঠী। এ গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা কম হইলেও মতামতের গুরুত্ব আছে। দিলীপকুমারের মতামত আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানি; 'পরিচয়ে' প্রকাশিত রচনাগুলির সম্বন্ধে সম্পাদকের সহিত তাঁহার মতান্তর হওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু 'অনিন্দিতা'রা অনেক ভালো কথা বলিয়া থাকেন; যথা—" 'পরিচয়' বিশ্বসাহিত্যের পরিচয় দিবার ভার লইয়া খুবই আবশ্যকীয় কাজে হাত দিয়াছেন এবং একটি অভাব মিটাইতেছেন।" কিন্তু 'অনিন্দিতা'র বড় দুঃখ, "সামাজিক, নৈতিক, যৌন ও মঙ্গলকর্ম্মাদি

বিষয়ক এত যে চিন্তাদর্শ এখন আসিতেছে বাংলা উচ্চশ্রেণীর কাগজ ত প্রায় তাহা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছেন।" 'অনিন্দিতা'র ভাষাও অনিন্দিতা হইতে পারে; কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি সেরূপ নহে। বাংলায় কি কোনও উচ্চশ্রেণীর কাগজ আছে নাকি? আমরা ত জানি বাংলা মাসিক সাহিত্য শাক-বেগুনের হাট; কতকগুলি ছোট-বড় ঝাঁকা খুলিয়া ফ'ড়ের দল বসিয়া থাকে; কারও ঘুন্শীতে পয়সার থলি ভারী, কারো হাল্কা—যে যেমন আমদানী করিতে পারে, যার যেমন হাঁকের জোর। তবে হ্যাঁ, 'পরিচয়ে'র কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু তাঁহারা ত—"সামাজিক, নৈতিক, যৌন ও মঙ্গলকর্ম্মাদি" রীতিমত সম্পাদন করিতেছেন! যৌন গল্প ও যৌন কবিতা তাঁহারা যে ভাবে সরবরাহ করিতেছেন তাহাতে অনিন্দিতাদের নিন্দার ভয় আর আছে কি? ইহাতেও যদি তাঁহারা অনিন্দিতা হন, তাহা হইলে, 'নন্দন-তত্ত্ব' যে মাঠে মারা যায়!

* *

'বস্ত্রহরণে'র কবি শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কি পদ্যে কি গদ্যে খাসা ছবি আঁকিতে পারেন—একেবারে পাঠকের চোখের সামনে ফুটাইয়া তোলেন! এবারকার 'পরিচয়ে' গদ্যে তিনি সেইরূপ একটি ছবি আঁকিয়াছেন—একেবারে যেন Cinemaর ছবি। ভাব অবশ্য সেই এক মহাভাব—'বস্ত্রহরণে'রই রকমফের। কবিবর লিখিতেছেন—

"আজ যদি পৃথিবীর সমস্ত পুরুষগুলোকে একত্র করে' এদের এক দলকে অতলান্ত মহাসাগরের ওপারে আর অন্য দলকে উক্ত মহাসাগরের এ পারে রাখা যায়—"

তাহা হইলে কি হয় বলুন দেখি?" আপনারা বোধ হয় বলিবেন, তাহাতে কি আর হয়? তাহাই ত হইয়া আছে; 'পৃথিবীর সমস্ত

পুরুষগুলা'র এক ভাগ অতলস্ত সাগরের এ পারে, এবং আর এক ভাগ ত ওপারে বরাবরই আছে। উহুঁ, আপনারা বুঝিলেন না—উহার মধ্যে একটু মজার খেল্ আছে! কবির ভাব আপনারা কি বুঝিবেন! কবি বলিতেছেন—"তবে পুরুষ ও নারী! দুয়ের চোখের দীপ্তিই নিবে যাবে—"। একেই বলে Romantisme—একেবারে ফরাসী কাব্যের ভাব! মাঝে অতলস্ত সাগর কিনা! দুস্তর সাগর, বড় প্রকাণ্ড সাগর, গভীর সাগর!—তল পাওয়া যায় না; তাই কবির কল্পনাও অতলস্ত। কারণ থাক বা না থাক, নারী ও পুরুষের চোখের দীপ্তি নিবিয়া যাইতে বাধ্য। তারপরে কবির সেই অপূর্ব্ব চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা। "তখন (মহাসাগরের এক তীরে দাঁড়াইয়া) পুরুষেরা দলবেঁধে (হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্যসহযোগে) কেবলই গান গাইতে থাকবে—

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও,
কুলু কুলু কল নদীর স্রোতের মত,
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।

আর (সাগরের অপর তীরে দাঁড়াইয়া) নারীরা দল বেঁধে (এক একটি লীলাকমল হাতে লইয়া) হতাশ হৃদয়ে কত দিন সেই দিকে ছল্ ছল্ চোখে চেয়ে থাকবে—তাদের চোখে পলক পড়বে না।"—কি ছবি! এ যেন একটি অনাদি অনন্ত বিরহরাগিনীকে রঙে ও রেখায় 'অনুবাদ' করা হইয়াছে! সাগরের দুই তীর—যে-সে সাগর নয়, অতলস্ত মহাসাগর—তাহারই দুই তীর হইতে নারী ও পুরুষের কি চোখ ঠারাঠারি! পুরুষরা গান করিতেছে, নারীরা তাহা শুনিয়া ছল্-ছল্ চোখে চাহিয়া আছে; তাহারাও গান গাহিয়া উত্তর দিতে পারিত, কিন্তু তেমন যুতসই গান পুরুষ কবির মনে পড়ে নাই, বোধ হয়;

আশা করা যায় ওটুকু নারী-কবিরা পূরণ করিয়া লইবেন। কবিবরের বর্ণনাটি যথার্থ হইয়াছে; তবে কিনা, উপসংহারটা কিরূপ হইবে বলা যায় না। কারণ, দুই চারিটা হারমোনিয়ম জুটাইতে পারিলেই, জ্যোৎস্নারাত্রে পান্সী-যোগে এ সাগর পাড়ি দিতে কতক্ষণ? তখন আবার সেই 'বস্ত্রহরণে'র পালা। কি অপূর্ব্ব কল্পনা! কি মনস্বিতা! 'পরিচয়ে'র গ্রাহক বাড়িতেছে ত?

* *

গতবারে আমরা 'চিঠি'র পাঠকগণকে একটি মর্ম্মান্তিক সংবাদ দিয়াছি—সংবাদ দিব কি—আমরাই সে সংবাদে শোক-বিহ্বল হইয়াছি। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সেই "বাংলার ইতিহাস" আর নাই, অগ্নিদেব নিজে তাহার সৎকার করিয়াছেন। কৈশোর হইতে যৌবন, যৌবন হইতে এই প্রায় প্রৌঢ় পর্য্যন্ত যে অমূল্য গবেষণার পরিণত ফলের প্রত্যাশায় কত বিনিদ্র রজনী জাগ্রত স্বপ্নে যাপিয়াছি, আজ কিনা তাহার এই পরিণাম! বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে যখনই দেখা হইয়াছে, তখনই আশ্বস্ত হইয়াছি যে, সে মহাগ্রন্থ বিশ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়া 'তাঁহার জীবনের' শেষ দিন পর্য্যন্ত নিত্য নব তথ্য যোজনার অপেক্ষায় অসূর্য্যম্পশ্য হইয়া বিরাজ করিতেছে; কিন্তু ভয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর যাহাতে তাহার মুদ্রণকার্য্যে কোনও বাধা না ঘটে তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়া রাখিয়াছেন। চর্ম্মচক্ষে কখনও দেখি নাই বটে, কিন্তু মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তাহাকে চিরদিনই দেখিয়াছি—কত আশাই করিয়াছি; বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন সফল হইয়াছে, বাঙ্গালীর কি সৌভাগ্য! কিন্তু এতদিন পরে অগ্নিদেব এ কি করিলেন! আমরা ত' কখনও দেখিবার আশা করি নাই, কেবল আছে এই আশাতেই প্রাণ ধরিয়া ছিলাম—সে সাধেও কেন

তিনি বাদ সাধিলেন ? অত বড় সম্পদ চোখ খুলিয়া দেখিতে বলিলেও আমরা দেখিতে সাহস পাইতাম না, কখনও দেখিতে চাহিতাম না; তবে কেন এ শাস্তি ? বিদ্যাভূষণ মহাশয়কেও বলি এ নিদারুণ সংবাদ প্রকাশ করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? আমরা যদি শ্রাদ্ধাধিকারী হইতাম, তাহা হইলে বুঝিতাম কোনও উপায় ছিল না। এ দুঃখ তিনিই বা কেন আমাদিগকে দিলেন ? শুনিয়াছি তিনি আর একখানি অতিবৃহৎ ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন—সে খানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; তাহাও নাকি একেবারে up-to date, ১৩৩৮ সাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হইয়া আছে। দোহাই বিদ্যাভূষণ! এখানিও যেন উইয়ে খাইয়া না ফেলে—ফেলিলেও সে সংবাদ যেন অপ্রকাশ থাকে; আমরা শপথ করিয়া বলিতেছি সে গ্রন্থও আমরা চর্ম্মচক্ষুতে দেখিবার বাসনা কখনও জানাইব না, স্বপ্নেই দেখিব।

—

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিদারুণ বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন। যে সকল সাহিত্য-সভায় ইনি শোভাস্বরূপ বিরাজ করিতেন সেগুলির কি হইবে ?

—

হায় বাংলাসাহিত্য! সম্রাট দীনেশচন্দ্র অকস্মাৎ গুলি খাইয়া ঘায়েল হইলেন—আবার ওদিকে গবেষক অমূল্যচরণ বাতে ও শোকে হতবাক। বাকী রহিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এবং রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়। ভগবান ইঁহাদিগকে দীর্ঘায়ু করুন।

—

'ছবির কথা'—বৈশাখের বিচিত্রায় কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকারকে লেখা একখানা চিঠি—রবীন্দ্রনাথের। কৈফিয়ৎ জিনিষটা

আসলে কৈফিয়ৎ না হইয়া কতদূর চমকপ্রদ হইতে পারে ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। সরকার মহাশয় সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের ছবির অর্থ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া তাঁহাকে পত্রাঘাত করিয়াছিলেন—জবাবে যাহা আসিল তাহাতে ছবির অর্থ না থাকিলেও ভেল্কি আছে—তুলনায় ছবিও যেন স্পষ্ট বোঝা যায়!

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"ছবির কথা কিছুই বুঝিনে। ওগুলো স্বপ্নের ঝাঁক, ওদের ঝোঁক রঙীন নৃত্যে। এই রূপের জগৎ বিধাতার স্বপ্ন—রঙে রেখায় নানাখানা হয়ে উঠ্‌চে।"

রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখিয়া আমাদেরও ঠিক এই কথাই মনে হইয়াছিল তবে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন 'নানাখানা' না হইয়া হইয়াছে আটখানা এবং তাহাও আহ্লাদে!

—

"আপনা আপনি সৃষ্টিকর্ত্তার তুলির মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েচে। ……অজানার স্বপ্ন-উৎস থেকে বিচিত্র রূপ উৎসারিত—এ সম্বন্ধে বিধাতার কোনো কৈফিয়ৎ নাই।"

বিধাতাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না, বিধাতার সুবিধা সেইটুকু—কিন্তু সে ব্যক্তি তো কখনও বলে নাই যে আমি যাহা সৃষ্টি করিলাম তাহা সমস্তই আনন্দদায়ক, সমস্তই অপরূপ সুন্দর! বিধাতার আস্পর্দ্ধার অভাব আছে। সৃষ্টিকর্ত্তার তুলির মুখ হইতে কুৎসিৎ এবং বীভৎসও যে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথ করিলেও, বিধাতা বেচারা তাহা অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া? খোদার উপর কতখানি খোদ্‌কারী করিতে জানিলে মানুষ একথা বলিতে পারে যে,

"আমার ছবিও তাই, রূপের নিগূঢ় আনন্দ নানা রূপে রূপে লীলা

করচে, * * * এই আনন্দ দর্শকের মনেও যদি সঞ্চারিত হয় তো ভালো—নইলে কারো কোনো ক্ষতি নেই।"—তাহাই ভাবিতেছি। দৃষ্টির পীড়াদায়ক বস্তু বাজারে বাহির করিয়া, 'কারো কোনো ক্ষতি নেই' বলিয়া মনকে চোখ ঠারিলেই কি দোষের লাঘব হয়?

—

কিন্তু, এই পত্রের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ—ঋষি রবীন্দ্রনাথ—জরথুস্ত্র রবীন্দ্রনাথ—একটি মহা সত্যকথা বলিয়া ফেলিয়াছেন; তাঁহার ছবি সম্বন্ধে এই কথাটি মনে রাখিলে আর কাহারও কিছু নালিশ করিবার থাকে না।

"সৃষ্টি কেন হয় তার ব্যাখ্যা অসম্ভব—সকলের গোড়াকার কথাটা হচ্চে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

রবীন্দ্রনাথের আনন্দ হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু যে ভূতগুলি জন্মিয়াছে তাহাদের জন্য গয়ায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে রবীন্দ্রনাথের মঙ্গল, আমাদের মঙ্গল এবং সকলের মঙ্গল।

—

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয়-বস্তু যাহাই হউক, তাঁহার ভাষা যে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং মধুর এ বিষয়ে মতভেদ ছিল না; এখন দেখিতেছি, উপন্যাস-রচনার ক্ষমতা লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাষাও বিকৃত বিরূপ হইয়া উঠিতেছে; শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্ব্বে অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ বলিয়া ঠেকিতেছে। মনে হইতেছে, গত তিন বৎসর উপন্যাসের খোরাক সংগ্রহের জন্য তিনি যেন সাইকলজিকাল ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্রকে লইয়া একটু বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন, ফলে তাঁহার ভাষা কিঞ্চিৎ পদ্মাপারগন্ধী হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত দিতেছি—

"পরের ইচ্ছায় পরের ঘরে বছরের পর বছর জমিয়া এই দেহটাকে দিল শুধু কৈশোর হইতে যৌবনে আগাইয়া কিন্তু মনটাকে দিয়াছে কোন্ রসাতলের পানে খেদাইয়া।"—বিচিত্রা—ফাল্গুন ১৭' পৃষ্ঠা

"বয়সে বছর চারেকের বড়, চিরকাল আধ্-পাগলা গোছের ছেলে—মনে হইল বয়সের সঙ্গে **সেটা** বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তাহার জবরদস্তি পূর্ব্বেও এড়াইবার যো ছিল না, **সুতরাং** আজ রাত্রের মতো সে যে আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না এই কথা মনে করিয়া আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। **বলাবাহুল্য** তাহার উল্লাস ও আত্মীয়তার সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার মত শক্তি আমার নাই। **কিন্তু** সে নাছোড়বন্দা।"—বিচিত্রা, চৈত্র, ৩০৭ পৃঃ

"আমি আর পাখী মারিনে,—বড় দুঃখ **লাগে**।"

—বিচিত্রা, ৩০৮ পৃঃ

"আমের সময় আমার বাগানগুলো তো সব ব্যাপারীদের জমা **করেই** দিই"—বিচিত্রা, ৩০৯ পৃঃ

"বাড়ীতে ফিরিয়া গহর তাহার পুঁথি আনিয়া হাজির করিল, তাহার পরিমাণ দেখিয়া ভয় পায় না সংসারে এমন কেহ যদি থাকেও **তাহা** অত্যন্ত **বিরল**।"—বিচিত্রা, ৩১৬ পৃঃ

"একটা **আম্র-ছায়া** চোখের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল।"

—বিচিত্রা, বৈশাখ, ৪৫২ পৃঃ

'মনের মধ্যে এই কথা **দুটাই** বহুক্ষণ ধরিয়া **নড়িয়া বেড়াইতে** লাগিল।"—বিচিত্রা, ৪৫৩ পৃঃ

চতুর্থ পর্ব্ব যদি পঞ্চম পর্ব্বে গড়ায় তাহা হইলে অবস্থা কি হইবে ভাবিতেছি।

বুড়া কার্ত্তিক রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন পরিত্যক্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের ময়ূরসিংহাসনে কোন্ নব কার্ত্তিকের অধিষ্ঠান হইবে তাহা লইয়া কিছুদিন যাবৎ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। এই নব কার্ত্তিকের দলে ঠাকুরবাড়ীর জামাতা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বার অ্যাট ল ও রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই দুই জনের নামই অধিকতর শোনা যাইতেছে। কনভোকেশন হলে গুলি খাইয়াও যেখানে রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর কেবলমাত্র বার্দ্ধক্যহেতু কাঁচিয়া গণ্ডূষ করিতে পারিলেন না (গুলি-খাওয়া বোধ হয় তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ) সেখানে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মত তরুণ নিশ্চয়ই চাকুরীর আশা করিতে পারেন—তিনি এখনও সত্তরের কোঠা পার হন নাই এবং বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের দুশ্চিন্তা তাঁহাকে করিতে হয় না।

—

বয়সের কথা যাউক, দাবীর দিক দিয়াও চৌধুরী মহাশয়ের দাবী বড় কম নয়—; বাংলাসাহিত্যের অতি আধুনিকদের দলে তিনি একজন পয়গম্বর, রায়তের কথা ও চারইয়ারী কথা লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ফ্রেঞ্চ বই যে পিছনের দিক হইতে পড়িতে হয় না এ তথ্য তিনি অবগত আছেন এবং আঁদ্রে জিদ্‌কে আঁদ্রে গীদ বলিয়া চালাইলেও মূল ফরাসীর সহিতই তাঁহার কারবার। শনিবারের চিঠির পাঠকেরা তাঁহার সনেট পঞ্চাশৎ বা বাংলা কাব্য সাহিত্যে তাঁহার দানের কথা অবগত আছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা 'পণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী' নিবন্ধের পাঠকমাত্রই জানেন এবং ভারতচন্দ্র ও তিনি যে প্রায় এক শ্রেণীর লোক তাহা স্বীকার করিতেও তাঁহাদের বাধিবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী খুঁজিতেছেন বলিয়া তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের প্রতি যদি কেহ কটাক্ষ করেন তাহা হইলে বুঝিব তিনি বেরসিক; বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী তিনি স্বয়ং খুঁজেন নাই—এই চাকুরীটাই তাঁহাকে বাংলাসাহিত্যের অন্ধকারে হাৎড়াইয়া ফিরিতেছে।

—

চৌধুরী মহাশয় কোণা ঘেঁষিয়া থাকিতে ভালবাসেন—তাঁহার বীরবলী ঢং কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে তিনি জাহিরগ্রামের লোক। তবু অন্ধকারে রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের খোলবাজনার শব্দে মিহি ও মোটা অন্য সকল আওয়াজ চাপা পড়িয়াছে। শনিবারের চিঠি ও হিতবাদী তাঁহার বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা যতই প্রচার করুক তাঁহার হাতে শ্রীখোল যে বাজে ভাল তাহা ভাইসচ্যান্সেলর স্থরাবর্দ্দী সাহেবও স্বীকার করিবেন, অবশ্য স্থরাবর্দ্দী সাহেব উপস্থিত থাকিলে কোটপ্যাণ্ট পরিয়া খোল বাজাইতে একটু বাধ বাধ ঠেকে—তা ঠেকুক।

—

এই খোলবাজনার একটু নমুনা সম্প্রতি বাংলাদেশের খোল-রসিকেরা পাইয়াছেন—কবি গোলাম মোস্তাফা সাহেবের সম্বর্দ্ধনা ব্যাপারে। এখানে রায় বাহাদুর মিত্র মহাশয় যে চাল চালিয়াছেন তাহা দাবার নৌকার চাল—বানচাল না হইলে এ চাল একেবারে অব্যর্থ। মুসলমান ভাইসচ্যান্সেলরকে হাত করিবার এমন সহজ সুযোগ যদি বা ভূতপূর্ব্ব দীনেশবাবু পরিত্যাগ করিতে পারিতেন (তাঁহার পৈতৃক ভিটাটি কন্যাজামাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও তাঁহারা ন্যায্য মূল্য দিতে স্বীকৃত থাকা সত্ত্বেও তিনি মুসলমানকে বিক্রয় করিয়াছিলেন এরূপ শোনা যায়) কিন্তু খগেনবাবু হিন্দু মুসলমান

কলহের দিনে মৈত্রীর এই সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। কবি হিসাবে গোলাম মোস্তাফা সাহেবের স্থান আস্তাকুড়েই হউক, ডগমগ আহ্লাদে বক্তিয়ার খিলিজি কর্তৃক 'বঙ্গবিজয়ে'র ব্যাপার লইয়া কবিতা লিখিয়া তিনি বাংলাদেশ ও জাতিকে যতই অপমান করিয়া থাকুন, হাতের কাছে যখন আর কোনও মহম্মদ ভক্তকে পাওয়া যাইতেছে না তখন গোলাম মোস্তাফাই সই! গোলামীতে বাহাল হইবার এমন অপূর্ব্ব সুযোগ হয় তো মিলিবে না। আশা করি অতঃপর খগেনবাবু গোলাম মোস্তাফার কবিতাগুলি কীর্ত্তনের সুরে গাহিবেন।

[ভাল কথা! এই সম্বর্দ্ধনাতে "মহম্মদ"-বন্দনা লেখক কবি-নাব সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের নাম ত দেখিলাম না!]

—

নজরুল ইসলামের কথা বলিতেছেন? শত্রুর মুখে ছাই দিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্যাজ ও পয়জার দুইই দিয়াছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার সহিত তাঁহার থোড়াই সম্পর্ক। তবে হ্যাঁ, গেঁয়ো কবি জসীমউদ্দীন আছেন বটে!

—

তাঁহার বেলাতেই কি কম করা হইয়াছে! যে ব্যক্তি ৮ লাইনের একটি বাংলা চিঠিতে বানান, idiom, syntax-এর ৩৮টা ভুল করিয়া বসেন তাঁহাকে বাংলায় এম এ পাশ করানো এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলার পরীক্ষক করিয়া লওয়া কি এমনিতেই হইয়াছে! আল্লার জয় হউক, সুরাবর্দ্দী সাহেবের নজরে কি ইহা পড়ে নাই?

—

কিন্তু, তোমার আমার কথাতেই কি কিছু যায় আসিতেছে? ময়ূর-সিংহাসনের কার্ত্তিক বাছাই করিবার ভার পড়িয়াছে আট ব্যক্তির —বাংলাসাহিত্যের অষ্টদিক্‌পালের উপর। পাঠকেরা কম্পান্বিত কলেবরে নিশ্চয়ই ভাবিতেছেন এই অষ্টদিক্‌পাল কে কে? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মৃত, রবীন্দ্রনাথ পারস্যপ্রবাসী—শরৎচন্দ্রকেও বিশ্বাস নাই। তবে কি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়? রাম, রাম, তাঁহার নাম করিলে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাতের হাঁড়ি ফাটিয়া যায়—তিনি নন। জলধর দাদা, ফণীন্দ্র পাল, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়—ইঁহারাও নহেন। বাংলাসাহিত্যের এই অষ্ট-দিক্‌পালের নাম—

ডাঃ হাসান সুরাবর্দ্দী সাহেব
শ্রীযুক্ত প্রমথ তর্কভূষণ
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি
শ্রীযুক্ত চারু বিশ্বাস
শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত হীরেন দত্ত
শ্রীযুক্ত প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ও শ্রীযুক্ত দীনেশ সেন

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাসাহিত্য অধ্যাপনার উপযুক্ত কে এবং কে নয় এই আট জন মহারথীই তাহা স্থির করিবেন। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, ই, বি, রেলওয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পল্‌তা ওয়াটার ওয়ার্কসের এঞ্জিনিয়ার সাহেবের নাম এই দলে নাই কেন, কে ইহার জবাবদিহি করিবে! এই মারাত্মক ভুল সত্ত্বেও নির্ব্বাচন কমিটির এই

আটজনের কেহই যে উড়াইয়া দিবার মত নহেন তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে ?

—

ডাঃ হাসান সুরাবর্দ্দী সাহেব, 'কক্‌নি' বাংলা হইলেও বাংলাতে কথা বলিতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরীরা তাহার সাক্ষ্য দিবে। 'স' কে 'শ' বলাটা দোষের না গুণের তাহা বিচার করিতে হইলেও তো আবার একটা কমিটি বসানো আবশ্যক। তাহার প্রয়োজন আছে কি ?

কাশীর শ্রীযুক্ত প্রমথ তর্কভূষণ বাংলার হেড এগ্‌জ্যামিনার হইয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাকে বাদ দিলে চলিবে কেন ? শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা সঙ্কলনে আছে এবং তিনি স্বয়ং বাংলাতে এম-এ। তাঁহাকে বাদ দিলে যজ্ঞ শিবহীন হইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় নাই কিসে ? এসেম্বলী, করপোরেশন—বাংলাসাহিত্য বিভাগই বা বাদ পড়িবে কেন ? স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় 'ইয়োরোপে তিনমাস' লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এবং শুনিলাম সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আজকাল রায়বাহাদুরের কীর্ত্তন শুনিয়া গদগদ হইতেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ-লেখক শ্রীযুক্ত হীরেন দত্ত মহাশয়ের পরিচয় সর্ব্বজনবিদিত। শ্রীযুক্ত প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে চার নম্বর ওয়ার্ডের কে না চেনে ? এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্যে'র লেখক।

—

এই ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম কমিটিতে নাই। বাংলাসাহিত্যসাধনায় তাঁহাদের ফাঁকি যে ধরা পড়িয়া গিয়াছে—ইহাতে আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। যে পরশপাথরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নপরীক্ষা হয় তাহা একবার দেখিতে সাধ যায়।

গত ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একসপ্ততিতম বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিসপ্ততিতম (বাহাত্তর) বর্ষে চরণার্পণ করিয়াছেন। শরৎ-চন্দ্রের এখনও ষোল বৎসর বাকী।

গত সংখ্যায় সংবাদ-সাহিত্য লিখিতে গিয়া আমরা অনবধানতা বশতঃ যে পাপ করিয়াছি তাহার কোনো প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা জানি না—আমরা শ্রদ্ধেয় কবি কালিদাস রায়ের নিকট বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। নন্দগোপাল সম্পর্কে এরূপ ঘটনা দ্বাপর যুগেও ঘটিয়াছিল —ননী চুরি করিয়া খাইতেন তিনি, শাস্তি ভোগ করিত অপরে। মাঘের অঞ্জলির লেখা যে কালিদাসবাবুর নয় তাহা আমরা লেখা দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল কালিদাসবাবু হামাগুড়ি-নন্দকে আস্কারা দিয়া থাকেন। এখন বুঝিতেছি গোপাল কাহারো সহিত পরামর্শ না করিয়াই ননী চুরি করেন।

কিন্তু কালিদাসবাবু ৩রা বৈশাখের সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত ছন্দবিষয়ক প্রবন্ধগুলির আলোচনায় গদাধর চন্দ্রের মত 'ডুটও খাব, টামাকও খাব' বলিলেন কেন? শনিবারের চিঠির 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' প্রবন্ধ প্রবোধবাবুর মতামতের রীতিমত প্রতিবাদ—কালিদাসবাবু লিখিয়াছেন, প্রবোধবাবুর প্রবন্ধগুলি চমৎকার কিন্তু

এ বিষয়ে শনিবারের চিঠির মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। ইহার পর তিনি 'ডিডিগো ঢরলে' বলিবেন না তো!

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কিছু লিখিতে গেলে আমাদের সঙ্কোচ হয় কারণ ইহার সহিত আমাদের নাড়ীর যোগ আছে। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ব্যাপারও ঘটিতেছে যাহাতে আমরা পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরদী বন্ধু প্রবাসী ও মডার্ণরিভিয়ু এখনও চুপ করিয়া আছেন কেন ভাবিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কর্ম্মচারী রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুরের জামাতা এবং বর্ত্তমানে ক্ষমতাপন্ন দলের পেটোয়া শ্রীযুক্ত তমোনাশ দাসগুপ্ত মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পি আর এস-এর জন্য একটি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে থিসিস বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করেন; পরীক্ষক নিযুক্ত হন—স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ও ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়। পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক থিসিসটি অযোগ্য বিবেচিত হয়। পরীক্ষকগণের দুর্ম্মতির জন্য কয়েক বৎসর থিসিসটি ধামাচাপা পড়িয়া থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে সেই একটি থিসিসই পুনরায় উচ্চতর পি এইচ ডি ডিগ্রীর ও গ্রিফিত মেমোরিয়াল প্রাইজের জন্য দাখিল করা হয়। পরে একই থিসিস দুই পুরস্কারের দাবী করিতে পারে না এই কারণ দর্শাইয়া গ্রিফিত মেমোরিয়াল প্রাইজ প্রতিযোগিতা হইতে থিসিসটি সরাইয়া লইয়া পি এইচ ডি ডিগ্রীর জন্য উহা পরীক্ষিত হইতে যায়। পরীক্ষক নিযুক্ত হন শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, সিলভ্যা লেভী সাহেব ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়। লেভী সাহেব ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় থিসিসটি ডিগ্রী পাইবার উপযুক্ত এই মত ব্যক্ত করিলেও

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মন্তব্য করেন যে থিসিসটি ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ—ডিগ্রীর অনুপযুক্ত। এই বাবদে যে মিটিং হয় তাহাতে কোনও একজন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি বলেন যে, পৃথিবীতে ভুলভ্রান্তি হয় না কার? তমোনাশবাবুর যে হইতে পারে তাহা তো স্বাভাবিক, তাই বলিয়া কি তিনি ডিগ্রী পাইবেন না? অতএব থিসিসটি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে ফেরত আনাইয়া ভুল সংশোধন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে দেওয়া হউক।

তাহাই করা হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য বাহাল রহিল না, কারণ লেভি সাহেব ও নগেনবাবু নিশ্চয়ই বাঙ্গালাসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহা অপেক্ষা অধিক বিশেষজ্ঞ; একজন সম্ভবত বাংলা পড়িতেই পারেন না, এবং অপর জন রোমাঞ্চকর উপন্যাস লিখিয়া ও বিদ্যাপতির মুণ্ডপাত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ফলে কি হইল আমরা জানি না, কিন্তু তমোনাশবাবু আজ একজন মহিমামণ্ডিত **পি এইচ ডি।**

ডিগ্রী রহস্য যদি ইহাই হয় তাহা হইলে প্রশ্নপত্র, গার্ড, এগজ্যামিনার, হেড এগজ্যামিনার, ট্যাবুলেটর, কণ্ট্রোলার ইত্যাদির পিছনে এত পয়সা ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? একটা সভা ডাকিয়া রক্তসম্পর্ক অথবা চেহারা দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা ছাত্রদের ডিগ্রী দিলেই তো গোল চুকিয়া যায়।

—

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে একটি ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি—কর্তৃপক্ষের বুদ্ধিশুদ্ধি ও লজ্জা কি একেবারে লোপ পাইয়াছে? বায়োস্কোপ দেখিতে গিয়া ইণ্টারভ্যালের পর পরবর্ত্তী সপ্তাহের ছবি হইতে 'খান' জায়গাগুলি বাছিয়া বাছিয়া ছবি সম্বন্ধে দর্শকদের আগ্রহ বাড়াইয়া দ্বিতীয় কিস্তি দাঁও মারিবার চেষ্টা যে ভাবে করা হ

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা প্রবাসীকেও কি তাহাই করিতে হইল? বাজার কি এতই খারাপ হইয়াছে—না হয় কিছুদিন—যাক। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে—রহস্যলহরী সিরিজের শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রবাসীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন নতুবা 'আরাতামা' লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের রোমাঞ্চকর উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের কিয়দংশ জ্যৈষ্ঠের পত্রিকায় ছাপিয়া 'আষাঢ় হইতে এই উপন্যাস আরম্ভ হইবে সুতরাং অবহিত হউন এরূপ কথা প্রবাসীতে লেখা হইল কিরূপে? একদিকে রবীন্দ্রনাথ এবং অপরদিকে এই রোমাঞ্চকর উপন্যাস। প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় পাঁচকড়ি দে মহাশয়কে কিছুদিনের জন্য ভাড়া লইলে গ্রাহক-সংখ্যা আরো সহজে বাড়াইতে পারিতেন।

—

অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে, আরো কিছুদিন পরে হয়তো ফুটপথের মোড়ে মোড়ে দেখিব হিন্দুস্থানী হকারেরা চীৎকার করিতেছে, 'প্রবাসী বাবু, খুন জখম ডিটেক্‌টিভের কেচ্ছা।' এবং তারো পরে 'চার চার পয়সা, দো দো আনা বাবু—লিয়ে যান লিয়ে যান।'

—

আষাঢ় হইতে ভারতবর্ষ ও বিচিত্রার বর্ষারম্ভ, সম্ভবতঃ এই রোমাঞ্চকর ঘটনার কারণ ইহাই। কিন্তু বয়স বাড়িয়া প্রবাসী সম্পাদকের বয়স যতই কমুক বাংলাদেশের পাঠককে কি এত সহজেই ভুলানো যায়!

টুক্‌রি

টুক্‌রি হাতে ঘুঁটে-কুড়নি বুড়ি মাঠে মাঠে গোবর কুড়িয়ে বেড়ায়, মাথা নাড়ে আর বক্ বক্ করে। টুক্‌রিতে যা জমা হয় তা দিয়ে ঘুঁটে তৈরী করে বাজারে বেচে বুড়ী অন্নসংস্থান করে। বাংলা সাহিত্যে গরুর অভাব নেই—গোবরও এখানে সেখানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জমে আছে; টুকরিতে ভরে তা নিয়ে ব্যবসা করার কথা এতদিন কারো মনেই আসেনি—এই গোবর কুড়িয়ে প্রথম টুক্‌রিতে ভরলেন শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী আর বিচিত্রা করল ঘুঁটের ব্যবসা। এর কৈফিয়ৎও আছে—

> "বাজারে বাজারে চলে সারা বেলা
> কথার হট্টগোল।
> আমি ফিরি তারই মাঝে
> কথা কুড়োনোর ব্যবসা আমার
> টুক্‌রি বোঝাই করি।"
>
> —বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

দেখে লোভ হ'ল আমারও—ভাবলাম, দেখি না একবার বাজার যাচাই করে—বসলাম খাতা পেন্সিল নিয়ে—টুক্‌রো টুক্‌রো কথায় খাতা বোঝাই হতে লাগল—কিন্তু ছন্দ এসে পড়ে যে! তাল সামলিয়ে কোনও রকমে পথ চল্‌তে লাগ্‌লাম—সাধনা যখন স্বরু করেছি সিদ্ধি লাভ হবেই। অতএব—

দুপুর

চুপ সহর, দুপ্রহর, রূপলহর চিক-ফাঁকে,
চুল খুলে ঘুলঘুলে মুখ তুলে বউ বুঝি।
আনমনে গান শোনে ডান কোণে রে-ডিওর,
'রুজ' মেখে বুঝবে কে, উজবেকের স্বপ্ন এ।

চার্ব্বাক

পথের দুধার দোকান ঘরের সারি,
হয়েছে উধার, দু' কান ভরিল গালে,
শুধু হাতে মোরে কেহ তো দিল না মাল,
দুধুভাতে আর সহজে যাবে না দিন!
বন্যার লাগি খুলিলে চাঁদার খাতা
কন্যার বিয়ে হলেও হইতে পারে।

দুপাটি জুতো

দুজনে রয়েছে পাশাপাশি চিরকাল
তবু তাহাদের ভালবাসাবাসি নাই,
এ যেদিকে চলে ও চলে উল্টা পথে,
এ ভাবে কেমনে ভুলটা উহার ভাঙি।
পাশাপাশি আছে এতদিন দুজনায়—
যেন ভারতের হিন্দু মুসলমান।

জাগরণ

চোখ কচলিয়ে 'শোচ লিয়ে রমাবাবু'
ভ্যাবাচ্যাকা ব্যাস অ্যাঁকাব্যাঁকা বাংলায়

কহে, 'এতো ঠিক মু'তো মেরা জাগরণ—
কাশী ছেড়ে, নিয়ে আসি কলকাত্তায়'।
অযোধ্যা সিং কহে শুধু 'রাধে, রাধে'—
দূরে তরু শিরে আগুন ফাগুন গুণে!

উঁহু, এতো হ'ল না—ভেবেছিলাম শুধু শেষের মিলটা না থাকলেই বুঝি টুক্‌রির কবিতা হবে—কিন্তু অভ্যাসের দোষে ভেতরে ভেতরে মিল এসে যেতে লাগল। অনেক কষ্টে মিললোভী মনটাকে দমিয়ে সমান অক্ষরের তাল সামলিয়ে 'জয়গুরু অবনীন্দ্রনাথ' বলে আবার বসলাম—সুবিধা যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন আবোলতাবোল না বকে কাজের কথাও তো দুচারটে পাঠকদের শুনিয়ে দিতে পারি—টুক্‌রি ভরছি, কারো কিছু বলবার নেই।

রবিঠাকুরের ছবি

ঠাকুর ঘরের শেকল টেনে খুলে
হঠাৎ দেখি আস্ত কোলা ব্যাং—
নারায়ণের বিগ্রহেরই পাশে
ফুলছে এবং চাইছে মিটি মিটি।
হায় ভগবান, তোমার এ কি লীলা,
ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল নন্দলাল!

সুপারম্যান

জেলেতে বসিয়া চরকা কাটেন গান্ধী সুখে,
রথী ভুলিয়াছে আনেনি স্যানাটোজেন।
গীতার ভাষ্য লিখে লিখে চিতা জ্বালাল দেশে,

উপনিষদের অধিকারী যে সে নহে!
মরুভূ ভারত হুহুহু বহিছে লু,
গোলাপ ফুটেছে বসোরার গুলবাগে।
কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য-নিনাদে গগন কাঁপে,
নটীর পূজায় নটরাজ খুসী রহে।

গুরুশিষ্য

দিলীপকুমার শান্তি লভেছে অরবিন্দাশ্রমে—
লেখায় এবং কথায় মৌনী গুরু সে সাধন রত,
শিষ্য যতই সাধনার পথে হতেছে অগ্রসর
লেখালেখি আর বকাবকি তত হতেছে প্রবল যেন!
দোহাই হে গুরু তব,
শিষ্যে তোমার মৌনী করিয়া রাখ।

প্রমথ চৌধুরী

বোম্বে চলিছে ধাপার মালের গাড়ী,
পিছনে পড়িয়া রহিল বোম্বে মেল—
পোলাও কাবাব ফেলে দিয়ে চানাচুর
সময় বিশেষে কি মুখরোচক ঠেকে।
পটলের ক্ষেতে কালিচূণ মাখা হাঁড়ি—
শ্রীপ্রমথনাথ হইবেন বুঝি রামতনু প্রফেসর।

পরিচয়

পুরু অ্যান্টিক কাগজ এবং সুন্দর ক'রে ছাপা—
লেখক যাহারা ডিগ্রি তাদের কত!

ফরাশী এবং ইংরাজী আর জার্ম্মাণ রুষ ভাষা
সবাই পেয়েছে শিরোপা, বাংলা কাঁদিছে আঁস্তাকুড়ে।
শ্রীপ্রমথ আর শ্রীদিলীপ তার পাঠক-গোষ্ঠী মাঝে
বাবুর্চ্চি রাঁধে বঙ্গবাণীর পেঁয়াজী চাটের ভোগ।
পড়িতে চেয়ো না কিনিয়া রাখিও ঘরে—
দাম বেশী নয় একটি মাত্র টাকা।

নরেন দা'

নাটক নবেল কাব্য এবং বিশ্বসাহিত্যও
একটি বিশেষ দিবসের পরে সবে দিল ইস্তফা ;
ছায়াচিত্রের জহুরী হইয়া বসেছে নরেন দাদা
নিভ্ বিভ্ কাঁদে গঙ্গার এই পারে।
লীলুয়া ওয়ার্ক্‌শপেতে হায়রে বাঁশী বাজে ঘন ঘন,
বাগানবাড়ীতে ফূর্ত্তি করিছে মাড়োয়ারী ক্ষেত্রীরা।

বিচিত্রা

রাজা পঞ্চমজর্জ্জ।
রাজ্য চালায় প্রাইমমিনিষ্টার—
কাব্য-কাকলী কূজন করিছে নীরদ ব্যারিষ্টার,
অলস দুপুরে চিলেদের হাহাকার !
হানাগুড়িরত রবীন্দ্রনাথ যে দুধ তুলিয়াছিল
প্রাচীন মাটিতে কবে সে হয়েছে মাটি !
কাহার বাহাত্তর ?
সুশীল মিত্র, উপেন গঙ্গো, কবি
রবি ঠাকুরের ?

আরো আছে

—ব্যস্ত হয়ো না, ব্যস্ত করো না সখি,
টুকরি আমার এখনও হয়নি ভরা।
—দেখ না রৌদ্র হইয়াছে খরতর,
দিতে না দিতেই শুকাইয়া যাবে ঘুঁটে।—
—ভয় নাই সখি দেখ ঘনাইছে মেঘ,
শুকনো ও ঘুঁটে ভিজিয়া গোবর হবে—
—হাতে যে আমার হাজা ও পাঁকুই হ'ল
চুলে ঢুকিয়াছে গুব্‌রে পোকারা যত—
—ভয় নাই সখি, 'সবুজ পত্র' মলে
'পরিচয়ে' হবে সুনিবিড় পরিচয়—
—থাকুক তোমার গোবর মাটিতে পড়ে,
একদা সেখানে ফুটিবে পদ্মফুল।

[ক্রমশঃ]

———

মৌলনা-মিলনে

খেলাফৎ ফণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা শওকৎ আলী সবে মাত্র বাহাত্তর বৎসরে (সম্ভবতঃ বয়োধর্ম্ম-অনুসারে) মিসেস রায়ান নাম্নী একটি অষ্টাদশী শ্বেতাঙ্গিনীকে শুভ নেকাহ্ সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন। ব্যাপারটি অত্যন্ত ঘরোয়া, কিন্তু এই ঘটনা লইয়া ভারতবর্ষের যাবতীয় বেরসিক ব্যক্তি (ইহার মধ্যে সৈয়দ খাজা হাসান নিজামী ও মৌলনার পুত্র মিঃ জাহিদ আলীও আছেন) খেপিয়া উঠিয়াছেন। এই সব খুদে পিঁপড়ের কামড়ে অস্থির হইয়া টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধির মারফৎ মৌলানা সাহেব এক 'এস্তেহার' জারী করিয়াছেন।

*　　　　*

ইস্তাহারটি খাসা। আল্লার রহমতে কেমন করিয়া শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হয়, পাকা দাড়ি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, এই ইস্তাহারে তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। বন্ধুবর মজ্‌লিস মিঞা ইহার একটি তর্জ্জমা করিতেছেন শুনিতেছি, এখনও দেখি নাই; টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার বর্ণনা পড়িয়াই হাতের কাছে কোনও ফণ্ড না থাকিলেও শরীরটা বেশ তাজা বোধ হইতেছে। মৌলনা সাহেব কহিতেছেন—"আমার বিবি ইঁটের মত (শক্ত কিংবা চৌকস বোঝা গেল না), ধীর এবং সাহসী; আমি তাঁহাকে রক্ষা করিব। ······আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, তিনি আমার গর্ব্বের বস্তু।"

কী রসঘন গভীর প্রেম! তাহার পর শুনিয়া যান।

*　　　　*

"মোছলমান হিসাবে আমার বিশ্বাস যে স্ত্রীলোকের পদতলেই বেহেস্ত। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু আমাকে একেবারে দেওয়ানা করিয়া গিয়াছে। এতদিন ধরিয়া আমি পবিত্র জীবন যাপন করিতেছিলাম। (সম্ভবতঃ এখন হইতে উল্‌টা জীবন যাপন করিবেন !) আমাদের সংসারে আমার সাথী হইবার এবং সান্ত্বনা দিবার মত কাহাকেও না পাইয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়াছিলাম, আজ এতদিন পরে আমার আয়েষা আমার জীবনে আসিয়াছে। আমি জোয়াল কাঁধে লইয়াই মরিতে চাই এবং কেহ আমার জন্য একখানা কুঁড়েঘরে নুন জলের ব্যবস্থা রাখিবে, এতটুকু আশা করিবার অধিকার আমার নিশ্চয় আছে।"

আছে, নিশ্চয় আছে। দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি এতদিন ধরিয়া এত তখলিফ্ বরদাস্ত করিতেছেন তাঁহার প্রতি দেশবাসীর কি কোনও কর্ত্তব্য ছিল না ? অবশ্য ছিল, দেশবাসী তাহা না করিয়া মৌলানা সাহেবের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অথচ ভাগ্য যখন তাঁহার যোগ্য সঙ্গিনী জুটাইয়া দিল তখন দেশের লোক তাঁহাকে খোঁচাইতে সুরু করিয়া দিয়াছে। নেমকহারামী আর কাহাকে বলে ?

* *

মৌলানা সাহেব কহিতেছেন, "বিশেষ দুঃখের কথা এই যে আমার ছেলে মিথ্যাসংবাদ রটাইতেছে। বরাবর এই ছেলেটির প্রতি আমি সদয় ছিলাম, কিন্তু আমার সাধু বিশ্বাসে—পুত্র, ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজন কাহারও অনধিকার হস্তক্ষেপ আমি বরদাস্ত করিব না। আল্লা এবং পয়গম্বরকে সাক্ষী করিয়া আমার শ্রদ্ধার পাত্রী নারীকে আমি প্রার্থনা করিয়াছি এবং তিনি রাজী হইয়াছেন, এখন আমি কাহারও তোয়াক্কা রাখি না। আমি চিরকাল যুদ্ধ করিয়াছি এবং এই নেকাহ্ রূপ মহান্

কার্য্যের পক্ষে আমি যুদ্ধ করিব এবং সহজেই লড়াই ফতে করিব।” তাহার পর এই লড়াই ফতে করিয়া মৌলানা সাহেব কি করিবেন তাহা বলিতেছেন,—

“আমি মার্কিণ মুলুকে গিয়া এছ্‌লাম মুস্‌লিম দেশ এবং ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালাইব, আমার আয়েষা আমার সঙ্গে থাকিয়া খাঁটি মুসলিমার মত আমাকে সাহায্য করিবেন।” পলিটিক্স হইতে প্রেম, প্রেম হইতে পলিটিক্স! ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে দ্রুতগতিতে বিচরণ করিবার কি অপার্থিব ক্ষমতা।

* *

মৌলনা সাহেবের শেষ কথা—“আমি বুড়া হইয়াছি, আমার পৌনে দুইগণ্ডা নাতি নাতনী আছে, কিন্তু আয়েষাকে নেকাহ্‌ করিয়া আমি পয়গম্বরের পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছি—তিনি একান্ন বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন।”

এ যুক্তি মারাত্মক এবং অকাট্য। তবে পয়গম্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার কথায় ছেলেবেলার একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। গ্রামে এক গোঁসাই বাবাজী আসিয়াছিলেন। তিনি পাড়ার তরুণী এবং প্রৌঢ়া বৈষ্ণবীদের একত্র করিয়া প্রতি রাত্রে তাহাদের সঙ্গে নৃত্য করিতেন, ভদ্রসন্তান কেহ আপত্তি করিলে কহিতেন, “ঠাকুরের কৃপায় তাঁরই রাসলীলা নরলোকে প্রচার করছি।” আর কেহ আপত্তি করিল না, রাসলীলা চলিতে লাগিল, অকস্মাৎ একদিন গভীর রাত্রে আর্ত্তনাদ শুনিয়া পাড়াশুদ্ধ লোক গোঁসাই বাবাজীর আখড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখি যে গোঁসাই বাবাজীকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া আশীশিক্কা ওজনের একমণি লোহার বাটখারা তাঁহার বুকের উপর রাখিয়া গ্রামের কানাই পাগলা হাসিয়া হাততালি দিতেছে।

কহিলাম—"কি রে কানাই? বাবাজী দম আট্‌কে মর্‌বে যে কি করছিস?"

কানাই হাসিয়া কহিল, "রাসলীলা হ'য়েছে, এখন বাবাজীকে গোবর্দ্ধন ধারণ করাচ্ছি!" মৌলানা সাহেব কাফেরী গোবর্দ্ধন ধারণ করিবেন না। তবে পয়গম্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এতদ্দামের কল্যাণের জন্য সাদি করা ছাড়া আর কি করিবেন তাহা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

চিঠিপত্র

মাননীয়

শ্রীযুক্ত 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

দোহাই সম্পাদক মহাশয়, আমার পত্রখানি প[illegible]। বড়ই মনের কষ্টে আপনাদের শরণাগত হইয়াছি। [illegible], অনুরোধ সংক্ষেপেই জানাইলাম।

অনেক দিন হইতে দেখিতেছি আপনারা বঙ্গবা[illegible]) মন্দিরের দরজায় কড়া পাহারা দিতেছেন। কিন্তু [illegible] (বৈদিক আমলের—সম্মানার্থে ব্যবহৃত) ঢুকিয়া মন্দি[illegible]। গেলে যেরূপ অবস্থা হয়, বাণীমন্দিরের অবস্থাও সে[illegible] তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? আপনাদের ক্লান্তি [illegible]?

বাংলা কাগজ যখন চালাইতেছেন তখন বাজারের অবস্থাটা যে কিরূপ তাহা বোধ হয় মর্ম্মেমর্ম্মেই বুঝিতে পারিতেছেন। বাংলা ফিল্ম দেখিয়া একদিন দণ্ডবৎ প্রণামান্তে চার গণ্ডা পয়সার শোকে নিজের বুদ্ধিহীনতাকে ধিক্কার দিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলাম—আর যাই নাই। এইরূপ অর্থ-কৃচ্ছ্রতার বাজারে মাসিক কাগজের সম্পাদকগণ যদি অকিঞ্চনদের বঞ্চনা করিতে সুরু করেন তবে যাই কোথায়! শনিবারের চিঠি বাঁচিয়া আছে, আপনারা আছেন—তবুও!—এ দুঃখ দুর্ব্বহ।

আমি মনে প্রাণে আপনাদিগকে 'মল্লিনাথের' আসন দিয়া রাখিয়াছি। আপনাদের টীকা পাঠ না করিলে, ব্যাপারটি ঝাপসাই রহিয়া যায়। তাই মর্ম্মবেদনা আপনাদের গোচর করিতেছি,—টীকায় উত্তর দিলে সুখী হইব।

ফাল্গুন গেল, চৈত্র গেল, বৈশাখও যাইতে চলিয়াছে কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব্বের কোন ভূমিকা না করিলেন আপনারা, না করিলেন বিচিত্রা-সম্পাদক মহাশয়। আমরা ফাঁপরে পড়িয়া গিয়াছি। যে শ্রীকান্ত শ্মশানে সজ্ঞানেও অজ্ঞান হন নাই, 'বাপ' শুনিয়া 'বাপ' বলিলেও কম্পিত হন নাই, তিনি সহসা সর্প-বিভীষিকা দেখিলেন কেন? (চৈত্র) যে রতনের সাম্নে রাজলক্ষ্মী-প্রেম ঘটিত উষ্মা প্রকাশ না হইয়া পড়ে ভাবিয়া সর্ব্বদা শ্রীকান্তকে সাবধান থাকিতে দেখিয়াছি, সেই শ্রীকান্ত—হায় হায়, সেই রতনের সহিত কি আলাপই না করিয়া ফেলিলেন (বৈশাখ)—ভাবিলে কলেবর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যাহা হউক, ন্যাড়া মাথা রাজলক্ষ্মীর পুনরায় কেশোদ্গম হইবে অনুমান করিয়া আশস্ত হইয়াছি। মনে মনে অভয়ার সাক্ষাতের আশা করিয়া উৎফুল্লও হইয়াছি—কিন্তু সরমজড়িতা পুঁটুকে প্রথমে

রেলষ্টেশনে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম বাঙালী কিন্তু ঠাকুর্দ্দার সহিত কলিকাতায় পুঁটু সহসা গাউন পরিয়া ফেলিল কেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া কারণ অনুমান করিয়াছি—শ্রীকান্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, একটু দুর্ব্বলতা আসিতেই তো পারে! রতনের কাছে বলিয়া ফেলিয়াই যদি থাকেন তাহাতে দোষের কি? তার পর—

"...এলো দুর্যোগের রাত, কালো মেঘে দিলে আমার জ্যোৎস্না ঢেকে।' জরা-মেঘে বুঝি শরৎচন্দ্রকেই ঢাকিয়া ফেলিল?

* *

বিচিত্রায় 'দুই বন্ধু' পড়িরা মাথা চাপড়াইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে—নগদ আট গণ্ডা পয়সা! শুনিয়াছি বিলাতে 'নারী-চরিত্র' বাদ দিয়া কথা-সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা চলিয়াছিল—লেখক বোধ হয় তাহাই Experiment করিতেছেন। গরীব বাঙালীর পয়সায় এ পরীক্ষা কেন? নারীচরিত্র লইয়া হাত মক্স করিয়া লইলে লেখক পাঠক উভয়েরই সুবিধা হইত।

বিচিত্রা-সম্পাদক মহাশয় আবার কি যেন পরিবেষণ করিবেন, উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি।

ভারতবর্ষ পড়িয়া সত্যই কাঁদিয়াছি—আনন্দে নহে, দুঃখে। কুমারের 'শক্তিশেল' শক্তিশেল হইয়াই বুকে বিঁধিয়াছে। কমলার উচ্ছ্বাস, মূর্চ্ছা, 'হা ভগবান' বুকের পাঁজরে শেল হইয়াই গাঁথিয়া রহিয়াছে। গল্পে কি নাই!—পূর্ব্বোক্ত তিনপদ বাদেও মোটর একসিডেণ্ট এবং মৃত্যু। কিন্তু একটি কথা একেবারে গলায় বাধিয়া আছে—'কিন্তু তোমার সন্তানকে দেহে ধারণ করবার সৌভাগ্য হয়েছে বলেই এদেহ নষ্ট

করবার অধিকার আমার নেই।' বঙ্গবাণীমন্দিরের রকে এতকাল ঘসিয়াও মাতৃমন্ত্রের লোহার মুষল ক্ষয় হইল না ?

তারপর 'অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ' পড়িয়া অতীতের দিকে চাহিয়া রহিলাম। স্বামীর মন-হরণের জন্য 'ইন্দ্রাণীর পা-কেটে-রক্ত-পড়া' নৃত্য যেন কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। মনে পড়িল সুদূর অতীতে 'মানসী-মর্ম্মবাণী'তে "বিদূষীর বিপদে' এমনি চোখ-ফেটে-জল-পড়া স্বামী সেবা দেখিয়াছিলাম—সম্প্রতি শুধু atmosphere বদল হইয়াছে।

*

তাহার পরে প্রবাসীর 'ট্রেনে এক রাত্রি'। আড়াই পৃষ্ঠাব্যাপী ট্রেণ বর্ণনা দেখিলেই আতঙ্ক হয় না এমন বীরপুরুষ কত জন আছেন জানি না। "তাঁর তিন দিক ঘিরে তাঁর সমবর্ণ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের পুরুষ গুঞ্জন করছে। তিনিও সকলের ওপরে নিরপেক্ষ ভাবে হাস্যে, স্পর্শে, কটাক্ষে মধুবর্ষণ করছেন।" ভাবিলাম এখনও কি ফোর্ট উইলিয়মের কলেজের যুগ চলিতেছে! হাল্‌কা গল্প যে ভারী গল্পের চেয়েও ভারী, সে কথাটি অতি বিনয়ের সহিত নিবেদন করিতেছি। তবে ভরসা এই যে—"রাঁচি থেকে কলিকাতা চলেছি।"

তাহার পরে 'তিনশো পঁয়ষট্টির এক'। ভাল গল্প—লেখক যাহাই বলুক না কেন, আমরা ব্যাপারটি জলের মত বুঝিয়াছি। আবগারী দোকানে পিকেটিং সুরু হওয়াতে, গেঁজেল মহলে যে কি নিদারুণ দুর্যোগ দেখা দিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া ফেলিয়াছি—সেজন্য আমার সহানুভূতির পারাপার নাই। "আজ শনিবার শমসের কবরেজকে ডাকিয়ে ঝাড়া দেওয়াতে পারলে ভাল হয়।" "চরণ বলির পাঁঠার মত কাঁপিতেছিল ও দুর্গানাম জপিতেছিল"—চলিত ও সাধুভাষার এক

সংমিশ্রণ ও 'ছিল'র অনুপ্রাস দেখিয়া কেরি সাহেবের কথা মনে পড়িতেছে।

পয়সা দিয়া হয়রাণ হইয়াছি তাই, অসহিষ্ণু হইয়া সম্পাদক মহাশয়ের গোচরে আফ্‌শোষ জানাইতেছি। অকিঞ্চনের পয়সা আর বঞ্চনা করিয়া লইবেন না। ইতি—

ভবদীয়

চব্বিশ আনা

[সম্পাদকীয় মন্তব্য—পত্রলেখক অনেকগুলি প্রশ্নের জবাব চাহিয়াছেন, সবগুলির জবাব দেওয়ার স্থান এই সংখ্যায় নাই। এই সংখ্যায় শুধু শরৎচন্দ্রের 'সর্প-বিভীষিকা' বিষয়ক জবাবটি দিয়া বাকী প্রশ্নগুলির উত্তর আগামী সংখ্যার জন্য রাখিয়া দিলাম। একথা ঠিক, শ্রীকান্তের বিশেষ সর্পভীতি কখনই ছিল না, এমন কি, মাছ চুরী করিতে যাইবার সময় শরবনে যখন শরের ডগা হইতে টপ্ টপ্ সাপ জলে পড়িতেছিল তখনও সে এবম্বিধ ভীত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জগত্তারিণী' মেডেল পাইবার পর শরৎচন্দ্রের সর্পভীতি অতিরিক্ত রকম বাড়িয়া গিয়াছে—ইহার কারণ রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের প্রভাব; ইনিও জগত্তারিণী মেডেলধারী। দীনেশবাবুর সর্পভীতির পরিচয় তাঁহার 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' নামক কেতাবে আছে। শরৎচন্দ্রে দীনেশবাবুর ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। ইহার পর রামতনু প্রফেসরশিপ এবং সর্ব্বশেষে গুলি খাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেই পূরাপূরি মিল হয়। আফিম, গাঁজা, গুলি লোককে একেবারে অকর্ম্মণ্যই করিয়া দেয়!]

আজ, কাল এবং তারো পরদিন

[ভূমিকা]

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বাঁশবেড়ের চৌধুরী বাবুদের বাড়ী, কাল—সন্ধ্যার কিছু পরে।

[চৌধুরী বাবুদের চকমিলান বাড়ী। উঠানের উত্তরের বারান্দায় ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছে। মধ্যের উঠানে সতরঞ্চি বিছাইয়া সাম্‌নের দিকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আসন করা হইয়াছে; পিছনের দিকে গ্রামের বয়স্থ ইতর সাধারণের আসন। বারান্দার ধারে ধারে বেঞ্চি ও চেয়ার পাতিয়া মাতব্বরদের ও বাবুদের বাড়ীর লোকের আসন ও দক্ষিণের বারান্দার সামনে চিক ফেলিয়া মেয়েদের স্থান করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই মণ্ডপ লোকে লোকারণ্য। গ্রামের মেয়ে ও বধূরা বাড়ীতে রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়ার পাট চুকাইয়া একে একে আসিয়া জুটিতেছে, তাহাদের উচ্চ চাপা কণ্ঠ ও চুড়ীবালার রিণিঝিনি শোনা যাইতেছে। সামনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে জায়গা লইয়া ইতিমধ্যেই কোলাহল স্থরু হইয়া গিয়াছে। মাতব্বর ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে নাম ধরিয়া এক একজনকে দাব্‌ড়ি দিতেছেন। বাড়ীর বড়বাবু গদি আঁটা চেয়ারে বসিয়াছেন বলিয়াই গ্রামের জনসাধারণ সিগারেট বা বিড়ি ফুঁকিতে সাহস পাইতেছে না। কেবল বৃদ্ধ কয়েকজনের হাতে হুঁকা। তামাকের গন্ধে আসর সরগরম।

দুইটি ঘণ্টা পড়িয়াছে, আর একটি ঘণ্টা পড়িলেই যবনিকা উঠিবে। পশ্চিমের বারান্দার কোণ হইতে কন্সর্ট স্থরু হইল—'তুমি কাদের কুলের

বৌ।" লোকে উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি ছোক্‌রা থিয়েটারের প্রোগ্রাম বিলি করিতে সুরু করিল। 'আমাকে একটা, আমাকে একটা' বলিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। অতিধূর্ত্ত দুই একজন সন্তর্পণে জায়গা ছাড়িয়া আসিয়া প্রোগ্রাম লইয়া যাইতে লাগিল। বড়রা 'এদিকে এদিকে' বলিয়া হাঁকিতে লাগিল।

এই গোলমালের মধ্যে কলিকাতা হইতে কয়েকজন অভ্যাগত তরুণ সাহিত্যিক আসিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিতেই চৌধুরীবাবু তাঁহাদিগকে তাঁহার নিকটস্থ চেয়ারগুলিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহাদিগকে পান ও সিগারেট দেওয়া হইল। প্রোগ্রাম-বিলিকারক একটি ছোক্‌রা বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে প্রোগ্রাম দিয়া গেল। তাঁহারা এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই জানিতেন না কি প্লে হইবে। প্রোগ্রাম পড়িয়া দেখিলেন—

'কুমার-অসম্ভব'

(পঞ্চমাঙ্ক নাটক)

বিখ্যাত চারণ-কবি কপিধ্বজ চক্রবর্ত্তী লিখিত

প্রোগ্রামে লেখকের একটি 'নিবেদন' ছাপা হইয়াছে। তাহা এইরূপ—

"কবিগুরু কালিদাস লিখেছিলেন কুমার-সম্ভব। সে কালিদাস নেই, সে উজ্জয়িনীও নেই; যুগের পরিবর্ত্তন হয়েছে। আজকের দিনের পার্ব্বতী কুমারের জন্যে আর তপস্যা করে না, কুমার আপনিই আসে। আধুনিক পার্ব্বতীর তপস্যা কুমার-অসম্ভবের লাগি। এরি জন্যে ইয়োরোপ আমেরিকার তরুণতরুণীদের অক্লান্ত তপস্যা।

কালিদাসের দেশেও তার হাওয়া এসে পৌঁছেচে। কালিদাসের নগাধিরাজও তাকে পারলে না ঠেকাতে। এই গণতান্ত্রিক যুগে গিরিরাজ-কন্যা উমার দৃষ্টান্ত ব্যতিল হ'য়ে গেল। তাই এযুগের এই অধম কবি এই যুগেরই গণমনের কথা লিখতে চেয়েছে। জানি না আমার কথাটা স্পষ্ট হয়েছে কি না, আমি যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করতে চাইনি এইটুকুই আমার গৌরব। কতকগুলো মনোজগতের বস্তু নিয়ে কারবার করতে হয়েছে ব'লে মাঝে মাঝে আমাকে অসম্ভব কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে, মহিলাদের সহজবোধ্য করবার জন্যে পৌরাণিক ব্যাকগ্রাউণ্ডও সৃষ্টি করতে হয়েছে। আপনারা শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধ'রে শুনবেন এইটুকুই আশা করি, তারপর—

পুরস্কার কিম্বা তিরস্কার দিয়ো মোরে

বহুমানে লব শিরপাতি।"

কুশীলবগণ

পুরুষগণ	স্ত্রীগণ
ম্যালথসের আত্মা	অষ্ট্রাল প্লেনে শ্রীমতী বেসান্তের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ আত্মা
শতক্রতু—অযোধ্যার রঘুবংশীয় নৃপতি	বিম্ববতী—শতক্রতুর মহিষী
জনার্দ্দন—ঐ সভাপণ্ডিত	নিবিড়নিতম্বা—ঐ রাজকন্যা
অরিন্দম—কোশলদেশের রাজকুমার	স্রগ্‌ধরা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা — রাজকুমারীর সখিগণ
বংশলোচন—ঐ বয়স্য	ভারমন্থরা—ডাইনী
অকিঞ্চন—চারণ কবি	চন্দনা, বিশাখা—নাগরিকা
মৃত্যুঞ্জয়—কোশলদেশের সেনাপতি	পরিচারিকা, প্রতিহারী নর্ত্তকী ইত্যাদি
পুণ্যপ্রভ—সন্ন্যাসী	
কোটাল, বণিক, পারিষদ্ ইত্যাদি	

বসন্তকাল, স্থান—অযোধ্যা ও প্রত্যন্তদেশে
কোটাল-রাজপুত্রের শিবির

ইহার পরে প্রোগ্রামে অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ দেওয়া ছিল। পরে একটি ফার্সের নাম—

কুকুরাশ্রম

কপিধ্বজ লিখিত রংদার একাঙ্ক গীতিনাট্য

ঢং করিয়া তিনের ঘণ্টা পড়িল, কনসার্ট থামিয়া গেল। যবনিকা উঠিতেই একটি ছোক্‌রা ফুটলাইটগুলি জ্বালাইয়া দিল।

উইংগ্‌সের অন্তরাল হইতে কপিধ্বজ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া সমবেত শ্রোতা ও দর্শকদের নমস্কার করিলেন। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল ঝামর পরচুলা স্কন্ধদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ললাটে বহ্নিশিখা-রঙ-এর প্রদীপ্ত রক্তচন্দন—যেন বজ্রাগ্নি। স্নিগ্ধ নয়নে ঘন কাজল ঝলমল করিতেছে,—পরণে পেন্সিল দিয়া ঘসা-শ্লেট রঙ-এর ধরা ও ঢিলা নিমাস্তিন্।]

কপিধ্বজ। সমবেত ভগিনী ও ভ্রাতাগণ, উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবার পূর্ব্বে আমি সামান্য দুই একটি কথা আপনাদিগকে শুনিয়ে দিতে চাই। আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি—বিশেষ ক'রে মানুষীকে। সকল ব্যথিতের ব্যথায় সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি নিজেকে অনুভব করি। কিন্তু আজকাল আমি ক্রমেই নিজেকে জানাশোনার আড়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছি; আমার আশা এই যে কাছে থেকে যাদেরকে কেবল ব্যথাই দিলুম দূরে গিয়ে অন্ততঃ তাদেরকে দুঃখ ভুলবার অবকাশ দেব। আমার স্কুলজীবনে আমি কখনো ক্লাসে

বসে পড়েছি এ অপবাদ কেউ আমাকে দিতে পার্‌বে না। তবু কাব্যমাতা আমার স্কন্ধে ভর করেছেন কি যে দেখে তা জানি না। তাঁরি তাড়ায় আজ আমি ঘরে বাইরে নাম কিনেছি, বদ্‌নামও কম কিনিনি—তাই আমি সন্ন্যাস নেব মনস্থ কর্‌ছি—তার আগে আমার বুকের রক্তে লেখা এই শেষ নাটক-নাটিকা ছুটো আপনাদেরই শুনিয়ে যেতে চাই, আপনারা দয়া করে আমায় মনে রাখ্‌বেন এই আমার কামনা। কারণ প্রবীণদের আশীর্ব্বাদ আমি পাইনি কিন্তু তরুণদের ভালোবাসা—বুকের মালা পেয়েছি। আমি দেশে দেশে চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। বারেবারে ডাক দিয়ে ফির্‌ছি নির্ভীক তরুণ ব্রতীদলকে। এরা যশের কাঙাল নয়। দারিদ্র্য সইবার মত পেট ও মার সইবার মত পিঠ এদের। এরাই সৃষ্টি কর্‌বে নূতন সাহিত্য। এরা যদি কালিদাস, ইয়েট্‌স্‌ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপ-স্রষ্টাদের পাশে বস্‌তে না-ই পায়—পুশকিন, ডষ্টয়ভস্‌কি, হুইটম্যান, গর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই। আমি এবার তপস্যা কর্‌ব, পথে চলার তপস্যা—আমি—

দূরে শ্রোতাদের মধ্যে একটি ছোক্‌রা। নাটক হোক মশাই। আপনার বক্তিমে শুন্‌তে আসিনি।

চারিদিকে বহুকণ্ঠে। লাটক হোক্‌—থিয়েটার চাই।

কপিধ্বজ (জনতাকে নমস্কার করিয়া)। আমি গণমতকে শ্রদ্ধা করি অতএব আচ্ছা।

[ভিতরে হারমোনিয়ম বাজিয়া উঠিল, কপিধ্বজ একা উদ্বোধন-সঙ্গীত সুরু করিলেন।]

বাজবে বাঁশী সুখে বাজ—
কুমারসম্ভব লিখেছেন কালিদাস দাদা—
উমার ছিল ছেলে, উষর ছিলেন শ্রীরাধা—
তাঁহারে মোরা নমি আজ।
রামের প্রেয়সী সীতার হ'ব হ'ব ছেলে—
বিদায় তাঁরে রাম দিলেন তাই অবহেলে—
উচিত সেই রাজকাজ।
নিবিড়নিতম্বার তপস্যা না-ছেলের লাগি,
জনার্দ্দন বুড়ো তাই শুনে উঠেছিল রাগি,
বিম্ববতী পেল লাজ।
আমিও প্রকাশিব সেই সে ইতিহাস কথা
কাহার হ'ল সুখ কাহারে বাজিল বা ব্যথা—
সমবেত সুধী সমাজ।

[ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল, যবনিকা পড়িল। কন্সার্ট্ বাজিয়া উঠিল—'জংলা পাখী পোষ মানে না।' কপিধ্বজ ইত্যবসরে রঙ্গমঞ্চ ছাড়িয়া কলিকাতা হইতে সমাগত তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।]

এক নং তরুণ। একি করেছ কপিধ্বজ? এযে একেবারে যাত্রা-নাটক, পুরাণ আর শাইকলজীর জগা খিঁচুরী। প্রোগ্রাম থেকেই তোমার নাটকের বক্তব্য মালুম হচ্ছে।

কপিধ্বজ। ঠিক্ ধরেছ ভায়া, এটা শাইকলজিকাল নাটক। ভাব্ছি এর একটা ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে আমেরিকার বার্থ কণ্ট্রোল লীগের কাছে পাঠাব। গানটা কেমন লাগ্ল?

২নং তরুণ। এটা কি একটা গান? তোমার হাত দিয়ে বেরিয়েছে? ছি ছি!

এক নং তরুণ। আগে বেড়ে লিখতে ভাই, [সুর করিয়া] কদমফুলি মাথা তোমার তো—

কপিধ্বজ। থামহে, বড় বাবু ব'সে আছেন,—এখনই প্লে আরম্ভ হবে।

এক নং। কোন্‌টি বড়বাবু, ওই ভুঁড়োপেট? জমিয়েছ নাকি ওর সঙ্গে?

কপি। চুপ চুপ্‌—ভারী গম্ভীর লোক। 'প্লে'টা আজ প্রথম দেখ্‌ছেন, কি ভাব্‌বেন কে জানে।

দু নং। তুমি যে একেবারে চাকুরে বনে গেছ দেখ্‌ছি—

৩ নং। তাতে আর দোষ কি?

কপি। বনেছি কি সাধে? উদর ভাই উদর—

[ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। যবনিকা উঠিল। অযোধ্যার সীমান্তে কোশল-রাজপুত্রের শিবিরে নৃত্যগীতপরায়ণ নর্ত্তকীর দল। মদের গ্লাস হস্তে অরিন্দম। বংশলোচন পাশে বসিয়া তুড়ি দিতেছে।]

ক্রমশঃ

চতুরিকা

কর্ত্তব্যচ্যুতঃ

কেমন প্রহরী তুমি ছি ছি নীবিবন্ধ !
দিনে থাকো দৃঢ় সুকঠিন জাগ্রত,
রাত্রিতে হায় সুপ্তিশিথিল অন্ধ
চোর যবে ফিরে লুণ্ঠন কাজে রত !

হোলি ঃ

পিচ্‌কারি-রঙে আবৃত হইল তনু,
আবীর বর্ম্মে ঢাকা দুটি পয়োধর।
আক্ষেপ করে হতাশে পুষ্পধনু
কোথা তরুণীর হানিবে কুসুমশর !

তারুণ্য ঃ

তরুণে হেরিয়া তরুণী চাহিল ফিরে,
তরুণীর পিছে ছুটিল তরুণ আঁখি।
চোখের বাঁধন বেঁধে নিল দুইটিরে
বাহুর বাঁধন রয়ে গেল শুধু বাকী।

ততোধিক ঃ

হাসিটি তোমার ভালবাসি আমি প্রিয়ে,
ভ্রূকুটি-ভঙ্গী আরো মোর ভাল লাগে ;—
হাসিটি গঠিত শুধু অনুরাগ দিয়ে,
ভ্রূভঙ্গ তব মাখা রাগ-অনুরাগে।

অবিশ্বাসিনী :

সিন্ধুর ভালে সিন্দুর লেপি' দিয়া
যেমনি সূর্য্য অস্ত অচলে ডোবে,
অমনি উর্ম্মি ছুটে চঞ্চল-হিয়া
শরদিন্দুর সুধা-বিন্দুর লোভে।

অপরা :

শিশু বুকে ধরি চুম্বন করে ধনি,
হেরিয়া আমার হিয়া বিদীর্ণ হয়।
কেমন স্বভাব—সহিতে পারিনা আমি
চুম্বন-ধন অকারণ অপচয়!

মধু-বিষ :

দৃষ্টি তোমার চন্দন-রস ঝারি
স্নিগ্ধ শীতল, হৃদয় হরিল ধনি।
হায় হতোস্মি! নিকট যাইতে নারি—
ভ্রূভঙ্গ যেন উদ্যত কাল ফণী!

বহুশত্রু :

কলহ করিয়া বর নাগরের সাথে
একাকিনী কত যুঝিবে সজনি কহ?
বিপক্ষ তব হয়েছে সম্মিলিত
বসন্ত, চাঁদ, মদন গন্ধবহ।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৫ সি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, শনিরঞ্জন
প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

একাদশ সংখ্যা]　　　শ্রাবণ, ১৩৩৯　　　[৪র্থ বর্ষ

মৃত্যু-দর্শন

মৃত্যুর কথা কেহ ভাবে না, এ কথা সত্য—ভাবিলে মানুষের পক্ষে বাঁচাই কঠিন হইত।

*　　　*　　　*

কিন্তু না ভাবিয়া থাকে কেমন করিয়া? জীবনের মোহ-রসে আচ্ছন্ন থাকে, মৃত্যু-বিভীষিকা সে মোহ ভেদ করিতে পারে না। বাঁচিয়া থাকিতে হইবে; সে বাঁচা দিন হইতে দিনে, বা বৎসর হইতে বৎসরে নয়—পলে অনুপলে; তাই মৃত্যুকে দেখিলেই সে পাশ কাটায়, একক্ষণ তাহার দিকে তাকাইতেও পারে না। মানুষের জীবধর্ম্ম এতই প্রবল, দেহের অণু পরমাণু এত চঞ্চল যে থামিবার ভাবিবার অবকাশ নাই। যে মুখে ছুটিতেছে তাহার বিপরীত মুখে মৃত্যু পাশ দিয়া ছুটিয়া

যাইতেছে, উভয়ে চক্রাকারে ছুটিতেছে—যখনই দেখা হয় শিহরিয়া উঠে ; কিন্তু গতির বিরাম নাই, ঘূরণের নেশায় মৃত্যুকে আমরা দেখি না যখনই সংঘর্ষ ঘটিবে তখনই চূরমার হইয়া যাইবে এ কথা সে জানে, কিন্তু ঘূর্ণনের মুখে তাহা মানে না। ইহারই উল্লেখ করিয়া মহাভারত-কার যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং'।

* * *

মৃত্যুকে ভাবিতে পারা যায় না—আর সব কিছু মানুষের জ্ঞান-গম্য, পরোক্ষ অনুভূতির বিষয়, কিন্তু মৃত্যুকে সাক্ষাৎ করিতে না পারিলে তাহার পরিচয় করা হয় না ; এবং সাক্ষাৎ করিলে আর কিছু বলিবার থাকে না। অস্তিত্বের বিলয়-মুহূর্ত্তে যে অপরোক্ষ অনুভূতি ঘটে, তাহা বজ্রাঘাতের মত—নিমেষের মধ্যে মহাশূন্য জাগিয়া ওঠে—তাহাতে দিক-কাল নাই, অগ্র-পশ্চাৎ নাই, স্মৃতি-বিস্মৃতি নাই—সেই মহানির্ব্বাণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কি অনুভব হয়, তাহা কেহ কাহাকে জানাইতে পারে না। মৃত্যু কি তাহা কেহ জানে না, জানিবার কোনও উপায় নাই। যাহা জীবনের বিপরীত জীব তাহা ধারণা করিতে পারে না ; তাই মৃত্যুর ঘটনা মানুষ দেখে, মৃত্যুকে জানে না ; বুদ্ধির দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয় সত্যকার মৃত্যুচিন্তা কেহ করে না।

* * *

যে দ্বার রুদ্ধ, যে পৈঠার পরে আর পদক্ষেপ নাই—যাহাকে ক্রমাগত চলিতেই হইবে সে সেদিকে চাহিবে কেন ? যাহাকে জানা পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ—জানার নামই জীবধর্ম্মের নিবৃত্তি—তাহাকে জানিবার প্রবৃত্তিই যে হয় না।

তাই মৃত্যুকে একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা রূপেই সে দেখে—ক্ষণিক বিভীষিকা প্রতি রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত প্রভাতের আলোকে প্রত্যহ মুছিয়া যায়—জীবনের জাগ্রৎ যাত্রার অবিরত তাড়নায় মৃত্যুর ফাঁক ভরিয়া ওঠে। এ যাত্রায় কিছুই ফিরিয়া দেখিবার অবকাশ নাই; বর্ত্তমান ছাড়া কাল নাই; পরের মৃত্যু অতীত, নিজের মৃত্যু ভবিষ্যৎ—এ দুইটার কোনটাই বাস্তব নয়।

*　　*　　*

অতএব মৃত্যু কি তাহা আমরা যেমন জানি না, জানিবার কোনও প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু তথাপি মৃত্যুর একটা রূপ আমরা দেখি—সেই পরোক্ষ দেখাও অপরোক্ষ হইয়া উঠে, যখন চোখের সম্মুখে প্রিয়জনের শেষ নিশ্বাস-ত্যাগের সেই চরম মুহূর্ত্ত গণনা করি। জীবনের সেই অবসান-দৃশ্য, প্রাণবায়ু-ত্যাগের সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ তখন একটা বিস্ময় বা বিভীষিকার মত কেবল একটা বিমূঢ় ভাবের উদ্রেক করে না, কেবল মন বা মস্তিষ্কের উপরেই আঘাত করে না—হৃদয় মথিত করে; জীবনের পুষ্প-পতাকাময় তোরণের অন্তরালে যে কঙ্কাল লুকাইয়া আছে তাহা যেন নির্লজ্জভাবে উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। সেও মৃত্যুর স্বরূপ নয়—তবু একটা রূপ আমরা দেখি; এই দেখিতে-পাওয়ার কারণ আর কিছু নয়, আমাদেরই একটা অংশ—প্রাণবৃক্ষের একটি শাখা—তখন শুকাইয়া খসিয়া যায়; সে যেন আমাদেরই আংশিক মৃত্যু, সে মৃত্যু তখন অনুভব করি প্রাণের মধ্যে; এই প্রাণী-দেহ যে স্নায়ুশিরা-বন্ধনের শত গ্রন্থিতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে—সেই গ্রন্থিতে চোট লাগে, সে বন্ধন আর তেমন থাকে না, শিথিল হয়; কয়েকটা স্নায়ু হয় ত ছিঁড়িয়া যায়। যাহাকে বুকের কাছে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম, যাহাকে হৃদয়ের স্নেহরসে পুষ্ট করিয়াছিলাম, যাহার জীবনে আমার

জীবন বেগ সঞ্চার করিয়াছে—মৃত্যু যখন তাহাকে গ্রাস করে, তখন আমারই কতকটা তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; না মরিয়াও আমি মৃত্যুর স্পর্শ লাভ করি।

* * *

সাধারণে ইহাকে বলে শোক। শোক বাহিরের আক্ষেপমাত্র, সে বেশি দিন থাকে না। জীবন্ত দেহে অস্ত্রোপচার করিলে ক্ষত-অঙ্গে স্নায়ু-পেশীর যে স্পন্দন অবশ্যম্ভাবী, শোক তদতিরিক্ত কিছু নহে। এই শোক বা আক্ষেপ অস্ত্রাঘাতমাত্রেই হয়; কিন্তু সকল অস্ত্রাঘাতে অঙ্গহানি হয় না—দেহের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয় না। শোক কালে শান্ত হয়; কিন্তু সেই অঙ্গহানি, প্রাণের সেই আংশিক মৃত্যুর কোনও প্রতিকার নাই; বরং বাহিরের আক্ষেপ বা শোক যত প্রবল ততই সান্ত্বনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আত্মীয়-বিয়োগে মৃত্যু যাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে তাহার পক্ষে সকল সান্ত্বনা নিরর্থক বলিয়াই বাহিরে কোনও আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায় না; সে মূঢ় মূক হতচেতন হইয়া যায়, ভিতরে পক্ষাঘাত হয়—যাবজ্জীবন সে অজ্ঞানে ও সজ্ঞানে সেই পক্ষাঘাত বহন করে।

* * *

ইহারই নাম মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎকার—নিজ মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষ মৃত্যুকে আর কোনও রূপে দেখিতে পায় না। সাধারণতঃ মৃত্যুকে আমরা জানি না, জানিতে চাই না, জীবিতের পক্ষে অপরের মৃত্যু একটা অর্থহীন দুর্জ্ঞেয় উপদ্রবমাত্র; যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি ততক্ষণ মৃত্যুকে স্বীকার করা অসম্ভব—মৃত্যুকে স্বীকার করাই মরা। স্বীকার এক রকম করি—যখন বুকের পাঁজর-কয়খানার কোনটা খসিয়া যায়—নিজের মনের মুকুরে নিজের সেই লাঞ্ছিত হতশ্রী মূর্ত্তি দেখিয়া মুখ

লুকাই, সে মুখ কাহাকেও দেখাইতে লজ্জা হয়; মানুষের সভায় যখন বসি তখন প্রাণপণে নিজের সেই ক্ষতচিহ্ন লুকাইয়া রাখি। যে শোক করে, সে মানুষের সান্ত্বনা সহানুভূতি চায়, সে জীবনের দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে চায়—সে মৃত্যুকে দেখে নাই।

* * *

জীবনে যার মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় নাই সে ভাগ্যবান—যে তাহাকে দেখিয়াও দেখে নাই সে হৃদয়হীন। যে মৃত্যুর অন্তরালে পরম আত্মাকে আবিষ্কার করে, মৃত্যুকে যে অমৃতের সোপান বলিয়া উপলব্ধি করে, মৃত্যু কোথায়ও নাই বলিয়া যে ঘোষণা করে, সে—হয়, জানিয়া শুনিয়া মধুর মিথ্যার প্রশ্রয় দেয়; নয়, সে কখনও বাঁচে নাই—দেহ পরিগ্রহ করিয়াও বিদেহ অবস্থায় আছে, অর্থাৎ সে প্রেত-পিশাচের সামিল। মানুষ যতক্ষণ মানুষ, ততক্ষণ সে তাহার ব্যক্তিপরিচ্ছিন্ন সত্তা বিস্মৃত হইতে পারে না—সেই সত্তার উপরে যে ব্যক্তিত্বহীন অমৃত-সত্তার আরোপ করিয়া আশ্বস্ত হইতে চায় তাহার আত্মপ্রবঞ্চনা কৃপার উপযুক্ত বটে। কিন্তু যে সেইরূপ আশ্বাসে আশ্বস্ত হইতে পারে সে মানুষ নয়—যে বস্তু কবি-বিধাতার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, সেই হৃদয় নামক যন্ত্রটি তাহার মধ্যে বিকল হইয়া আছে। যাহারা লোক-লোকান্তরের স্বপ্ন দেখে, যাহারা মৃত্যুর পরেও অবিচ্ছেদে জীবনযাপন করার কথায় বিশ্বাস করে, তাহারা শিশুর মত রূপকথার ভক্ত। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে তফাৎ এই যে, একদল তত্ত্বজ্ঞানের অভিমানে হৃদয়বৃত্তি নিরোধ করে; অপর দল হৃদয়াবেগের মোহে নির্ব্বিচারে মিথ্যার শরণাপন্ন হয়।

* * *

মৃত্যুর পরে আর কিছুই নাই—এ কথা যতই সত্য বলিয়া মনে

হউক—স্বীকার করিতে সকলেই ভয় পায়। মৃত্যুর সম্বন্ধে ভাবিতে গেলেই মনের মধ্যে একটা অন্ধকার শূন্য মাত্র অনুভব করি—অথচ, শূন্য বা নাস্তিত্বের কল্পনাও আমাদের সংস্কার-বিরোধী ; তাই মন সেই শূন্য বা নাস্তি-চেতনাকে নানা কৌশলে আবৃত করিবার চেষ্টা করে—সেই অন্ধকার গহ্বরকে কোন কিছু দিয়া ভরাইয়া রাখিতে চায়। মানুষ মৃত্যুশোকে সান্ত্বনা চায়, তার অর্থ, মৃত্যুকে সে মানিতে চায় না ; অস্তিত্বের ঐকান্তিক বিলোপ তাহার জীব-সংস্কারের পক্ষে বিষবৎ মারাত্মক, তাই আত্ম-প্রবঞ্চনার দ্বারা সে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মানুষ সাধারণ মৃত্যু-ঘটনায় বিশেষ বিচলিত হয় না—যে মরিয়া গেল, জীবন-ব্যাপারে তার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকে না বলিয়া তাহাকে সে আর গণনার মধ্যেই আনে না। শোকের আক্ষেপ মনের একটা সাময়িক পীড়া মাত্র ; যে বাঁচিয়া আছে সে প্রাণবন্ত—প্রাণহীনের সঙ্গে প্রাণীর যে সম্পর্কহীনতা, তাহা ধর্ম্মের মত দুর্লঙ্ঘ্য—যে মৃত সে আর আমাদের কেহ নয়, এই সংস্কার যেন প্রাণের মর্ম্মমূলে জড়িত হইয়া আছে। অতএব শোক মিথ্যা, সান্ত্বনা সুসাধ্য।

* * *

মৃত্যু জীবনের উপরে রেখাপাত করিতে পারে না। মৃত্যুর সম্বন্ধে শিশুর যে মনোভাব, নিত্যসঙ্গীরও অকস্মাৎ তিরোধানে শিশুর যে আচরণ, বয়স্ক ব্যক্তির আচরণও তাহাই—মূল জীবন-চেতনার বা সত্যকার জীবন-ধর্ম্মের তাগিদে আমরা মৃতজনকে আমাদের জগৎ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিই ; অমৃতের আশ্বাস, ধর্ম্মের সান্ত্বনা, পরলোকের কাহিনী-কল্পনা—এ সকলই তাহার প্রমাণ ; মৃতজন আমাদের প্রাণের সন্নিকটে আর বাস করে

না; আমাদের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাহাদের কোনও যোগ নাই। যার কায়া নাই তার সঙ্গে দেহধারীর কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না—তাই থাকেও না; তথাপি যে সম্পর্কের দাবী করি তাহা ভাণ মাত্র; তাহা যে সত্য নয় তার প্রমাণ সর্বত্র; মানুষের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে মৃতজনের সম্বন্ধে কোনও চেতনা কোনও সজ্ঞানতা তাহার মধ্যে কুত্রাপি নাই। শিশুর আচরণ অবিমিশ্র সত্য, তাহাতে ভাণ নাই; বয়স্ক ব্যক্তির স্মৃতি নামক একটা মানস-ব্যাধি আছে, হয় ত লজ্জাও আছে, তাই সে মাঝে মাঝে স্মরণ করে, দুঃখ করে, লজ্জা পায়।

* * *

মানুষ আপনার চেয়ে কাহাকেও ভাল বাসে না; যদি কাহাকেও খুব ভালো বাসে, তবে তাহা আপনার চেয়ে নয়—আপনার মত। তাই স্নেহ যত গভীর হউক, প্রেম যত বড় হউক, তার মূলে স্বার্থ থাকে। পরের জন্য আপনাকে হত্যা করা—পরের মৃত্যুতে নিজের জীবন-সঙ্কোচ করা জীবের ধর্ম্ম নহে, মানুষের মত শ্রেষ্ঠ জীবেরও নহে। যে মরিয়া গেল তাহাকে ভাল বাসিতাম, খুব ভাল বাসিতাম—তার অর্থ, আমার প্রীত্যর্থে তাহাকে প্রয়োজন ছিল; তাহার মৃত্যুতে আমার আত্মপ্রীতির বিঘ্ন ঘটিয়াছে। আত্মপ্রীতির জন্য এই যে পরকে আশ্রয় করা—ইহারই নাম হৃদয়-ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের চরম বিকাশে মানুষ শেষে আত্মবিস্মৃত হয়, আত্মরক্ষা শেষে আত্মবিসর্জ্জনে পর্য্যবসিত হয়। এই বিসর্জ্জন বা বিসৃষ্টিও আত্মহত্যা নয়—আপনাকেই ভিতর হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া, বিষয়ান্তরে আপনাকেই সৃষ্টি করা। এতখানি কল্পনা সকলের নাই—কিন্তু মূলে সকলের ধর্ম্মই এক, সকলেই আত্মধর্ম্মী, আত্মব্রতী। যাহাকে ভালোবাসি, স্নেহ করি, সে আমার

আত্মীয়, অর্থাৎ আত্ম-সম্পর্কিত, অর্থাৎ আত্মপ্রীতির আশ্রয়। সেই আত্মীয় যখন মরিয়া যায় তখন যে শোক উপস্থিত হয়, তাহা সাধারণতঃ স্বার্থ-হানির শোক। কিন্তু তাহাকে আর কোনও প্রয়োজনে পাইব না, এই জীবনের প্রত্যক্ষ লীলামঞ্চে কোনও সূত্রে সে আমার সঙ্গে আর বাঁধা নাই; মৃত্যুর পরে যদি সে থাকে-ও তবে তাহার জাত্যন্তর ঘটিয়াছে; জীবিত আত্মার সঙ্গে মৃত-আত্মার কোনও গুণ-সামান্য নাই, অতএব সে আর আত্মীয় নহে;—প্রাণের গভীরতম চেতনায় মানুষ ইহা অনুভব করে, তাই অজ্ঞানে প্রাণ-ধর্ম্ম পালন করে; কেবল মানস-ধর্ম্মের তাড়নায় তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। মানুষ কাঁদে, কিন্তু প্রকৃতি হাসে—জীবধর্ম্ম পালন করিতে সে বাধ্য, করে-ও। একদিকে শোক করে, আর এক দিকে নিজ জীবনের প্রয়োজন পূরাপূরি সাধন করে।

* * *

আত্মীয়-বিয়োগে আত্মার বিয়োগ হয় না; আমাকেই কেন্দ্র করিয়া যে জগৎ দাঁড়াইয়া আছে, আমারই প্রয়োজনে যাহার অস্তিত্ব, আমারি প্রীত্যর্থে যাহাকে আমি চাই—যতক্ষণ আমি বাঁচিয়া আছি ততক্ষণ তাহার ক্ষতিবৃদ্ধির হিসাবে কোনও স্থায়ী তারতম্য হইতে পারে না। আমি ছাড়া আর সবটাই এই জগতের অন্তর্গত; এই আত্মপ্রয়োজনাধীন জগতের এক টুকরাও হারাইবে না—যতক্ষণ না আমি আমাকে এতটুক হারাইতেছি। সকলই পর, সকলই পর, সকলই পর। এ পরের যেটুকুকে আপন বলিয়া ভাবি তাহাও জীবনের লীলা-সুখের জন্য নিজ আত্মার অভিমান পরের উপর আরোপ করা; কাজেই তাহা মিথ্যা। প্রিয়জনের মৃত্যুতে সেই অভিমান ব্যর্থ হয়—সে যেন তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া

আমাকে ফিরাইয়া দেয়, তাই আঘাত পাই, সেই আঘাতের নাম শোক। তার পর, সে ক্ষতি তখনই অন্য দিক দিয়া পূরণ করিয়া লই; কিম্বা ব্যয় সংক্ষেপ করি, অর্থাৎ বৈরাগ্য-সাধনা করি। আত্মীয়ের মৃত্যুতেই প্রমাণ হয়, সে কতদূর অনাত্মীয়—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত মিথ্যা, মানুষের ভাগ্য-বিধাতা মানুষকে কতটা আত্মৈক-শরণ, আত্মপরায়ণ, নিঃসঙ্গ, একক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহার জীবনে স্বকর্ম্মনির্দ্ধারিত পথ বা আত্মস্বার্থসাধন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আত্মীয়-অনাত্মীয় যার দশা যেমন হউক, যে যখন যেখানে যেরূপ করিয়াই জীবনলীলা শেষ করুক—আসলে তোমার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তোমার পথে তুমি চলিতে থাকিবে, তুমি ফিরিয়াও চাহিতে পার না—চাহ না। ফিরিয়া যদি চাহিতে, তবে তুমিও মরিতে—পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ-কাহিনী স্মরণ কর। তুমি মরিতে চাও না—তাই ফিরিয়া চাহিতেও নারাজ। তাই বিশ্বাস হয়, অপরের মৃত্যু অপরেরই—সে যতই প্রিয়জন হউক; সে মৃত্যু আমাদের নিকট অবাস্তব—নিজের মৃত্যুই একমাত্র বাস্তব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মৃত্যুকে আমরা দেখিয়াও দেখি না; তথাপি সময়ে সময়ে প্রাণসম প্রিয়জনের মৃত্যু আমাদের দৃষ্টিকে অপলক নিশ্চল করিয়া রাখে। পরের মৃত্যু একটা নিত্যদৃষ্ট ঘটনা মাত্র, সে ঘটনাকে ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবকাশও যেন আমরা পাই না—একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি হয় মাত্র, সে অনুভূতিকে বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দিই না—মনের দরজা বন্দ করিয়া দিই; জীবনের বাসগৃহে একটা ভূতের ঘর আছে, সে ঘর খুলিয়া কখনও

উঁকি মারি না—সময়ে সময়ে যখন আপনি খুলিয়া যায়, তখন তাহাকে বন্ধ করিয়া দিই। ইহাই আমাদের স্বভাব—ইহা না হইলে আমরা বাঁচিতাম না। কিন্তু যাহাকে এমন করিয়া বুকে করিয়া রাখিয়াছিলাম যে যাহার নিঃশ্বাস-বায়ু আমারই নিশ্বাসবায়ুর প্রতিশ্বাস বলিয়া মনে করিতাম, যাহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বসিয়া বহু দিন ও বহু রাত্রির দীর্ঘ প্রহর যাপন করিয়াছি ; সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়, আবার সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত, অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা—যাহার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রাণশক্তির গতি নিরীক্ষণ করিয়াছি, নাড়ীর বেগ বা হৃদ্‌স্পন্দন গণিবার সময় মৃত্যুর আক্রমণ নিজের নাড়ীতে নিজের হৃদ্‌স্পন্দনে অনুভব করিয়াছি ; যাহার মৃত্যুকরনিষ্পেষিত কণ্ঠের আর্ত্তস্বর শুনিয়া, শুধু আমার নয়, জগতের সকল জীবিত জনের জীবন-শ্বাসকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইয়াছে ;—মৃত্যু যখন তাহাকে কবলিত করিল, বিস্ফারিত অক্ষিতারকা স্থির জ্যোতিহীন হইয়া শেষে জালাবৃত হইয়া গেল ; পরে ক্ষণকাল দেহের আনাভি-কণ্ঠ আন্দোলন শেষে মুখ-গহ্বর হইতে প্রাণবায়ুর শেষ-শ্বাস-নির্গম প্রত্যক্ষ করিলাম—যে মুহূর্ত্তে সে মরিয়া গেল সেই মুহূর্ত্তকে চাক্ষুষ করিলাম, তখন কি দেখিলাম ? কি অনুভব করিলাম ? দেখিলাম একটা জীবনের অবসান হইয়া গেল—বুঝিলাম যে ছিল সে আর নাই ! সে আর নাই, এই পরম সত্য উপলব্ধি করিলাম—উপলব্ধি করিলাম আমি বাঁচিয়া আছি। শবদেহ বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম, মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলাম ; কারণ, তখন স্পষ্ট বুঝিলাম, অবশিষ্ট যাহা তাহা এই দেহটা, উহার অতিরিক্ত আর কিছু অস্তিত্বের সীমানায় আর নাই। চিরদিনের শিক্ষা-সংস্কার বিস্মৃত হইলাম—যে গেল সে ওই দেহটা নয়, আর কিছু ; সে আর উহার মধ্যে নাই, ত্যক্ত বসনের মত

সে উহাকে পরিহার করিয়া গিয়াছে—এ সকল কথা বিশ্বাস হইল না। দেহের দিকে না তাকাইয়া তাহার আত্মার প্রয়াণ-পথ কল্পনা করিতে পারিলাম না; কারণ, মৃত্যু কি, তাহা সেই মুহূর্ত্তে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। জীবন ওই দেহেরই ধর্ম্ম—জীবিতের মূর্ত্তি ওই দেহ—ওই মূর্ত্তি মরিয়াছে, সে আর বাঁচিয়া নাই—সে আর নাই। তবু যতক্ষণ ওই দেহটা আছে, প্রাণহীন হইলেও তাহাকেই দেখিতেছি—তাহাকে আর কোনও রূপে কল্পনা করিতে পারি না। যে রহস্যময় প্রাণবায়ু ওই দেহকে ত্যাগ করিয়া গেল, সে মহাশূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে, দীপ নির্ব্বাণ হইলে শিখা যেমন শূন্যে বিলীন হয়। সে বায়ু ওই দেহকেই সঞ্জীবিত করিয়াছিল—তাই তাহার এত মূল্য; সে বায়ু এখন নিঃশেষ হইল, মানুষ মরিল। শব-মুখে যতই চাহিয়া দেখি, ততই মনে হয় সে মুখ যেন কাঙালের মত—প্রাণ হারাইয়া সে যেন সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে, তার আর কিছু নাই—কিছু নাই; সে মুখে চাহিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম, এই শেষ, এইখানেই সব শেষ—তার অস্তিত্বের শেষ নিদর্শন ওই দেহ। মৃত্যু তার মুখে ভয় বা বিস্ময়ের চিহ্ন অঙ্কিত করে নাই—অতি দীন দুঃখী ভিখারীর মত সে মুখে একটি বড় করুণ ছায়া বিস্তার করিয়াছে; জীবন ও মৃত্যুর সন্ধি-মুহূর্ত্তে যে-সত্য তাহার মুখে মুদ্রিত হইতে দেখিলাম তাহাতে সকল মিথ্যা সংস্কার দূর হইল; যে অবস্থা ধারণা করিতে পারি না, জীবিতের পক্ষে যাহা অপরোক্ষ করা অসম্ভব—সেই চিরনির্ব্বাণ, সেই মহাশূন্য বা চরম পরিণাম যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। ওই প্রাণহীন শবদেহও যতক্ষণ ধ্বংস না হয়, ততক্ষণ তাহা সত্য; সৃষ্টির মূল সত্য—যে মূর্ত্তি বা কায়া—তাহা তখনও সম্মুখে বিদ্যমান। মনে হইল প্রাণ নাই, তবু সে আছে—প্রাণহীন সে; সে-হীন প্রাণ—যাহাকে আত্মা বলে, তাহা

কল্পনা করিতেই পারিলাম না ; যাহাকে হারাইলাম তাহার শেষ সত্য ওই দেহটা, তাই সেটাকে বুকে চাপিয়া ধরিলাম।

* * *

ইহাই মৃত্যু—দেহ-বিযুক্ত আত্মার লোকান্তর-প্রাপ্তি নহে। মৃত্যু-শোক বিরহ-দুঃখ নয়, কারণ মৃত্যু লোকান্তর-বাস নয়—অতলস্পর্শ শূন্য-গহ্বর। যে আর নাই—তাহার সম্বন্ধে বিরহ-ভাব হয় কেমন করিয়া? কাহারও মৃত্যু যদি গভীরভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে, যদি তাহাকে এমন ভালবাসিয়া থাক যে তাহার অভাবে—তোমার কি হইল না ভাবিয়া—তাহার কি হইল ভাবিতে পার, তবেই মৃত্যুর স্বরূপ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবে। যে মরিল সে যে আর নাই—এ কথা ভালো করিয়া গভীর ভাবে উপলব্ধি করা দুরূহ ; আমার জীবন-সংস্কার অর্থাৎ 'আমি আছি'র সংস্কার সে পক্ষে প্রধান বাধা। এই সংস্কার যদি মুহূর্ত্তের জন্য ঘুচিয়া যায় তবে মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও রূপ কল্পনা-বিলাস আর টিকিতে পারে না। প্রাণসম প্রিয় জনের মৃত্যু-ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া যখন মনে হয়—আমি আছি, আর, সে নাই ; আমার বাঁচিয়া থাকার তুলনায় তাহার না-বাঁচার অবস্থা যখন তীব্রভাবে অনুভব করি, তখন এই ভাবিয়া মর্ম্মমূল ছিঁড়িয়া যায় যে, আমি যাহা ভোগ করিতেছি সে তাহা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইল। যে আয়ু অপেক্ষা পরম ধন আর নাই, যে আয়ু আমি এখনও ভোগ করিতেছি—শোকের আবেগে নিজের সেই আয়ুকে যতই ধিক্কার দিই না কেন, অন্তরের অন্তরে যার মূল্য সম্বন্ধে আমি সচেতন—সেই আয়ু—অস্তিত্বের সেই একমাত্র স্বাদ-সুখ—হইতে যখন তাহাকে বঞ্চিত হইতে দেখি, তখন কপট বৈরাগীর মত নিজে গোপনে ভোগসুখে আসক্ত থাকিয়া অপরের সম্বন্ধে সুমহান বৈরাগ্যের আদর্শ প্রচার করার

মত, নিজে জীবিত থাকিয়া মৃতের জন্য আত্মা বা পরলোকের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তখনই মৃত্যু কি, তাহা বুঝিতে পারি, জীবন-বঞ্চিত হতভাগ্যের জন্য যে দুঃখ অনুভব করি—আমার অভাব নয়, তাহার সেই অভাব—সেই সব-শেষ-হওয়ার মহা দৈন্য যখন উপলব্ধি করি, তখন একদিকে জীবনকে যেমন পরম আশীর্ব্বাদ বলিয়া বুঝিতে পারি, আর একদিকে মৃত্যু যে কত বড় অভিশাপ, তাহাও অন্তরের অন্তরে অনুভব করি।

* * *

পরক্ষণেই মনে হয় যে রহিল না, যে আর নাই, তাহার জন্য দুঃখ কি?—দুঃখ তাহার, না তোমার? জীবন-বঞ্চিত হইয়াছে কে? 'হইয়াছে' কথাটা যার সম্বন্ধে খাটে তাহার একটা সত্তা মানিতে হয়—কিন্তু সে যে নাই! মৃত্যু যে মহা অবসান—চির সমাপ্তি! তখন বুঝি দুঃখটা আমার—আমারই সম্পর্কে, আমারই স্বার্থজড়িত। শোক করিতে গিয়া মনের মধ্যে বাধা পাই। চোখ ফাটিয়া যে অশ্রুর উদ্গম হয়, তাহার হেতুরূপে আমা ছাড়া আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাই না।

* * *

তখন বুঝিতে পারি, যাহার শব-দেহ বার বার বক্ষে ধারণ করিতেছি—সে আর নাই বটে, তবু আমার জীবনে তাহার জীবনের রেশ রহিয়াছে—আমি যে আছি! এই যে 'সে নাই' ভাবিতেছি ইহা ত' আমারই ভাবনা. 'না থাকা' যে কি, তাহা যে নাই সে ত আর বুঝে না; যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণই মৃত্যু আছে—যাহার মৃত্যু ঘটে তাহার আর কিছুই নাই—মৃত্যুও নাই! শবদেহ যেমন চিতার অগ্নিজ্বালা অনুভব করে না—কিন্তু জীবিত দেহের, একটা অঙ্গ যখন অগ্নিদগ্ধ হয় তখনই দহন-জ্বালা যে কি তাহার অনুভব হয়—তেমনই মৃত্যু-রূপ জ্বালার

অনুভূতি জীবিতেরই হইয়া থাকে। আবার, অপরের দেহ দগ্ধ হইলে সে জ্বালা যেমন আমি অনুভব করি না, তেমনই পরের মৃত্যু যতই অনুমান-সাপেক্ষ হউক, আমার অনুভূতি-গোচর হয় না। কিন্তু আমারই একটা অঙ্গ দগ্ধ হওয়ার মত যখন আমার জীবনের অংশস্বরূপ কোনও পরম প্রিয়জনের মৃত্যু হয়; তখনই আমি মৃত্যুকে অনুভব করি— আমি যখন একেবারে মরিব তখন আমিও তাহা অনুভব করিব না। মৃত্যুকে অপরোক্ষ করার আর কোনও উপায় নাই—আমারই জীবনের অংশ রূপে আর একটা জীবন যখন আমার মধ্যে মরিয়া থাকিবে তখনই মৃত্যুর সহিত আমার পরিচয় ঘটিবে—যে মরিল, মৃত্যু যেন তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমারই জীবনের মধ্যে বাসা বাঁধিল! অতএব মৃত্যুর জন্য যে সত্যকার শোক সম্ভব—তাহা মানুষের নিজেরই মৃত্যু-শোক; মৃত্যুকে আর কোনও অবস্থায় আমরা বুঝি না, অনুভব করি না—আর সকল মৃত্যুই আমাদের নিকটে অবাস্তব—সে সকল মৃত্যুতে যে শোক আমরা করিয়া থাকি তাহা সুখবোধের বিপরীত একটা দুঃখবোধ মাত্র—নানা অন্যবিধ যন্ত্রণার মত একটা যন্ত্রণা—সে মৃত্যু বাহিরের আঘাত মাত্র; তাহা জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয় না, প্রাণের মর্ম্মস্থানে ক্ষত চিহ্ন রূপে বিরাজ করে না; করিলে, সে শোক একটা ঝড়ের মত জীবনের শাখাপ্রশাখাগুলিকে কিছু কাল আন্দোলিত করিয়াই নিবৃত্ত হয় না— মূল হইতে রস সঞ্চারে বাধা দেয়, পত্র পুষ্প বিবর্ণ হইয়া যায়; সম্পূর্ণ অলক্ষিতে তাহার প্রভাব ক্রমশঃ ভিতর হইতে বাহিরে প্রকট হইয়া পড়ে।

* * *

কিন্তু এমন ভাবে আমরা মৃত্যুকে সচারাচর অপরোক্ষ করি না— পর এমন আত্মীয় হয় কদাচিৎ। অতি বড় শোকও যে কালে আরোগ্য

হয়—আমরা যে সান্ত্বনা খুঁজি এবং পাই—তার কারণ, মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধি আমরা করি না, মৃত্যু যে কি তাহা ভাবিতেও ভয় পাই ; যে মরিয়াছে তাহাকে বিস্মৃত হইবার প্রাণপণ চেষ্টা করি—বাঁচিতে চাই। স্ত্রী-বিয়োগে, সন্তান-বিয়োগে, বন্ধু-বিয়োগে আমরা যে ব্যথা পাই—তাহা মৃত্যু-চেতনা নয়—জীবনেরই একটা দুঃখবোধ—সুখভোগে একটা বাধার মত। কিন্তু মৃত্যুকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিবার অবকাশ যদি কখনও ঘটে, তবে জীবনের যত কিছু সংস্কার মুহূর্ত্তে উড়িয়া যায়—শোক ও সান্ত্বনা দুইই অনর্থক বলিয়া মনে হয়। সে অবস্থায়—যাহাদের হৃদয়বৃত্তি অতি গভীর ও প্রবল, তাহারা প্রিয় জনের মৃত্যুতে তৎক্ষণাৎ নিজেও মরিয়া যায় ; এমন যুগপৎ মৃত্যুর দৃষ্টান্ত বিরল নহে—'মৃতে ম্রিয়তে যা' বলিয়া যে প্রেমিকার চরিত্র বর্ণনা আমরা পাঠ করি তাহা মিথ্যা নয়। যাহাদের জ্ঞানবৃত্তি প্রবল, তাহারা শূন্যবাদী, নাস্তিক বা বৈদান্তিক মনোবৃত্তির অনুশীলন করিয়া কাঠ-পাথরের মত হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে ; মৃত্যুকেই মোক্ষ বলিয়া বুঝে, কেবল তৎপূর্ব্বে অবশিষ্ট জীবনটা কোনও রূপে অতিবাহন করিবার জন্য কূটতর্কের জালে তাহাকে আবৃত করে। যাহাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রবল, তাহারা মৃত্যুকে স্বীকার করিয়াও জীবনের এই সুযোগটা উত্তমরূপে ভোগ করিতে চায়, সত্যকার শক্তিমান নাস্তিক তাহারাই—জীবনের মদিরাপাত্র আকণ্ঠ পান করিয়া কীর্ত্তির নেশায় মস্‌গুল থাকে—মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করে না—শেষ কোথায় ? ইহারাই পরম বিস্ময়ের পাত্র—কারণ ইহারা সাধারণ নরনারীর মত ক্ষুদ্রমনা বা স্বার্থমোহগ্রস্ত নয়, তথাপি ইহারা মৃত্যুর মত এত বড় একটা ঘটনার সম্বন্ধে উদাসীন—মনের মধ্যে সে প্রশ্নকেই যেন ঠাঁই দিতে নারাজ।

* * *

মৃত্যুতে শোক করা আর মৃত্যুকে দেখা এই দুইটা এক নয়; এই কথাটাই বার বার বলিয়াও শেষ করিতে পারিতেছি না। শোক সকলেই করে—কিন্তু মৃত্যুকে দেখিতে সকলে চায় না, বা পারে না। মৃত্যুকে যথার্থ দেখিতে পাইলে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহা বজ্রালোকের মত—জীবনের সকল তিমির-সংস্কার বিদীর্ণ করিয়া সে আলোকচ্ছটা মানুষের মানস-চক্ষু বাঁধিয়া দেয়; সে বজ্র যাহার উপর পতিত হয় সে তন্মুহূর্ত্তেই মহা রহস্য-সাগরে বিলীন হইয়া যায়। যে তাহাকে দেখিয়াছে মাত্র, সেই বজ্রের আলোক যাহার দুই চক্ষু ঝলসিয়া দিয়াছে, সে অস্তিত্বের ঐকান্তিক অভাব চকিতে অনুভব করিয়াছে; সে বুঝিয়াছে, সকল জ্ঞানের সীমা কোথায়, মানুষের মানস-বৃত্তি মহাশূন্যকে আচ্ছাদন করিয়া জীবন-রঙ্গভূমির জন্য যে মিথ্যা-বিচিত্র যবনিকা রচনা করে তাহার ছিদ্র কোথায়। সে ছিদ্রমুখে দৃষ্টি সংলগ্ন করিলে যে সত্যের উপলব্ধি হয়, তাহাতে এই প্রতীতি জন্মে যে, জীবনের বাহিরে আর কিছুই নাই—মৃত্যুর পরে আর কোনও রহস্য নাই, মৃত্যু অমৃতের দ্বার নহে। এই জীবনই— তিক্ত হোক মিষ্ট হোক একমাত্র রস'। ইহার হিসাব বা ব্যবস্থা করিবার কালে কোনও অদৃষ্ট ভবিষ্যতকে গণনার মধ্যে গ্রহণ করা ভুল; বীরের মত সে ভরসা ত্যাগ করিয়া জীবন যাপনের নীতি স্থির কর; ভগবান বা পরলোক, আত্মার অমরতা বা ব্রহ্মাণ, এ সকল মরীচিকা মাত্র—মৃত্যুকে চাক্ষুষ করিবার মত সাহস নাই বলিয়া, জীবনকে যথার্থরূপে ভোগ করিবার মত হৃদয়-বল নাই বলিয়া এ পথ্য হজম করিবার মত পরিপাক-শক্তি নাই বলিয়া—সাধারণ জীব আমরা দুধে জল মিশাইয়া, নানা পেটেণ্ট ঔষধের সহযোগে জীবন-পিপাসা নিবৃত্তির উপায় করিয়া থাকি।

*   *   *

মৃত্যুকে যে যথার্থরূপে দেখিয়াছে, সে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে—মিথ্যা হইতে সত্যে নব জন্ম লাভ করিয়াছে। তার মানস-প্রকৃতির একটা পরিবর্ত্তন এই হয় যে, সে কোনও কিছুর পরিণাম বা ভবিষ্যৎ পূর্ণতায় আর বিশ্বাস করে না। সে আর যাচঞা করে না, প্রার্থনা করে না—লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল-অমঙ্গল তাহার নিকটে সম-মূল্য। জীবন-বিধাতার নিয়তি-রূপ সে মানিয়া লয় বটে, সে শক্তিকে সে প্রত্যক্ষ করে জীবন-মৃত্যুর বন্ধন-পাশ রূপে—সে শক্তি ঈশ্বর নয়, তাহার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই; এই জগতের অণু-পরমাণু হইতে মানুষের প্রাণ পর্য্যন্ত সৃষ্টির যত কিছু রূপ-বৈচিত্র্য যে অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন, সেই নিয়ম-বন্ধনের মূল-গ্রন্থিরূপেই সে তাহাকে চিনিয়া লয়; সে গ্রন্থি আপনাকে আপনি—উন্মোচন করা দূরে থাক—একটু শিথিল করিতেও পারে না। ইহাও সে বুঝে—তাহার সেই শক্তির সীমা কতদূর? আমার জীবন-সংস্কারের বাহিরে আমার উপরে তাহার অধিকার কোথায়? জীবনে আমি তাহারই স্ব-বন্ধন-রজ্জুতে আবদ্ধ আছি; মৃত্যুতে আমি সকল বন্ধনমুক্ত—অস্তিত্বের বহির্ভূত। অতএব যে মৃত্যুর স্বরূপ-সন্ধান পাইয়াছে—সে আশাহীন, ভয়হীন; তাহার পরিণাম-চিন্তা নাই, তাহার ভগবান নাই। সে হাতযোড় করিয়া কিছুই যাচনা করে না। যে কেহ এইরূপ দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে—সে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও সুযোগ-মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে দেখিতে পাইয়াছে—সে দেখা এমন দেখা যে তাহার পর জীবন-সংস্কারের অনুকূল কোনও রঙ্গিন মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। জীবনের নিশীথ-প্রহরের যে লগ্নে সকলে ঘুমাইয়া পড়ে সে তখন সহসা জাগরিত হইয়া প্রকৃতির নেপথ্যগৃহে দৃষ্টিপাত করিয়াছে; সেখানে যে দৃশ্য তাহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে দুই চক্ষের মায়া-অঞ্জন

মুছিয়া গিয়া সর্ব্বমোহের অবসান হইয়াছে—সে চরম সত্যের দীক্ষালাভ করিয়াছে।

* * *

মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে—পশুও করে; পশুর জীব-সংস্কার অস্পষ্ট, তাই তার ভয়ও অস্পষ্ট। এই অস্পষ্ট সহজাত মৃত্যু-ভয়ের উপরে মানুষ খুব বড় একটা কাল্পনিক ভয়কে খাড়া করিয়াছে—'the dread of something after death'; মানুষ বাঁচিতে চায়—কারণ বাঁচিয়া থাকার একটা জ্ঞান তাহার আছে—দেহগত জীব-সংস্কার ছাড়া একটা মানস-সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে; এই সংস্কার বশে সে ইহজীবনকে পরজীবনে প্রসারিত না করিয়া পারে না। এই অন্ধ প্রাণগত বিশ্বাসের বশে সে মৃত্যুকে একটা জীবনান্তর সেতু বলিয়া মনে করে—এই সেতুই বৈতরণী, এক পার হইতে আর এক পারে পঁহুছিবার অগ্নিময় খেয়া-পার। পার হওয়ার পর সে থাকিবে—কিন্তু কি অবস্থায় থাকিবে তাহা জানে না। মৃত্যুর সঙ্গেই যদি জীবন-শেষ না হয়, তবে জীবনের শেষ কোথায়? সেই অনন্ত জীবন একদিকে যেমন তাহাকে আশ্বস্ত করে, অপর দিকে অবস্থান্তরের অনিশ্চয়তা তাহাকে অধিকতর শঙ্কাকুল করিয়া তোলে। মনুষ্য-সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস অতীত কালে যতদূর আমাদের দৃষ্টিরোধ না করে তাহাতে খুব আধুনিক যুগ ছাড়া আর আর সকল যুগে মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধীয় এই ধারণাই তাহার জীবনকে সমধিক নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মানুষ তাহার জীবনের অর্দ্ধেক—কি তাহারও বেশী—ভগবান ও দেবতাকুলকে বাঁটিয়া দিয়াছে, জীবনের সূর্য্যালোক মৃত্যুপারের রহস্যময় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছে, জীবনের উপরে মৃত্যুচিন্তাকে নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে প্রশ্রয় দিয়াছে। এই ভয়-সংশয় আশা-বিশ্বাস তাহার সর্ব্ববিধ

ভাবনা ধারণা, হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্তুগুলিতে পর্য্যন্ত জড়াইয়া আছে—সে এই নশ্বর দেহের ক্ষুৎপিপাসাকে অমৃতপিপাসায় শোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে,—ভোগের মধ্যে ত্যাগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনুষ্য-চরিত্রকে একটা বিরাট বীর-মহিমার আধার করিয়া তুলিয়াছে। এ সকলের মূলে ঐ এক সংস্কার—মৃত্যুই শেষ নয়, আত্মা অমর, তাহার গতি লোকলোকান্তরে অপ্রতিহত, এ জীবন তাহার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। এইরূপ ভাবনার দ্বারা জীবনকে শোধন করিয়া মানুষ যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে, মৃত্যুকে মহিমান্বিত করিয়া মৃত্যু-ভয় নিবারণের যে প্রয়াস পাইয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, মানুষ জীবিতকালেই মৃত্যুর সাধনা করিয়াছে—জীবনের অনেকখানি মৃত্যুর নামে উৎসর্গ করিয়া একটা আপোষ করিতে চাহিয়াছে—নিরতিশয় শূন্য যাহা তাহাকে কল্পনায় পূর্ণ করিয়া সে-বিভীষিকা হইতে যতটা সম্ভব বাঁচিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এই যে মিথ্যা, ইহাই আজও পর্য্যন্ত জীবনের মূল ভিত্তি হইয়া রহিয়াছে। জীবন একটা প্রকাণ্ড আত্ম-প্রবঞ্চনা—মানুষের যত কিছু ভাবনা সাধনা এই আত্মপ্রবঞ্চনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস।

* * *

অতি আধুনিক কালে মানুষের এ বিশ্বাস টলিতে সুরু করিয়াছে, মানুষ ভগবান পরলোক প্রভৃতিতে আর তেমন আস্থাবান হইতে পারিতেছে না, আত্মপ্রবঞ্চনার শক্তি, অথবা নিছক ভাব-চিন্তা বা কল্পনার শক্তি ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। জীবন ও জগৎ এখন বে-আবরু হইয়া পড়িয়াছে, প্রত্যক্ষের তাড়নায় অপ্রত্যক্ষের রহস্য বা ভয়-বিস্ময় এখন ফিকা হইয়া পড়িতেছে। আশ্চর্য্য এই যে, তাহার ফলে মানুষের আত্ম-প্রত্যয় যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, মানুষ যেন

আত্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। মৃত্যুকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখায় যে কথা বলিয়াছি, সে বিষয়ে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই—স্বাভাবিক কারণেই তাহা হইতে পারে না; অথচ মানুষ অপ্রত্যক্ষের ভয় বা আশ্বাস হারাইতেছে। প্রত্যক্ষ জীবনের কোনও মহত্ব সে উপলব্ধি করে না —ক্ষুদ্র আয়ুষ্কালের যত কিছু সুখ দুঃখ কেবল মাত্র ভোগ করিতে পারা বা না-পারার মূল্যে সে গ্রহণ করিতেছে; জীবনকে সে পণ্যস্ত্রীর মত ভোগ করিতে চায়, মৃত্যু সম্বন্ধে সে উদাসীন।

* * *

মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের মনোভাবের এই দুই দিক তুলনা করিয়া দখিলে মনে হয়, মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য ধারণা জীবনের পক্ষে যেমন সম্ভব নয়, তেমনই প্রয়োজনীয়ও নহে। কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে মিথ্যা কল্পনার প্রয়োজন আছে—সেই মিথ্যাই মানুষের জীবনকে রঙ্গীন করিয়া তোলে, তার রক্তে যে অবসাদ বা উন্মাদনা জাগায় তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ হয়—কামনার শক্তি বাড়ে। দেহযন্ত্রে রক্ত-সঞ্চালনই জীবন নহে—সেটা জীবন-ক্রিয়া মাত্র, কামই জীবনীশক্তির মূল। এই কাম যদি কল্পনাহীন হইয়া পড়ে—যদি জীবন-ক্রিয়ার বাহিরে তাহার কোনও স্ফূর্ত্তির অবকাশ না থাকে, তবে মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার ভোগ-ক্ষমতাও কমিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত মানুষ যেখানে যত শক্তির পরিচয় দিয়াছে তার মূলে আছে প্রবল কামনা। তাহাকে জয় করা অথবা জয়ী করা—এই উভয়ের শক্তি এক, এ শক্তির মূলে আছে মরণান্তরিত মহাজীবনের স্বপ্ন, অমরতার আশ্বাস। তাহার ভরসায় মানুষ যেমন ইহজীবনের সর্ব্বস্ব হাসি মুখে ত্যাগ করিতে পারে, তেমনই ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া জীবনের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভোগের পথে নিঃশেষে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারে; কারণ উভয়ত্র এ বিশ্বাস

আছে যে, ইহাই শেষ নয়, আমার মৃত্যু নাই, শেষ পর্য্যন্ত কোনও খানে ক্ষয় বা ক্ষতির আশঙ্কা নাই; যে অসীম অনন্ত জীবন সম্মুখে নিত্যকাল প্রসারিত হইয়া থাকিবে, তাহাতে কত অবস্থান্তর, কত জয়-পরাজয়, কত লাভ-ক্ষতির অবকাশ আছে! দুঃখ কিসের? কার্পণ্যের প্রয়োজন কি? ভোগেই হোক আর ত্যাগেই হোক মানুষের অন্তরের অন্তরে সেই বিশ্বাস থাকে—সেই কল্পনার শক্তিই মানুষকে এত শক্তিশালী করিয়া তোলে।

* * *

অতএব, মানুষের পক্ষে এই কল্পনাই ভালো—সত্য ভালো নয়; সত্য বিষ, সত্য মারাত্মক। মানুষের সমগ্র জীবনাদর্শের মূলে আছে এই প্রকাণ্ড ছলনা, এই মহতী মিথ্যা। যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী, দার্শনিক কেহই এই মিথ্যার সেবা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই—নাস্তিক বা আস্তিক ভক্ত বা জ্ঞানী সকলেই, কেহ সূক্ষ্ম কেহ স্থূলভাবে—এই মিথ্যার আরাধনা করিয়া থাকে। মৃত্যুর অন্তর্নিহিত যে সহজ প্রত্যক্ষ সত্য তাহাতে আস্থাবান না হইবার একমাত্র কারণ—মানুষ মরিতে চায় না; এমন কথা স্পষ্টই বলে, যেহেতু আমি মরিতে চাই না, অতএব আমি মরিব না। মৃত্যুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই দার্শনিক যে সকল তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় তাহাতে সে প্রশ্নের কোনও সরাসরি জবাব মেলে না। সচ্চিদানন্দ-ব্যবসায়ী বৈদান্তিক অস্তি-ভাতি-নাম-রূপ প্রভৃতির ব্যাখ্যার দ্বারা ক্ষুদ্র আস্তিক্যবুদ্ধি লোপ করিয়া মহা আস্তিক্যবুদ্ধির প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হইয়া উঠেন। বেশ বুঝিতে পারিবে, থাকা অর্থে তুমি যাহা অনুভব কর, তোমার যে একমাত্র সহজ ব্যক্তি-চেতনা ব্যতীত আর যাহা কিছু সকলই তোমার সংস্কার-বিরোধী—যাহাকে ছাড়িয়া আর কিছুর ভাবনা তোমার সত্যকার

ভাবনা হইতেই পারে না—তাহা যে মিথ্যা, অর্থাৎ তুমি থাকিবে না, তোমার সে অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইবে এ কথা দার্শনিক মাত্রেই স্বীকার করিবে ; কিন্তু তাহার স্থানে একটি অতি বিশুদ্ধ অস্তিত্ব, নামগোত্রহীন সত্তার আশ্বাসে তোমাকে আশ্বস্ত হইতে হইবে—ইহারই নাম আস্তিকতা। যাহারা নাস্তিক্যবাদী তাহাদের মতের সঙ্গে এই মতের বিশেষ পার্থক্য নাই—যাহা কিছু পার্থক্য, সে কেবল চিন্তাপ্রণালীর সূক্ষ্ম কৌশল-ভেদ। ইহাদের নিকট মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই দেখিবে ইহারা সহজভাবে তাহার উত্তর দিবে না—যেন প্রশ্নটা নিতান্তই স্থূল। তার কারণ, তাহারাও মৃত্যুকে দেখিবার সাহস করে না, প্রাণের অনুভূতিকে জ্ঞানের দ্বারা রোধ করিয়া মনস্বিতার নামে অন্যমনস্ক হইতে চায়। আসল কথা, তাহারাও মানুষ—জীবধর্ম্মী ; মৃত্যুর স্বরূপ-চিন্তা তাহাদেরও সংস্কার-বিরোধী।

* * *

মনে কর, কোনও বড় কর্ম্মী বা জ্ঞান-বীরের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। মৃত্যুর আক্রমণে দেহ বিবশ, মুহুর্মুহু আক্ষেপ হইতেছে—মুখ বিবর্ণ ও বিকৃত, চেতনা আচ্ছন্ন; চক্ষুতারকা দৃষ্টিহীন। সে সময়ে সে ব্যক্তির মহত্ত্ব, তার কীর্ত্তি বা তপস্যা-গৌরব স্মরণ করিয়া তার সেই মৃত্যুমলিন দীন কাতর মূর্ত্তির প্রতি করুণা অনুভব না করিয়া পারো? ভালো করিয়া তার সেই মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট নিশ্বাস, দেহের সেই অন্তিম মিনতি-পূর্ণ আবেদন যদি বুঝিয়া থাক, তবে মহান আত্মা বা মহতী কীর্ত্তির এই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নিরীক্ষণ করিয়া এই মনে করিয়া আশ্বস্ত হইবে না যে, যে ব্যক্তির জীবন ধন্য হইয়াছে তাহার মৃত্যু মৃত্যুই নয়। বরং, মনে হইবে, ঐ ব্যক্তি সর্ব্বজীবের মতই আজ মৃত্যুর অধীন হইল—এ মুহূর্ত্তে তার নিজের পক্ষে সর্ব্ব কীর্ত্তি সর্ব্ব গৌরব বৃথা;

তার কীর্ত্তির জন্য জীবিতেরা জয়ধ্বনি করিবে, কারণ সে কীর্ত্তির উত্তরাধিকারী তাহারা; কিন্তু ঐ যে প্রাণ-বুদ্বুদ অসীম শূন্যে বিলীন হইতেছে, উহার রহিল কি? নশ্বরতার হাত হইতে কোন্ কীর্ত্তি তাহাকে রক্ষা করিবে? সকল মিথ্যা অভিমান মনোগত সংস্কার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুর পানে চাহিয়া দেখ—তাহার মরজীবনের চরম লাঞ্ছনা, তাহার ক্ষণ-অস্তিত্বের চির-অবসান—নিয়তির নির্ম্মম অট্টহাস চাক্ষুষ করিতে পারিবে। জীবনের চেয়ে বড় কি আছে?—সেই জীবন হইতে বঞ্চিত হওয়ার যে নিদারুণ নিঃস্বতা তাহা কি ওই ব্যক্তির পক্ষে সত্য নয়? সে কি কাহারও চেয়ে কম হতভাগ্য? মৃত্যুর আঘাতে তার মুখ কি কালিমালিপ্ত হয় নাই—তাহার মহাপ্রাণী কি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাঁচিবার চেষ্টা করিবে না? চাহিয়া দেখ—মহামনীষী মহাপুরুষ বা মহাবীরের মৃত্যুও মৃত্যু, তাহার সেই মৃত্যুকালীন মুখচ্ছবি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে, মৃত্যুই চরম অভিশাপ, কোনও কীর্ত্তি কোনও গৌরব সে ক্ষতি পূরণ করিতে পারে না—যাইবার সময়ে তাহাকেও ভিখারীর মত যাইতে হইবে।

* * *

মৃত্যুকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতে হয়—মস্তিষ্কের সাহায্যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নয়। যার প্রেম যত বড়, যার হৃদয়-বৃত্তি যত গভীর সেই মৃত্যুকে তত সুস্পষ্ট দেখিতে পায়; সে সহজেই আত্ম-সংস্কার বিসর্জ্জন দিতে পারে বলিয়াই মৃত্যু তাহাকে ফাঁকি দিতে পারে না। মহাপ্রেমিক নহিলে নাস্তিক হইতে পারে না। মৃত্যু যে কত বড় পরিসমাপ্তি, কত বড় শূন্য, তাহা আত্মাভিমানী জ্ঞানী বুঝিবে কেমন করিয়া? যে আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে না, যে নিজে মরিতে ভয় পায়, সে আপনার জন্য একটা অবিনশ্বরতার স্বপ্ন

দেখে—যেমন অর্থেই হোক, একটা অস্তিত্বের অভিমান সে শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া থাকিবে। তাই, যে গেল সে যে একেবারেই গেল, এমন বিশ্বাস সে প্রাণ থাকিতে করিবে না। কিন্তু যে পরের মৃত্যুতে আপনার ভাবনা না ভাবিয়া পরের ভাবনাই ভাবে; যে মরিল তাহার আত্যন্তিক অভাব অনুভব করার পক্ষে যাহার নিজ পরিণাম-ভাবনা বাধা হইতে পারে না, সেই অন্তরের অন্তরে বুঝিতে পারে মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না—কারণ সে যে মৃত প্রিয়জনের সম্পর্কে সত্যকেই চায়, মিথ্যা দিয়া সে অভাব পূরণ করিতে তার হৃদয় একান্ত বিমুখ। এজন্য প্রেমই মানুষকে মৃত্যুর স্বরূপ দেখায়, প্রেমিক ভিন্ন আর কেহ নাস্তিক হইতে পারে না। জগতের আদি মহাপ্রেমিক বুদ্ধ-ভগবান এই জন্যই নাস্তিক ছিলেন; তিনি আত্মার গল্পে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—তিনি মৃত্যুকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই জন্মস্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য নির্ব্বাণ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

* * *

মৃত্যু-দর্শন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা তত্ত্বালোচনা বা চিন্তাবিলাস নয়। মৃত্যুর তত্ত্বালোচনা করিতে হইলে সমগ্র মানব-চিন্তার ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিতে হয়; তাহাতেও মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও সংশয়-রহিত জ্ঞান লাভ হইবে না। তাহার প্রমাণ, মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা এ পর্য্যন্ত সমান রহিয়াছে। যত যুক্তি, যত পাণ্ডিত্য, যত সূক্ষ্ম দার্শনিক তর্করীতিই এ বিষয়ে নিয়োজিত কর, কিছুতেই কিছু হইবে না। এই মহা রহস্য-নিকেতনের দ্বারে স্বয়ং মহাকাল ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কোনও জিজ্ঞাসার অবসর সেখানে নাই। সে উপায় নাই বলিয়া মানুষ দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিয়াছে, অর্থাৎ এক-তরফা আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে; মহাকাল তেমনই নীরব। যে

কলস শূন্য তাহাকে উল্টাইয়া নিঃশেষ করা যেমন অসম্ভব, তেমনই যে তত্ত্ব মূলেই নাস্তি, তাহার সন্ধান শেষ হইতে পারে না। তাই, সন্ধানের বস্তুটার চেয়ে সন্ধানের নেশাটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে; তার কারণ সত্য মানেই ধ্বংস, প্রলয়, শেষ,—নেশাই জীবন। এ নেশা ভাঙ্গিতে চাহিবে কে? অর্থোপার্জ্জন যেমন নেশা, ধর্ম্মোপার্জ্জন যেমন নেশা, বিদ্যা-উপার্জ্জন তত্ত্ব চর্চ্চাও সেইরূপ নেশা। যে সত্যের পিছনে মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া ছুটিতেছে তাহাকে পাইতে হইলে সকল নেশা ত্যাগ করিতে হয়; চক্ষুর দৃষ্টি—দূরে নয়—নিকটে সংলগ্ন করিতে হয়; জ্ঞানের অভিমান নয়, প্রাণের ঐকান্তিকতা অর্জ্জন করিতে হয়। যাহাকে শিকার করিয়া ধরিতে চাও সে শিকারের বস্তু নয়, জ্ঞান-বুদ্ধির নিশিত শরও তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না; সে ধরা দেয় স্বেচ্ছায় —সে বাস করে হৃদয়ের অতি সন্নিকটে। সমস্যার সে গ্রন্থি অতি সরল, তাহাকে খুলিতে হইলে অতি লঘুস্পর্শ অঙ্গুলির চকিত প্রয়োগই যথেষ্ট, বল প্রয়োগ করিলেই সে বন্ধন বজ্রকঠিন হইয়া উঠে। মৃত্যু আমাদের প্রাণের অতি সন্নিকটে বাস করিতেছে, তাহাকে আমরা অহরহ দেখিতেছি তথাপি তাহাকে চিনি না কেন? চিনিলে যে আমাদের নেশা ছুটিয়া যায়। আমরা গ্রন্থির উপর গ্রন্থি বাঁধিয়া নেশা বজায় রাখিয়াছি, পাছে সকল রহস্যের মূল এই মৃত্যু অতি সরল হইয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে—তৎক্ষণাৎ সকল আশা সকল সংশয় ছুটিয়া যায়। যাহা চরম সত্য তাহা পরম সরল—যাহা যত জটিল তাহা ততই মিথ্যা। জগতে যেখানে যে সত্যকে লাভ করিয়াছে সে এইরূপ সরল অকুতোভয় দৃষ্টির সাহায্যেই তাহাকে লাভ করিয়াছে—তাহাতে তর্ক নাই, চিন্তা-বিলাস বা যুক্তি-তর্কের আস্ফালন নাই। মৃত্যু সম্বন্ধে যে সত্য, তাহাকেও তেমনই ভাবে

লাভ করা যায়—অন্য উপায় নাই। সে সত্য প্রবেশ করে হৃদয়ে, অথচ হৃদয়কেই বিদীর্ণ করে। যখন সেই মহাসত্য হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন শোক করিতে গিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হয়—কোনও অজুহাত কোনও আশ্রয় পায় না; উচ্ছ্বসিত রোদন যখন সেই মহাশূন্যের অট্টহাস্যে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, তখন মনে হয়, এ সত্যের সাক্ষাৎকারে কতখানি শক্তির প্রয়োজন। যে নিমেষে মিথ্যার মোহপাশ মোচন করিয়াছে তার শাস্তি কি ভীষণ! তাই মৃত্যু-দর্শনের কথা যাহা লিখিয়াছি, তাহা মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়; মৃত্যু যত বড় অভিশাপ, মৃত্যু-দর্শন তার চেয়ে অনেক বেশী। মানুষ ধর্ম্মবিশ্বাস অথবা দার্শনিক চিন্তা-বিলাস লইয়াই থাকুক—মৃত্যুর সত্যকে উপলব্ধি করার মত দুর্ভাগ্য যেন কাহারও না হয়।

চেটে দিয়ে গেল আরসোলায়

দুনিয়াতে চলা এত কঠিন,
চাই ষ্টার্চ আর চাই প্রোটিন;
ভাইটামিনও দুশো প্রকার!
ষ্টোভ ধরাইতে চাই পোকার,
ছবি টাঙাইতে চাহি পেরেক—
সরিষার তেল সের দেড়েক
মাসে, দুধ রোজ সের আড়াই;
প্রস্থ হলেই চাই খাড়াই!

খাড়া করাটাই মুস্কিলের—
বাড়ে যে সংখ্যা ছেলেপিলের,
উদরে তাদের বাড়বানল—
তবু তারা নাহি দেয় আমল—
বলে, জানো বাবা, গকি কে ?
যদি তারা সাবু হলিকে
না হ'ত মানুষ—করিত কি—
খাইয়ে ছাড়িত হরিতকী !
আরো কত আছে ঘোর বিপদ
জানে মাই-খাওয়া সব দ্বিপদ !
এসব সত্ত্বে আছি বেঁচে।
কভু পাকি কভু যাই কেঁচে
কখনও মরমে থাকি মরে—
দিন যায় আর রাত ঘোরে !
অনেক কষ্টে পথ চলি
সদর সড়ক, অলি গলি—
কাঁটা কাদা, কদলীর খোসা,
ছারপোকা আর মাছি মশা
সকলই বাঁচিয়ে চলিতে হয়—
বেঁচে আছি আশ্চর্য্য, নয় ?
সমাজে রয়েছে পংক্তি ভাগ—
কুমড়ো ইক্ষু অথবা ছাগ
বলি খুসীমত চলে না ক—
ব্রাহ্মণে পুরোহিতে ডাক।

বিবাহে কুলীন ভঙ্গ মেল
না মেনে চলিলে সমাজ-জেল !

রাষ্ট্রে রয়েছে অর্ডিন্যেন্স
টাকা আনা পাই পাউণ্ড পেন্স—
সন্ধ্যার পরে বুতাও বাতি
সাহেব দেখিলে বন্ধ ছাতি—
বাংলাদেশের গজনবী
আগে তিনি পরে রবি কবি !
ফেজী বাবুদের তের আনা
ভোগ পূরা হ'লে পাবে খানা ।
আরো কত আছে গণ্ডগোল
আগে মাদ্রাসা পরেতে টোল !

এসকল তবু সহাও যায়—
বাগীশ্বরীতে শ্রীরবি হায়
টীকা দিল সুরাবর্দ্দীকে
এ রোগের বল বদ্যি কে ?
পীর আর আলি করে শাসন—
বিশ্ব-কবির অভিভাষণ
পড়ে দেখ, তিনি বাগ্‌দাদে
দাড়ি নাড়িলেন মন-সাধে !

এদিকে বাংলা সাহিত্যে—
মেলি কফ বায়ু ও পিত্তে

বিষম কাণ্ড করিছে যে
ভাষা ও ছন্দে ভেজে ভেজে।
প্রবোধচন্দ্র ক্ষেপিয়া খুন—
বুদ্ধদেবের মদনাগুণ—
নয়গুণ হ'ল গল্পতে,
সুখ ভূমাতে না অল্পতে।
অচিন্ত্য লেখে একমাসে
আটাশ গল্প—এক বাঁশে
আকাশ পিদিম যেন আটাশ,
সাহিত্য যেন মূলোরই চাষ!

স্বর্গ নেমেছে পরিচয়ে;
দেখ্‌ছি অতীব ভয়ে ভয়ে
এলিয়ট প্রুস্ত হাক্সলিরা
দই মেখে যেন খায় চিঁড়া!
লরেন্স শ্রীগল্‌সওয়ার্দ্দিও—
বলে, দু আঁচলা মুড়ি দিও।

আসলে এসব কিছুই নয়—
ব্যাঙের ছাতার হতেছে জয়;
গজে মারে লাথি শ্রীকোলা ব্যাঙ,
মাথা ভুঁয়ে থোয় উপরে ঠ্যাঙ।
ঠাকুর পূজার প্রসাদ হায়—
চেটে দিয়ে গেল আরসোলায়।

রামতনু রেস

নেকে জিতে গেল খোলন্দাজ,
গলে নেকটাই, নয়নে লাজ
খোলে চাঁটি মেরে দিল বিদায় :—
বঙ্গবাণী : আসরে, হায়
মোসাহেবদেরই পোয়া বারো—
সেই বড় যার তেল গাঢ়।

রামতনু হাফ-আখড়াই

চেহারা না মিললেও তিনি

তিনি। আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে নিয়ে এই ইত্যাদি—

এনারা। আজি সব ভাষা সব বাক্ নীরব হইয়া যাক ইত্যাদি—

পাঁচ হাজারী মনসবদার

—চিত্রাঙ্গদা আজ থাক স্যার, 'দুই আর দুইয়ে চার'
আর 'ছিনিমিনি'র একটা তুলনামূলক—
—ও দুটোই 'শেষের কবিতা'র চুরি !

এবার ফিরাও মোরে

অন্ন চাই, আলো চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু।

ঢোঁড়া সাপের গরহজম
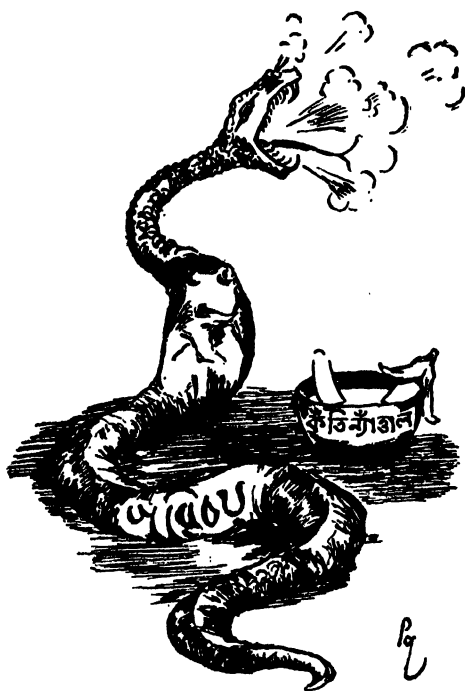
পেটের ভেতর কট্‌কটে ব্যাঙ, সাম্‌নে দুধকলা,
ঢোঁড়া ভাবে, উগ্‌রে তোলাই 'কাল্‌চার' নির্জ্জলা !

প্রসঙ্গ-কথা

আজকাল প্রায় মাসে মাসে, এমন কি সপ্তাহে, একটি করিয়া ছোট-বড় জয়ন্তী-উৎসব সম্পন্ন হইতেছে—আজ যতীন্দ্র-দিবস, কাল প্রেমেন্দ্র-সন্ধ্যা, আজ জলধর-নিশিপালন, কাল শরৎ-চতুর্দ্দশী—তাহাতে পঞ্জিকার পর্ব্বদিন বাড়িয়া গিয়াছে। এখনও কত বাকি! কারণ, যাহারা গঙ্গামুখো, কেবল তাহাদেরই চান্দ্রায়ণ নয়, যাহারা এখনও আঁতুড় ঘরে—তাহাদেরো সাহিত্যিক 'ষেটেরা'-পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। এরূপ আবালবৃদ্ধের সাহিত্যিক তর্পণ দেখিয়া মনে হয়, এত দিনে আমাদের বুদ্ধি ফিরিয়াছে—কালকে কলা দেখাইবার একটা উপায় করিয়া লইয়াছি। যাহাদের মৃত্যু আসন্ন এবং যাহারা স্বল্পায়ু, এই উভয়বিধ সাহিত্যিকের জন্ম দিন থাকিতে স্বস্ত্যয়ন সারিয়া লইতেছি, না লইলে বেচারীদের যে আর গতি নাই; মরিবার পরে অমর হওয়ার কথায় আমরা আর বিশ্বাস করি না—কেন যে, সে কথা অন্তরাত্মাই জানে। তাই চট্‌পট্ যাহা-কিছু আদায়-বিদায় শেষ করাই ভালো। মতলবটা মন্দ নয়। রবীন্দ্রনাথও যে লোভ সামলাইতে পারিলেন না,—যে ভয়ে তিনিও অস্থির, সে ভয় সে লোভ কার না হয়? তাই সোণার পুঁথি না হইয়া যদি রূপার কলমই হয়, এমন কি এক জোড়া পুরানো চটিও যদি হয়—তাই সই—তাহাতেই আহ্লাদে গদ্‌গদ। এ যেন শিশুর অন্নপ্রাশন, একবার মামা-ভাত খাওয়ান চাই-ই, নহিলে পাড়াপড়শীরা বলিবে কি? বাংলা সাহিত্যের 'দ্বিতীয় শৈশব' উপস্থিত, ছেলেবুড়া মিলিয়া পরস্পরের অন্নপ্রাশন-উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

* * *

লজ্জা কাহারও নাই—ক্যাঙলা হ্যাংলার দলেই দেশটা ভরিয়া উঠিয়াছে। দিন-কাল, সঙ্গতি বা শোভনতার ভাবনাই নাই; এই যে জয়ন্তীর তামাসা আরম্ভ হইয়াছে, এ হুজুগে শেষ পর্য্যন্ত কতগুলি এইরূপ কুচো-জয়ন্তী হইবে, তাহা অনুমান করা দুরূহ নহে। এ দেশে মৃত্যুর পর স্মৃতিবার্ষিকী হয় না, এবং হইবে না জানে বলিয়া—যে মরিয়া যায় তার সঙ্গে কোন স্বার্থ-সম্পর্ক বা mutual admiration. এর সম্বন্ধ সম্ভব নয় বলিয়াই—এই যশ-কাঙালীরা সময় থাকিতে পরস্পরের নিকট পাওনা আদায় করিয়া লয়। এ পাওনা নগদ—ধারে কারবার যে চলে না! এই সব জয়ন্তীতে যাহারা উপস্থিত হয়, যাহারা ইহার উদ্যোগ করে, তাহারা সকলেই কাঙালী—আজ যাহাকে ভিক্ষা দেয়, কাল আবার তাহারি দুয়ারে ঝুলি হস্তে দাঁড়ায়; আজ যেমন রাম শ্যামের সম্বর্দ্ধনায় সভাপতি, কাল তেমনই শ্যাম রামের সম্বর্দ্ধনায় সভাপতি। রামের দল শ্যামকে আপ্যায়িত করিলে, শ্যামের দলও রামকে আপ্যায়িত করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা স্বাভাবিক। এইরূপ কাঙালীপনা হইতে একটা সামাজিক বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি হয়,—সাহিত্যের নামে এক নূতন ধরণের সামাজিকতার আদান-প্রদান চলিতে থাকে। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র এক্ষণে এইরূপ সামাজিকতার আসরে পরিণত হইয়াছে। ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তিগত কারণে মিষ্টভাষণ ও শিষ্টাচার—ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়াই দলগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহার কোনটিই জাতীয় অনুষ্ঠান নহে, এমন কি সাম্প্রদায়িকও নহে। সাহিত্যসমাজ বা সাহিত্যিক সম্প্রদায় বলিয়া বাংলাদেশে কিছু নাই—সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও জনমত বা আদর্শের বন্ধন নাই, সাধারণের কোন গরজ বা শ্রদ্ধা নাই। এ সমাজে শুধু adult franchise কেন, অপোগণ্ড-franchiseও বিধি-বিরুদ্ধ নয়। অতএব এই যে সকল

তামাসা আজকাল সাহিত্যের দোহাই দিয়া চলিতেছে, তাহার ভিতরে কিছুই নাই—ইহাতে যাহারা উপস্থিত হয় তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঐ সাহিত্যিকের বন্ধু বা বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধে সম্বন্ধী,—সামাজিকতার খাতিরে, অথবা কোনও কারণে—চক্ষুলজ্জার খাতিরে—এইরূপ অন্নপ্রাশন-উৎসবে তাহারা উপস্থিত হয়; বাকি যাহারা তাহারা তামাসা-দর্শনার্থী,—অথবা, এবম্বিধ কর্ম্মে মোড়লী করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়।

*　　　*　　　*

সাহিত্যিকের সম্মান করিতে হইলে সাহিত্যের সম্মান জানা চাই। যে দেশের শিক্ষিত সমাজ সাহিত্যের প্রতি উদাসীন; যে-দেশে সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদন করিয়া থাকে পুস্তক ব্যবসায়ী অথবা মুদ্রাযন্ত্রাধিকারী; যে-দেশে এ পর্য্যন্ত একটা উপযুক্ত সাহিত্য-প্রকাশক দেখা দিল না; যে-দেশে সাহিত্যের কারবার শাক-বেগুন-বেচার মত, অথবা রথতলায় পাঁপর-ভাজার দোকানের মত;—সে দেশে সাহিত্যের আদর্শ এবং সাহিত্যের মর্য্যাদা যে কিরূপ হইতে পারে তাহা কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির অগোচর নহে। এ দেশে সাহিত্যিক বলিতে পুস্তকবিক্রেতার অনুগৃহীত জীব-বিশেষ মাত্রকেই বুঝায়; এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায়—যার না আছে সাহিত্যিক ধর্ম্মজ্ঞান, না আছে আত্মসম্মান বোধ—কারণ এই দুইটি গুণ থাকিলে তাহার গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া দুর্ঘট; এবং প্রকাশিত হইলেও, যে অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজ এ দেশে সাহিত্যের খরিদ্দার, তাহাদের মধ্যে সে গ্রন্থের চল হইবে না। অতএব বাংলাদেশে লোকপ্রিয় সাহিত্যিক কিরূপ সাহিত্যের সেবক, এবং সেরূপ সাহিত্যিককে যাহারা সম্মান করে তাহাদের সাহিত্য-প্রেম কি বস্তু,

তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এ দেশে, এ কালে মাসে মাসে সপ্তাহে সপ্তাহে যে সাহিত্যিক-সম্বর্দ্ধনা হইতেছে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই—এখানে ছোট-সাহিত্যিক কেহ নাই, সকলেই বড় সাহিত্যিক, কাজেই সম্বর্দ্ধনার উপযুক্ত সাহিত্যিক এখানে প্রত্যহ একটি করিয়া মিলিতে পারে।

* * *

এ সমাজে জ্যাঠা ছোকরাদের কাণ মলিয়া দিবার মত সাহস কাহারও নাই, পাছে সম্বর্দ্ধনার সময় তাহারা গোলমাল করে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সেই কারণে অতি সাবধানে বাক্যস্ফূর্ত্তি করেন। এ দেশ চির কালই 'চাচা আপন বাঁচা'র দেশ। যাহা মিথ্যা ও কুৎসিত, তাহাকে তিরস্কার করিবার মত সাহস যে সমাজে কাহারও নাই, সে সমাজে সাহিত্যের মত বস্তুর সম্মান হইবে? সে সমাজ সাহিত্যের মর্য্যাদা বুঝিবে? সেই সমাজের পূজা পাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাজসজ্জা করিয়া সভাস্থলে আবির্ভূত হন, গদ্‌গদ কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন—এ অভিনয় করিতে প্রবৃত্তি হয়! সেই সমাজের হাতে জয়মাল্য লাভ করিবার জন্য শরৎচন্দ্র গরদের জোড় পরিয়া, মাল্য-চন্দন ধারণ করিয়া, বাসরঘরের বরটির মত আসন গ্রহণ করেন। কি দীনতা—কি ভিখারী-পনা! যে সাহিত্যিক হইয়া সাহিত্যের সম্মান চায় না, চায় নিজের সম্মান, তার সম্মান কোথায় হইবে? কোন্ আঁস্তাকুড়ে তাঁহার চতুর্দ্দোল আসিয়া ঠেকিবে? যে শরৎচন্দ্র এককালে সাহিত্য-রচনা করিয়াছিলেন—শ্রীকান্ত, পল্লীসমাজ লিখিয়াছিলেন, এ শরৎচন্দ্র সে শরৎচন্দ্র নয়। আজ বাংলাদেশে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের যে মূর্ত্তিবিকাশ হইয়াছে, তাহাতে যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, সেই কদাচারের মধ্যে নিজ পূজার আয়োজন দেখিয়া উল্লসিত হয়, সে কি আর সম্মান বা সম্বর্দ্ধনার

যোগ্য? ইহারা সাহিত্যকে বিদায় দিয়াছে—যশ ও অর্থ দুইই যখন লাভ করা গিয়াছে, তখন পরমহংস হওয়াই স্বাভাবিক—এখন চন্দন-বিষ্ঠায় সমজ্ঞান, তাই সাহিত্যের সত্য অপেক্ষা নিজের সম্মান অধিকতর উপাদেয় হইয়াছে।

* * *

এই যে সমাজ, এখানে সত্যের মর্য্যাদা আছে? সাহিত্য করিবে ইহারা? ইহারা সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করে?—করিতে পারা সম্ভব? যেখানে জাতীয় চরিত্রের এতখানি অবনতি হইয়াছে, সেখানে সাহিত্যের মত একটা অতি সূক্ষ্ম, সুকুমার, সাংসারিক প্রয়োজনাতীত, কাঞ্চনমূল্যহীন মানস-কর্ম্মের গৌরব কোথায়? সাহিত্যের সত্যকার নখ-দন্ত নাই, তাহাকে ভয় করিবার কি আছে? অতএব ভক্তি করিবে কেন! এ সমাজে ভক্তির পাত্র সে-ই, যে গলা টিপিতে পারে। ভয় নাই বলিয়াই সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও ভাবনাও নাই, প্রয়োজন বশে, সাহিত্যের মাথায় পদাঘাত করিলেও কোনও ক্ষতি হয় না—সাহিত্যিক যাহারা তাহারাই সব চেয়ে দুর্ব্বল—তাহাদের কথা মানে কে?

* * *

বাংলাসাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা কতটুকু তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অবস্থা কাহারও অজ্ঞাত নহে—কি করিয়া যে এই প্রতিষ্ঠানটি কোনও রূপে বাঁচিয়া আছে, এবং ইহার ব্রত কি ভাবে কত টুকু সম্পন্ন হইতেছে, এবং তাহার কারণ কি, একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না—বাঙ্গালীর প্রাণে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি বা কল্যাণকামনার স্থান কতখানি। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির চিরমুমূর্ষু অবস্থার কারণ

কেবল সাহিত্যের প্রতি ঔদাসীন্যই নয়—এ জাতির চরিত্রগত ক্ষুদ্রতাও তাহার জন্য দায়ী। আমরা সার্ব্বজনিক কর্ম্মেও ব্যক্তিগত অভিমান, ঈর্ষ্যা, দলাদলি কখনও ত্যাগ করিতে পারি না; দেশের ও দশের সেবায় যাহা গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাতেও ব্যক্তিগত ক্ষমতালাভের নেশা, পৈতৃক বিষয়ে স্বত্বাধিকার বজায় রাখার মত স্বার্থ-রক্ষার চেষ্টা, দমন করিতে পারি না—তাহার ফলে এইরূপ সকল প্রতিষ্ঠানই কয়েকজন ব্যক্তিমাত্রের জমিদারী হইয়া দাঁড়ায়—বাহিরের কেহ তাহার সহিত কোনওরূপ আত্মীয়তা বোধ করেন না? উপায় কি? এ জাতির স্বভাবই এই যে—ব্যক্তিগত ক্ষমতা বা স্বার্থ-বোধ ব্যতিরেকে ইহারা কোনও কার্য্যে সত্যকার আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত নহে; যাঁহারা কাজ করিবেন তাঁহাদের এই মনোভাব একান্ত প্রয়োজন, নতুবা ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার প্রবৃত্তি এই অতি-চতুর জাতির পক্ষে অসম্ভব। এজন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রতিষ্ঠানেই দেখা যাইবে যে, সেই সকলের পরিচালনায় এইরূপ ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসাধনের তুলনায় কোনওরূপ সার্ব্বজনিক হিতসাধন অবান্তর হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ আত্মকর্ত্তৃত্বস্থাপনই পরম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়—তাহার ফলে, একজন শক্তিমান ব্যক্তির নিগ্রহানুগ্রহ-সামর্থ্যের প্রভাবে প্রতিষ্ঠানটি ধর্ম্মহীন, ভীরু, লোভী, তোষামোদ-মাত্র-সম্বল ব্যক্তিগণের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়ায়। জাতীয় চরিত্রের এই লক্ষণ, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না; এ লক্ষণ আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে আজিকার এই ভীষণ অন্নাভাবের দিনে—মানুষের মনুষ্যত্ব আর কোথাও নাই; বিদ্বান বুদ্ধিমান বয়স্ক ব্যক্তিগণ ইহাকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়াছেন। দিকে দিকে আমরা ইহার যে পরিচয় পাইতেছি—যাঁহারা কুলে শীলে ধনে মানে

বিদ্যায় সমাজের শীর্ষস্থানীয় তাহাদের মধ্যেও এই প্রবৃত্তি যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এ জাতির পরিণাম চিন্তা করিয়া সুগভীর নৈরাশ্যে অভিভূত হইতে হয়।

*　　　*　　　*

এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ দিব। তাহাতে আমার দুইটি অভিযোগই পূর্ণ প্রমাণিত হইবে—আমরা জাতীয় চরিত্র হিসাবে কোথায় নামিয়াছি; বাংলা সাহিত্যের প্রতি বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা কতটুকু। সম্প্রতি কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির বাংলা অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। এই অধ্যাপক-নিয়োগের ব্যাপারে কিছুকাল যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল চাল চালিতেছিলেন, তাহার সবটা না হোক—কিছুটা সাধারণের অজ্ঞাত নহে। কে বা কাহাদের কূট অভিসন্ধির ফলে এত বড় একটা কুৎসিৎ নির্লজ্জ স্বেচ্ছাচার শেষ পর্য্যন্ত জয়যুক্ত হইল তাহাও একেবারে গোপন নাই। রায় বাহাদুর দীনেশের পরে ঐ পদে রায়বাহাদুর মিত্রকে নিযুক্ত করা হইবে, ওই পদটি যে তাঁহারই জন্য চিহ্নিত হইয়া আছে, ইহাও প্রথম হইতে শহরবাসী অনেকেই জানিতেন। কিন্তু কেমন করিয়া এতগুলি যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-অধ্যাপনার সর্ব্বোচ্চ-পদ, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সহিত প্রায় সম্পর্ক-বর্জ্জিত এই ব্যক্তিটিকে দেওয়া হইতে পারে, তিনি ঐ পদের প্রার্থী হইয়াছিলেন কোন মুখে, কিসের ভরসায়—সে সম্বন্ধে কেহ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিস্ময় বা সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে, তথা জাতীয় প্রতিষ্ঠান মাত্রেই, ন্যায় ও ধর্ম্মনীতি, এবং অপক্ষপাত সুবিচারের কতটুকু অবকাশ আছে তাহা সাধারণ বুদ্ধিমান দেশবাসীর অবিদিত নহে—সেজন্য এসকল ব্যাপারে কেহ বিস্মিত হয় না। সমগ্র

জাতিই যে কতখানি demoralised হইয়াছে, ন্যায় বা সুবিচার সম্বন্ধে তাহারা যে কতখানি উদাসীন—জনমত বলিয়া কোনও শক্তির সাড়া পর্য্যন্ত এদেশে যে আর নাই—তাহার প্রমাণ সম্প্রতি এমন ভাবে আর কোনও ব্যাপারে প্রকট হয় নাই। সংবাদপত্রে কোনও সমালোচনা বা প্রতিবাদের সম্ভাবনা মাত্র নাই। অথচ, এমন শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি এই ঘটনার মধ্যে যে নির্লজ্জ কদাচার প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বিচলিত হন নাই। ব্যাপারটা যাঁহারা ভালোরূপ অবগত নহেন তাঁহাদের জন্য, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সবিশেষ উল্লেখ করিব।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে স্থান দিয়া স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নাকি বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন—এই কথা আমরা যখন তখন বলিয়া থাকি; যাঁহারা ভিতরের খবর জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, ইহাতে বাংলাভাষা বা সাহিত্যের বিশেষ কোনও উপকার হয় নাই; কারণ এপর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-অধ্যাপনার যে ব্যবস্থা, পাঠ্য-নির্ব্বাচন প্রণালী, পরীক্ষার আদর্শ ও রীতি যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে ইহাই প্রতীতি হয়, যে এ বিভাগ বাংলাশিক্ষার উন্নতির জন্য নয়—একজন ব্যক্তির উদর-ভরণ ও কদর-বৃদ্ধির জন্য। এই ব্যক্তিটির শাসনে বাংলাবিভাগে এপর্য্যন্ত কোনও যোগ্য ব্যক্তির স্থান হয় নাই, সাহিত্যের গবেষণা ও অন্যান্য কর্ম্মে কোনও সত্যকার গুণী ব্যক্তির অভ্যুদয় হয় নাই—যত কিছু গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ছেলে-ভুলানো ব্যাপার। ছাত্রেরা যে কিরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহারা যে কিরূপ বিদ্যার জোরে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, ছাত্রেরাই তাহার প্রমাণ। এজন্য 'বাংলার এম-এ উপাধিলাভ

শিক্ষিত সমাজে একটা অবজ্ঞার বিষয় হইয়া আছে। পরীক্ষণীয় বিষয়গুলি ও পাঠ্যসমূহের তালিকা দেখিলে সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহার কারণ বুঝিতে পারিবেন। ম্যাট্রিকুলেশন হইতে বি-এ পর্য্যন্ত যে-সকল পাঠ্য নির্দ্ধারিত আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলির যেরূপ সম্পাদন-সৌকর্য্য—এমন কি সেগুলির মুদ্রণ-সৌষ্ঠব পর্য্যন্ত যেরূপ যত্নের পরিচায়ক—তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা যে কি শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছে, তাহা চাক্ষুষ করা যায়। কিন্তু ইহার কোনও রূপ প্রতিকার এ পর্য্যন্ত হয় নাই, এবং হইবার আশাও নাই। স্বর্গীয় আশুবাবু এই ভাবেই বাংলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। এ বিভাগে তিনি যে বাদশাহটিকে, তাঁহার খড়ম দুখানি মাথায় দিয়া, বসাইয়াছিলেন, তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাবে, বাংলা অধ্যাপনার যে আদর্শ দাঁড়াইয়াছে—বাংলা সাহিত্যের যে নিকৃষ্ট রূপ পাঠপদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, তাহাতে আশুবাবুর প্রতি বাংলা সাহিত্যসেবী কাহারও কৃতজ্ঞ হইবার কারণ নাই ; বরং তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জিদ ও আত্মম্ভরিতার বশে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অনাচার, nepotism, jobbery এবং দলাদলির কূটনীতিকে স্থায়ী করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেবলমাত্র বাংলার জন্য নহে, বাঙালীর এই সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাপীঠস্থানে যে দূষিত বায়ু বাঙ্গালীর শিক্ষাকে পর্য্যন্ত অধঃপতিত করিয়াছে, তার জন্যও তিনি জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন নহেন। এ কথা বিমূঢ় বাঙ্গালী একদিন বুঝিবে ; আজ এ কথা ভাল লাগবে না ; কিন্তু একদিন সত্য প্রকাশ পাইবে—যখন বাঙালী মানুষ হইবে, যখন ব্যক্তি-পূজার মোহ-পাশমুক্ত হইয়া আত্মমর্য্যাদাবোধ ও সার্ব্বজনিক কল্যাণ-কামনায় সে সকল মিথ্যাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে।

* * *

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার স্থান কোথায়, তাহার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাবোধ কতখানি—তার সম্বন্ধে তাহার ধর্ম্মজ্ঞান কতটুকু, তার আভাস উপরে দিয়াছি। এক্ষণে খগেন্দ্র মিত্রকে অধ্যাপকপদে নিয়োগ করায় সেই আদর্শ ও সেই নীতি যে আরও প্রকট হইয়াছে—ইহাই প্রণিধান-যোগ্য। কিন্তু এতখানি অনাচার যে সম্ভব হইতে পারে সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—অন্ততঃ, অন্যান্য পদপ্রার্থীদের তুলনায় খগেন্দ্র মিত্র যে কি গুণে উপযুক্ততম বলিয়া বিবেচিত হইবেন—কেমন করিয়া এতখানি নির্ল্লজ্জতা প্রকাশ করিতে বাধিবে না —ইহা অনেকে ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই। কারণ, অন্যান্য পদ-প্রার্থীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যাঁহারা বিভিন্ন শাখায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যেই এমন ব্যক্তি আছেন—যিনি এই খোল-বাজিয়ে কীর্ত্তনীয়ার অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উপযুক্ত! ভাবিয়া দেখুন, এই বাংলা দেশে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবায় যাঁহারা জীবন কাটাইলেন, যাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতি ও কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন—যাঁহাদের নিকট বাংলা সাহিত্য ঋণী, বিষয়-বিশেষে যাঁহাদের পাণ্ডিত্য, রচনা-নৈপুণ্য, ভাষাজ্ঞান অবিসংবাদিত, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বঙ্গ-সরস্বতীর রাজনিকেতনে, তাঁহাদের স্থান কখনও হয় নাই, আজও হইল না। এমন বহুব্যক্তির নাম করা যাইতে পারে (পদপ্রার্থীগণ ছাড়া), সাহিত্য-সেবায় ও সাহিত্যিক প্রতিভায়, যাঁহাদের জুতার ফিতা খুলিবার যোগ্যতাও মিত্রবাহাদুরের নাই। তাঁহাদের কেহ এ পদ প্রত্যাশা করেন নাই, আবেদন করিতে সাহসী হন নাই; তার কারণ দুইটি; প্রথমতঃ, অধ্যাপকপদের জন্য বিশেষ করিয়া যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন—উপাধি-গৌরব, শিক্ষাদানকার্য্যের অভিজ্ঞতা, এবং বৈজ্ঞানিক রীতিতে গবেষণার খ্যাতি—এমন গুণাবলীযুক্ত দুই

একজন ব্যক্তি আছেন, অতএব উক্ত পদ সেই তাঁহাদেরই একজনের প্রাপ্য। দ্বিতীয়তঃ, একথাও তাঁহারা জানিতেন যে, উচ্চপদপ্রার্থী হইতে হইলে আজিকার এই কাঞ্চন-কৌলীন্যের যুগে, কেবল পদোপযোগী গুণাবলী থাকিলেই চলিবে না—পূর্ব্ব হইতেই উচ্চ বেতনভোগী হওয়া চাই। এই জন্যই আবেদনকারীর সংখ্যা এত কম হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যাঁহাকে এই পদে নিয়োগ করিলেন তাহাতে প্রমাণ হইল, পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর প্রয়োজন আদৌ নাই, শেষোক্ত গুণই একমাত্র গুণ—অর্থাৎ বাংলাসাহিত্যের অধ্যাপক হইতে হইলে, যে কোনও অন্য বিদ্যার উপাধি থাকিলেই যথেষ্ট; চাই কেবল রায় বাহাদুর খেতাব, উচ্চপদ, এবং মোটা মাহিনার কৌলীন্য। হায় বাংলা সাহিত্য! হায় বাংলার অধ্যাপনা! হায় বাঙ্গালীর বিশ্ব-বিদ্যালয়! হায় বাঙ্গালীর স্বরাজ!

* * *

বাঙ্গালীর চোখ কবে খুলিবে? বাঙ্গালী কবে মানুষ হইবে? ভাই বাঙ্গালী! এই চরিত্র লইয়া তুমি স্বরাজ কামনা কর? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত ছাড়া আরও অনেক দৃষ্টান্ত চারিদিকে ছড়াইয়া আছে—এ সব তুমি কখনও ভাবিয়া দেখ?—লজ্জা পাও? ঘৃণায় মরিয়া যাও? বিদেশীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার উৎসাহে তুমি কি একেবারে ছন্নমতি হইয়াছ? তোমার জাতীয়তা-প্রচারক সংবাদপত্রগুলি এই সকল ব্যাপারে কোনও কথা কহে না কেন?—কেন, তাহা জানো? সব ছদ্মবেশী স্বার্থ-ভীরুর দল, শক্তিশালী বড়লোকের পদলেহনই তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। অথচ ইহারাই ইংরাজ বুরোক্রেসীর বিরুদ্ধে কি আস্ফালনই করে! এইরূপ প্রচ্ছন্ন শ্ব-বৃত্তিপরায়ণ একখানা ইংরেজী দৈনিক এই অধ্যাপক-নিয়োগের সংবাদে কি মন্তব্য করিয়াছে দেখিয়াছ? লিখিয়াছে—"বিশ্ববিদ্যালয় এই অতিশয় সুকর্ম্মটির জন্য অভিনন্দনীয় হইয়াছেন, ভাল কাজ করিবার বাহাদুরী তাঁহাদের আছে।" আর এক খানা কূটবুদ্ধিশালী ব্যবসায়ী বাংলা দৈনিক লিখিয়াছে—"রায় বাহাদুরের আজীবন বাণীসাধনার এই পুরস্কার লাভে আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি।"—এই দুইখানি পত্রিকারই

প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ বাংলার জনমতের প্রতিনিধি ও নিয়ন্তা ইহারাই। ইহারাই বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে! এই বিমূঢ় জাতির আসল শত্রু যে কোথায়—ভিতরে না বাহিরে, সে কথা সে নিজেই জানে না, ভাবিয়া দেখে না। ধন-তন্ত্র ও গণতন্ত্রে যে কখনও মিল হইতে পারে না—সে ধন-তন্ত্র স্বদেশীই হৌক আর বিদেশীই হৌক, তাহা যে সমান মারাত্মক, বরং ছদ্মবেশী গৃহশত্রুরাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ—একথা এখনও আমরা সম্যক বুঝি নাই। আমাদের দেশপ্রীতির নাম ইংরাজ-বিদ্বেষ; অথচ, এখনও—আজও—ইংরেজের চরিত্রে আমরা যতটা আস্থা স্থাপন করিতে পারি, অন্ততঃ স্থলবিশেষে তাহাদের নিকট অপক্ষপাত ন্যায়-বিচার যেটুকু প্রত্যাশা করিতে পারি—তাহা যে এই সকল স্বদেশীয় শক্তিমান ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংঘের নিকট আশা করিতে পারি না—আমাদের সমাজে, আমাদের জীবনে এ যে কত বড় অভিশাপ, তাহা আমরা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করি; কিন্তু ভুলিয়া থাকিলেই কি যমে ছাড়িবে? ইংরেজ কেহ নয়!—বিধাতার নির্দ্দয় ন্যায়দণ্ড আমাদের উপর উদ্যত হইয়াছে—পাপের ঋণ শোধ করিতেই হইবে।

* * *

যে জাতির যে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা ন্যায়-সত্যের এই অবমাননা নিত্য ঘটিয়া থাকে—সেই অনাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস বা চরিত্রবল যাহাদের নাই, যাহারা ধনী ও শক্তিমানের পদলেহন—কর্ত্তাভজাকেই—একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া জানে, তাহারাই সত্যের নামে, ন্যায়ের নামে বিজাতির নিকট আত্ম-শাসনের অধিকার দাবী করে! এঁটোকুড়ের পাত স্বর্গে যাইতে চায়! আজ, একথা মনে করিয়া লজ্জাবোধ করি, কিন্তু না মনে করিয়া পারি না যে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে যদি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব থাকিত—যদি সেখানে শিক্ষিত ইংরেজের প্রাধান্য থাকিত—তবে বাংলার অধ্যাপক-নিয়োগে এত বড় অনাচার প্রশ্রয় পাইত না; পদপ্রার্থী ব্যক্তিগণের গুণাগুণ বিচারকালে ইংরেজের রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি আর যাহাকেই মনোনীত করুক, তাহার ন্যায়-বুদ্ধি রায়বাহাদুর মিত্রের মত ব্যক্তিকে ঐ পদে নিয়োগ করিতে বিদ্রোহ হইয়া উঠিত। কিন্তু বিশ-

বিদ্যালয়ে আমরা স্বরাজ লাভ করিয়াছি—এবং স্বরাজ লাভ যখন করিয়াছি, তখন ন্যায়-ধর্ম্মের ধার ধারিব কেন? ইংরেজের তুলনায় দেশবাসী কত ভালো! কবির কথায়—আমরা যে বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরকেও মাথায় তুলিয়া লই। ইহাই আমাদের রাজনীতি—ইহাই আমাদের জাতীয়তা! এ জন্য আমরা দুঃখ করি না; কারণ আমাদের মহাপ্রাণীও বুঝিতে পারিয়াছে যে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য—বাঁচিবার মত শক্তি আমাদের নাই। আমরা মরিব—তবে, পরের হাতে মরিতে আমরা চাই না; নিজের বুকে নিজেই ছুরী মারিয়া মরিব।

* * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিয়াই উপস্থিত শেষ করিব। বাগীশ্বরী-অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপার লইয়াও বাহিরে একটা কোলাহল উঠিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়. যেটা তার চেয়েও বাঙ্গালীর পক্ষে ঢের বেশী ক্ষোভের কথা—সে বিষয়ে, অর্থাৎ বাংলার এই অধ্যাপক নিয়োগের সংবাদে, কোথাও বিশেষ সাড়া-শব্দ নাই। ইহা হইতে, বাংলার প্রতি বাঙ্গালীর দরদ কতটুকু, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ অধ্যাপকপদটির প্রতি বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা কতখানি, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। বোধ হয়, কর্ত্তৃপক্ষ ইহা ভালোরূপ জানিতেন বলিয়াই এ সম্পর্কে যাহা-খুসী করিতে কিছুমাত্র ভয় বা দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু বাগীশ্বরী-অধ্যাপকের পদটা আরও গুরুতর—উহা ত শুধুই বাংলার নয়, ভারতীয় হিন্দু কলচার-ঘটিত ব্যাপার! কাজেই বাঙ্গালীর পক্ষে বাংলার অধ্যাপনা যেরূপ তুচ্ছ, উহা সেরূপ নয়। ব্যাপারটি কিন্তু ঘটিয়াছে যে-চালবাজির ফলে, তাহার মূলে ছিল ঐ বাংলার অধ্যাপক-পদের সমস্যা। হিন্দু সম্বন্ধে হিন্দু যাহা-খুসি করিতে পারে, তাহাতে কথা কহিবার কেহ নাই; কিন্তু বিপদ হইয়াছিল মুসলমানকে লইয়া। দুইটি পদের মধ্যে অন্ততঃ একটিও মুসলমান না পাইলে অনেক দিকে মুস্কিলের সম্ভাবনা। বাংলার অধ্যাপক-পদপ্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন বাংলাভাষাভিজ্ঞ খ্যাতনামা মুসলমান পণ্ডিত ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্; আর সকলের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া,

যোগ্যতম হিন্দুকেও লঙ্ঘন করিয়া, রামা-শ্যামাকে নিযুক্ত করা যেমন সহজ, যোগ্যতম না হইলেও যোগ্যতর মুসলমানকে ঠেকাইয়া রাখা তেমনই শক্ত—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটুক মুসলমান-প্রাধান্য আছে। তাই, বাংলার চাকরিটি মিত্র বাহাদুরের জন্য নির্ব্বিঘ্ন করিবার অভিপ্রায়ে, মুসলমানপক্ষকে খুসী করিবার জন্য, অপর পদটি একটি মুসলমানকে দেওয়া হইয়াছে। এ কাজটি করিতে বিশেষ বেগ পাইতেও হয় নাই, সদ্য-নিযুক্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়াই সে কার্য্য হাসিল হইয়াছে। এক রবীন্দ্রনাথের সমর্থনেই আর সকলে গলিয়া ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। চালবাজীর বাহাদুরী আছে! এ হেন বিশ্ববিদ্যালয় যদি বাঙ্গালীর গৌরব না হয়, তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই বা গৌরব কি?

* * *

বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কথা লইয়া প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিলাম—সেই কথা দিয়াই শেষ করিব। সেদিন জলধর-সম্বর্দ্ধনায় একটি বড় মজার দৃশ্য দেখিয়াছি। যে তরুণেরা, হেম নবীনের ত কথাই নাই—বঙ্কিম রবীন্দ্রকেও গণনার মধ্যে আনে না—সেই মহাবীর সাহিত্যিকেরা সেদিন সদলবলে জলধর-সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিয়া স্তুতি পাঠ করিয়াছিল। হঠাৎ মনে হইবে, ইহারা বুঝি এতদিনে ভুল বুঝিতে পারিয়াছে—জলধরবাবুর প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া, সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া, সাহিত্যকে সম্মান করিতে আসিয়াছে। একটু খট্‌কা লাগিল; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলাম, ইহারা তরুণ এবং বীর হইলেও—বাঙ্গালী; পেটের দায়টাই বড় দায়, সাহিত্য তার চেয়ে বড় নয় ইহারা ইতিমধ্যেই তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের নিকট পাঁচ টাকায় কপিরাইট বিক্রয়ের আশায় যুগান্তকারী গ্রন্থরচনার প্রতিভা ও উৎসাহ ইহাদের আছে—এবং 'ভারতবর্ষে' গল্প লিখিয়া টাকাটা সিকেটা উপার্জ্জন করিবার ভরসা ইহারা রাখে। তাই জলধর-সংবর্দ্ধনায় ইহাদের এত উৎসাহ। বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যিক আদর্শনিষ্ঠা ইহার উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। এ দেশে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সম্মান আর কত হইবে?

———

মন-জুয়ান

তৃতীয় সর্গ

স্কট টমসন লিখিত

[বায়রণের ডন জুয়ানের সহিত ইহার কোনও সংশ্রব নাই]

আমার এ কাব্য যেন ফকিরের ঘোড়া
 যে দিকে চলুক, তাহে নাহি কোন ক্ষতি ;
হাসির যে লক্ষ্য মোর আছে বিশ্বজোড়া,
 কখনো প্রবাসী কভু স্বর্গীয় প্রগতি ।
আপাতত বুদ্ধদেব (নয়া আন্‌কোরা)
 ঢাকা মেলে ছুটেছেন, গোয়ালন্দ প্রতি ।
 বিধাতার ঋণশোধে করিয়া মনন
 পদ্মাপারে ছুটেছেন রমণা-রমণ ॥

ভাবিতেছে বুদ্ধদেব, কিম্বা ভেবেছিল,
 অন্তত উচিত ছিল এইরূপ ভাবা !
প্রকাশের সাধ মনে অতৃপ্ত রহিল,
 হায়রে, থাকিত যদি সম্পাদক-বাবা !
বাণীর আসরে তবে খুলে দিয়ে 'দিল্'
 পিতারে শিখণ্ডী করি খেলিতাম দাবা ।
 মাসি, পিসি, খুড়ি, খুড়া, চাকর, নফর
 সব মিলে ভরিতাম পত্রিকা-গহ্বর ।

যে টুকু থাকিত বাকি, ফাইল-বাবু তা
পুরাতন মাসিকের পঙ্কোদ্ধার করি,
বাল্মীকির উপাখ্যানে ধরি কোন ছুতা
কীটতন্ত্রী-গবেষক, দিতেন তা ভরি।
বাকি টুকু পূরাইত সম্পাদক-সুতা
বাংলা লেবেলে ইঙ্গ গল্পের লহরী।
নগেন্দ্রীয় উপন্যাসে বেড়ে যেত নাম,
চলিতে থাকিত ad infinitum ॥

এই মত কত কথা ভাবিতে ভাবিতে
ছুটেছেন বুদ্ধদেব নিশ্চল বসিয়া !
বিস্মিত হয়ো না কেহ কথার ইঙ্গিতে—
বসে থেকে ছোটা, এরে হেঁয়ালী বলিয়া !
কত না বিস্ময় হেন আছে পৃথিবীতে
সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ে দেখ না চাহিয়া !
কলম থাকিলে যদি হয় গো লিখক,
দোষ কি করিল তবে হাঁস ও Pea-cock ॥

ছুটিয়াছে ঢাকা মেল ; বৃষ্টি টিপ্ টিপ্ ;
রজনীর অন্ধকারে চকিত জোনাকী ;
আকাশের তারা আর গাঁয়ের প্রদীপ
মেঘ ও বনের ফাঁকে দেখি থাকি থাকি ;
ইক্ষু ক্ষেতে ডেকে ওঠে শৃগাল-সচিব
অট্টপ্রতিধ্বনি-রবে জাগে সুপ্ত পাখী।

ছোট ছোট ষ্টেশনের আলো, কোলাহল ;
পুনরায় অন্ধকার, জোনাকীর দল ।

গাড়ীর অন্দরে বসি বুদ্ধদেব নব
ঠিক যেন বুদ্ধ সেই বোধিদ্রুমমূলে ।
তাঁহার অন্তরে কত চিন্তা অভিনব
ভাবনার ভোগবতী-উৎস দেয় খুলে
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু এই কবি-লব
ভেঙেছে রামের মত দুই হাতে তুলে,
স্বয়ংআগতা শ্রেষ্ঠ বনিতা কবিতা
সবলে আনিলে হয় Rape ও ছবিতা ॥

অন্তরে বসেছে তার লুসি ও ললিতা
বিদেশিনী স্বদেশিনী অপ্সরীণিগণ,
বিশ্বের রমণী যত হ'য়ে সঙ্কলিতা
নব বালিগঞ্জ যেন করেছে সৃজন ।
হঠাৎ মেলিয়া চক্ষু হেরিলেন মিতা
(মোর নয়, গৌতমের) করিছে গমন
মেঘদল দক্ষিণেতে ; হাত করি জোড়
কহিতে লাগিল বুদ্ধ ভাবেতে বিভোর ॥

কোথায় চলেছ মেঘ, যেথা খুসি যাবে
শুধু দেখে যেয়ো পথে বালিগঞ্জটায় ;
বক্র পন্থা হইলেও খরচ পোষাবে
নতুবা চক্ষুর ফল নাহি পেলে হায় ।

নিপুণিকা চতুরিকা সবারেই পাবে
কেবল সেজেছে তারা শেমিজ শায়ায়।
মালবিকা সাজিয়াছে ব্লাউজ 'ভি-কাটে'
মেঘদূত বাঁধা যেন মরক্কো মলাটে।

প্রাসাদ-শিখরে বসি বহিনেরা যত
পাতানো-ভায়ের সনে করে যে খেলন,
আধুনিক চোখে তারে দেখিও সতত
নতুবা নিতান্ত সেই পুরাণো মতন
হয় তো ভাবিবে পতি! তারা দূরে গত
কেহ মস্কো, কেহ স্বর্গে, কেহ বা লণ্ডন।
তারাও বিরহী নয়, প্রবাসে প্রবীণ—
সেথাও জুটায়ে তারা নিয়েছে বহিন॥

স্বামী দূরে গেলে এরা থাকে পথ চেয়ে
বিকালে আসিবে পুন ভাইটি কখন্!
বিরহের অবসর 'টমি'টারে নিয়ে
আদিম প্রণয়-রীতে কাটে ততক্ষণ।
সেটাও বিহারে গেলে, পথ নাহি পেয়ে
আদরে বরণ করে 'ইউ-ডি-কলোন'।
নব নব প্রেমে তারা নিযুক্ত ফি-মাসে
নূতন পঞ্জিকা সম বদলি fiancee॥

সেথায় দেখিবে এক প্রাসাদের কোণে
চুরুটের ধূমোদ্গারে স্তব্ধ বীরবল

ফরাসী গ্রন্থের নব পত্রসংখ্যা গণে ;
(হাভেনা চুরুট-ধূম্রে পাবে তুমি বল ।)
শুনিবে স্বগত উক্তি আপনার মনে !
কালিদাস ব্যাস ভাস বাল্মীকির দল
শ্রীমুখনিঃসৃত যদি পরামর্শ মিলে
করজোড়ে দাঁড়াইয়া চায়ের টেবিলে ॥

সহসা জাগিয়া দেখে মেলিয়া নয়ান
অপার উদার এক জলের চাদর
অতি দূর পরপারে নীরবে শয়ান
অশ্রু-কুহেলিকা নীল ক্ষীণ দিগন্তর ।
সমগ্র ধরিত্রী যেন হেথা অবসান—
দিক্‌বলয়িত এক সজল প্রান্তর ।
বিরাট গরুড় দুই পক্ষ উদাসিয়া
বিষ্ণুর পরশ-রসে আছে বিহ্বলিয়া ।

হে পদ্মা হে চিত্রাঙ্গদা, তোমারে ভোলাতে
পারে নাই ভগীরথ-শঙ্খের স্বনন,
আর্য্য-ইতিহাস-ধারা, ক্ষুব্ধ পদপাতে
উপেক্ষিয়া অবজ্ঞিয়া বিহ্বল মতন
অনার্য্য শবর ব্যাধ কিরাতের সাথে
তীর্থযাত্রা হীন বঙ্গ ভাগ্যের গগন
উজলিয়া উদ্ভাসিয়া উচ্চকিয়া শেষে
উদিলে ধূসর ধূম্র ধূমকেতু বেশে ॥

বঙ্গের অঙ্গনে তুমি দুর্ব্বাশার শাপ !
বঙ্গহর্ম্ম্য তলে তুমি ভূমিকম্প চির !
আতিথ্য-বিস্মৃত মুগ্ধ প্রেমের প্রলাপ
ডুবাইয়া দেয় তব গর্জ্জন গভীর।
তোমাতে দোসর পেলো গাণ্ডীবী-প্রতাপ,
মৃগয়াচারিণী তুমি, যুগ্মতূণ তীর।
স্মৃতির একুশ রত্ন, অতীতের মঠ
সহে না, সহে না, পদ্মা ক্ষুব্ধ তব তট ॥

একি নৃত্য ভয়ঙ্কর! লাস্য একি হায় !
নূপুর স্খলিত পায়ে ভীষণ তাণ্ডব।
মৃতভর্ত্তা বেহুলা কি অমর সভায়
পতিপ্রাণ ভিক্ষা মাগি নাচে অভিনব।
তব নৃত্যে হে স্থন্দরি! আজি মৃতপ্রায়
পাইবে না বঙ্গদেশ জীবন-বৈভব।
নিঃসাড় বঙ্গেতে তুমি প্রাণের নাগিনী !
জীবনের মধ্যরাত্রে কানাড়া রাগিনী ॥

শীতে শান্ত, গ্রীষ্মে ক্ষীণ, শরতে অমল ;
অপুত্রকা, দেখ তুমি কাশপুষ্প রাশে
শিশুর দুধের হাসি মৌক্তিক ধবল।
তার পরে যেই দিন দূর হিমাবাসে
এলায়ে সহস্র বেণী গর্জ্জি কল কল
ডাকিনী সঙ্গিনী তব ছুটে চলে আসে

ছন্দ-বন্ধ উল্লঙ্ঘিয়া চল ভাঙি চুরি
নির্ম্মম যেনরে বিশ্বকর্ম্মার হাতুড়ি।

বিশ্বাসী চাষীরা কেটে লয় কাঁচা ধান ;
গৃহস্থ ভাঙিয়া ঘর করে পলায়ন ;
সীমানা দখল ছাড়ি লয়ে নিজ প্রাণ
বাদী প্রতিবাদী দোঁহে করে সম্বরণ।
কাঁচা ধান, পাকা ঘর, দেবতার স্থান
পিনেস ও পান্সী কর একত্র মজ্জন।
হতভাগ্য আরোহীর প্রার্থনা মৃত্যুর
রবে ডুবাইয়া, কি হাস্য নিষ্ঠুর।

এত কথা অবশ্যই ভাবে নাই কবি,
মনে ছিল রমণার রমণীয় রাধা
হঠাৎ পড়িল চোখে পদ্মার এ ছবি !
পীরিতের পথে হায় পদে পদে বাধা !
এ নদী যমুনা নয়, নয় এ জাহ্নবী
এ মেয়ে যে কীর্ত্তিনাশা, মিছে এরে সাধা !
প্রেমেতে ডুবিলে তবু থাকে গো জীবন
পদ্মায় ডুবিলে, হায় ; নিতান্ত মরণ॥

প্রেমের উপমা বিশ্বে পাকা তরমুজ,
বিরহের শুষ্ক চরে উভয়েই বাড়ে ;
পরশে শীতল আর বরণে সবুজ,
আকণ্ঠ করিলে পান তাপে দগ্ধি মারে।

ভাঙিয়া করিতে যদি চাহ বুঝ সুঝ
নিছক সলিল তার তের আনা সাড়ে।
বাকি যে আড়াই আনা, কালো কালো বীচি
প্রেমেও তুদিন বাদে লাগে খিচি মিচি।

অর্থহীন ভালবাসা, হায় নিরর্থক
কুটীরে টেকে না মন, তুই দিন গেলে!
নন্দন-কাননে দেখ মিটিল না সখ
মজিল আদম ইভ সোনার আপেলে।
বাসি দধি সম প্রেম লাগিবেই টক
রূপায় ছুটিবে মন রূপ ছুঁড়ে ফেলে॥
অবশ্য ঢাকায় ভেদ নাহি এটা ওটা
সেথাকার শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রেম ও পরো॥

জাহাজে গেল না বুদ্ধ, করিল তরণী;
কুলু কুলু ঢেউগুলি ভাঙি তুই ধারে,
সহস্র জিহ্বায় যেন করে হুলুধ্বনি;
শ্যামল বনের চিহ্ন ক্রমে তুই পারে
ঝাশা-ঝাপসা হ'ল; তাল গণি গণি
কাটিতে লাগিল জল চার খানি দাঁড়ে।
ফোলে পাল, দোলে হাল, শক্ত চার মাঝি
সাতাশে, বিস্যুৎবার, আষাঢ়ের আজি

অকস্মাৎ আকাশের পশ্চিমের কোণে
এক খানি ছোট মেঘ, কটা, কটা কালো;

ইস্পাৎ-ধবল পদ্মা হ'ল সেই ক্ষণে
মৃতের চোখের মত নিস্তেজ ঘোলালো :
ছেঁড়া-কাঁথা অস্ত মেঘে, অশুভ লক্ষণে
যক্ষাপাণ্ডু রক্তিমাভা কি উৎকট আলো।
জল স্থির, স্থল স্থির, আকাশ নিখুঁৎ
হঠাৎ গর্জ্জন এক, একটি বিদ্যুৎ ॥

একবার নৌকাখান কাঁপে থর থর ;
পালের কাছিতে শুধু পড়ে এক টান্ ;
সম্পূর্ণ বিস্তৃতি লভি পালের কাপড়
উড়ে চলে যেতে চায় পাক্ষীর সমান্।
হাল গিয়া পরশিল অনন্ত অম্বর,
সম্মুখ গলুই নুয়ে করে জল পান।
পূর্ব্বাপর হীন এক স্বপ্নের মতন
ছুটিল বিভ্রান্ত তরী আশঙ্কা-মগন ॥

দিগ্বিদিক নাহি জানি, নাহি দেখি কিছু,
কখনো তরঙ্গ শিরে কখনো গহ্বরে ;
লক্ষ ঢেউ ছুটে চলে একটার পিছু
হা হা স্বরে করতালি লক্ষ লক্ষ করে।
বিষম নাগর-দোলা কভু উঁচু নীচু ;
গেল গেল এইবার আবার উপরে !
আকাশ পৃথিবী জল ঘুচাইয়া ভেদ
নৌকাখান্ বাজি রেখে করিতেছে জেদ্ ॥

শুভ্র ফেনে মিশে গিয়ে লক্ষ গাঙচিল
ঝড়ের প্রেতের মত করিছে চীৎকার ;
সলিল-সমাধি হ'তে উতারিয়া খিল
মৃতেরা বাহিরে আসি এত দিন কার,
তাজা মানুষের গন্ধে হাসে খিল খিল্—
এস এস দলে এস, পরশে তোমার
সমাধি-শীতল দেহ তাতাইয়া লই,
অতীত জীবন যদি লভি মুহূর্ত্তই ॥

শ্যামল দোলনাখানি ঘিরি পৃথিবীর
অতীতের লক্ষ জীব কাঁদিছে নিয়ত ;
যদি কোন অবকাশে বাতায়নটির,
যদি কোন অবকাশে সম্ভব রে হ'ত
কালের খিড়কি খোলা ; করি তারা ভিড়
ঢুকিয়া পড়িয়া তারা সুবোধের মত
বলিত, এ ধরণীর সব কিছু ভালো,
তাত্ত্বিকেরা এরে শুধু করেছে ঘোরালো ॥

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ দিয়ে তারা
ব্যাকুলি ধরিত চাপি পালঙ্ক ধরার !
দীনহীন ক্ষীণতম ভাবে আত্মহারা
পড়িয়া থাকিত শুধু নিঃশব্দে আবার ।
যা-ছিল রে বাঁধা রেখে যা-হবের কারা
বরণ করিয়া তারা লবে নাকো আর ॥

কাল অন্তহীন বটে ; জীবনে আমার
যতটুকু ধরে, শুধু মূল্য আছে তার ॥

তাদের লেলিহ জিহ্বা কবির কপালে
রহি রহি করিতেছে কর্কশ পরশ।
তাদের শীতল শ্বাস ভীত দুই গালে
ক্ষরণ করিছে যেন সমাধির রস।
মাংসহীন কঙ্কালের শীর্ণ শুষ্ক ভালে
ঝুম ঝুম দুলিতেছে নখ সংখ্যা দশ।
পাণ্ডুশুভ্র দন্তপাতি জ্বলে থাকি থাকি
শ্বাস-রোধা অন্ধকারে ফুটায়ে জোনাকী ॥

উপরে দেখিল চাহি কোদালিয়া মেঘে
সমস্ত আকাশ যেন চলেছে উড়িয়া
ক্ষীণ চন্দ্রকলাখানা ঝটিকার বেগে
ঘাটের নোঙর ছিঁড়ি ছুটে উন্মাদিয়া।
ক্ষণে ক্ষণে নভস্তল উঠিতেছে রেগে
বিদ্যুৎ বিস্তারে শাখা প্রশাখা মেলিয়া।
আকাশের পাণ্ডু আভা ধরার কালোকে
দীপ্যমান করি শুধু আনিতেছে চোখে ॥

হঠাৎ দমকে এক পালের কাপড়
ছিঁড়ে উড়ে চলে গেল পাখীর মতন।
মাস্তুল পড়িল ভাঙি ; তরী থর থর ;
তীব্র তীক্ষ্ণ শীতবায়ে দংশিছে মরণ।

ফাঁসিয়া তরণী জল ওঠে দবৃদব্ ;
সতরণী বুদ্ধদেব হলেন মগন,
প্রেমে নয়, প্রেমে নয়, গভীর পদ্মায়
বুভুক্ষু তরঙ্গ সব গরাসিল হায় ॥

শুনিয়াছি ঢেঁকি স্বর্গে গেলে ধান ভানে,
দেখি নাই, কারণ যে হই নি স্বর্গীয়।
অবশ্য গিয়েছি বটে 'ঈডেন-উদ্যানে'
দেখিয়াছি (না দেখিলে আজি দেখে নিয়ো)
জোড়া জোড়া আদম ও ইভা ; কোনো খানে
সোনার আপেল ভ্রমে আদমবর্গীয়
আদমিরা দংশিতেছে ইভাদের গাল
স্বর্গে কি জুটিত দৃশ্য এমন রসাল !

বুদ্ধর কপাল ভাল ! শোনো ইতিহাস
মরণের পরপারে স্থির হ'য়ে বসি !
—সেথা সরোবর ঘাটে দুটি রাজহাঁস
শরৎ-আলোক-ফুল্ল পদ্মবনে পশি
পরস্পরে হারাইয়া হয়েছে হতাশ ;
ব্যাকুল কলিতকণ্ঠ মকরন্দে রসি
উদ্‌ভ্রান্ত করিছে আরো ; কাঁপে পদ্মবন
পুষ্পোত্থিত ভ্রমরের উঠিছে গুঞ্জন ॥

হেন সরোবর ঘাটে সোপান গাঁথনী !
(উত্তর সমুদ্র যেথা তুষারে আঘাতি,

জনহীন দিগ্বলয়ে তুলি বজ্রধ্বনি,
কখনো তিমির-পুচ্ছ তাড়নায় মাতি,
উদ্গারয়ে স্বচ্ছ ফেন ; যে স্নিগ্ধ নবনী
কোকিল-আকুল কুঞ্জে না পোহাতে রাতি
গোপবধূ-হস্ত-বর্ণে করে পরাজয়
তারি মত) শুভ্র শিলা-সোপান নিচয় ॥

কোথায় সোপান আর কোথায় বা আমি
বিশেষণ পিছে পিছে হ'য়ে আত্মহারা
নৃপতি দুষ্যন্ত সম মৃগ-অনুগামী
ঘাড়ে এসে পড়িলাম ; যেথায় বেচারা
শকুন্তলা ঘটভারা ; স্বয়ং শ্রীরামই
স্বর্ণ-বিশেষণ পাছে করেছেন তাড়া,
অতএব কারে আর বলি বল লোভী ।
বিশেষণ ব্যবহারে ধরা পড়ে কবি ॥

হেন সরোবর-ঘাটে কে আসে আজিকে,
মঞ্জীর-শিঞ্জনে তার কল গুঞ্জরণ
থামিল কমল-বনে ; নিতে তাই শিখে
সচকিত লহরীরা করি সঞ্চরণ
তটের গায়েতে যায় আবেদন লিখে ।
সনাল মৃণাল-নিন্দী বাহুর বেষ্টন
ধরিয়াছে সযতনে শূন্য কুম্ভটায়
—তরুণ কবিরে হলে আরও মানায় ॥

প্রণয়ের যুগ্ম বেদী হৃদয়ে তাহার
দূর গৌরীশৃঙ্গ শিরে তুষারের মত ;
রক্তিম বসন খানি আবরি আবার
প্রকাশে রহস্যখানি ইঙ্গিতে সতত।
কত কাব্য-কাহিনীর সে দুটি আগার !
নিজেই জানে না তন্বী মূল্য তার কত ।
গৌরীশৃঙ্গে একদিন হবে উল্লঙ্ঘন
অনুল্লঙ্ঘ্য দুরারোহ যুবতীর স্তন।

সেই আদি যুগ হ'তে দুঃসাহসী কত
ও গিরির সানুদেশে পড়িল মরিয়া
পুরূরবা অগ্নিমিত্র, দেহমাত্রব্রত
যযাতি দুষ্মন্ত কত গিয়াছে ফিরিয়া !
স্বয়ং অর্জ্জুন সেথা হইয়াছে নত
দুর্জ্জয় গাণ্ডীবখানা নিঃশেষে ভাঙিয়া ।
যুগান্ত কঙ্কাল সেথা রচিছে সোপান
কামনার কোন্ স্বর্গে ! সাধু সাবধান

অটুট যৌবন তার সেই সরোবর
যাহাতে হয় নি ভরা প্রথম কলসী !
এ যেন রে স্বর্ণ ঘট পূরন্ত, সুন্দর,
নাহি উছলায় জল, উঠিছে উচ্ছ্বসি ।
বসনে ভূষণে হিয়া কাঁপে থর থর ;
তৃণাগ্রে শিশির বিন্দু পড়ো-পড়ো খসি।

ইন্দ্র-ধনু মাঝে সে যে সেই বর্ণ খানি
চক্ষে যা পড়ে না তবু চিত্ত বলে জানি ॥

নামিল কিশোরী-ধীরে থামিল সোপানে,
রাখিল কাঁখের ঘট শ্বেত শিলাতলে।
হঠাৎ পড়িল বাধা, চাহি কার পানে
মন না বসিল আজ ভরিবারে জলে !
কে ওই নাগর হোথা, শয়ন অজ্ঞানে,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আহা চলে কি না চলে !
শিয়রে বসিয়া তার করিল বীজন
ধীরে ধীরে সঞ্চারিল বিলুপ্ত জীবন।

উঠিয়া বসিল বুদ্ধ জাগে তো সবাই
হেন জাগরণ হয় ভাগ্যে ক'জনের !
লক্ষ মধ্যে ভাল করে' গুণে দেখ ভাই
পাবে না নিশ্চয় বেশি পাঁচ ছ'জনের।
য়ুরোপে কিঞ্চিৎ বেশি percentage high
তবুও অধিক নহে লক্ষ ডজনের।
অবশ্য তরুণদের পার্সেন্টেজ বাড়া
তরুণীর স্পর্শ ছাড়া জাগেন না তাঁরা ॥

কহিল আন্দোলি বাহু, বালা নিরুপম,
মণিবন্ধ নীলকান্ত মণিবলয়িত
রণিত বীণার তারে আলোচ্ছটা সম
লাবণ্য-কিরণ-কণা মুহু তরলিত—

আমারে গিয়েছ ভুলে, হ্য অদৃষ্ট মম,
প্রেমের নিদান মোরা তুলনা রহিত!
স্বর্গে মোরা ছিনু দোঁহে মদন ও রতি
পৃথিবীতে তুমি বুদ্ধ, আমি কঙ্কাবতী॥

বৃদ্ধ বঙ্গ সাহিত্যের ধ্যান ভাঙিবারে
জন্ম নিলে ধরাতলে তরুণ হইয়া
চালাইলে কামেশ্বর রসায়নটারে
পুস্তকের ছদ্মবেশে মলাটে বাঁধিয়া।
নৌকাডুবি হ'য়ে আমি জল-কারাগারে
নিতান্ত বেকার ভাবে আছি অপেক্ষিয়া॥
ধ্যান-ভঙ্গ ব্রতে চল যাই দোঁহে সেজে,
সাহিত্যে লাগিবে তুমি, আমি শূন্য ষ্টেজে॥

ফিরে পেল বুদ্ধদেব (ভূতপূর্ব্ব-কাম)
অস্থানে অকালে হের স্বর্গীয় সঙ্গিনী!
ভাগ্য যার ভাল তারে রক্ষা করে রাম;
শুষ্ক ডাল সরসিয়া হয় দারুচিনি।
নাগপাশ প্রেম-পাশ হয় অভিরাম;
শৃঙ্খল কিঙ্কর সম সেবে রিনি ঠিনি।
দুঃখের মুখোস খানা উতারি তখন
ভাগ্যবানজন হেরে প্রিয়ার বদন॥

দুইজনে ধীরি ধীরি ত্যজি' জলতল
প্রবেশ করিল যেথা, নাহি পাঠকের

প্রবেশের অধিকার ; অতএব চল
আপনার ঘরে ফিরি ছাড়ি লেখকের
মূল্যবান্ সঙ্গসুখ। তার আগে বল
জয় হোক এ মিলন রতি-মদনের ॥
জয় হোক্, কিন্তু বটে থেকো সাবধান
তরুণ সাহিত্য-গ্রন্থ মোদক রসান ॥

গোপন খবর এক পেয়েছি জানিতে,
বাংলা গভর্ণমেণ্ট নূতন বজেটে,
তরুণ সাহিত্য 'পরে কাব্য ও সঙ্গীতে
বসায়েছে ট্যাক্স এক আবগারী রেটে।
বজেট ব্যালান্স হবে, আশা করি ইথে !
বেকার যুবকগণ ভাত পাবে পেটে !
পাইকারী দরে নিলে কমিশন ছাড়,
'বিচিত্রা' ও 'পরিচয়' হয়েছে Vendor ॥

ইতি তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

ঘৃতকুম্ভ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

আহারান্তে দ্বিপ্রহর কথাবার্ত্তা এবং তন্দ্রায় ব্যয় করিয়া বেলা পাঁচটায় বিমলা কহিল, "আমি এইবার যাই মামীমা!" নারায়ণী কহিলেন, "গাড়ী ডাকতে পাঠাই। ততক্ষণ দু'খানা লুচী মুখে দিয়ে নাও।"

বিমলা আপত্তি করিয়া কহিল, "এই তো খেলাম মামীমা!"

নারায়ণী দেবী কথা বলিবার পূর্ব্বেই সদাশিববাবু পাশের ঘর হইতে প্রশ্ন করিলেন, "বৌমা খেয়েছেন কখন?" নারায়ণী দেবী কহিলেন, "দশটায়।" সদাশিববাবু কহিলেন, "মুসুরীর ডাল, রুইমাছ, কপি ও সন্দেশ ছয়ঘণ্টায় পরিপাক হয়। এখন স্বচ্ছন্দে লুচী খেতে পারেন!"

বিমলা একটু লজ্জা পাইল কিন্তু গুরুজনের কথা অবহেলা করিতে পারিল না। খাইতে বসিল।

নারায়ণী দেবী ভবানী ও বিমলার সম্মুখে বসিয়াছিলেন। মিনু পরিবেষণ করিতেছিল এবং ভবানীর সহিত চোখাচোখী হইবা মাত্র মাতার চক্ষুকে এড়াইয়া যথাসম্ভব সতর্কতা সহকারে বিচিত্র মুখভঙ্গী করিতেছিল। ভবানী রাগে ফুলিতেছিল কিন্তু বিমলা আসিবার সময়ই জানাইয়া দিয়াছিল যে কুটুম্ব-বাড়ীতে জোরে কথা কহিতে নাই, কাজেই কথা কহিতে পারিতেছিল না। অকস্মাৎ মিনু ধপ্ করিয়া

ভবানীর সম্মুখে বসিয়া পড়িয়াই বিনা ভূমিকায় ভবানীকে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা বলতো 'জামাতৃ' মানে কি?" রসগোল্লার আধখানা ভবানীর ঠোঁটের কাছ হইতে পড়িয়া গেল—সে প্রশ্ন শুনিয়া বদন ঈষৎ ব্যাদান করিয়া ফেলিল। ভবানীর বিচলিত ভাব দেখিয়া নারায়ণী দেবী কন্যাকে কহিলেন, "খেতে দিবি নে নাকি?" মিনু মায়ের নিষেধ-বাণী কানে তুলিল না। আবার ভবানীর দিকে চাহিয়া কহিল, 'পার্লে না?' বিমলা উৎসুক দৃষ্টিতে ভবানীর দিকে চাহিল। ভবানী দেখিল, কাজেই মিনুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পারিল না, কহিল—"জানি নে বুঝি? 'জামাতৃ' মানে দর্জ্জি।"

মিনু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বিমলা মুখ কালো করিয়া খাবার থালার দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। ভবানী তখন তাড়াতাড়ি নারায়ণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মামীমা, 'জামাতৃ' মানে দর্জ্জি নয়? যে জামা তৈয়ারী করে।" নারায়ণী কথা না কহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন, বিমলা দেখিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

গাড়ীতে গম্ভীর মুখে বিমলা বসিয়াছিল। ভবানী দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল বিমলা জবাব দিল না। ভবানী তখন কাঁদিয়া ফেলিল। বিমলা জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁদছিস্ কেন?"

ভবানী ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিল, "তুই রাগ করেছিস্ যে!"

বিমলার অনুতাপ হইল, ভবানীর মাথা বুকের উপর টানিয়া আনিয়া তাহার মুখে চুমা দিয়া কহিল—"রাগ করিনি। দুঃখ হচ্ছিল। তোকে এখন থেকে লেখাপড়া শিখতে হবে ভবু।" ভবানী বিমলার বুক হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল, "শিখ্‌ব।"

গাড়ী হইতে নামিয়াই বিমলা তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠিল।

তারপর কুলুঙ্গী হইতে দশপঁচিশের ছক, ঘুঁটি এবং কড়ির জুতার বাক্সটি হাতে লইয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। দিন সাতেক পূর্ব্বে 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়িয়াছিল, আয়েষার কথা মনে পড়িল। কহিল, "নাঃ! এ প্রলোভন আর রাখিব না" বলিয়া ক্রীড়া-সরঞ্জামের আধার জুতার বাক্সটি জানালা গলাইয়া বস্তির নর্দ্দমা-পরিখা মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

দশ পঁচিশের সরঞ্জামের অকস্মাৎ নর্দ্দমাপ্রাপ্তির পর হইতে ভবানী ও বিমলা একেবারে বেকার হইয়া পড়িল। দিন আর কাটিতে চাহে না। প্রাতঃকালটা যদি বা থোড়বড়ি এবং সজিনার ডাঁটার প্রসাদাৎ কাটিল কিন্তু মধ্যাহ্ন! অলস মধ্যাহ্ন! নির্ম্মেঘআকাশচারীদীপ্ত-সূর্য্যকরোজ্জ্বল, অদূর বস্তিবাসিনী রজক নরসুন্দর বাদ্যকর-বধূ-বালা-গণের কলকলহমুখর, স্ফীতাহতস্কন্ধ মহিষবলিবর্দ্দবাহিত ক্ষীণতৈল ভীমচক্র শকট-শব্দে ধ্বনিত, মক্ষিকা-অনীকিনীবিলসিত অলস মধ্যাহ্ন! মধ্যাহ্ন আর কাটে না! ভবানী জানালা দিয়া নর্দ্দমার দিকে চাহিয়া পুরাতন বন্ধুর কথা মনে করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে আর বিমলা একটা পাশ বালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া কখনও দুগ্ধফেননিভ শয্যা বক্ষে ক্বচিৎ বা কঠিন হর্ম্ম্যতলে একটি দীর্ঘায়ত সিন্দূরবর্ণ বিলাতী কুষ্মাণ্ড বৎ গড়াইতে থাকে। কিন্তু শান্তি নাই—জগন্নাথবাবুর তিরোধানের পরও যে শান্তিটুকু অবশিষ্ট ছিল দশপঁচিশের ঘুঁটিগুলির সঙ্গে সেটুকুও গিয়াছে। অভাগিনী বিমলা!

তবে এই বিরহ-দাবদগ্ধ বেকার-জীবনের আশ্রয়স্থান একটি ছিল, সে ভবানী। বিমলার দুঃখ সে বুঝিত; বিমলা যখন অতিরিক্ত অধীর হইয়া সেই মধ্যাহ্নকালে খট্টা হইতে ভূমিতলে এবং তথা হইতে সিঁড়ি-ঘরে কখনও শয়ান এবং কখনও দণ্ডায়মান অবস্থায় আবর্ত্তন করিতে

থাকিত তখন ভবানী আসিয়া কহিত—“বড্ড খারাপ লাগ্‌ছে না ভাই?” বিমলা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিত, “তুই থাক্‌তে খারাপ লাগ্‌বে কেন ভাই?” বিমলার শুষ্ক হাসি ভবানীর চোখে ধরা পড়িত, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিত, “আর একটা নিয়ে আসি—এই কাছেই বাসুর দোকানে পাওয়া যায়!” বিমলার অন্তর মন্থন করিয়া একটি চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঈষৎ চ্যাপটা নাসিকার ক্ষুদ্র দুটি রন্ধ্রপথ দিয়া নির্গত হইয়া দরদী ভবানীর মুখখানিতে স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দিত। ভবানী সম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেই বিমলা তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া কহিত, “যা যাবার গেছে আর কাজ নেই!” ভবানী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত।...মনে বুঝিত গোপনে একটা ছক কিনিয়া আনিলে বিমলা নিশ্চয় খুসী হইবে কিন্তু বস্তুটির নগদ মূল্য ছয় পয়সা এবং ভবানীর নিদারুণ অর্থাভাব, যেহেতু ক্যাশবাক্সের চাবি বিমলার অঞ্চলপ্রান্তে দৃঢ়বদ্ধ। তবে অকস্মাৎ সুযোগ ঘটিল। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে গলির মোড়ে বিনা কারণে দাঁড়াইয়া ভবানী মনে মনে ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যা গণিতেছিল, এমন সময় দেখিল পর পর চার জন দাসী বিচিত্র আবরণে আবৃত মৃৎভাণ্ড শিরে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; ভবানীর কৌতূহল হইল। হাঁড়িতে কি আছে জানিবার জন্য গলা সাধিয়া সর্ব্বাগ্রগামিনী দাসীকে প্রশ্ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল কিন্তু তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া আর স্বর ফুটিল না। চতুর্থ দাসীটি একটু রোগাটে ধরণের খর্ব্বকায়া, তাহাকে দেখিয়া ভবানীর সাহস হইল, সাহসে বুক বাঁধিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “কি নিয়ে যাচ্ছ তোমরা?” দাসীটির জিহ্বা বোধ হয় ভাণ্ডস্থ বস্তুর স্মরণ মাত্রে সরস হইল, পিচ্‌ করিয়া খানিকটা সুদোক্তাতাম্বুল রস ফেলিয়া সে কহিল, “জামাই বাড়ী তত্ত্ব যাচ্ছে। বাগবাজারের

রসগোল্লা !" দাসী চলিয়া গেল। ভবানী নির্ণিমেষ নেত্রে মরীচিকাবৎ চলমান মৃৎ ভাণ্ডগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

বাগবাজারের রসগোল্লা! কথাগুলি তাহার কর্ণে ক্রমাগত মধু-বর্ষণ করিতে লাগিল, স্বর্গীয়া জননীর ব্রাহ্মণভক্তির কল্যাণে প্রতি অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে রসগোল্লা সে অনেকই খাইয়াছে কিন্তু বাগবাজারের রসগোল্লা খাইয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। ভাবিতে ভাবিতে ভবানী বাড়ী ফিরিল। পথে একটা ভেট্‌কি-কণ্টক-চর্ব্বণনিরত মার্জ্জার-শিশুর লাঙ্গুল দলিত করিয়া গেল, বেচারী বেদনায় 'ম্যাঁও' করিয়া উঠিল ভবানী ফিরিয়াও চাহিল না। তাহার জগৎ তখন বাগবাজারের রসগোল্লার রসে বেমালুম নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে!

বিমলা দুই পা ছড়াইয়া চুল বাঁধিতে বসিয়াছিল, ভবানী নীরবে আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল। সম্মুখের দর্পণে ভবানীর চিন্তা-বিরস মুখের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া বিমলার হাতের চিরুণী কাঁপিয়া গেল, সে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কি হ'য়েছে ভবু?" ভবানী মিথ্যা কহিতে পারিল না। চুপ্‌ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভবানীর দুই হাত ধরিয়া কহিল, "বল্‌ না ভবু, আমার বুকের ভিতর কাঁপ ছে!" ভবানী ভয় পাইল, বিমলার বুকের কাঁপুনি থামাইবার জন্য তাড়াতাড়ি কহিল, "বাগবাজারের রসগোল্লা।"

বিমলার ভয় তথাপি ঘুচিল না, কহিল, "ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌!"

ভবানী রসগদ্‌গদ স্বরে কহিল, "খাব।"

বিমলা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বাঁচালি ভবু! এখুনি খাবি? তেওয়ারীকে ডাক।"

ভবানী কহিল, "সে যদি ভালো দেখে না আনে!"

বিমলা ভবানীর যুক্তির সারবত্তা বুঝিল, কহিল,—"তবে আজ থাক্ ভাই, কাল সকালে তুই নিজে দেখে চেখে নিয়ে আস্‌বি !"

মাত্র বারো ঘণ্টার বিলম্ব বইত' নয় ! এক রকম করিয়া কাটিবেই ভাবিয়া ভবানী কহিল,—"সেই ভাল, কাল সকাল বেলাতেই—"

* * *

পরদিন চোখে মুখে জল দিয়াই ভবানী আসিয়া বিমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্মিত মুখে কহিল, "দিদি আজ—"

বিমলা হাসিয়া এক টাকা দুই আনা আঁচল হইতে খুলিয়া ভবানীর হাতে দিয়া কহিল, "এক টাকার রসগোল্লা আন্‌বি—আর ট্রাম ভাড়া দুই আনা। 'সাবধানে যাবি সাবধানে আস্‌বি। পথের মোড়ে গাড়ী ঘোড়া দেখে দাঁড়াবি, বুঝ্‌লি ?"

ভবানী মাথা নাড়িয়া বিমলার আদেশ পালনের সম্মতি জানাইয়া বাহির হইয়া গেল।

এক ঘণ্টার মধ্যে আসিবার কথা, দেড় ঘণ্টা হইয়া গেল ভবানী ফিরিল না। বিমলার ডালে লবণ দিতে ভুল হইয়া গেল। ক্রমে ন'টা বাজিল, বিমলা উনুনের আঁচ ফেলিয়া দিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল।

বক্ষোপিঞ্জরে তাহার হৃদ্‌বিহঙ্গম আশঙ্কায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। 'বৌমা চচ্চড়িটা তাড়াতাড়ি নাবিয়ে দাও!' 'ওরে চালের জল দে' 'জামার হাতাটায় দু'টো ফোঁড় দিয়ে দাও গো' 'সাঁত্রাগাছির ওল যদি ভাল পাও তা হ'লে—' গলির মোড়ের বাড়ী হইতে ইত্যাকার ধ্বনি শুনিয়া বিমলা বুঝিল দশটা বাজিয়াছে। তখন সে কাঁদিতে বসিল। তেওয়ারী ভোরে গঙ্গাজীতে তাহার স্বর্গীয় পিতার পিণ্ডদান করিতে গিয়াছে, তিন প্রহরের পূর্ব্বে ফিরিবে না।

কাহাকে পাঠাইয়া সন্ধান লয় ? দুইবার সে দরজা খুলিয়া চারিদিকে সাশ্রুনেত্রে চাহিয়া দেখিল, গলি নির্জ্জন, শুধু একটা মুচি নিবিষ্ট চিত্তে এককোণে বসিয়া এক পাটি কুড়ানো চটি জুতা হইতে প্লাস সহায়ে সন্তর্পণে পেরেক খুলিতেছে। তাহাকে ডাকিলে কেমন হয় ! পরক্ষণেই মনে হইল মুচি অযাত্রা। তাহার সাহায্য লইলে ভবানীর ফিরিবার যেটুকু সম্ভাবনা আছে তাহাও কাটিয়া যাইবে ; অগত্যা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সে দেয়ালে লম্বমান কালীঘাটের ছাপা বহু পুরাতন একটি কীটদষ্ট বরাহ অবতারের ছবির নীচে মাথা ঠুকিতে লাগিল। এমন সময় দরজা খোলার শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল ভবানী! তাহার মুখ রক্তবর্ণ—কলেবর ঘর্ম্মাক্ত, হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি। বিমলা হাঁড়ি নামাইয়া কুপিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"এত দেরী কল্লি যে!" ভবানী ঈষৎ হাসিয়া পকেট হইতে দশ পঁচিশের একখানা রঙ্গীন্ ছক বাহির করিয়া কহিল—"ট্রামের পয়সা দিয়ে এইটে কিনে—"

বিমলার দেহের সমস্ত রক্ত টগবগ করিয়া মাথায় উঠিতে লাগিল ; ঠাস্ করিয়া ভবানীর পিঠে এক চড় বসাইয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে এই কিনে হেঁটে এসেছ ! আমি এদিকে ভেবে ভেবে খুন হ'লুম ;" অকস্মাৎ বজ্রপাত হইতেও এই অকারণ চপেটাঘাত ভবানীকে বেশী করিয়া আঘাত করিল। সে আর কথা না কহিয়া কাপড়ের খুঁটা দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে উপরে চলিয়া গেল।

ভবানী দৃষ্টিপথ অন্তরালে দোতলায় অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিমলার দারুণ মনস্তাপ উপস্থিত হইল। দশপঁচিশের ছকখানি কুড়াইয়া লইয়া রসগোল্লার হাঁড়িটি কোলের উপর রাখিয়া সে কাঁদিতে বসিল। ভবানীর রৌদ্রদগ্ধ বিরস বদনখানি কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। আহা ! কেবল তাহারই জন্য বেচারা বাউলপাড়া হইতে

বাগবাজার ও বাগবাজার হইতে বাউলপাড়া প্রায় চার ক্রোশ পথ প্রখর সূর্য্যতাপ অবহেলা করিয়া পায়ে হাঁটিয়াছে। ভাণ্ড মধ্যে নেত্রপাত করিয়া দেখিল ঠিক চার গণ্ডাই রহিয়াছে—একটিও ভবানী খায় নাই। বিমলার দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিল, সে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিল মনে নাই, সহসা ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল, দেখিল যে রসগোল্লার গাঢ় রস তাহার প্রবল অশ্রুধারা পাতে তরল হইয়া উঠিয়াছে। আরও ক্রন্দন করিলে রসগোল্লা লবণাক্ত হইয়া অখাদ্য হইবে ভাবিয়া সে হাঁড়ি ক্রোড়চ্যুত করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "ভবু"? কোনও উত্তর আসিল না। বিমলা তাড়াতাড়ি ভবানীর অনুসন্ধানে চলিল।

ভবানী তখন বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইতেছিল। বিমলার পদশব্দ শুনিয়াও মুখ ফিরাইল না। বিমলা কাছে আসিয়া ভবানীকে ফোঁপাইতে দেখিয়া নিজেও ভবানীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। দুইজনে সমানতালে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া আবেগ নিঃশেষ করিয়া মিনিট পনেরো পর এক সঙ্গেই হাসিয়া উঠিল। বিমলা কহিল—"বড্ড লেগেছে ভাই?"

ভবানী কহিল, "কিচ্ছু না।"

বিমলা ভবানীর হাত ধরিয়া টানিয়া নামাইয়া যে স্থানটিতে ইতি-পূর্ব্বে চপেটাঘাত করিয়াছিল সেইখানে তাহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া কহিল, "আয়, আজ একটু খেলি!"

ভবানী হাতে স্বর্গ পাইল। জিজ্ঞাসা করিল, কেমন ছক্ দেখেছিস দিদি?"

বিমলা কহিল—"খুব সুন্দর—আয়।"

খেলিতে বসিয়া কেবলই নারায়ণীদেবীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার

কথা বিমলার মনে পড়িতে লাগিল, মিনুর সেই বিদ্রূপ! ভবানীর লেখা পড়া না শিখিয়া শুধু দশপঁচিশ খেলিলে চলিবে না। এই চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া বিমলা ভাল করিয়া খেলিতে পারিল না, হারিয়া গেল। এক বাজী শেষ হইলেই বিমলা ছকখানি আলমারীর মাথায় তুলিয়া ভবানীকে স্নান করাইতে লইয়া গেল। ভবানীর পিঠের চপেটাহত স্থানটি ভাল করিয়া তেল মালিশ করিয়া বিমলা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "লাগে নি তো ভাই?" ভবানী কহিল "না"। বিমলা নিশ্চিন্ত হইল, কিন্তু সমস্ত দিন আর বিমলার চিন্তার অবধি রহিল না। সন্ধ্যায় তেওয়ারীকে ডাকিয়া সে কি পরামর্শ করিল ভবানী তাহা জানিল না। পরদিন তেওয়ারীর সহিত বেহারাডিহি এ্যাংগ্লো ইষ্টার্ণ এ্যাকাডেমিক ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেড্‌ মাষ্টার শ্রীযুত মদনমোহন মুখুটি বি, এ, বি, টি মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিমলা রান্নাঘরে আত্মগোপন করিয়া তেওয়ারীকে দিয়া জানাইল যে প্রাতে তিন ঘণ্টা ও বৈকালে তিন ঘণ্টা একুনে ছয় ঘণ্টা তাঁহাকে পড়াইতে হইবে, পারিশ্রমিক বাবদ ঘণ্টা পিছু দশ টাকা হিসাবে মাসিক ষাট্‌ টাকা পাইবেন মুখুটি মহাশয় অঙ্কশাস্ত্রে বি, এ পরীক্ষায় অনার্স লইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন ঠকা হইবে না। সন্ধ্যাকালে ভবানীর জন্য এক গাদা গণিত ভূগোল ইতিহাস ব্যাকরণ সাহিত্য বিজ্ঞান স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের বহি আসিল। পরদিন প্রাতে মুখুটি মহাশয় পড়াইতে আসিলেন।

দিন দুই পড়াইবার পর একদিন মুখুটি মহাশয় ভবানীকে প্রশ্ন করিলেন, "যাঁকে দিদি বল তিনি তোমার কে হন?"

ভবানী কহিল, "দিদি।"

"বেশ! বেশ! ভাল ক'রে পড়াশুনো কর। তোমার দিদি খুসী হবেন, তা' তোমার দিদির বয়স কত?"

"জানিনে।"

"তা বেশ! বেশ! অঙ্কটা বেশ ক'রে শিখবে। তোমার দিদির স্বামী বুঝি নেই?"

রান্নাঘর হইতে এই সময় বিমলা ডাকিল, "ভবু?" ভবানী উঠিয়া গেল। তাহার পর মিনিট দশ পর ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দিদি বল্লে আপনাকে আর আস্তে হবে না। দুদিনের আর আজ সকাল বেলা—এই আড়াই দিনের মাইনে দিদি তেওয়ারীকে দিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দেবে।" মুখুটি মহাশয় আমতা আমতা করিয়া কি বলিতে গেলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ দরজার পাশ হইতে শব্দ আসিল— "আপনি বাড়ী যান্!" মুখুটি মহাশয় বুঝিলেন ইহার পর প্রতিবাদ চলিবে না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলেন।

পরের দিন তেওয়ারী আর এক মাষ্টার আনিয়া উপস্থিত করিল, তিনি প্রৌঢ় কিন্তু বিমলা লক্ষ্য করিল যে বহির পাতা অপেক্ষা দরজার ফাঁকের দিকেই তাঁহার মনোঝোঁক বেশী। তিনিও দ্বিতীয় দিবসে বিদায় পাইলেন। ভবানী খুসী হইল কিন্তু সে দিনেকের জন্য মাত্র। সেই দিনই ভবানীকে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার অবকাশ দিয়া তেওয়ারী সমভিব্যাহারে বিমলা শকটারোহণে নারায়ণী দেবীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল এবং তৎপর দিবস নারায়ণী দেবীর ত্রিভঙ্গিম অক্ষরমালা সম্বলিত একখানি লিপিকা লইয়া শ্রীযুক্ত ভাগ্যধর ভাদুড়ী বিদ্যাভূষণ, বি, মহাশয় বিমলার বাড়ীতে আগমন করিলেন। ভাগ্যধর বাবু বিশ বৎসর বয়সে বি, এ পাশ করেন তাহার পর জ্যোতির্বিদ্যায় নবদ্বীপের এবং ব্যাকরণ-জ্ঞানের জন্য ঢাকার পণ্ডিত-

মণ্ডলীর উপাধি লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র পাঠ করিলেন কিন্তু জ্যোতিষী, পণ্ডিত অথবা কবিরাজ কি হইবেন তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার স্ত্রী বয়সের ত্রয়োদশ বৎসরে মাতা, উনপঞ্চাশে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সপ্তদশে এবং বিধবা ভগ্নী বিংশ বর্ষে একসঙ্গে ষ্টীমারের ধাক্কা খাইয়া গোয়ালন্দের অনতিদূরে ডিঙ্গি নৌকাসহ জলমগ্ন হইলেন। ভাগ্যধর বাবু কলিকাতায় সদাশিব বাবুর ডিস্‌পেন্‌সারীতে বসিয়া কুষ্মাণ্ডখণ্ড প্রস্তুত করিতে করিতে সে সংবাদ শুনিয়া একঘণ্টাকাল নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পরে কহিলেন—"ভাগ্য!" ইহার পরেই ভাগ্যধর বাবুর কবিরাজ জ্যোতিষী অথবা পণ্ডিত হইবার আকাঙ্ক্ষা আর রহিল না। তিনি সুযোগ পাইলে বৈতনিক না পাইলে অবৈতনিক শিক্ষা-দান কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বাড়ীতে সম্পত্তি যাহা ছিল বাকী খাজনার দায়ে নীলাম হইয়া গেল, কোঠা বাড়ীর প্রথমে চূণ বালি তাহার পরে ইঁট এবং গত বৎসর ছাত শুদ্ধ ধ্বসিয়া পড়িল। ভাগ্যধর বাবু শুনিয়া কহিলেন, "ভাগ্য।" ভাগ্যধর বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া ভবানীর ছবির বহির পাতা উল্টাইতেছিলেন, বিমলা বাম চক্ষু মুদ্রিত ও দক্ষিণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দক্ষিণের বাতায়নের যবনিকার একটি আধলা পরিমাণ ছিদ্র পথে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। দেখিল যে বয়সে নবীন হইলেও দোতলার জানালা অথবা একতলার কলতলার দিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিবার কৌশল আগন্তুকের অভ্যস্ত নহে। বিমলার সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল—নূতন মাষ্টার আসিলে এবার সম্পূর্ণ ভাবে অসঙ্কোচে তাঁহাকে দর্শন দিয়া—তিনি যেই হৌন্ না কেন—তাঁহার কৌতূহল একেবারেই নিবৃত্ত করিবে, দরজার ফাঁকে উঁকি ঝুঁকি দিয়া সময়ের অপচয় করিতে দিবে না। বিমলা অনেকক্ষণ

দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার পর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া গুরুভার দেহখানি ধপ্ শব্দে তক্তপোষের উপর নিক্ষেপ করিয়া সোজা হইয়া বসিল। ভাগ্যধর বাবু মুখ তুলিয়া দেখিয়া অভ্যাস মত দুই ইঞ্চি সরিয়া বসিলেন। তাহার পর প্রশ্ন করিলেন, "কি পড়্‌বেন? জ্যোতিষ, ব্যাকরণ—"

বিমলা বাধা দিয়া কহিল, "আমি পড়্‌ব না।" বলিয়াই ডাকিল, "ভবু?" ভবানী ফজলী আমের একটা আঁটি চুষিতে চুষিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিমলা কহিল, "একে পড়াবেন। দু বৎসরের মধ্যে পণ্ডিত করে দিতে হবে, তিনটে পাশ দিলেই আর আপনাকে কষ্ট কর্ত্তে হবে না।" ভাগ্যধরবাবু অনায়াসে কহিলেন, "সে হবে, তবে সবই ভাগ্য!"

বিমলা কহিল, "আপনার মাইনে হবে"—ভাগ্যধরবাবু কহিলেন, "সে আর বেশী কথা কি? সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে। বোস খোকা।"

বিমলার যেন কোথায় আঘাত লাগিল, "ওর নাম খোকা নয়। ভবু—ভবানী।"

ভাগ্যধরবাবু কহিলেন, "আচ্ছা সে দেখ্‌ব। হাত ধুয়ে এস।"

বিমলা ভবানীর হাত ধোয়াইতে লইয়া চলিয়া গেল।

* * *

ইহার পর হইতে রীতিমত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিল। দশ-পঁচিশের ছক্ আলমারীর মাথায় অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিল, তাহার রক্তবর্ণ স্থানগুলি আর্শুলা চাটিয়া শাদা করিয়া ফেলিল, বিমলা সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিল না। তাহার ধ্যান জ্ঞান তখন ভবানীর পড়া। ভাগ্যধরবাবুর কাছে প্রাতঃকালে ভবানী পড়িতে বসিলে সে আয়-

প্রান্তে একখানি বঁটি লইয়া বসিয়া আবশ্যক অনাবশ্যক তরকারী কুটিত, বৈকালে ভবানীর পড়িবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের তিনঘণ্টা ঠিক্ একস্থানে বসিয়াই লুচির ময়দা ঠাসিত। ময়দা খাস্তা হইয়া পরে আঠা হইয়া যাইত তথাপি নড়িত না। ভবানী কবে একটা পাস দিবে কেবল তাহাই ছিল তাহার চিন্তা। মাঝে মাঝে ভাগ্যধরবাবুকে প্রশ্ন করিত—"ভবু পাশ দেবে কবে মাষ্টার মশাই?" ভাগ্যধরবাবু কহিতেন—"ভাগ্যে থাক্‌লে আস্‌ছে বছর।"

বিমলা নিশ্চিন্ত হইত, মনে মনে ভাবিত মিনুর পাশ দিতে আরও দুই বৎসর বাকী। ভবানী পাশ দিলে কেমন করিয়া সে ভবানীর হাত ধরিয়া নারায়ণী দেবীকে নমস্কার করিতে যাইবে, মিনু কেমন করিয়া ভবানীর মুখের দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিবে—ওঃ সে কি দিন! সে শুভদিন আসিবে কবে?

দেখিতে দেখিতে সে শুভ দিন আসিয়া পড়িল।

সেদিন বৈকালে সম্মুখে একখানি কুড়ি ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট পাথরের থালা লইয়া বিমলা লঙ্কা সহযোগে কালোজাম খাইতেছিল, এমন সময় ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া ভবানী কহিল—"আমি পাশ করেছি দিদি—ফার্ষ্ট ডিভিশন!" আবেগে বিমলার গলায় একটা জামের আঁটি আট্‌কাইয়া গেল। কোঁৎ করিয়া সেটি গিলিয়া ফেলিয়া সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ভবানীকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পর তাহাকে কোলে বসাইয়া তাহার সমস্ত মুখখানি চুমায় চুমায় পিচ্ছিল করিয়া দিল। বিমলা সদ্য ঝাল লঙ্কা চর্ব্বণ করিয়াছিল তাহার ঝালে ভবানীর গাল জ্বলিয়া যাইতে লাগিল তথাপি আনন্দে আবিষ্ট হইয়া সে নড়িল না। হঠাৎ ভবানী অনুভব করিল তাহার মাথায় টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। কারণ অনুসন্ধানের জন্য

কড়িকাঠের দিকে চাহিতেই ভবানী দেখিল বিমলার চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিতেছে।

ভবানী সার্টের আস্তিন দিয়া বিমলার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া কহিল,—"কাঁদ্‌ছিস্ যে?" বিমলা মনে মনে বগলামুখী দেবীকে নমস্কার করিয়া কহিল—"একখানা গাড়ী ডাক ভবু, মিনুদের বাড়ীতে যাই।"

(ক্রমশঃ)

বদন-ভস্মের পরে

কবীন্দ্ররে লুব্ধ ক'রে করেছ একি দেশ্‌বাসী
মাষ্টারীতে দিয়েছ তাঁরে চড়ায়ে;
হায় গো কবি, ঠাট্টা যারে করিতে আগে উল্লাসি
গর্ত্তে তারি আপনি এলে গড়ায়ে।
নড়িয়া ওঠে সেনেট দেখি নটরাজের ভঙ্গীতে
সকল দিক নাচিয়া ওঠে আপনি।
শুষ্ক পুঁথি ভাসাবে বুঝি রসের নব ভঙ্গীতে,
খাতার পাতে শিখাবে ছবি আঁকনি?

আজিকে হায় বুঝিতে নারি কিসের এটা মন্ত্রণা
অনেক কথা কহিছে শুনি কু-লোকে,

যোগ্যতর গুণীরে না কি করিতে গিয়ে বঞ্চনা
তোমারে শেষে আনিল টানি পুলকে।
সুশীল শহীদুল্লা কাঁদে ভিজা নয়ন-পল্লবে
খগেন বসি' গুঞ্জরিছে কি ভাষা ?
শশুরে হেরি' প্রমথ ভাবে এও কী কভু সম্ভবে ?
মর্ম্মাহত সুনীতি ছাড়ে সে আশা।

জগত না কি শুনিতে পাই চরণে তব লুণ্ঠিত
সাক্ষী আছে সোনার পুঁথী পাতাতে,
এহেন তুমি কিসের মোহে মোটেই নহ কুণ্ঠিত
আধেক দামে দীনেশ-পদে বিকাতে !
অনেক খেলা খেলিলে কবি নিজের পরে বিশ্বাসি
বদনখানি ফেলিলে শেষে পোড়ায়ে
কবীন্দ্ররে লুব্ধ করে' করেছ একি দেশবাসী
দীনেশ-পদে ফেলেছ তারে গড়ায়ে।

বিশ্বকবি, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বখোল

রবীন্দ্রনাথের মনের মানুষটি কিন্তু লোক ভাল নন; তিনি মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথকে দিয়া এমন সব কর্ম্ম করাইয়া বসেন কবি রবীন্দ্রনাথের ভক্তদের পক্ষে যাহা হজম করা কঠিন। শান্তিনিকেতন আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কথা আর বলিব না, অনেক বৎসরের অভ্যস্ত গলগণ্ডের মত উহার দুর্ব্বহ ভার আর আমাদের গায়ে লাগে না, কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁহার মনের মানুষ তাঁহাকে দিয়া যে দুইটি গুরুতর কাণ্ড ঘটাইলেন—একটি তাঁহার নিজের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাকুরী স্বীকার করা এবং অপরটি সাহেদ সুরাবর্দ্দী সাহেবকে বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা—ভাদ্রের প্রবাসীতে ('পত্রধারা'য়) তিনি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে ভাবে লিখিয়াছেন, "এই মনের মানুষই তো আমাকে একদিন আত্মনিবিষ্ট সাহিত্য-সাধনার গণ্ডী থেকে শান্তিনিকেতনের কর্ম্মক্ষেত্রে টেনে এনেছিল"—কিছুকাল পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী লওয়া সম্পর্কেও কি ঠিক তেমনই সহজভাবে মনের মানুষের উপর দায়িত্ব চাপাইয়া পত্রধারা লিখিতে পারিবেন? শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তাঁহার মনের মানুষ অর্থলোলুপ ও সুবিধাবাদী ছিলেন না এবং তখন এই মনের মানুষটির লৌকিক লজ্জাবোধ ছিল।

—

অর্থের অভাবে মানুষ যখন কোনও কাজ করে তখন তাহাকে সেই কাজের জন্য ব্যঙ্গ করিলে নির্ম্মমতা প্রকাশ পায়, সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার নিজের চাকুরী গ্রহণ করিবার জন্য কিছু বলিতে আমাদের

বাধিতেছে। কিন্তু বাগীশ্বরী-অধ্যাপক পদে সাহেদ সুরাবর্দ্দীর নিয়োগ? শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও অর্দ্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অপেক্ষা ঐ ব্যক্তিকে তিনি উপযুক্ত জ্ঞান করিলেন কোন্ হিসাবে? ভাইস্-চ্যান্সেলরের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া? মুসলমান বলিয়া? না, নাট্যশিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলিয়া? শেষোক্ত কারণে হইলে শিশিরকুমার ও অহীন্দ্র চৌধুরী কি অপরাধ করিয়াছিলেন? সতু সেন?

—

অবশ্য আমরা বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদে সাহেদ সুরাবর্দ্দী সাহেবের নিয়োগ সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের কোন্ মনোভাব কার্য্য করিয়াছিল, তাঁহার তৎকালীন অপরাপর কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহার বিচার করিতে পারি। তিনি সবে মাত্র পারস্যে জয়যাত্রা সারিয়া ফিরিয়াছেন। সেখানকার আতর গুলাব ও গুলবদনী সুন্দরীদের মোহ তখনও কাটে নাই; রাজদরবারের পোলাও ও কোপ্তা-কাবাব তখনও তাঁহার পেটে গজগজ করিতেছে; পারস্য-সম্রাটের নিকট হইতে ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যে কাল্‌চারাল যোগ স্থাপনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা আছে! তাহা ছাড়া, তাঁহার 'সমাস্যা-পূরণ' গল্পের কাশী প্রত্যাগত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জারজ মুসলমান পুত্রকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করার মত, বার্দ্ধক্য হেতু, তাঁহার ধমনীতে যে পীরালির রক্ত প্রবাহিত তাহা স্বীকার করিবার সঙ্কোচ তাঁহার কাটিয়াছে; পারস্য-দেশে কোনও অতি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে তিনি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছ একটি জবাবে মুসলমানদের সহিত তাঁহার যোগ-সম্পর্কও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তাঁহার দেবতা অপেক্ষা প্রিয় বাবুর্চ্চি মকবুলের কথা মনে হইয়াছে, যে ভাইস্‌চ্যান্সেলারের আমলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচহাজারী মনসবদার নিযুক্ত

হইলেন তাঁহার ধর্ম্মের কথা ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথাও মনে হইয়াছে—সুতরাং রমাপ্রসাদ চন্দ ও অর্দ্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে অকূলে ভাসাইয়া দিতে তাঁহার দ্বিধা হয় নাই।

—

এত জনের এত কথা মনে রাখিয়াও তিনি একটি লোকের কথা বিস্মৃত হইয়া ভাল কাজ করেন নাই, তিনি তাঁহার একমাত্র সুযোগ্য Publicity Officer শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দবাবু চটিয়াছেন এবং রামানন্দবাবু চটিলে আর যাহার যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের বিপদের আশঙ্কা আছে। রবীন্দ্রনাথ বিরূপ হইলে রামানন্দ বাবুর যে কোনই ক্ষতির ভয় নাই তাহা তাঁহার পারস্যভ্রমণবৃত্তান্ত বিচিত্রাকে বিক্রয় করাতেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। পারস্যভ্রমণ-বৃত্তান্ত রবীন্দ্রনাথ না দিলেও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুরূপ বৃত্তান্ত লিখিতেছেন এবং কেদারবাবুর লেখাই যে অপেক্ষাকৃত সুখপাঠ্য মনোরম ও সহজবোধ্য হইতেছে তাহা নিতান্ত কর্ত্তাভজা ব্যক্তিরা ছাড়া সকলেই স্বীকার করিবেন।

—

কিন্তু, ইহা অবান্তর কথা। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পাঁচ হাজার মুদ্রার লোভে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। অপর কাহারও নিকট অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রীত হইলেও ততটা দোষের হইত না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিরকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দূরছাই করিয়া আসিয়াছেন; স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ও অধ্যাপকবৃন্দ সম্পর্কে তিনি বহুবিধ কটূক্তি ও ব্যঙ্গ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীরূপে যে দিন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়

সে দিনও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ও উপাধিধারী বিদ্বজ্জন সম্পর্কে আপনার পূর্ব্বকৃত অপরাধ ক্ষালন করিতে গিয়া নানা পরস্পরবিরুদ্ধ কথা বলিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। যেমন—

(১) পণ্ডিতদের মধ্যে অভ্যর্থনা লাভ করিতে আমি অভ্যস্ত নহি; একথা সকলেই জানেন। যদি কখনও তাহা ভাগ্যে ঘটে আমি অতিরিক্ত গর্ব্বানুভব করি বটে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে চলি।

(২) জ্ঞান-সংগ্রহ এবং জ্ঞান-সঞ্চয় করিয়া তাহাতে ছাপ মারা আমার ভাগ্যে ছিল না, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম সম্মানও আমি অর্জ্জন করি নাই। সুতরাং বিদ্বানদের সহিত সমতার দাবী করিবার অধিকার আমি হারাইয়াছি।

(৩) আমিও যদি সেভাবে আমার বিদ্যার দারিদ্র্যের গৌরব করি, তবে আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-কারিগণ বলিবেন যে, ইহা আমার বিনয়ের বিকার মাত্র। আমার মনে মনে এই অহঙ্কার আছে যে, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন আমি তাঁহাদের নিকট একটা অসীম বিস্ময়। ছোট বেলায় আমি যে গুরু মহাশয়দিগকে ফাঁকি দিতে পারিয়াছি এজন্য আমি আমার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই যে পাঠ ছাড়িয়া পলায়ন, এই পলায়নই আমার মনে চির যৌবন সঞ্চারিত করিয়াছে। পাঠ-শালার বাঁধাপথে না চলিয়া সবুজ মাঠে অলস বিশ্রামে কাটাইয়া আমি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে অনন্ত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছি।...এইজন্য যে সমস্ত ছাত্র শিক্ষার যাঁতাকলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হয় নাই তাহাদের সহিত আমি আত্মীয়তা অনুভব করি।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি খাপ খাই না। তথাপি যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত আমার একটা সম্বন্ধ......ইত্যাদি।

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি যে inferiority-complex প্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু এইরূপ যাঁহার মনোভাব, মাঠে মাঠে প্রজাপতির মত উড়িয়া বেড়াইয়াই যিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান, সেরূপ ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল গাঁথা হলের মধ্যে বক্তৃতা করিতে দেওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ই বুঝিবেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ছাত্র তাড়াইয়া বিশ্বভারতীতে ছাত্রসংখ্যা বাড়াইবার একটা গুপ্ত অভিসন্ধি রবীন্দ্রনাথের আছে কি না বলিতে পারি না—তবে এটা ঠিক যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে সবুজ মাঠ নাই এবং বোলপুর শান্তিনিকেতনে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। গোপনে বলিয়া রাখা ভাল, এতদ্‌সত্ত্বেও উক্ত শান্তিনিকেতন হইতে এমন একটি ছাত্রও আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই যে অনন্ত সৌন্দর্য্য দূরে থাক খণ্ড সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাওয়ারও পরিচয় দিয়াছে, তবে যদি খণ্ড সৌন্দর্য্য বলিতে বিদেশিনী সহধর্ম্মিনী বুঝায় তাহা হইলে জনকয়েক কৃতকর্ম্ম হইয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে।

এই অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ (প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র—ঋষি ও গুরুদেব) আমাদের দেশের কৌপীনধারী সন্ন্যাসীদের লইয়া একটি কুৎসিৎ অমার্জ্জনীয় রসিকতা করিয়াছেন। বাহাত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মুরগীর হাড় চিবাইয়া স্যানাটোজেন না খাইলে যাঁহার দিন চলে না, সেইরূপ ঋষির পক্ষে এইরূপ রসিকতাই সম্ভব! রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা দারিদ্র্যকে আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই কৌপীনধারী সম্প্রদায়কে ভগবান অনুগ্রহ করুন—আমার মতে তাঁহাদের দারিদ্র্য স্বেচ্ছাকৃত নহে, বরং অলঙ্ঘ্যনীয়।"

পীরালি সম্বন্ধে যে অপবাদ সাধারণতঃ প্রচলিত আছে এই উক্তিই তাহার সমর্থন করিতেছে—যথার্থ হিন্দু কোনও ব্যক্তির মুখে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের এমন কদর্য্য অর্থ কখনও বাহির হইবে না। যে দেশের মহাদেব কুবেরের সম্পত্তির মালিক হইয়াও শ্মশানে মশানে কৌপীন-বন্ত হইয়া ঘুড়িয়া বেড়ান সে দেশের সন্ন্যাসীদের দারিদ্র্য অলঙ্ঘ্যনীয়ই বটে।

—

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা জিনিষ আমরা বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, হিন্দুধর্ম্ম, সমাজ ও আচার সম্পর্কে তিনি বরাবরই অত্যন্ত অসহিষ্ণু; একবার গোরার যুগে বাহিরের কাহারও প্রভাবে পড়িয়া হিন্দুধর্ম্মকে বুঝিবার বাসনা তাঁহার হইয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রদ্ধা টিকে নাই। নিজে অপরিমিত ভোগবিলাসের মধ্যে বাস করিয়া, মাংসাহার কালে এখনও পরাণকে অরুণবরণী করিবার প্রবৃত্তি লইয়া রহিয়া রহিয়া উপনিষদের বুকনি আওড়াইলেই যদি ঋষি হওয়া যাইত তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। ত্যাগ ও সাধনা ব্যতীত কোনও দেশে মানুষ কখনও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকারী হয় নাই—রবীন্দ্রনাথ জীবনে এমন কি ত্যাগ করিয়াছেন যাহার জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বলিবার দাবী করিতে পারেন? কাব্যমার্গে চীনাংশুক আলখাল্লা পরিয়া বিচরণ করিলেই গুরু হওয়া যায় না, গুরু হইতে হইলে তপস্যা প্রয়োজন।

—

থাক, এইবার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বকবির অভ্যর্থনা। যাঁহারা এই ব্যাপার দেখেন নাই তাঁহারা বিশ্বাসই করিতে পারিবেন না যে গোলদীঘির ধারে কলিকাতার বুকের উপর এমন আলিগড়ী ব্যাপার

সংঘটিত হইতে পারে। আর একটু পশ্চিমে গিয়া গ্যাঁড়াতলা পার্কে রবীন্দ্রনাথকে ঐ ভাবে অভ্যর্থনা করা হইলে আমাদের কিছু বলিবার থাকিত না।

—

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। বিশ্বকবিকে বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতার) বিশ্বভাবানুপ্রেরণায় সমারোহে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। ধারণা ছিল, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবি হইলেও জাতিতে বাঙ্গালী এবং বঙ্গভাষায় এক আধখানি বহি লিখিয়াছেন। কলিকাতা বাঙ্গালার রাজধানী এবং বাঙ্গালার অধিবাসীর মাতৃভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু সম্বর্দ্ধনার গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া মনে হইতেছে আমাদের ধারণাটা সম্ভবতঃ সত্য নহে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন ইংরাজী ভাষায়, সংস্তুত হইয়াছেন ফার্সী ও উর্দ্দু প্রশস্তি-কবিতার দ্বারা; নিজেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া। দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতেছি বঙ্গ ভাষা—বুল্ বুল্ এ 'জমীন্' বিশ্বের পিঁজরা টুটিয়া দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনে বিশ্বাতীত ফির্ দোসের মুখে সহযাত্রা সুরু করিয়াছে। খোস খবর। ইহার পর নব পদ্ধতি অনুযায়ী রামতনু-অধ্যাপক ডাঃ রবীন্দ্রনাথকে মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ছাড়িয়া রুজবেহার খাকানী, জামী, নিজামী, আনওয়ারী, আহেলী, হাফিজ, ফিরদৌসীর অধ্যাপনা করিতে দেখিলেই সকল ধোঁকা টুটিয়া যায় এবং সার হাসানের রহমতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'বিশ্ব' নাম সার্থক হইতে পারে।

—

অভ্যর্থনাটি বেশ মোগলাই রীতিতেই হইয়াছে। আতর গুলাব পিয়ালা, গুলরোখ খোবরুই সাকীরা না থাকিলেও ভাবে ভঙ্গীতে

কবিতায় ও বক্তৃতায় একেবারে মোগলাই। উর্দ্দ ও ফার্সী কবিতা পাঠ হইল। এক কবি রবীন্দ্র-প্রশস্তি গাহিতে গিয়া কহিলেন,—(ফার্সী হইতে অনুবাদ) "হে জগতের প্রিয় পাত্র সার হাসান তুমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ কিরীট মস্তকে ধরিয়াছ। সুফী সিহাবুদ্দিনের বংশের তুমি প্রদীপ, 'তোমারই তুলনা তুমি এ-মহী মণ্ডলে!' গ্রীসের পণ্ডিতরা বলিয়াছেন যে সূর্য্যের তুলনা সূর্য্য। হে সার হাসান, তোমার হৃদয় উদার ও বিদ্যা অসীম. আমি তোমার জন্য গর্ব্ব বোধ করিতেছি, যে হেতু তুমি জ্ঞানের সূর্য্যকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছ। তোমার অতিথির (রবীন্দ্রনাথ) জন্যও গর্ব্ব আমার নিতান্ত কম নহে; যাঁহার যশঃ শনিগ্রহ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।"* শনিগ্রহ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে কিনা জানি না তবে কবিকে নিশ্চয় শনির দশায় ধরিয়াছে নতুবা বৃদ্ধকালে অধ্যাপক বনিয়া এ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে কেন?

* 11. Now in the assembly of the large-hearted and generous Chief (of the University)
Like the sun and moon he entered the galaxy of the Wise.
12. The chosen one of the Universe, Sir Hassan, who
Has accepted the crown of the University of Calcutta.
13. How great is the dignified Suhrawardy in name and fame,
Who is the lamp of the family of the famous, the godly Shihabuddin.
14. So say the wise men of Greece,
The Sun is the proof of the Sun.
15. I am proud of your generosity and learning, O Sir Hassan!
That you have invited the Sun of learning to be your guest.
16. Not less am I proud of your honoured guest
Whose fame of excellence has reached the planet Satrnn.

নিজের ঘরে বসিয়া গৃহকর্ত্তা স্যার হাসান অভ্যাগতের প্রশস্তির সহিত এই উদ্ভট আত্মস্তুতিও অসঙ্কোচে উপভোগ করিলেন এবং তদনন্তর ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গলার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বাঙ্গালী কবিকে স্বাগত করিয়া প্রসঙ্গতঃ জানাইলেন যে পারশীক সভ্যতার সহিত কবির বংশের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের ফলে কবির কাব্যাদর্শ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। এই কথাটি ইতিপূর্ব্বে স্যার হাসান বেশ ঘোরালো করিয়া Golden Book of Tagore এও প্রকট করিতে মানস করিয়াছিলেন কিন্তু হিসাবে গরমিল ছিল বলিয়া সম্পাদক মহাশয়েরা প্রবন্ধটিকে বেঁড়ে করিয়া দিয়াছিলেন। স্যার হাসান একটু বিবেচনা করিলে ভাল করিতেন যে তিনি বাঙ্গলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার রূপে কবিকে স্বাগত করিতেছেন—পারশ্যের সাহের প্রতিনিধি হিসাবে নহে আর গোলদীঘির পশ্চিম পারের কোটাবাড়ীর নাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—তেহারাণের 'দারউলউলুম' নহে।

যাক্! ইহার পর কবির জবাব। মনে মনে 'পড়েছি মোগলের হাতে' ভাবিয়াই সম্ভবতঃ কবি খানিকক্ষণ বস্‌রার গুলবাগিচার কথা কহিয়াছেন। এ বিষয়ে আর কিছু কহিব না, তবে 'অঞ্জনা' নদীতীরের 'খঞ্জনা' গ্রামের কবির সেই 'রঞ্জনা' অশ্রুসজল চোখে যখন প্রশ্ন করিল,—তিনি আমার কথা কি বলিলেন?

কহিলাম—

আগর আন তুর্ক্-ই-শিরাজী ব-দস্ত আরদ দিল-ই-মারা।
বখাল-ই- হিন্দবস্ বখ্শম সমরকন্দ উ বোখারারা।

কিন্তু তোমার গালে যে তিল নাই সখি!

—

এইবার শ্রী খোল ও খোলন্দাজ রায় বাহাদুর খগেন মিত্রের কথা।

রবীন্দ্রনাথকে লইয়া তিনিই অর্দ্ধনারীশ্বর, রায়তন্ত্র প্রফেসর হইয়াছেন। এ বিষয়ে রায়বাহাদুরের কোনও দোষ আমরা দিতে পারি না। রাস্তার কোনও বাতুল যদি বাংলার লাটগিরির জন্য দরখাস্ত করিয়া বসে, সে অপরাধী নহে, লাটগিরি যদি তাহাকে কেহ দেয়, অপরাধী সে। তিনি না হয় কিঞ্চিৎ স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের কর্তৃত্ব কামনা করিয়াছিলেন কিন্তু আশ্চর্য্য হই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা ভাবিয়া যেখানে এরূপ ব্যক্তিরাও বাংলা-সাহিত্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবার স্পর্দ্ধা করিতে অবকাশ পায়। এই ব্যক্তির স্পর্দ্ধা যাঁহারা বজায় রাখিয়াছেন তাঁহারা বাংলাদেশ বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের যে কি ভয়ঙ্কর অবমাননা করিয়াছেন, মানুষ হইলে তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইত না। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক পদে বৃত হইবার কি গুণ ইহার আছে? রায় বাহাদুরী এ বিষয়ে গুণ নহে; স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর হইলেই এই পদ দাবী করা যায় না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইহার দান কি? ইনি বৈষ্ণব-ভাবে মুগ্ধ হইয়া খোল বাজাইতে পারেন। দুই একটা গল্প ও প্রবন্ধও লিখিয়াছেন এবং বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কিত দুই একটি পুঁথি অতি কদর্য্যভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত পদামৃত মাধুরী যে কি বস্তু হইয়াছে তাহা আমরাই ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এইটুকু যাহার মূলধন তাঁহাকে অধ্যাপক করিবার কথা যাঁহাদের মনে হইয়াছে, তাঁহারা হয় বাতুল নয় মতলববাজ!

অন্য যাঁহারা দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাঁহারাও উপযুক্ত কি না সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিতেছি না, কিন্তু রায় বাহাদুর খগেন্দ্র মিত্রের চাইতে যে প্রত্যেকে উপযুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই পদের

বেতন লইয়া বিচার করিলে চলিবে না, আসল কথা হইতেছে এই পদের সম্মান লইয়া। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে যাঁহারা কর্ম্ম করিতেছেন, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রলাল বসু, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন,—ইহাঁরা প্রত্যেকেই খগেন্দ্র মিত্র অপেক্ষা বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের দাবী করিতে পারেন—অন্য লোকের অভাবে ইঁহাদের কাহাকেও অধ্যাপক পদ দেওয়া হইল না কেন? সিনেটে এবং সিণ্ডিকেটে কি এমন একজন ব্যক্তিও ছিলেন না যিনি এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে পারিতেন? তাঁহাদের মাতৃভাষা বাংলা নহে? তাঁহারা কি সকলেই লাপল্যাণ্ড দেশের অধিবাসী?

—

পরম্পরায় শুনিতে পাইতেছি, স্যার আশুতোষের পুত্রেরাই রায় বাহাদুরের নিয়োগ সম্পর্কে উদ্যোগী ছিলেন। ইহা না হইলে আর পিতৃঋণ শোধ হয় কি করিয়া? পিতা অনেক দ্বন্দ্ব অনেক কৌশল করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন; তাহার মর্য্যাদা পুত্রের এরূপ ভাবে না রাখিলে কে রাখিবে! অথবা ইহা স্যার আশুতোষেরই দোষ—তিনি নিজের খ্যাতি ও জেদ বজায় রাখিবার জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটা স্থায়ী আসন রাখিয়া গেলেও বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে যথাযথ সম্মান করিবার জন্য কিছুই করেন নাই। তাহা তাঁহার উদ্দেশ্যও সম্ভবতঃ ছিল না। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার মোসাহেব ছিল, যাহারা তাঁহার চেয়ারের ছারপোকা অথবা ঘরের আরসোলা মারিয়া তাঁহার কৃপা অর্জ্জন করিয়াছিল, উত্তর কালে তাহারাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়াছিল, সেই সকল মোসাহেবদের ভাত-

কাপড়ের সুবিধা ছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য স্যার আশুতোষ অধিক কি করিয়াছিলেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আজ পর্য্যন্ত এমন কিছুই করা হয় নাই যাহাতে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোনও বিভাগের পরিচালনার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। কত কি তাঁহারা করিতে পারিতেন, বাংলাভাষার একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড তাঁহারা স্থির করিতে পারিতেন, এমন একটা প্রভাব এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দেশের সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতে পারিত যাহাতে অতি-আধুনিক সাহিত্য নামে যে কদর্য্যতা সম্ভব হইয়াছে তাহা সম্ভব হইত না। বাংলা সাহিত্যে যাহার একান্ত অভাব—যথার্থ সাহিত্যিক criticism তাহাও গড়িয়া উঠিতে পারিত; বাংলার একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অভিধান ও প্রচলিত ইডিয়মের বহিও আমরা দেখিতে পাইতাম।

—

আসলে এই দলেব উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার সেবা করা নহে—বাংলা ভাষার নামে যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তি হইলেই হইল! সুতরাং ভাল লোক, উপযুক্ত লোক বাছিবার প্রয়োজন ইহাদের নাই, এমন কোনো ব্যক্তি হইলেই চলিবে যে আত্ম-মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া সকল কাজেই দলপতির সহিত হেঁ-হেঁ করিতে পারিবে। খোলন্দাজ খগেনবাবুকে সেই সর্ত্তেই বাহাল করা হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু আশ্চর্য্য হই ইহা ভাবিয়া যে সমগ্র সেনেট সিণ্ডিকেটের মধ্যে এমন একজন লোক নাই যিনি এই অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দুকথা বলিতে পারিতেন! চাকুরীর মায়া কি এতই বেশী? অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর আমাদের শ্রদ্ধা ছিল, তিনিও কি ইহার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলিতে পারিতেন না? অথবা দুঃখ করা বৃথা, বিড়াল বনে গেলেই বনবিড়াল হয়।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য শেষ হয় নাই—বিশ্ববিদ্যালয়ের গলদ এত বেশী যে আমাদের বক্তব্য কখনই হয় তো শেষ হইবে না। এই পাহাড়প্রমাণ অনাচারের বিরুদ্ধে মাসের পর মাস তিল পরিমাণ আন্দোলন করিয়া আমরা বিশেষ যে কিছু করিতে পারিব এবন ভরসা পাই না তবুও ক্ষেত্র বিচার না করিয়া বীজ ছড়াইলে হয় ত তাহার কোনটি হইতে একদিন বিশাল মহীরুহের জন্ম হইতে পারে এই ভরসায় আপাতমনোহর কোনও ফল-প্রাপ্তির আশা না থাকা সত্ত্বেও আমরা এই কার্য্য করিব। রবীন্দ্রনাথ সুরাবর্দ্দী ও খগেন মিত্র মহাশয়ের নিয়োগ সম্পর্কেও এখনও অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে বাকী আছে। তা ছাড়া, পরীক্ষক নিয়োগ, পাঠ্য পুস্তক রচনা, উক্ত উভয় কার্য্যই অন্য লোক দ্বারা সস্তায় করাইয়া মাঝ পথে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি নানা ব্যাপার আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালীদের দ্বারাই পরিচালিত হয়, বাহিরের প্রভাব যৎসামান্য; সেখানে যদি এই সকল কুৎসিৎ ব্যাপার অহরহ সংঘটিত হইতে পারে তাহা হইলে স্বরাজ স্থাপিত হইলে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া কি কাণ্ড ঘটিবে সহজেই অনুমান করিতে পারি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনা আমাদের দেশের কলঙ্ক। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে দুই চারি জন সুদক্ষ ইংরাজ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিতেন তাহা হইলে অনেক অনাচারই রোধ হইত। বারান্তরে এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

সংবাদ-সাহিত্য

রবিবাসর ও কয়েকজন আধপাকা আধকাঁচা সাহিত্য-সেবীর সাধু উদ্দেশ্যই ছিল—৭২+১ বৎসর বয়সে অজাতশত্রু সম্পাদক ও প্রবীণ সাহিত্যিক রায়বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়কে তাঁহারা সাহিত্যের খাতিরে না হউক বয়সের খাতিরেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে মানস করিয়াছিলেন। কিছু অর্থব্যয় করিয়া আয়োজনও করা হইয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জলধর দাদার পাতে কতখানি শ্রদ্ধা গড়াইল জলধর দাদার হিমালয়ই বলিতে পারিবেন। আমরা বাহির হইতে যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হইল, ভারতবর্ষের যুগ্ম খুঁটি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সন্স হরিদাস বাবু ও সুধাংশু বাবুরই যেন জয়ন্তী (কাহার কত বয়স জানি না) হইয়া গেল। তাঁহারা দীর্ঘজীবী হউন।

—

জলধর সম্বর্দ্ধনায় যাঁহাদের উচ্ছ্বাস-প্রবন্ধ শোনা গেল তাঁহারা অধিকাংশই তরুণ—তরুণ-চূড়ামণি। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জলধর দাদা সাহিত্যপল্লীর যে অঞ্চলে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছেন, সে অঞ্চলে ঘোরাফেরা দূরে থাকুক, প্রবেশ করিতেই তরুণদের লজ্জা ও অপমান বোধ হয়। জলধর দাদা যে বস্তুর কারবারে যে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন বস্তাপচা বাসি জ্ঞান করিয়া তরুণেরা সেগুলি স্পর্শ তো করেই না, ঐ সকল দ্রব্যের কারবার করেন বলিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের অনুকম্পার অবধি নাই। তরুণদের মাসিক পত্রিকাগুলি ঘাঁটিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। হঠাৎ সেই জলধর দাদাকে

লইয়া এতখানি আমড়াগাছি করা—বৃদ্ধা ঠান্‌দিকে লইয়া নাত্নিরাও এতটা করে না! সুতরাং অনুমান করা গেল, ইহার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর বাংলার তরুণ সাহিত্যিকদের প্রচ্ছন্ন কোন মতলব আছে।

—

সম্মুখেই হরিদাস বাবু ও সুধাংশু বাবু বসিয়া, মতলব বুঝিতে দেরী হইল না। তরুণদের জলধর-বন্দনার ভিতরে ভিতরে প্রচ্ছন্ন অর্থ এই —হে বাংলাসাহিত্যের দুই দিকপাল, তোমরা খুসী থাকিও। তোমাদের কাগজের সম্পাদককে খাতির নিবেদন করিতে আমাদের কুণ্ঠা নাই, কারণ জানি তোমরা ইহাতে গর্ব্ব অনুভব করিবে; আমরা তাঁহাকে খাতির না করিলেও তোমাদের খাতিরে এই প্রহসনে যোগ দিয়াছি; তোমাদের নেক-নজর হইতে যেন আমরা বঞ্চিত না হই! তোমাদের জলধর সেনের কোন লেখাই আমরা পড়ি নাই—বটতলার বই আমরা পড়ি না—প্রব্‌লেমহীন, শাইকলজী-হীন বই পড়িতে আমাদের ঘৃণা হয়—কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়! তাঁহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য তাঁহার বই পড়ার কোনও আবশ্যক আছে কি? তোমরা উপস্থিত থাকিবে ইহা জানিয়াই আমরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রচনা করিয়া উপস্থিত হইয়াছি—যে অর্ঘ্য তাঁহার নামে উৎসর্গিত হইল আসলে তাহা তোমাদের প্রাপ্য; আমাদের মতলব যেন বৃথা না যায়। তোমরা খুসী থাকিও।

হয়তো তরুণদের মতলব হাঁসিল হইয়াছে, কে জানে! জলধর দাদারও দুঃখিত হইবার কারণ নাই; রবীন্দ্র জয়ন্তীর পর এত আয়োজন আর কাহারও বেলায় হয় নাই; ভিতরের কথা যাহাই থাকুক, তাহা তাঁহার শুনিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু একটি বিষয় ভাবিয়া দুঃখ হয়, শুনিয়াছিলাম, তরুণেরা বেপরোয়া, খাঁটির উপাসক,

পুরাতনকে বাসীকে খালি বোতলের মতই যেখানে সেখানে ফেলিয়া যান ; পয়সার খাতিরে তাঁহারা শেষে নিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করিলেন !

—

প্রেমেন্দ্র মিত্রও কম যান না ; একবার হাফ-জগাই খোকা হাকিম অন্নদা শঙ্করের মুখে শুনিয়াছিলাম, বাংলা দেশে প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন দুইজন—রামী রজকিনীর চণ্ডীদাস এবং—র অচিন্ত্যকুমার। মাঝখানে কেহ নাই।—এর লিখিলাম এইজন্য যে নাম গোপন করিলেও অচিন্ত্যকুমারেরও পরকীয়া, রজকিনী না হইতেও পারেন। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কিছু অবগত নহি, কিন্তু তাঁহার কাব্য পাঠে এইরূপই মনে হয়। চণ্ডীদাসের রজকিনীর কথাও কাব্যেই পড়িয়াছি। কোনও বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক লিখিয়াছেন—কাব্যই জীবন।

—

প্রবীণদের জয়ন্তী হয়, তরুণদের হয় Day। সেদিন সাহিত্যসেবক-সমিতিতে প্রেমেন্দ্র Day হইয়া গেল ; মীরাটের অবনীনাথ রায় আয়োজন করিয়াছিলেন সুতরাং একটু military গোছের আয়োজন হইয়াছিল। শুনিলাম যুগকবি একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্র—তিমি যন্ত্রের এবং মুটে মজুরের এবং ভাঙা শিরদাঁড়ার গান লিখিয়াছেন। তখন দিলীপকুমারের 'অনামী'র বিজ্ঞাপন দেখি নাই, দেখিলে প্রতিবাদ করিতাম, বলিতাম যুগকবি দিলীপকুমার, কারণ, এ যুগ বাতুলের যুগ। জগাই এবং হাফ জগাইয়েরা মিলিয়াই আসর সরগরম রাখিয়াছেন—সুতরাং প্রেমেন্দ্র মিত্রের খুসী হইবার কারণ নাই। বুদ্ধদেবের সার্টিফিকেটের মূল্যও বেশীদিন টিকিবে না কারণ, বৌদ্ধ যুগও শেষ হইতে চলিল ; জগাই মাধাই উঁকি মারিয়াছেন।

বড়-বিদ্যাভূষণকে চেনা ইস্তক 'বিদ্যাভূষণ' দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। শ্রাবণের 'উত্তরা'তে রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'বাংলাসাহিত্য' প্রবন্ধ ভয়ে ভয়ে পড়িলাম। বিদ্যার পরিচয় আছে! রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমের গঠিত নবীন বঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নূতন সজ্জায় দেখা দিলেন। বঙ্কিমযুগের পোষাক পরিচ্ছদ স্পর্শও করিলেন না। রবীন্দ্রনাথের সমস্তই নিজস্ব, সমস্তই আপনার হাতে তৈরি।"

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথকে খুসী করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বঙ্কিমের মৃত্যুর পর অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধ সাধনায় বাহির হইয়াছিল তাহার শেষ দিকে অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণ যে ভাবে স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে উপরোক্ত উক্তি সত্য বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য পরে পুস্তকাকারে যখন উক্ত প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয় তখন প্রবন্ধের শেষাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যাপক রবীন্দ্র-নাথের সাইকলজী ধরিতে পারিয়াছেন।

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তুলনা করিতে গিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেছেন—"রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-সুন্দরীর কমনীয় কানন শেফালিকা বধূর কলগীতিকায় মুখর, আর শরৎচন্দ্রের——পল্লীভবনের আশেপাশের জঙ্গলে ঘুঘু——"

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে রসিক তাহাতে সন্দেহ নাই। 'সুন্দরীর কমনীয় কানন' এবং 'শেফালিকা বধূর কলগীতিকা'—খরগোস শিকার করিতে গিয়া দক্ষিণ আমেরিকার পার্ব্বত্য শিকারীরা শালগমের মত শব্দ করে, এইরূপ শুনিয়াছিলাম। তখন বুঝিতে পারি নাই। শেফালিকা বধূর কলগীতিকা শুনিয়া ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হইল।

'সুন্দরীর কানন'——যাক। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ঘুঘু কথাটি খুব signi-ficant। বাংলা সাহিত্যের ভিটায় উক্ত পক্ষী চরাইতে একা শেষ-প্রশ্নের কমলই যথেষ্ট ছিল, সম্প্রতি শেষের পরিচয় ও শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব চলিতেছে। তবে এ বিষয়ে নীরব থাকাই ভাল, কারণ বেশী কিছু বলিতে গেলে ভক্ত দিলীপকুমার ও ভক্তবন্ধু ক্ষিতীশ সেন আই-সি-এস আবার চিঠি লেখালেখি করিবেন। 'ইঙ্গিত' পত্রিকাটি সংগ্রহ করিয়া আবার পড়িতে হইবে, উক্ত পত্রিকায় এত ছাপার ভুল থাকে যে পড়িতে রীতিমত কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা আছে।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শুনিয়াছি বাংলাসাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া বিষয়ক গবেষণা করিয়া উচ্চ ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু অর্দ্ধশিক্ষিত ও সিকি শিক্ষিত পরিচয়-গোষ্ঠীতে যোগ দিয়া তাঁহার মত পণ্ডিতেরা যে চৌরাস্তার মোড়ে নিজেদের বে-আব্রু করিয়া দেখাইতে পারেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। প্লেগ কলেরার মত সাহিত্যের ন্যাংটামি রোগটাও যে ছোঁয়াচে তাহা কে জানিত! আমরা 'বোলে' 'জোড়িয়ে' 'কোরে' 'হোয়েছেন' ইত্যাদির কথা বলিতেছি না—শ্রাবণের পরিচয়ে তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া' প্রবন্ধে এইরূপ বহু বিচিত্র ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার মত পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি কেমন করিয়া লিখিলেন—"এ ছাড়া আরো কত রকমে চতুর্দ্দশপদীকে যে রবীন্দ্রনাথ আপন কোরে নিয়েছেন তা তাঁর উৎসর্গ বা গীতাঞ্জলির পাতা ওলটালেই বোঝা যাবে।" গীতাঞ্জলির পাতা বার বার উল্টাইয়াও তো চতুর্দ্দশপদী কবিতার সন্ধান পাইলাম না; for private cir-culation only—গীতাঞ্জলির বিশেষ কোনও সংস্করণ নাই তো?

অধ্যাপক মহাশয় অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—"অন্য পক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তারুণ্যের গর্ব্বে স্ফীত হোয়ে স্পর্দ্ধাভরে সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ কোরতে লাগলেন—"আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের রুখবে;"—কোটেশনে এরূপ মারাত্মক ভুল করা যে বর্ব্বরতা তাহা অধ্যাপক-পুঙ্গব কি জানেন না?—একটু সাবধান হইয়া প্রবন্ধ লিখিতে বসিলে এরূপ হয় না। সম্ভবতঃ প্রমথ চৌধুরীর মত প্রিয়রঞ্জন বাবুরও হয়তো ধারণা, এদেশে কলম ধরিতেছি এই তোমাদের ভাগ্য—সাবধান হইয়াই যদি লিখিব তবে বিদেশী কাগজগুলি আছে কিজন্য? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভয় হয়; বাংলা সাহিত্যের বুঝি আর নিস্তার নাই।

—

বাংলাদেশের তরুণ ও তরুণীদের মনোভাব ঠিক এক নয়। তরুণেরা একটু অধিক অগ্রসর, তাহারা এখন শুধু দেহ-সম্ভোগের বিষয়ে লিখিয়াই সুখী নয়, সম্ভোগের পাত্রী বাছাই কার্য্যে তাহার নজর দিয়াছে; এমন একদিন ছিল যখন বাজারের বধূ, পথের বধূ, ঘরের বধূ, ঝি, মাসতুতো বোন, বৌদি কিছুতেই তাহাদের আপত্তি ছিল না। নরেনদার খেলার পুতুল, অচিন্ত্যকুমারের বেদে, শৈলজানন্দের বানভাসি, প্রেমেন্দ্রের পাঁক—এই সকল উপন্যাসেই নায়িকাদের এমন কোনই বৈশিষ্ট্য নাই যাহাতে চট করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু বেশীদিন এই অবস্থা রহিল না। ঢাকা হইতে বুদ্ধদেব আসিলেন—লুসী-ললিতা, সাবিত্রী বোস, অমিতা চন্দ ও শর্ব্বরী রায়ের পরিচয় উয়ারীর ধূলিকণা হইতে সংগ্রহ করিয়া; ইঁহারা শিক্ষিতা হোটেল-টেনিস-ডিনার-বিলাসী এরিষ্টক্র্যাটিক সোসাইটির মেয়ে—অন্ততঃ লেখক বুদ্ধদেব ও তাঁহার একনিষ্ঠ পাঠক সম্প্রদায়ের এইরূপই

ধারণা। ইতিমধ্যে 'টুটাফুটা'র অচিন্ত্যকুমার 'তুত্তোর' বলিয়া কলিকাতায় অন্য বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া ফিরিঙ্গী মেয়েদের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন—তাঁহার সদ্য প্রকাশিত 'প্রাচীর ও প্রান্তর' নামক উপন্যাসে এই পরিচয়ের আভাস আছে। এবং বিলাত প্রত্যাগত দিলীপকুমার ও অন্নদাশঙ্কর খাঁটি সাদা চামড়ার মেয়েদের সহিত ঘনিষ্ঠ মেশামিশির কথা লিখিয়া উত্তর কলিকাতাকে একেবারে লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ড বানাইবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। দিলীপের দুধারা, দোলা ও অন্নদাশঙ্করের আগুন নিয়ে খেলা, অসমাপিকা ও যার যেথা দেশ—শ্বেতদ্বীপবাসিনীদের কথায় পূর্ণ। এই প্রচণ্ড প্রগতির সহিত তাল রাখিতে না পারিয়া প্রেমেন্দ্র শৈলজা প্রবোধ ও জগদীশ ব্যাক-ডেটেড্ হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

—

ইতিমধ্যে দিদি ও মন্ত্রশক্তির দল কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া 'বুকের বীণা' পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন—কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। নায়ক অধিকাংশ স্থলেই রীতিমত আইনসঙ্গত, ভিন্ন দেশীয় দূরের কথা—ভিন্নজাতীয়ও নহে। তবে বিবাহিত স্বামী বা অবিবাহিত প্রণয়ীর সহিত যে প্রণয়-ব্যাপার এতকাল গোপন রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে, সেই গুপ্ত রহস্যেরই আভাস কিছু কিছু ইহারা দিতে চেষ্টা করিতেছেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক—

গভীর নিশীথ রাত্রে নিদ্রা গেল টুটি'—
… … … …
সন্তর্পণে ক্ষুদ্র চুমা আঁকি তার মুখে
উঠিতেই,—সে কহিল টানি লয়ে বুকে
"—কোথা যাও এখনো তো হয় নি কো ভোর"
দেখি শুকতারা সম হাসে চক্ষু ওর।

ধ্যানলোকে তপোভঙ্গ এলো মহাক্ষণ !
সৃজন-প্রলয়-লগ্নে কাঁপিছে অন্তর !

আত্মীয় কহিছে কেহ—"একি রুচি ওর ?—
শেষে কি না—ছি ছি—"

—

সুতরাং বাংলা সাহিত্যে নারী-প্রগতি পুরুষ-প্রগতির তুলনায় অল্পই হইয়াছে ; কিন্তু ঘি আর আগুন—বেশী প্রগতি হইতে কতক্ষণ ? সেই জন্যই ভয়।

—

ভাদ্রের উত্তরায় একটি কবিতা—'কিছুই প্রেমের মত নয়'—পড়িয়া স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের সেই বিখ্যাত 'কিন্তু সবার চাইতে ভাল পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়' মনে পড়িয়া যায়। উত্তরার কবিতাতে দুইই আছে—কবির লালাক্ষরণ একটু বেশী হওয়াতেই দোষ ঘটিয়াছে। কবি বলিতেছেন—

লাল ঠোঁট, কালো চুল, তুষারের মত শাদা বাহু,
মর্ম্মর-মসৃণ জানু, মুঠিভরা ছোট দুই স্তন,
শরীরের পাত্র ভরি' শরীরের উচ্ছ্বসিত সুরা—

তুষারের মত শাদা বাহু এবং মর্ম্মর মসৃণ জানু—কবির ভাগ্য ভাল ! White leprosy নয় তো !

—

এত অল্পে ঘাবড়াইলে কিন্তু চলিবে না। আরো আছে—

আঙুলের লঘু স্পর্শে শত শৃঙ্গারের উন্মাদনা ?

এটা কিন্তু একটা রোগ, চিকিৎসায় সারে। কিন্তু পাছে পাঠক

মন্দ কিছু ভাবিয়া বসেন, এই জন্য কবি হঠাৎ মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে দৌড় মারিয়াছেন—"ঈশ্বরের ইঙ্গিতের মত?" "ঈশ্বরের স্বর্গের মতন" এবং "নিজেরে কি দ্যাখো নাই শাপভ্রষ্ট দেবশিশু সম?" বুদ্ধদেববাবুর মত সকলেই নিজেকে শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর মত দেখিতে পারিবেন কেন? মানুষ হইলেই গ্লানি অনুভব করা স্বাভাবিক, দেবতার বাচ্ছা হইতে হইলে ভাগ্য থাকা চাই! ঈশ্বর যখন শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর বাবা তখন তাঁহার 'ইঙ্গিত' বুঝা যায়, কিন্তু ঈশ্বরের স্বর্গ—? ইংরাজী God's Heavenএর অনুবাদ নাকি?

—

তারপর—

…এই প্রেম? প্রেমে এত প্রেম? বাসনা অপরিসীম—
তৃষ্ণার নাহি কো তৃপ্তি—একী মৃত্যু! হৃদয়, হৃদয়!

যেন, বিদ্যুৎ আর একবার, আর একবার! Intensityর চূড়ান্ত! অতি অল্পে দিলীপকুমারের ভাব লাগে নাই, রবীন্দ্রনাথের নিকট cutting পাঠাইবার সময় এই কবিতার cutting পাঠাইলে রবীন্দ্র নাথেরও ভাব লাগিত!

—

'তার মত—ঠোঁটে-ঠোঁটে টুকটাক মিঠে পাখীপনা'? পড়িয় প্রাণের আবেগে একটা গোটা কবিতা লিখিয়া ফেলিয়াছি, যাহা অপরে প্রাণেও কাব্যোন্মাদনা জাগায় তাহা নিশ্চয়ই বড় একটা কিছু কবিতাটি এই—

তার মত—ঠোঁটে-ঠোঁট টুকটাক মিঠে পাখীপনা?
তাক বুঝে গালে গালে ধুপধাপ ত্বক্‌ আলোচনা,
চোখে চোখে চোখা চোখা খটাখট ভাষা বিনিময়—
কানে কানে কোনাকুনি খোনা খোনা কথায় প্রণয়!

চুলে চুলে চুলোচুলি চুলবুল চিকুর চাঁচর—
বুকে বুকে বকাবকি খচখচ নখের আঁচড়,
হাতে হাতে হাতাহাতি হাতিয়ার কিবা আছে আর,
পদে পদে misuse কি যাতনা হইল ভাষার !

'চলন্তিকা'য় কি 'টুকটাকে'র প্রয়োগ দেওয়া নাই ?

—

সর্ব্বশেষ পংক্তি—

'তবু কেন আপনার অপচয় ? তোমরাই বলো।'

বন্ধু, সেই কথাই তো আমরা এত কাল ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি, তুমি শুনিতেছ কই ? তাহার চাইতে বিবাহ করিয়া ঘর সংরার কর, আলো জ্বালিলে ভূতেরা যেমন পলায়ন করে, যাঁরাই থাকুন, এঁরা আর ওঁরা আর তাঁরা—সকলেই পলায়ন করিবেন।—অপচয় কখনই ভাল নয়, বিশেষতঃ তোমার শরীরটা যখন তেমন শক্ত নয় !

—

প্রবাসী পত্রিকা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি মাঝে মাঝে পক্ষপাত প্রদর্শন করিলেও দুই একটি সামান্য ব্যাপার ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক ও সাহিত্যিক বহু ব্যাপারেই ইহাতে নিরপেক্ষ আলোচনা হয় বলিয়া প্রবাসীকে আমরা শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, অন্ততঃ আমাদের এইটুকু ধারণা ছিল যে, ইহা কোনও গোষ্ঠী বা পরিবারের পত্রিকা নহে। এই কারণেই ভাদ্রের বিবিধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র শ্রীমান নিত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া একটি প্রসঙ্গ লিখিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এমন ব্যাপার সম্পর্কেও বিরুদ্ধ কথা লিখিতে হইতেছে বলিয়া অনেকে আমাদিগকে হৃদয়হীন বর্ব্বর মনে করিবেন জানি। কিন্তু আমাদের সাধারণ জ্ঞান-

বুদ্ধিতে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে, নিত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সহিত বাংলার জনসাধারণের যোগ কোথায় ?

মৃত্যু সকলেরই সমান, বহু লোক প্রত্যহ প্রিয় পরিজনকে কাঁদাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিন্তু প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে তাহা উল্লিখিত হয় না, উল্লিখিত হইতে পারে না, কারণ দেশের লোকের সহিত কাহারও ব্যক্তিগত শোকের কোনও সম্পর্ক নাই। রবীন্দ্রনাথের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন পত্র দ্বারা চলিত ; এইভাবে তাহা প্রকাশিত হইলে সুবৃহৎ ঠাকুর পরিবারের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ লইয়াই তো প্রবাসীর কয়েক পৃষ্ঠা ভরাইতে হইবে। তাহাতে সহৃদয়তা প্রকাশ পাইতে পারে, ন্যায়নিষ্ঠা প্রকাশ পায় না। অবশ্য ইহা ঠিক যে, নিত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ অথবা প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় যদি এমন কিছু রচনা করিয়া প্রকাশ করিতেন যাহাতে মৃত্যুর খবরটা ছাড়াও অন্য বস্তু প্রকাশ পাইত, অর্থাৎ লেখাটির কোনও সাহিত্যিক মূল্য থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার থাকিত না।

—

সব চাইতে বিসদৃশ ঠেকিতেছে এই যে প্রবাসীতে সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে উল্লেখ নাই। তিনি জীবনে ঠাকুর পরিবারের কেহ হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন নাই বলিয়াই হয় তো মৃত্যুতে প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ স্তম্ভে স্থান পান নাই ; অথচ ভদ্রলোক আজীবন একনিষ্ঠার সহিত বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, ব্যঙ্গ রচনায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন। কিন্তু অধুনাবিভ্রান্ত প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের নিকট বঙ্গবাণীর সেবক হওয়া রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র হওয়ার তুল্য গৌরবের বস্তু নহে।

বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রের মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হই না, কারণ বিচিত্রা প্রবাসী নয়—সাহিত্যের নামে এমন কুৎসিৎ মোসাহেবী পেশাদার মোসাহেবদেরও কল্পনার অতীত। বিচিত্রা যে সাহিত্যিক পত্রিকা বলিয়া এখনও উল্লিখিত হয়, ইহাই বাংলাভাষাভাষীদের পক্ষে কলঙ্কের কথা।

বিচিত্রার সম্পাদকীয় বিভাগ—নানা কথা। শ্রাবণের 'নানা কথা'য় 'দেশের কাজ ও বিশ্বভারতী' শীর্ষক প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিলেও মনের ক্ষোভ দূর হয় না। সাহিত্য সেবার নামে, পত্রিকা পরিচালনার নামে, এমন কদর্য্যতা যেখানে সম্ভব, একজন কবিকে দেবতা কল্পনা করিয়া মনুষ্যত্বের যে অবমাননা ইহারা করিয়াছেন তাহা মোহান্তদের ঘরেই সম্ভব; রবীন্দ্রনাথকে পূজা করিতে বসিয়া দেশকে এই কুৎসিৎ অপমান, এই জঘন্য মিথ্যাচার, দেশটা বাংলাদেশ বলিয়াই লোকে এমন অকুতোভয়ে করিতে সাহস করে।

এই বাতুল লিখিয়াছেন—

সমস্ত দেশের উদ্যম বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে মিলিত হলে দশ বছরের মধ্যে বাংলা দেশের চেহারা একেবারে বদ্‌লে দেওয়া যায়—এমন আশা করা মোটেই বাতুলতা নয়, বিশেষতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে রেখে। দেশের জন্যে কারাবরণের উপর প্রিমিয়মটা অতিরিক্ত মাত্রায় দেওয়া হচ্ছে; যাঁরা জেলে যাচ্চেন তাঁরা ভেবে দেখছেন না, জেলে গিয়ে শক্তির অপচয়ই হয়.........কয়েক সহস্র লোকের কারাবাসের মধ্যে যে প্রতিবাদ,—সমস্ত দেশের তরফ থেকে বিচার করলে তা দুর্ব্বলের ক্ষীণ প্রতিবাদের মতই শোনাবে, কার্য্যকরী হবে না। দূরদর্শী সত্যদ্রষ্টা ঋষি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগেই বুঝেছিলেন যে ভিতর থেকে এদেশের শক্তির উদ্বোধনেই দেশের মুক্তি, অন্য কোনো পন্থা নাই.........তাঁর নির্দ্দিষ্ট পথ যদি স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ থেকে দেশ-নেতারা অনুসরণ করতেন তবে গত পঁচিশ বছরের

ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতে পারত। আজও যদি সমস্ত দেশের মিলিত শক্তি বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্বভারতীকে বাঁচিয়ে রাখে তবে দেশের অদূর ভবিষ্যতের মধ্যে কিছু আলো দেখা যায়।……রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় মনীষী মহাপুরুষের জন্ম জগতে কচিৎ কখনো ঘটে,—তাঁকে পেয়েও যদি আজ ভারতবর্ষ মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে না পারে,—তবে ভারতবর্ষের দাসত্বের যুগ আরো কত শতাব্দি প্রলম্বিত (?) হবে কে জানে? এত বড় মনীষীরা জনপ্রিয়তার লোভে আপনার পথ থেকে কখনও এক তিলও বিচলিত হন না, তাই বোধ করি জনপ্রিয়তা তাঁদের ভাগ্যে বড় একটা জোটে না। যীশুখৃষ্টকে তাঁর সমসাময়িকেরা বোঝে নি, লাঞ্ছিত করেছিল; রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর সমসাময়িক লোকেরা বুঝল না। রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে অবশ্য সে জন্য কিছু এসে যায় না, এর বেদনা বহন করার শক্তি তাঁর মহত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে।

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার আন্দোলনকে তুচ্ছ করিয়া, দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ যাঁহারা তাঁহাদের কারাবরণ ও যন্ত্রণা ভোগকে উপেক্ষা করিয়া অতি সাধারণ স্বার্থপর ভোগবিলাসে আজীবন লালিত পালিত একজন ব্যক্তিকে (কবি হিসাবে তিনি মাথায় থাকুন) ভারতবর্ষের মুক্তির ঋষি বলিয়া প্রচার করার মধ্যে যে বীভৎসতা আছে তাহা মোহান্ধ বাঙ্গালী কি বুঝিবে? এই মৃত্যু—কারাবরণ—দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ সমস্তই তুচ্ছ—সার কি না, বিশ্বভারতীর সহিত যোগ স্থাপন করিয়া কাজ করা, তাহা হইলেই পঁচিশ বৎসরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া যাইবে? দশ বৎসরেই দেশের চেহারা বদলাইয়া যাইবে? সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত এই উপলক্ষে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হওয়া ইস্তক গত এগারো বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠান এমন কি কার্য্য করিতে পারিয়াছে যাহাতে দেশের লোক উহার সহিত যোগ দিতে পারিত? পঁচিশ বৎসরে দেশকে স্বাধীন করিবার মানস যাহাদের তাহারা এগারো বৎসরে কি একটি মানুষকেও মনের দিক দিয়াও স্বাধীন করিতে পারিয়াছে? বিশ্বভারতী দেশের কি কাজ করিয়াছে? ইহা তো রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার

পুত্রের জমিদারী মাত্র; চারিদিকে মোসাহেব পরিবৃত হইয়া দুই দশটা পুকুরে কেরোসিন তেল ঢালিয়া, দশজন লোককে কুইনিন বিতরণ করিয়া, বৈজ্ঞানিক চাষ-আবাদ ও পশুপক্ষী পালনের নামে পরের অর্থ জলের মত ব্যয় করিয়া, নৃত্যগীত নাটকাভিনয় ও চিত্রবিদ্যা শিখাইয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের affiliation সংগ্রহ করিয়া, ডিগ্রিবিলাসীদের প্রশ্রয় দিয়া, বিশ্বভারতী কি দেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিতেছে? কয়জন দেশের লোক এই প্রতিষ্ঠানকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকে? বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের কলঙ্ক না গৌরব?

এ বিষয়ে দেশের লোককে, জনসাধারণকে যে দোষ দেয় সে মূর্খ—দেশকে স্বাধীন করিবার শক্তি যাহার মধ্যে নিহিত—দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া যাহা ঘোষিত হইতেছে তাহার সহিত জনসাধারণ যোগ দেয় না এমন কখনই হইতে পারে না। ত্যাগের মহিমা, বৈরাগ্যের মহিমা তাহারা যাহার-মধ্যেই দেখে তাহাকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করে—তাহার নেতৃত্ব স্বীকার করে। স্বার্থপর মিথ্যাচারী ভোগ-বিলাসী জমিদার ও তাঁহার জমিদারীকে লোকে শ্রদ্ধা করিবে কেন? বিশেষতঃ সেই জমিদারী যখন মহৎ আদর্শের নামে ভিক্ষা ও ফন্দী-ফিকিরের অর্থে প্রতিষ্ঠিত, তখন দেশের লোক তাহা হইতে দূরে থাকিয়া ভালই করিয়াছে। নহিলে বিশ্বভারতীর প্রচারের তো কোনও ত্রুটি এই এগারো বৎসরে হয় নাই। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা অবধি সত্য ও মিথ্যা বিজ্ঞাপনে দেশ ও বিদেশ ছাইয়া গিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ ও সি এফ এণ্ড্রুজ, প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ ও বিচিত্রা, বিশ্বভারতীর পাব্লিসিটি ডিপার্টমেণ্ট, বড় লাট ও ছোট লাটের দল, বেতন দ্বারা নিযুক্ত বহু খ্যাতনামা পাশ্চাত্য মনীষী কেহই বিশ্বভারতীকে প্রচার করিতে কসুর করে নাই—জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করিবার

জন্য নানা মনোহারী বস্তুও সেখানে স্থাপিত হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে ফল হইয়াছে কি? মিথ্যা মানুষকে কখনও আকর্ষণ করে না—বিশ্বভারতীও করে নাই। তাহা জনসাধারণের দোষ নহে, বিশ্বভারতীরই অন্তঃসারশূন্যতা।

সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—এই মূর্খ লেখক জানে না যে, রাশিয়ার উক্ত প্রতিষ্ঠান বহু ত্যাগ স্বীকার বহু রক্তপাতের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে—উহার সহিত রাশিয়ার নাড়ীর যোগ আছে। তাহারা পদ্মপাতার উপর শয়ন করিয়া, স্ত্রীলোক নাচাইয়া, বিলাস-লালসার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া, কবিতা লিখিয়া, দেশকে স্বাধীন করিবার মতলব করে নাই—দেশের স্বাধীনতার জন্য তাহাদিগকে বহুপ্রাণ বলি দিতে হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও যীশুখৃষ্ট একই পর্য্যায়ের মানুষই বটে—মহাত্মা গান্ধী অতি সাধারণ ব্যক্তি! যীশুখৃষ্টের পিতার জমিদারী ছিল না, এই যা তফাৎ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যীশুখৃষ্টের সহিত রবীন্দ্রনাথের নামটি কি এক সঙ্গে উচ্চারিত হইতে পারে? যীশুখৃষ্ট এক মহান আদর্শের জন্য দীনদরিদ্র জনসাধারণের সহিত পথে পথে বিচরণ করিয়া অসীম যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন এবং শেষ অবধি নিজের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কি করিয়াছেন? মানুষ যতখানি ভোগবিলাসের কল্পনা করিতে পারে তিনি ততখানিই জীবনে ভোগ করিয়া আসিয়াছেন—কবিতা প্রবন্ধ ও উপন্যাসের জন্য কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁহাকে শুনিতে হইয়াছে, ইহার জন্যই কি তিনি যীশুখৃষ্টের সমান হইয়া গেলেন? তাঁহার মত সম্মান জীবনে কে পাইয়াছে—দেশের জন্য কোনও মহান আদর্শের জন্য, তাঁহার পান হইতে কখনও চূণ খসিতে দেওয়া হইয়াছে কি? তিনি একদিনও কি মানুষের দুঃখে দেশের দুঃখে ব্যথিত হইয়া পায়ে হাঁটিয়া পথে বাহির হইয়াছেন, তাঁহার মাথার উপরের বৈদ্যুতিক পাখা কি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম পাইয়াছে—তাঁহার ভোজন-টেবিলে এক দিনের জন্যও কি কোনও রাজভোগের অভাব ঘটিয়াছে? যীশুখৃষ্ট!—গোষ্পদের সঙ্গে সাগরের তুলনা!

মহাত্মা গান্ধী মহাপুরুষ, ত্যাগের মহিমায় তাঁহার সমস্ত জীবন উদ্ভাসিত তাই তিনি সমগ্র দেশের প্রাণে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—ভোগী বাবুর তাঁহাকে হিংসা করিবার স্পর্দ্ধা কেন! দেশের লোকের বড় অপরাধ তাহারা, এরোপ্লেন-মোটর-ফার্ষ্টক্লাস কুপে-মধু-মাংস-সিল্ক-সাবান-বিলাসী কবির অনুসরণ করিল না, মহাত্মা গান্ধীর সহিত কারাবরণ করিয়া 'শক্তি'র অপচয় করিল। সে শক্তি নৃত্য-গীত নাট্যাভিনয় ও রমণীবিলাসে ব্যয়িত হইলেই পঁচিশ বৎসরে দেশ স্বাধীন হইয়া যাইত—দেশ নেতাদের ভুল হইয়াছে!

—

কৌতুকের কথাও আছে—"আমাদের এই নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যের দেশে অচলায়তন জনমনকে চালনা করতে যে কতখানি শক্তির প্রয়োজন হয় তা' সহজেই অনুমেয়;—বিশ্বভারতীর বিবরণী পাঠ করিলে আশা হয়—যে তার আচার্য্য-প্রতিষ্ঠাতা তাঁর প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে এই শক্তির বীজ বপন করতে সমর্থ হয়েছেন। অদম্য উৎসাহে এই শ্রীনিকেতনে মানুষের **বাহ্যিক আন্তরিক** সকল রকম **রিপুর** বিরুদ্ধে সংগ্রামের আয়োজন দেখ্‌তে পাই।"

আশার কথা, বীজ উপ্ত হইয়াছে—নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যের দেশে অচলায়তন জনমনকে চালনা করিবার শক্তি বিশ্বভারতী অর্জ্জন করিতেছেন, কেমন করিয়া? বাহ্যিক কোন্ কোন্ রিপুর সহিত সংগ্রাম করা হইতেছে?—ম্যালেরিয়া মশা? আন্তরিক—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য? রসিকতারও একটা সীমা থাকা উচিৎ! আমাদের তো ধারণা এই যড়রিপুই বিশ্বভারতীকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—লোভের অন্ত নাই, মোহ ভীষণ, মদমাৎসর্য্যের মধ্যেই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা, ক্রোধ অতঃপর হইবে।

—

তবে আন্তরিক দুইটি রিপুর সহিত সংগ্রামের সংবাদ আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। বিশ্বভারতীর কোনও এক কর্ম্মচারীর সহিত বৃদ্ধা মাতা শান্তিনিকেতন আশ্রমের বাহিরে সুরুলে থাকিতেন। তিনি তাঁহার আবাসগৃহের মধ্যে কালীমূর্ত্তির পূজা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ হুকুম দিয়াছেন—এই বর্ব্বরতা তাঁহার জমিদারীতে চলিবে না। ইহা

রিপুর সহিত সংগ্রাম বটে। অথচ শুনিতে পাই, নিজামের কৃপায় মুসলমান ছাত্রেরা আশ্রম-গণ্ডীর মধ্যে নামাজ পড়ে, ব্রাহ্মমতে মন্দিরে উপাসনাও হয়!

দ্বিতীয় রিপু—বার্দ্ধক্য। বিশ্বভারতীর যে সকল কর্ম্মচারীর বয়স ষাটের অধিক হইয়াছে তাঁহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাহাত্তর—কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ!

—

ভাদ্রের প্রবাসীর কষ্টিপাথর দেখিয়া যাহা মনে হইল তাহা নির্ভয়ে প্রকাশ করিলে মানহানির আশঙ্কা আছে, তাই ভয়ে বলিতেছি যে, প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয়, এমন কি কোনও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মচারীও এই বিভাগে কি ছাপা হয় তাহা পড়িয়া দেখেন না। প্রবাসীতে তো ভাল প্রবন্ধ ইত্যাদি বাহির হয়ই—ইহা ছাড়া অনেক লেখক ভুল করিয়া, ঠিকানা না জানার দরুণ অথবা বাধ্যবাধকতার খাতিরে অন্যত্রও দুই একটি ভাল প্রবন্ধ ছাপিয়া বসেন—প্রবাসী সেগুলি কষ্টিপাথরে কষিয়া আত্মসাৎ করেন—ইহারই নাম কষ্টিপাথর!

এমন যে কষ্টিপাথর তাঁহাতে যদি 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসে'র মতন নিতান্ত পঞ্চমশ্রেণীর প্রলাপ-প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয়, কষ্টিপাথরটি কাজের বাহিরে গিয়াছে, নয়, যিনি কষিয়া দেখেন তাঁহার মতিভ্রম ঘটিয়াছে। প্রবন্ধটি হস্তলিখিত 'তরুণ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়, তারপর মুদ্রিত ইঙ্গিত পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। ভাদ্রের কষ্টিপাথরে ঐ প্রবন্ধটিই উদ্ধৃত হইয়াছে, আশঙ্কা হইতেছে কিছুদিনের মধ্যে লণ্ডনের Times Literary Supplement-এ উহার অনুবাদ বাহির হইবে। এ যেন কালিঘাট স্পোর্টিং, 'সি' ডিভিজন হইতে 'বি' ডিভিজন এবং বি ডিভিজন হইতে সটান 'এ' ডিভিজনে প্রমোশন পাইল। প্রবন্ধটির পয় ভাল।

—

প্রবন্ধটি বাতুলের প্রলাপোক্তি। বেশী দৃষ্টান্ত দিতে গেলে গ্রন্থ বাড়িয়া যাইবে; শুধু একটি দুইটি দৃষ্টান্ত দিলেই পাঠক বুঝিবেন—প্রবাসী কোথায় নামিয়াছে! মনে রাখিতে হইবে, প্রবন্ধটির নাম "আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যরস"।

১। "শিশু সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু। তাঁর "লাল কালো" বইখানা বঙ্গসাহিত্যের গৌরব।"

শুধু এই উক্তিটির জন্যই প্রবন্ধটি প্রবাসীতে স্থান পায় নাই তো!

২। "এঁদের সঙ্গে (রবীন্দ্রনাথ শরচ্চন্দ্র, কেদারনাথ ও রাজশেখর বাবু) সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নামও উল্লেখযোগ। অধুনা-বিলুপ্ত সবুজপত্রে প্রকাশিত সুরেশবাবুর লেখা 'হাসি' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ মূল্যবান সন্দেহ নাই!"

ইহার নামই গবেষণা—এবং এই গবেষণায় মুগ্ধ হইয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র প্রবাসী কষ্টিপাথরে এই প্রবন্ধের স্থান দিয়াছেন। গলায় দড়ি আরও সহজে জুটিতে পারিত!

অর্ব্বাচীন লেখক যাহা খুসী লিখিতে পারে, হাতের লেখা পত্রিকায় যাহা খুসী বাহির হইতে পারে এবং ইঙ্গিতের মত নগণ্য পত্রিকাতে রাবিশ প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রবাসীর কি দায়িত্ব-জ্ঞান মোটেও নাই! সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সবুজ পত্রে' লিখিতে পারেন কি না তাহাও প্রবাসীর কাহারও খেয়াল হইল না! 'সবুজ পত্রে' হাসি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয়! এদিকে তো দেখিতে পাই—গবেষণার রাজা প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন সাহিত্য ঘাঁটিয়া প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবাসীর কষ্টিপাথর ভরাইয়া তুলিতেছেন! সামান্য তারিখ ভুল হইলেও কাহারও নিস্তার নাই!

অথবা, সতীশচন্দ্র ঘটকের নাম করিতে প্রবাসীর বাধিয়াছে—না বিবিধ প্রসঙ্গে, না কোথায় উক্ত মৃত সাহিত্যিকের উল্লেখ করা হয় নাই—এই প্রবন্ধেই বা তাঁহার উল্লেখ হইবে কেন?

—

ভাদ্রের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপকতা' সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "যিনি একদা স্যার উপাধি বর্জ্জন করিয়াছিলেন——" ইত্যাদি

জানিয়া শুনিয়া রামানন্দবাবু ইহার উল্লেখ করিলেন কেন বুঝিতেছি না, হঠাৎ ড্রামাটিক হইবার লোভে তিনি একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন বটে কিন্তু 'স্যার' সম্বন্ধে মোহ তাঁহার কাটে নাই। ম্যাকমিলন কোম্পানী এই উপাধি বরাবরই তাঁহার গ্রন্থে তাঁহার নামের পূর্ব্বে বজায় রাখিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেন নাই। জাত বৈরাগীর মত মাংসের ঝোলের সঙ্গে মাংসখণ্ড পাতে পড়িলেও তিনি অখুসী নহেন এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তা ছাড়া, গত রবীন্দ্র-আর্ট একজিবিশনের গেটে, প্লাকার্ডে ও ছাপানো পরিচয়-পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের নামের পূর্ব্বে যে স্যার উপাধি দেওয়াছিল তাহা যে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞাতসারেই ঘটিয়াছিল তাহা রামানন্দবাবু ভালরূপেই জানেন। এবং আমরাও জানি, এই ব্যাপারে রামানন্দবাবুর সহিত রবীন্দ্রনাথের কিছু মনোমালিন্যও ঘটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন, শুধু স্যার (Sir) কেন, আমি শ্রী (Sri)ও বিসর্জ্জন দিতে পারি! ভাদ্রের প্রবাসী ও বিচিত্রায় তিনি শ্রী বিসর্জ্জন দিয়াছেনও। শিষ্য চারুচন্দ্র এ বিষয়ে গুরুর অগ্রজ হইয়াছেন।

—

ছোট সম্রাট শরৎচন্দ্রও বলিলেন, আমিও কেউকেটা নহি, শুধু শ্রী কেন আমি চট্টোপাধ্যায় পর্য্যন্ত ছাড়িতে রাজি আছি—চেনা বামুনের পৈতার প্রয়োজন কি? ফলে ভাদ্রের বিচিত্রায় শুধু 'শরৎচন্দ্র' শ্রীকান্ত লিখিতেছেন! চন্দ্রের যেরূপ আধিক্য দেখিতেছি, আমরা বলি 'শরৎ' শব্দটিরই বা আবশ্যক কি? শুধু 'চন্দ্র লিখিলেই তো দেখিতে শুনিতে ভাল হয়—অর্থও হয়! রবীন্দ্রনাথ দেখাদেখি লিখুন, শুধু 'নাথ' কারণ তিনিই বর্ত্তমানে ষাটহাজার গোপিনীর এক কৃষ্ণের মত সমস্ত স্ত্রীভাবাপন্ন বাঙালী জাতির 'নাথ' হইয়া আছেন।

"এরা আর ওরা এবং আরো অনেকের" একটি

লেখা শেষ কর্‌ব পরে, বসো না গল্প করি,
বারো কি চোদ্দ মিনিট তুমি হও প্রাণেশ্বরী,
আমি হই Swain তব, Swainই কথাটাতো ?
ডাকিও নামটা ধ'রে—ব'ল না প্রাণনাথো—
সেটা তো সইতে নারি। ব'সো না 'আল্‌গা' ভাবে,
আনাবো চকোলেট কি ? চা—না কফি খাবে ?
চুমু ? তা সেটাও ভাই, খেয়ো'খন যাবার বেলায়,
ঘামে যে ভিজে গেছ ! বুঝেছি, টেনিস খেলায়
এত নাই ঝোঁক থাকিল ; প্রেমও তো মস্ত খেলা,
অবিশ্যি ক্ষেত্র বড় জানি যে তোমার বেলা !
হোক্‌ না তাতেই বা কি, আসিলে পালা ক'রে
আমরা থাক্‌ব বেঁচে, যাবে কি তুমিই ম'রে ?
উস্‌খুস কচ্ছ কেন, তাতে কি, খাও 'সিগ্রেট'—
সমানে সাম্‌নে চেয়ো, মাথা নাই করিলে হেঁট।
তুমি কি ভয় পেয়েছ ? না আমি 'হাতাবো' না—
ব্লাউজের নীচে জানি ঘামটা ঠেক্‌বে 'নোনা' !
সেটা মোর পছন্দ নয়, আমি পাই উপরি যাহা,
উপরে ঠোঁট কি চুলে, for me enough তাহা
বাকিটা তারা এবং উহারা নিক বাটিয়া,
সত্যি, I pity them, আপনার নাক কাটিয়া

অপরের যাত্রা ভাঙা! হ্যাঁ—হ্যাঁ, 'বোতাম খোলো',
আমি যে হেথায় আছি, ক' মিনিট সেটাই ভোলো!
সহসা পাচ্ছি যেন, হাল্‌কা গন্ধ ফুলের
'পাউডার কিউটিকুরা'—অথবা তোমার চুলের?
ওটা কি 'ভ্যানিটি ব্যাগ'—ও হাতে টেনিস র‍্যাকেট,
ফুরাল সিগ্রেট কি? আনাচ্ছি আরেক প্যাকেট।
মুখটা তোমার হ'ল আবীরের মত রঙীন—
তাই তো—'হিস্‌ট্রিক্‌স্‌' কি? না, না দেখ I mean—
লাগে না—দেখ্‌তে ভালো ও মুখের মূর্ত্তি কালো—
সুইচটা off করে দি—ফোনে কে ডাক্‌ছে; "হ্যালো—
হ্যাঁ হ্যাঁ তৈরী লেখা, রাখিও পাঁচটা টাকা—
আধ্‌লা কম হবে না, দিয়েছ word পাকা—
রাইট ও—" ডাকাত বেটা, মুফতে গল্প নেবে—
এদিকে চুল পেকে যায় সারাদিন গল্প ভেবে।
সকালে ঘুম ভাঙিলে বিধাতায় ডেকে বলি
কোরো না উজার প্রভু, মগজের গল্প-থলি!
ফলে কি হয় জানো না—যারে পাই তারেই ধরে
মিলিয়ে সত্য ঝুটা নায়িকা নায়ক ক'রে,
ছেড়ে দিই গল্পে ছোট—হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিও আছ,
এখানে আসার কথা—এট্টু প্রেম-ছোঁয়াচ ও—
দেখ না; মুস্কিল কি,—রাম আর শ্যাম দাদাকে
নিয়ে এক গল্প লিখে দিয়েছি তাকে তাকে!—
বাপকেও দিনি ছেড়ে ছাড়িনি সৎমাকেও,
গুষ্টিতে যত আছে কুমারী বিধ্‌বা এয়ো—

আছিল বন্ধু যত তাহাদের বৌদি বহিন
ঢুকিয়ে ছাড়নু সবে আমার এই গল্পে গহীন্।
আহা হা চমকাও যে—আমায় তো খেতে হবে—
অচেনা লোক ধরি না—কে জানে কখন কবে
মান-হানির দায়ে ফেলে ঘোরাবে চর্কি ঘোরা,
তাইতে গল্পে আমার মা-মাসী বহিন পোরা!
এখনই উঠবে নাকি—খানিকটা বসো আরো—
বড্ডই লাগ্‌ছে গরম—তাতে কি, লজ্জা ছাড়ো!
ফিরিয়া যাবেই যদি মনটার রাশ টানিয়া—
দেখেছ কলম হাতে, জানো যায় গল্প নিয়া
এদেশী হ্যাংলা যত মাসিকের সম্পাদকে—
লেখাতে নিজকে চিনে চ'টো না গোপন Shock-এ।
আমার এ স্বভাব সখি পেটে যে খিদে আছে,
যেটুকু পাও নিয়ে যাও হীরা ভ্রম ক'রে কাচে!
কালো? তা তোমায় দেখ আঁকিব আল্‌তা দুধে
তোমার ঐ শরীর ভরা ও ফেনিল মদ-ওষুধে
বেচিব শিশি ভ'রে মাসিকের পাতে পাতে;
তোমারও গর্ব্ব হবে—আমারও দুধে ভাতে
এখানে থাকা হবে—উপ্‌রি লইব যাহা
পারি তো শোধ করিব এবারে ফিরে 'ডাহা'।
আজ আর নয় 'ত্যেতাত্যেৎ'—গল্পটা দিতেই হবে—
বিলিতি মরশুমী ফুল এদেশী মাটির টবে।

শনিবারের চিঠির

ভাদ্র সংখ্যা

৩১শে ভাদ্র বাহির হইবে

এবং

আশ্বিন সংখ্যা

১৫ই আশ্বিন বাহির হইবে

দুই সংখ্যাই পূজা সংখ্যা

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত। ৫ সি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, শনিরঞ্জন
প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংখ্যা] আশ্বিন, ১৩৩৯ [৫ম বর্ষ

কবি ও মহাত্মা

মহাত্মাজীর অনশনব্রত উপলক্ষে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ যে প্রাণ-পূর্ণ আহ্বান-বাণী বাঙ্গালীকে ডাকিয়া বলিয়াছেন তাহাতে স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথের সেই ভাবমূর্ত্তির পুনঃপ্রকাশ আমরা দেখিলাম—দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম; আমরা বাঙ্গালী, আমরা ইহাই ভালবাসি, ইহাই চাই। রবীন্দ্রনাথের মত কবি লাভ করিয়া আমরা যে অসামান্ত সৌভাগ্যের গর্ব্ব করি—আজও রবীন্দ্রনাথ সে গর্ব্ব চরিতার্থ করিয়াছেন; তাই রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া আছেন বলিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি, আমরা তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

* * *

সংবাদ পত্রে দেখিতেছি অনেকে মহাত্মাজীর এই ব্রত ও তাহার সাফল্য লক্ষ্য করিয়া এই ব্যাপারটিকে একটি modern miracle

বা একালের একটি অলৌকিক ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অলৌকিক বলিয়া আমরাও স্বীকার করি—কারণ এই ঘটনায় আমরা স্বদেশীযুগের রবীন্দ্রনাথকে ফিরিয়া পাইয়াছি—কতদিনের জন্ম জানি না, কিন্তু সত্যই পাইয়াছি। ভাষায় যদি প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা সম্ভব হয় তবে এই রচনাটির মধ্যে সেই অকৃত্রিম আবেগ,সেই স্বতঃউৎসরিত অনাবিল ভাবস্রোতের পরিচয় আছে —মানুষ রবীন্দ্রনাথের চেতনা-গহনে যে কবি-পুরুষটির বসতি আমরা সেকালে ক্ষণে ক্ষণে আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইতাম, ইহার মধ্যে বহুদিন পরে আবার আমরা সেই সদ্যোজাত শুচি-শুভ্র শিশু-প্রাণ বীর কবির সাক্ষাৎ পাইয়াছি। দ্বিসপ্ততি বৎসর বয়সেরও পরে: জয়ন্তী উৎসব সমাধা করারও পরে 'প্রবাসী' পত্রিকায় পত্রধারার মত ধর্ম্মব্যাখ্যারও পরে, রবীন্দ্রনাথের মুখে এই বাণী যে কত বড় miracle, তাহা আমরা অনুভব করিয়াছি। এজন্য ভারতের কল্যাণ-বিধাতা, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন জনকেই আমরা প্রাণের প্রণতি নিবেদন করিতেছি!

* * *

রবীন্দ্রনাথ কবি—তাঁহার জীবনের আদি মধ্য ও অন্ত, এই তিন কালেই তিনি কেবল মাত্র কবি; কবিত্বই তাঁহার স্বধর্ম্ম তাহাতেই তিনি পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সিদ্ধিলাভের পর তিনি শেষ জীবনে কিছুকাল ছুটি ভোগ করিতেছেন। সেই ছুটির অবসর-বিনোদনার্থে তিনি যাহা বলিয়া থাকেন, বা করিয়া থাকেন তাহা স্বধর্ম্ম সাধন নয়, পরধর্ম্ম লইয়া একটু খেলা মাত্র। তাহা যে খেলা তাহা যে সত্যকার মন্ত্রসাধন নয়—তাহা এতদিনেও না বুঝিয়া থাকিলে আজ তিনি তাহা বুঝিয়াছেন, ইহা যদি বিশ্বাস না

করি, তবে তাঁহার এই বাণীকে অবিশ্বাস করিতে হয়। সকল অভিমান, সকল মানস-বিলাস, সকল বাহ্যিকতা ভেদ করিয়া যে সহজ সরল সত্যসন্ধ কবিহৃদয় উহার মধ্যে সহসা আবির্ভূত হইয়াছে দেখিতেছি তাহাকে ত' অবিশ্বাস করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ বিশেষের অনুরাগী, প্রত্যক্ষের উপাসক—যে কবি-হৃদয় তাঁহার কাব্যে রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা নির্ব্বিশেষ ভাব-কল্পনার আধার নহে—যে কাব্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবি-পরিচয় বহন করিতেছে, তাঁহার রচনারাশির মধ্যে যেগুলি "কালের অগ্র-প্রসারিত করমুখে অঙ্গুরীয়ক-মণির মত চিরদিন দীপ্তি পাইবে"—সেগুলি নিছক ভাববস্তু নহে, মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়-সংঘাতজনিত উৎসধারার বিচিত্র রূপ-সৃষ্টি। সেই কবিকে আমরা আবার মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া পাইয়াছি। আজ ভারতবর্ষে যে মহাতপস্বী হোমানল জ্বালিয়া মানুষের চরম বেদনা চরম গ্লানির স্বস্ত্যয়ন কল্পে নিজ প্রাণ আহুতি দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন—পাপভারপীড়িত, অতিদুর্গত পরমাত্মীয়ের পরিত্রাণ-কামনায় নিষ্ক্রয় স্বরূপ নিজকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছেন—কবি রবীন্দ্রনাথ সেই মহাপুরুষের মহা-গৌরবদান দর্শনে স্থির থাকিতে পারিলেন না; মানসোৎক মরালের চঞ্চুপুট হইতে বিসকিশলয় স্খলিত হইয়া গেল, মহামানবের ভাব-সরোবরে বিহারের আশা ত্যাগ করিয়া শুভ্রপক্ষ বিহঙ্গম আবার এই কণ্টকশয্যাকীর্ণ পঙ্কিল জলাশয়ে অবতরণ করিল। Miracle আর কাহাকে বলে? মহাপুরুষের পুণ্যবলে মহাকবির মোহ দূর হইল।

* * *

বর্ত্তমানকালে ভারতে ব্যক্তি-মহিমার দুইরূপ প্রকাশ আমরা

দেখিয়াছি—মহাত্মা গান্ধী ও মহাকবি রবীন্দ্রনাথ; যেন দেশদেবতারই দুইরূপ, এক রূপ ফুটিয়াছে গঙ্গা-সাগরের শতবেণীসঙ্গমে, আর একরূপ ফুটিয়াছে গুর্জ্জরের সিন্দু-সিকতায়। বাঙ্গালীর প্রতিভায় ফুটিয়াছে বাণীর বামকরধৃত বক্ষশোভী কাব্য-শতদল—প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম, গুজরাটে দেখিতেছি দেশ-দেবতার প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তপস্যার্জ্জিত বরাভয়। পদ্মের সৌরভে নিদ্রাতুর জাতি স্বপ্ন দেখিয়াছিল, স্বপ্ন হইতে জাগিয়া সেই স্বপ্নস্মৃতির অপরূপ বেদনায় বিহ্বল হইয়াছিল। এই স্বপ্ন-জাগরণ এ জাতির ইতিহাসে একটা বড় অধ্যায়। স্বদেশী আন্দোলনের যে ভাবপ্লাবন একদিন বাংলাদেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া সারা ভারতকে পুণ্যস্নান করাইয়াছিল, তাহার মূলে যে শাশ্বত সত্যের মন্ত্রবল ছিল তাহা রবীন্দ্রনাথেরই অপূর্ব্ব কবি-ভারতী—দেশাত্ম-বোধ ও তাহার সাধনপন্থা সেদিন এমন করিয়া আর কেহ জাতির হৃদয়গোচর করিতে পারেন নাই; জাতীয়তার উদ্বোধনে ভারতের বিশিষ্ট সাধনাকে এমন করিয়া নির্দ্দেশ করিতে আর কেহ পারেন নাই। সেদিন কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সে যজ্ঞের ঋষি-পুরোহিত; গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় তিনি দেশদেবতার যে প্রতিমা, ও সেই প্রতিমার যে অর্চ্চনাবিধি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—মহাত্মাজীর সাধন-মন্ত্রে তাহার প্রভাব আজিও সুস্পষ্ট। তারপর বাণীর কাজ ফুরাইল; সে বাণী ব্যর্থ হয় নাই বটে, সে বাণী পথ নির্দ্দেশ করিল বটে, কিন্তু তপ্ত কঙ্করময় দুর্গম পথে সে স্বপ্নসঞ্চরণ ভাঙ্গিয়া গেল; কানে গানের রেশ রহিয়াছে, কিন্তু প্রাণ চায় প্রাণ; পন্থকে গিরিলঙ্ঘন করিতে হইবে, হাতের মুঠার মধ্যে পাথেয় চাই, দেহের স্নায়ুশোণিতে শক্তি চাই, পথশ্রম ভুলিবার জন্য মহাপ্রেমিক সঙ্গী চাই—যার জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুতারকায় দূর তীর্থের আশ্বাসদীপ্তি, ললাটে দুর্জ্জয়

সঙ্কল্পের কুঞ্চন-রেখা, অধরে মৃত্যুঞ্জয়ী আনন্দের স্থির হাস্য ; অথচ, যে আমার পাপ-দুর্ব্বল আত্মার বেদনা জানে, যে আমাকেই সেই পরমতীর্থে উত্তীর্ণ করিবার জন্য পথে বাহির হইয়াছে—আমার উপবাসক্লিষ্ট, পিপাসাপাণ্ডুর মুখে চাহিয়া যার ভাবনার অন্ত নাই। কবি পিছাইয়া রহিলেন—পথিপার্শ্বে নিকুঞ্জভবনে আশ্রয় লইলেন ; তখন বেলা বাড়িয়াছে, মরুপথ-যাত্রীর মাথার উপরে তপ্ত-তাম্রাভ নভোমণ্ডল ; পথিক-জনতা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু সে যাত্রাপথ দিশাহীন, এমন সময়ে এ কোন্ দ্বিতীয় দিশারীর আবির্ভাব হইল !—

জয়ভেরী তার বাজে কি বাজে না—সে ভাবনা নাই বটে !—
লিখিল না কেহ নামটি তাহার উদ্ধত ধ্বজ-পটে।
কোন্ পথে সে যে কোন্ দিক দিয়ে হেথায় দাঁড়াল আসি',
মৌসুমী বায়ু সঙ্গে যেমন সুমেদুর-মেঘরাশি—
সে কথা কেহই জানিবার আগে হঠাৎ দেখিল দেশ,
নব-শ্রাবস্তি জেরুজালেমের অপরূপ এ কি বেশ !

অধরে তাহার মৌন-মহিমা, ললাটে অমৃত-ভাতি,
নয়নে গভীর প্রসাদ-দীপ্তি, হেরিছে প্রভাত রাতি।
ক্ষীণ তনু, তবু বজ্রে রুখিতে ঝড়েরে বাঁধিতে জানে !
উদ্যত ফণা কালিয় তাহার বাঁশীর শাসন মানে !
জন-সমুদ্রে কল্লোল ওঠে—'অবতার ! অবতার !'
রুদ্ধ-নিশাসে হেরিছে ভারত নবলীলা বিধাতার।

* * *

সে আজ দশ এগারো বৎসর পূর্ব্বের কথা—বিধাতার এই নব-লীলার শেষ এখনও হয় নাই, প্রাণের সেই অফুরন্ত দান-উৎসব এখনও

চলিয়াছে! বঙ্গোপসাগরের শতবেণীসঙ্গমে গঙ্গার কলকলভাষ যখন নীরব, তখন পশ্চিম সাগর-কূলে দধীচির আশ্রমে মৃত্যুঞ্জয়-যজ্ঞের মন্ত্ররাবে আকাশ বাতাস শিহরিয়া উঠিতেছে।

* * *

তথাপি সে যজ্ঞে কি সামগানের পালা একেবারেই শেষ হইয়াছে?—উদ্গাতার প্রয়োজন কি আর নাই? সারাভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে এতদিন ধরিয়া যে অগ্নিষ্টোম যাগ অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে কি কেবল হবন-কর্ম্ম ছাড়া আর কোনও কর্ম্ম নাই?—ভারতের বাণীকে যিনি সপ্তদ্বীপা মেদিনীর চতুরুদধিপারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন সেই মহাকবির কণ্ঠ নীরব কেন? যে কবি এখনও বাঁচিয়া আছেন, যাঁহার লেখনীর মসীকর্ম্ম এখনও অব্যাহত রহিয়াছে—ভারতবিধাতার এই নবলীলার কীর্ত্তন-গীতি তাঁহার কণ্ঠে রুদ্ধ হইয়া আছে! বিস্ময়ের কথা নয় কি? নৃত্য-গীতমুখর কলাভবনে যাঁহার নিত্যনূতন অভিনয়-চাতুর্য্যে শর্ব্বরীর শশধরও রশ্মিরোমাঞ্চে বিহ্বল হইয়া উঠে—জরাকে জয় করিবার রসায়ন-বিদ্যা যিনি এমন করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন, মৃত্যুকে যিনি প্রিয়তম বল্লভের মত বীণার গুঞ্জনে ঘুম পাড়াইবার কৌশল অবগত আছেন—সেই নট-চূড়ামণি কবি যাদুকর সুর-সপ্তকের মায়াজাল রচনা করিয়া যে ভাবের ভুবনে এখন বাস করিতেছেন—সেখানে সত্যই কি ধরিত্রীর আর্ত্তরোদন পশিতে পারে না? মহাত্মার আত্মদান, কোটী-নরনারীর এই অমৃত-বাসনা, পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব-সাধনার এই প্রাণপণ প্রয়াস এই নাট্যনিপুণ কলাবিলাসীর বিলাস-লালসায় আঘাত করিতে পারিল না! বিস্ময়ের কথা নয় কি? এত বড় কবির সে কবি-প্রাণ কোথায় গেল? সে প্রাণ আত্মপ্রসাদের কোন্ দুর্ভেদ্য দুর্গ

নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছে? কবি কি তবে মহাপ্রাণ মহাপুরুষ নহেন—মহাত্মার সঙ্গে মহাকবির কি কোনও সম্বন্ধ নাই? গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ—এ দুইটি নাম কি মানব-মহত্ত্বের কোনও একটা গভীর ঐক্য-সত্যের পরিচায়ক নহে? ভারতবর্ষ আজ মহাকালের যে রঙ্গভূমিতে পরিণত হইয়াছে—মানব-সাধনা ও সভ্যতার মন্বন্তর-সঙ্কটে আজ যে সমস্যা-সমাধানের ভার তাহার উপরে পড়িয়াছে—তাহাতে কি কেবল মহাত্মার স্থান আছে, কবির নাই?

* • *

ইদানীন্তন কালের নট-কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার একটা উত্তর নিজেই নানা আচরণ-অনুষ্ঠানে, ভাবে ও সুরে, বাণী ও বক্তৃতায় দিয়া আসিতেছেন। আজ সহসা তিনি যে ভাবে পুনরায় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য বুঝিতে হইলে প্রথমে সেই উত্তরটির একটু আলোচনা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন একটি ভাবপ্রধান নাটকের অঙ্কপরম্পরা। ভক্তেরা বলেন, উহাই তাঁহার কবিজীবনের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য—উহা নাট্য-লীলা নহে, অর্থাৎ নানা কালে নানা ভূমিকার অভিনয় নহে—একই অক্ষয় অব্যয় মানবাত্মা উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহন করিয়া নব নব বিকাশ-মহিমায় আপনাকে মহিমান্বিত করিয়া আত্মার অবিশ্রান্ত প্রগতির পরিচয় দিতেছে; ভ্রমর যেমন একই পুষ্পে লগ্ন না থাকিয়া ক্রমাগত পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়া মধুচক্র পূর্ণ করিয়া তোলে, কবি রবীন্দ্রনাথ তেমনই অমৃতের অভিযানে তাঁহার আত্মাকে ধরণীর পুষ্পবাটিকায় কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তর-ভ্রমণে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন—তাঁহার সেই বিভিন্ন বেশ-বাস, বিভিন্ন ভ্রমণভঙ্গি ও বিভিন্ন গীতিগুঞ্জন, একই আত্মার একই আনন্দ-সন্ধানের বিপুলতর

সাফল্যের পরিচয় দেয়। কথাটি বড়ই গভীর, বড়ই সান্ত্বনাপ্রদ। কিন্তু এ সাধনার মাহাত্ম্য সাধারণে বুঝিবে না—কারণ সাধারণ মানুষ পতঙ্গ নয়, ভ্রমরও নয়, আবার কেবলমাত্র আত্মনিষ্ঠ 'আত্মা'ও নয়। 'আত্মা' বলিতে তাহারা হৃদয় নামক একটা বস্তুকে বাদ দিতে চায় না; সেই হৃদয়ের একটা ধর্ম্ম—আসক্তি, অর্থাৎ কোনও কিছুতে লগ্ন হইয়া থাকা—ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে, সত্য হইতে সত্যান্তরে, এক নীতি-মার্গ হইতে ভিন্নতর নীতিমার্গে বিচরণ করিবার মত আত্মিক অনাসক্তি তাহারা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে না, কারণ তাহারা এখনও মনুষ্যত্ব-সংস্কারে আবদ্ধ। হয় ত' তাহারা মহাপুরুষ, মহাজ্ঞানী, বা তপস্বী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা, অস্পষ্ট হইলেও, বিশ্বাস করিয়া লয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি—অর্থাৎ সহজ স্বাভাবিক মনুষ্যহৃদয়ের যে গভীরতম অনুভূতি কবিত্বের নিদান—তিনি সেই কবিত্বের অধিকারী; তিনি মহাজ্ঞানী, ঋষি, তপস্বী বা সন্ন্যাসী নহেন; এমন কি, মহাপুরুষ বলিতে ঠিক যাহা বুঝায়, তিনি তাহাও নহেন;—ভারতবর্ষের হিন্দুজনসাধারণের সংস্কারে মহাপুরুষের যে সকল বিশিষ্ট লক্ষণ দৃঢ়মূল হইয়া আছে, রবীন্দ্র-চরিতে তাহার কোনটাই নাই—মহাত্মা গান্ধীর পার্শ্বে তাঁহাকে দাঁড় করাইলেই কাহারও তাহাতে সন্দেহ থাকে না, বিচার-বিতর্কের প্রয়োজনই হয় না—এ যেন—Look on this picture and on that!

* * *

অতএব সাধারণ জ্ঞানে রবীন্দ্রনাথ কবি—তিনি মহাপুরুষ নহেন। তাঁহার জীবনে ত্যাগ নাই, ব্রতপালন নাই, দেহকে দমন করিয়া তাহারই আসনে আত্মার প্রতিষ্ঠা নাই—জীবনের কোনও ক্ষেত্রে

বুদ্ধ গান্ধীর মত তপস্যাও নাই, প্রেমের পরিচয়ও নাই। না থাক, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের গৌরবহানি হয় না, কারণ তিনি কবি, তিনি মহাপুরুষ নহেন। কিন্তু বিপদ হইয়াছে এই যে, তিনি কবির ভূমিকা ত্যাগ করিয়া মহাপুরুষ বা ঋষির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন—ভক্তেরা বলিতেছে, তিনি এ যুগের মহা-মানুষ, মনুষ্যত্বের যাহা সার সেই আত্মানুশীলনের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে তাঁহার জীবনে—তিনি বুদ্ধ নহেন, গান্ধী নহেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ।

* * *

তাই রবীন্দ্রনাথের কবি-আখ্যাও তাঁহার সমগ্র বা সত্য পরিচয় নহে—তিনি আত্মানুশীলনের মহতী সাধনায় তাহারও অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন, তাঁহাকে আধুনিক কালের ঋষি বলিলে কতকটা যথার্থ হয়—তথাপি তিনি ঋষিরও অনেক উচ্চে। ঋষিরা কেবল জীব-ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ মহামানববাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। এ হেন রবীন্দ্রনাথ কি আজও বাঁশী বাজাইবেন ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার প্রেরণায়? সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু ও সুউচ্চ উষ্ণীষ যে নিরাকার 'পুরুষং মহান্তং'কে সাকার করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সহিত পথধূলিম্লান স্বেদজলক্লিন্ন কৌপীনধারী মানবক—হিন্দুত্বাভিমানী জাতিহিতার্থী কূপমণ্ডুকের সহযোগিতা! রবীন্দ্রনাথ একথা বলেন নাই সত্য রবীন্দ্রভক্তেরাও এত মুক্তকণ্ঠ এখনও হন নাই; কিন্তু গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি পুরুষের তুলনা যখনই তাঁহাদের মনে উদয় হয়, তখনই উভয়ের 'কালচার' যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, ইহা মনে করিয়া তাঁহারা কাহার প্রতি ভক্তিগদগদ হইয়া উঠেন তাহা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেন নাই বটে, তিনি গান্ধীজীর তপস্যার বিরুদ্ধে কোনও

অভিমত স্পষ্ট করিয়া জ্ঞাপন করেন নাই বটে, কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি দেশের অতীত বর্ত্তমান সাধনা, হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস এবং এই জাতীয়তার আন্দোলনকে যে ভাবে আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন, এবং সেই সঙ্গে বিশ্বমানবতা-ধর্ম্ম ও মহামানব-দেবতার যে মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে। রবীন্দ্রনাথ যে এখন এই আন্দোলন হইতে দূরে আছেন তাহার কৈফিয়ৎ ইহাই। সে কথা ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—কেবল প্রবন্ধে, গানে, কবিতায় নহে, কেবল বিশ্বভারতীর আদর্শ-ঘোষণায় নহে, তাঁহার নবতম প্রচার প্রচেষ্টায়—'মানুষের ধর্ম্ম' নামে এক অতি পুরাতন ভাববিলাসকে একটি অতি অভিনব ধর্ম্মরূপে প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষায়। এই ধর্ম্মের যিনি উপাস্য সেই দেবতার নাম মহামানব—যিনি উপাসক তাঁহার নাম অতিশয় স্বার্থপর ভাববিলাসী 'অহং'। রবীন্দ্রনাথ এতদিনে নবধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা ধর্ম্মগুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতের অগ্নিক্ষেত্রে আজ যে ব্রতধারীরা প্রেমের ত্যাগের সত্যের ও তপস্যার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া আত্মবিসর্জ্জনে বদ্ধপরিকর, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের সেই আত্মদানব্রত উপেক্ষা করিয়া, নিজ দেশ ও জাতির পরিত্রাণ-চিন্তা বর্জ্জন করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণচিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ঋষিও নহেন মহাপুরুষও নহেন; সেদিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিতেও নারাজ; তাঁহার দৃষ্টি ধর্ম্মক্ষেত্র য়ুরোপের উপর নিবদ্ধ—কারণ তাঁহার মতে সেইখানেই আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ মানুষ ও ঋষিদের আবির্ভাব হইয়াছে। কিছুকাল ধরিয়া 'প্রবাসী' পত্রে তিনি 'পত্রধারা' নামে যে ধারাবাহিক ধর্ম্মালোচনা সুরু করিয়াছেন তাহার তত্ত্ব এতদিন

তাঁহার হৃদয়-গুহায় নিহিত ছিল, কবি রবীন্দ্রনাথ তাহাকে নানা ছলে, নানা ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াও খুব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিতেছিলেন না—এতদিন কেবল জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকেই তিনি ধিক্কার দিয়া আসিতেছিলেন ; এক্ষণে ভারতীয় হিন্দুর ধর্ম্মসাধন-পদ্ধতি ; তাহার পূজাবিধি, পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠান, তাহার সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের আদর্শ ; তাহার ভগবৎ-প্রেম-পিপাসা-নিবৃত্তির নানা উপায়, তাহার আত্মবিস্মৃতি ও আত্মনিবেদন—এই সকলকেই তিনি হেয় প্রতিপন্ন করিতে উৎসুক হইয়াছেন। যে সাধনপন্থায় এ দেশের এত সাধু মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—ধর্ম্মসাধনার যে বৈশিষ্ট্য কেবল মাত্র হিন্দুরই—ধর্ম্মগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহামানব রবীন্দ্রনাথ, মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথ, মহাঋষি রবীন্দ্রনাথ আরাম-কেদারায় শুইয়া তাহারই বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

* * *

এহেন রবীন্দ্রনাথ আজ এই কৌপীনধারী হিন্দু তপস্বীর অনশনব্রত উপলক্ষ্যে যে বাণী রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে যে-আদর্শের প্রতি যে-ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, সেই ভক্তি-প্রকাশে যে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা বিস্ময়কর বটে। এ ত স্বদেশীযুগের রবীন্দ্রনাথ নহে—তখন রবীন্দ্রনাথ পূরা হিন্দু ; তখন দেশও তাঁহার মুখ চাহিত, তিনিও দেশের মুখ চাহিতেন ; তখন য়ুরোপ-বিশ্ব নোবেল প্রাইজ দিয়া তাঁহার জাতিধর্ম্ম নাশ করে নাই—আত্মপূজার বিরাট আয়োজন-সম্ভাবনা তখনও তাঁহার মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। আজিকার রবীন্দ্রনাথ ও তখনকার রবীন্দ্রনাথে অনেক প্রভেদ ! তখনকার রবীন্দ্রনাথ কবি, এখনকার রবীন্দ্রনাথ ঋষি ; তখনকার রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অগ্রদূত, এখনকার

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ গান্ধীজীর পরিপন্থী। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, যে উপলক্ষ্যে তিনি আজ এই বাণী রচনা করিয়াছেন, যে জন্য গান্ধীজীর প্রায়োপবেশন—তাহা হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষায় চরমতম অভিলাষ, চরমতম উদ্যম। বিশ্বমানব নহে, এমন কি ভারতীয় জাতি-সাধারণও নহে—মহাত্মা সহসা অতিশয় ক্ষুদ্রাত্মা হইয়া, অতিশয় সঙ্কীর্ণ হৃদয়বৃত্তি ও ঘোরতর কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, যখন কেবলমাত্র হিন্দুসমাজের কল্যাণ-কামনায় জীবন পণ করিলেন, তখন মহামানবের উপাসক রবীন্দ্রনাথ একি করিয়া বসিলেন? ঋষি রবীন্দ্রনাথ আবার কেমন করিয়া কবি হইয়া পড়িলেন—যাদুবিদ্যা-বিশারদ রবীন্দ্রনাথ এ কোন প্রবলতর যাদুকরের প্রভাবে এমন করিয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন? রবীন্দ্রনাথকে আমরা অনেকদিন চিনিয়াছি—চিনিয়াছি বলিয়াই আজিকার এই আচরণে আমরা যতটুকু মুগ্ধ হইয়াছি তাহারও অধিক বিস্মিত হইয়াছি।

* * *

রাজনীতিক্ষেত্রে শৌকৎআলির সঙ্গে মহাত্মার যে সম্বন্ধ, ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার মিল তদপেক্ষা বেশী নহে। মহাত্মার জীবন ও কবির জীবন যে এক হইতে পারে না, তাহা আমরা জানি—কারণ কবি মহাত্মা নহেন, মহাত্মাও কবি নহেন। কিন্তু মহাত্মা ধর্ম্মকে যে ভাবে ধারণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে যে তপশ্চর্য্যা সম্ভব হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ও তদানুষঙ্গিক সুকোমল তপশ্চর্য্যা যে তাহা হইতে স্বতন্ত্র, ইহা বলিবার, বুঝিবার ও বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ এক্ষণে মহামানবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন,—মানুষের ছোট অহংকে কেমন করিয়া বড় অহংএর আদর্শে উন্নত রাখিতে হয়, এবং 'আমি' ও মহামানবের সেই

সম্পর্ক ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়া সেই অনুসারে জীবন যাপন করাই যে খাঁটি মানুষের ধর্ম্ম—এই সুসমাচার প্রচারে তিনি এক্ষণে ব্রতী আছেন। এ ধর্ম্মে মানুষের দেশ নাই, জাতি নাই—এ ধর্ম্ম কোনও বিশেষ লোক-ধর্ম্ম নহে, এ ধর্ম্মের আচরণে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের ভাবনা, সংসার সমাজ বা জাতির প্রতি কোনও সঙ্কীর্ণ প্রেম-ভাবের প্রয়োজন নাই। এ ধর্ম্ম আত্মগত, মনোগত, ভাবগত—ইহার অনুষ্ঠানে কোনও কায়িক তপস্যার বা বৈষয়িক ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন নাই ; এ ধর্ম্ম বড় সহজ ও সরল, ইহার সাধনায় কোনও শাস্ত্র, কোনও গুরু-বাক্য কোনও আনুষ্ঠানিক বিধির স্থান নাই—ইহাতে কোনও রূপ আত্মশাসন নাই—আছে আত্মার স্বাধীনতা, 'আমি'র অপ্রতিহত ভাব-বিলাস। এই যে মহামানববাদ, বা আত্ম-মহিমা-উপলব্ধি-মূলক 'মানুষের ধর্ম্ম', তাহা যে মূলে apotheosis of self—এ কথা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল হইতে যে নব্য ধর্ম্ম-সংস্কারে বর্দ্ধিত হইয়াছেন—যে অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এবং চিরজীবন যে ঐশ্বর্য্যজনিত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে এইরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আহার-বিহারের মহাঢ্যতা, বেশভূষার প্রাচুর্য্য ও মনোহারিতা, স্রক্‌চন্দনাদির অযাচিত সুলভতা যখন দেহ ও মনকে একান্ত অবশ করিয়া তোলে—যখন সেই ভোগের অভ্যাসকে পরিত্যাগ করা অসাধ্য, অথচ পরিতৃপ্তিজনিত একটা অক্ষুধার উদ্রেক হয়—তখন বুদ্ধিমান ভাবুক চিন্তাশীল কবিপ্রাণ ব্যক্তি তাহারই মধ্যে অবস্থান করিয়া একটা বৃহত্তর উপলব্ধির সান্ত্বনায় নিজ চিত্তকে প্রসন্ন করিতে চায়। সমাজ বা জাতি বা দুর্গত দরিদ্রদের প্রতি এরূপ ব্যক্তির কোনও সত্যকার স্নেহ বা সহানুভূতির উদ্রেক হওয়া

অসম্ভব। সে তখন সেই ভোগের মধ্যেই ভোগকে স্বার্থকে ভাব-বিলাসের সাহায্যে বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করে, নিজের সঙ্কীর্ণ অহংকে একটি বিরাট সত্তার দ্বারা আবৃত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"যাঁর ধ্যান আমার চিত্তের অবলম্বন শাস্ত্রমতে তাঁকে কী সংজ্ঞা দেওয়া যায় জিজ্ঞাসা করেচ। সহজে বোঝাতে পারব না, উপলব্ধির জিনিষকে ব্যাখ্যাদ্বারা স্পষ্ট করা যায় না। * * * * ব্যক্তিগত মানব মহামানবকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়, মহিমা লাভ করে যখন সে নিজের ভোগ নিজের স্বার্থকে বিস্মৃত হয়, যখন তার কর্ম্ম, তার চিন্তা মরণধর্ম্মী জীবলীলাকে পেরিয়ে যায়, যখন তার ত্যাগ তার প্রয়াস সুদূর দেশ ও সুদূর কালকে আশ্রয় করে, তার আত্মীয়তার বোধ সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে খণ্ডিত হয়ে না থাকে"।

এ ধর্ম্মে কোনও কর্ম্ম বা ব্রতানুষ্ঠান নাই, আছে একটি অতি অপূর্ব্ব ও সুগভীর উপলব্ধি—তাহাই আদি ও তাহাই শেষ; এ ধর্ম্মে যে ত্যাগের কথা আছে—সে ত্যাগ "সুদূর দেশ ও সুদূর কালকে আশ্রয় করে"; এ ধর্ম্মে যে ধার্ম্মিক, তার "আত্মীয়তা-বোধ সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে খণ্ডিত হয়ে থাকে না"; পাছে আত্মীয়তা-বোধ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে সে জন্য কেবলই বিশ্বের কথা ভাবিতে হয়, মানব নয়—মহামানবের ধ্যান করিতে হয়। তারপর আরও কথা এই যে—

"এই বোধের দ্বারা আমরা একটি সত্তাকে অন্তরতমরূপে উপলব্ধি করি যা আমার ব্যক্তিগত পরিধিকে উত্তীর্ণ ক'রে পরিব্যাপ্ত। তখন সেই মহাপ্রাণের জন্যে মহাত্মার জন্যে নিজের প্রাণ ও আত্মসুখকে আনন্দে নিবেদন করতে পারি * * * * সেই পুরুষের—যিনি

সকলের মধ্যে ও সকলকে অতিক্রম ক'রে—উপনিষদ যাঁর কথা বলেছেন—'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ'।"

এ ধর্ম্ম কার—কোন্ মানুষের ধর্ম্ম? "বোধের দ্বারা সত্তাকে অন্তরতমভাবে উপলব্ধি"; "সে সত্তা ব্যক্তিগত পরিধিকে উত্তীর্ণ ক'রে পরিব্যাপ্ত"। অর্থাৎ আমিই তখন বড় হইয়া যাই; সেই যে "আমি" তিনিই মহাপ্রাণ ও মহাত্মা, তাঁর জন্যই "নিজের প্রাণ ও আত্মসুখকে আনন্দে নিবেদন করতে পারব"। নিজের ভোগ, নিজের স্বার্থকে বিস্মৃত হওয়ার কথাও ইহাতে আছে, কিন্তু সে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ লৌকিক অর্থে নহে—পরার্থে ত্যাগ বা আত্মবিসর্জ্জন নহে, এমন কি আত্মসুখ বা ভোগসুখ ত্যাগ করাও নহে; সেই "মহাপ্রাণ মহাত্মার" জন্য (—জাতি, সমাজ বা কোনও ক্ষুদ্রতর মানবগোষ্ঠীর জন্য নহে) আত্মসুখকে আনন্দে নিবেদন করার নামই আসল ত্যাগ; অর্থাৎ, আমি যখন সুখভোগ করিতেছি, তখন মনে করিতে হইবে ইহা আমার সুখ নয়—আমার ব্যক্তিগত পরিধিকে উত্তীর্ণ করিয়া যিনি পরিব্যাপ্ত, সেই মহাপ্রাণ মহাত্মাই সে সুখ ভোগ করিতেছেন। এরূপ সাধনাকে তিনি 'পূর্ণতার সাধনা' বলিয়াছেন, অর্থাৎ কোনও রূপ আত্মসঙ্কোচ বা আত্মনিগ্রহ বা কৃচ্ছ্রসাধন ইহাতে নাই। "মানুষের যে কোনো প্রকাশের মহিমা আছে তাহাতেই 'তাঁর' উপলব্ধি হয় বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে।" এ তোমার সেই সেকেলে তপস্যার ধর্ম্ম নয়—কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ব্বরের কৌপীন-মাহাত্ম্য নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বার বার কেবল একটা কথার উপরে জোর দিয়াছেন—কোনওরূপ আচার-নিষ্ঠা বা অনুষ্ঠান, জপতপ পূজার্চ্চনা এই মহা উপলব্ধির পক্ষে বাধা—তাহা এই মহামানবধর্ম্মের অন্তরায়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই তাঁহার ধর্ম্মের যে পরিচয় উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না—এই ধর্ম্মে ও গান্ধীজীর ধর্ম্মে কত প্রভেদ; বুঝাইতে যাওয়াই দেশবাসীর হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে অপমান করা। জোঁকের মুখে লবণ যেমন, এই ধর্ম্মের মুখে গান্ধীজীর ধর্ম্মও তদ্রূপ। একজন, মানব-প্রেমিক বলিয়াই স্বজাতিপ্রেমিক; আর একজন আত্ম-প্রেমিক বলিয়া বিশ্বপ্রেমিক; একজন ত্যাগী সন্ন্যাসী, আর একজন ভোগী 'ব্রহ্মজ্ঞানী'; একজন কর্ম্মযোগী, আর একজন ভাববিলাসী; একজন ধারাবাহিক সমগ্র হিন্দুসাধনা ও ঐতিহ্যের যুগোপযোগী প্রাণ-মূর্ত্তি, হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠাতা—জ্ঞানে কর্ম্মেও প্রেমে; আর এক জন হিন্দু নয়, বরং হিন্দুত্ব-বিদ্বেষী, আত্মধর্ম্মের নামে স্বৈরাচারী, সর্ব্ববিধ ঐতিহাসিকতা বা ঐতিহ্যের বিরোধী; এবং সেই আত্ম-ধর্ম্মের উপরে ঋষিত্বের ছাপ দিবার জন্য, জাতিধর্ম্ম লোকধর্ম্ম ও দেশ-কাল এড়াইবার জন্য—উপনিষদ্-পন্থী; আসলে তাহা উপনিষদও নয়—নিজ ভাববিলাসের সমর্থন-জন্য উপনিষদের কয়েকটি সুনির্ব্বাচিত বাণীর আবৃত্তি ও তাহার মনোমত ব্যাখ্যায় পারদর্শী! রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের অন্তরালে হিন্দুর genius নাই; উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইতিহাস পর্য্যন্ত হিন্দু-সাধনার যে বিশেষ মর্ম্ম কালে কালে নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে—যে বিশিষ্ট মনীষা ও আত্মিক দৃষ্টি আমরা যুগে যুগে হিন্দুর প্রতিভা বলিয়া চিনিয়া লইয়াছি, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ভাবসাধনায় এখানে ওখানে তাহার ছোপ লাগিয়া থাকিলেও, যে বস্তু হিন্দুরই বিশিষ্ট সম্পদ সেই তপস্যা বা সাধনার চিহ্নমাত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনে নাই—বরং তাঁহার সমগ্র জীবন তাহারই একটা প্রতিবাদ। মহাত্মা গান্ধী তাহার ঠিক

বিপরীত, তাঁহার মধ্যে আমরা শাশ্বত হিন্দু-প্রতিভারই একটি অভিনব যুগোপযোগী প্রকাশ দেখিয়াছি—হিন্দু-সাধনার যাহা মূলমন্ত্র তাঁহার জীবনে তাহারই শক্তিপরীক্ষা হইতেছে—জগৎব্যাপী অহিন্দু শক্তির সহিত সংগ্রামে। হিন্দু-ভারতবর্ষে বহুকাল এত বড় প্রতিভার উদয় হয় নাই; গান্ধীজীর জয়লাভের উপরে হিন্দুর শেষ ভরসা নির্ভর করিতেছে—গান্ধীজীর পরাজয়ে—শুধু হিন্দুর নয়, মানবজাতির ক্ষতি হইবে, যে বাণী—যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রীকৃষ্ণ, বেদব্যাস, গীতাকার, বুদ্ধ ও শঙ্করের ভিতর দিয়া আজও আপন সত্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেই বাণীর—সেই অপূর্ব্ব মুক্তিমন্ত্রের—আশ্বাস হইতে জগৎ বঞ্চিত হইবে। কবি রবীন্দ্রনাথ আজ ধর্ম্মগুরু-রূপে যে বাণী প্রচার করিতেছেন তাহা মানুষের মনোবিলাসের উপকরণ মাত্র, তাহা পরিত্রাণের দিব্যমন্ত্র নহে। গান্ধীর বাণী—তাঁহার সমগ্র জীবন, তাহাতে জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় আছে; এবং সর্ব্বোপরি সে বাণী ত্যাগের বাণী। রবীন্দ্রনাথের বাণী জীবন নহে—স্বপন; তাহার মূলে জ্ঞান নাই, আছে ভাব-মোহ; প্রেম নাই, আছে সুন্দর-পূজার আবেগ; কর্ম্ম নাই, আছে আত্ম-চর্চ্চা; সে বাণী ত্যাগের নহে, ভোগের।

* * *

সেই রবীন্দ্রনাথ আজ গান্ধীজীকে যে মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মবিস্মৃত বা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। গান্ধীজীর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়…যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি; সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।"

এমন কথা রবীন্দ্রনাথ আর কাহারও সম্বন্ধে কখনও বলেন নাই—গান্ধীজীর সম্বন্ধেও নয়; যে এক মহাপুরুষের কথা রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজকে শুনাইয়া বারবার বলিয়া থাকেন, তিনি রাজা রামমোহন—তাঁর সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এতখানি আবেগ প্রকাশ করেন নাই; কারণ, তিনি আরো বলিয়াছেন—

"আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্ত্যলোকে সেই দিব্য ভালবাসা সেই প্রেমের ঐশ্বর্য্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে * * * ইত্যাদি।"

দেখা যাইতেছে রবীন্দ্রনাথ অবতার-বাদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের 'মহামানব-ধর্ম্মে' কোনও মহাপুরুষ বা অবতারের স্থান নাই। আরও দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ দুঃখব্রত বা তপস্যার বিরোধী। কিন্তু এখানে কি দেখিতেছি? —তিনি সেই তপস্যা, সেই দুঃখচর্য্যাকে প্রণতি জানাইয়াছেন।

"যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, তপস্বী তাঁদের বোঝা সহজ নয়; কেন না, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু একটা জিনিষ বুঝতে কঠিন লাগে না, সেটা ভালোবাসা। যে মহাপুরুষ ভালোবাসা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন তাঁকে আমাদের ভালোবাসা দিয়ে আমরা এক রকম করে বুঝতে পারি।"

অর্থাৎ, জ্ঞানী গুণী ও তপস্বী আমাদের অপেক্ষা এত বড় যে সেখানে আমরা আমাদের বুদ্ধি ও সংস্কার বলে পৌঁছিতে পারি না কিন্তু সেই তপস্বীর যে ভালবাসার দিকটি আমাদের চোখে পড়ে তার দ্বারাই আমরা তাঁহাকে চিনি—কারণ মানুষের একমাত্র সহজ সম্পদ তাহার হৃদয়বৃত্তি। গান্ধীজীর তপস্যার মহত্ত্ব আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, সে তপস্যা এতই বড়; তাঁহাকে বুঝি

তাঁহার ভালবাসার ভিতর দিয়া। এ ভালোবাসা তাঁহার আছে বলিয়াই তিনি এত বড় তপস্বী, এত বড় ত্যাগী—"ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন।"

*　　　*　　　*

এ ভালোবাসা, এ ত্যাগ, এ তপস্যার কথা রবীন্দ্রনাথের আধুনিক ধর্ম্মতত্ত্বে ত নাই! এ কেমন হইল? এ কোন্ রবীন্দ্রনাথ? আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছি—মুগ্ধও হইয়াছি; স্তম্ভিত হইয়াছি তাঁহার আত্ম-বিস্মরণে, মুগ্ধ হইয়াছি তাঁহার কবিত্বে। রবীন্দ্রনাথের যে কবি-পরিচয় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীকে মুগ্ধ কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত করিয়াছে, এবং যে ঋষিত্ব তাঁহার দেশবাসীকে ক্ষুব্ধ ও নিরাশ করিয়াছে—আজ এই গান্ধী-বন্দনায় আমরা রবীন্দ্রনাথের সেই পূর্ব্বতন স্বধর্ম্মের স্ফুরণ ও অধুনাতন পর-ধর্ম্মের বিলোপ লক্ষ্য করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছি। জানি তাহা ক্ষণিকের, কারণ কবি-প্রকৃতি অতিশয় ভাব-চঞ্চল, ঋষিপ্রকৃতিই অচঞ্চল। তথাপি কবি রবীন্দ্রনাথকে, স্বদেশী যুগের জাতীয়তার সেই ভাব-নায়ক রবীন্দ্রনাথকে আজিকার দিনে মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা হয়। জানি সে রবীন্দ্রনাথ গত হইয়াছেন, সে কবিকে আমরা হারাইয়াছি। জানি আজিকার এই গান্ধী-বন্দনা আর একযুগের সে অরবিন্দ-বন্দনার মতন কাব্য-রচনা হইলেও—ইহার প্রতিছত্রে যে আন্তরিকতার আবেগ প্রদীপ্ত হইয়া আছে তাহা কবি-প্রাণের অতি সহজ প্রবল অতর্কিত ভাবোৎসার হইলেও—সেদিনের সে আশ্বাস হয়ত ইহাতে নাই; কারণ 'জালিয়ানওয়ালা বাগ' উপলক্ষ্যে এমনই আরেকদিনের কবিকীর্ত্তির কথা আমাদের মনে পড়ে—সেদিন তিনি কবিসুলভ আবেগ ও অধীরতার বশে যে কাজ করিয়াছিলেন, পরে তাহার

বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারেন নাই ; এতদিন পরে এই সেদিন তাঁহার সেই পরিবর্ত্তিত রুদ্ধ মনোভাব সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে. 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বরাবর অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন—সে সম্বন্ধে বেশী পীড়াপীড়ি করায় তিনি অবশেষে অভিমানবশে নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'ও পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহাও জানি। তথাপি, কিছুক্ষণের জন্য আমরা সে কথা ভুলিয়া থাকিতে চাই—রবীন্দ্রনাথ যে ঋষি নহেন, মহাত্মাও নহেন—তিনি যে কবি, তাঁহার সেই কবিপ্রাণের চাঞ্চল্যও যে এমন বাণী-রচনায় সার্থক হইতে পারে, ইহাও আমাদের পরম সৌভাগ্য। আজ রবীন্দ্রনাথ না থাকিলে আর কে এত বড় ঘটনার ভাব-রূপকে বাণীর সাহায্যে এমন করিয়া আমাদের হৃদয়গোচর করাইতে পারিত ? অতএব রবীন্দ্রনাথের কবি-মূর্ত্তির এই ক্ষণিক প্রকাশকে আমরা প্রণাম করি।

শরৎ-বন্দনা ও মহিলা-সাহিত্যিক

(১)

শরৎবাবুকে বন্দনা করতে গিয়ে একটি মহিলা লিখেছেন—

—"কণ্টকাকীর্ণ পথ বেয়ে তিনি (শরৎবাবু) আমাদের কাছে এসেছেন, তাঁর পায়ে, সারা গায়ে কত কাঁটা বিঁধেছে, অথচ সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নাই।"

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী, "শরৎবন্দনা", পৃঃ ৪৬।]

বড় দুঃখের কথা। নারী-হৃদয়ের সহানুভূতি উদ্রেক করাই যদি শরৎচন্দ্রের এ-রকমভাবে আসার কারণ হয়,—তবে তিনি জয়ী হয়েছেন তা ত প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আর এক কবি লিখে গেছেন—

"যদিও বা ভুলে, কাঁটা থাকে ফুলে
তাহাতে কিসের ভয়,
ফুলের উপরে ফেলিব চরণ—
কাঁটার উপরে নয়।"

যাঁর যেমন রুচি। আবার এও বলতে হয়, যার যেমন জোটে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন, "পথ ত সকলের এক নয়।" শরৎবাবু যে এসেছেন এতে বাঙ্গালী মাত্রেই খুসী। সে কথা হচ্ছে না। মহিলাটি যেরূপ শরৎ-আগমনের realistic বর্ণনা দিয়েছেন,—তা যদি সত্যি হয়—তবে হয়ত কোন অর্ব্বাচীন বলে উঠতে পারে—"হ্যাঁ মশাই, শরৎবাবু ওরকম বেহুঁস অবস্থায় আগমন করলেন কেন? পায়ে গায়ে কত কাঁটা!—এ যে দেখছি মেয়েদের দৃষ্টিও এড়ায়নি। একটু সুস্থ হয়ে সাম্‌লে এলে * * ইত্যাদি।"

'গায়ে, পায়ে কাঁটা' এরকম অবস্থায় কেউ এলে, মহিলারা আগে পছন্দ করতেন না,—এই ত আমাদের ধারণা ছিল। কত ভুল ধারণাই যে ছিল! এখন দেখতে পাচ্ছি—ঐ রকম অবস্থায় এলেও, অথবা এলেই, মেয়েরা অধিকতর পছন্দ করেন—। কেন না সহানুভূতি প্রত্যক্ষ।

অথচ শরৎচন্দ্রের জীবনের কতটুকুই বা আমরা জানি? ভেলু কুকু?টাই খালি জলধরদাদা দেখেছেন। বৃদ্ধ। সব দেখতে পাননি বীরবলী কেতায় বলতে হ'লে বলতে হয়,—জানার চাইতে না জানার

ভাগই বেশী। "অত্যন্ত রহস্যময় তাঁর জীবন, তাঁর সম্বন্ধে বহু জাতীয় জনশ্রুতি।" কেন?

(২)

শরৎবাবুর উপন্যাস পড়ে আর একটি মহিলা যা 'চট'করে 'বুদ্ধি' দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেছেন তা তাঁর ভাষাতেই প্রকাশ করি।

—"শরৎচন্দ্রের আগে—বঙ্কিমচন্দ্রের আমল অবধি আমরা দেখতে পাই স্ত্রীলোকের দেহের শুদ্ধতার হিসাবই তার পরিচয়ের সবটা।—এর বাইরে আর সমস্তই লেপে মুছে একাকার।" * * *

—"একদা হয়ত তাদের দেহের বিচ্যুতি ঘটেছিল। কিন্তু মানুষ যে এই একটা কথাকেই অনুক্ষণ জপ করে না, একে ছাড়িয়েও তার চিত্ত অসীম, মন বিচিত্রতর, ইত্যাদি।" * * *

—"পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের সহিত একবস্তু নয়।" * * *

—"পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যে কেবল সতীত্বের সহিত একান্ত এক নয় এবং এর চেয়ে ঢের বড় এবং ঢের সর্ব্বাঙ্গীন * * * বুদ্ধির দিক থেকে কে না চট করে বুঝতে পারে?" * * *

—"কেবল দেহের উপর সতর্ক পাহারা রাখাই স্ত্রীলোকের চরম পরিচয় নয়! বিরাট জীবনের অপরিসীম বিস্তার,—* * * ইত্যাদি।"

[শ্রীআশালতা দেবী। পৃঃ ১০০-১০৩।]

কোনও ভদ্রমহিলা যদি শরৎবাবুর লেখা পড়ে এই রকমের তাৎপর্য্য "চট করে" (?) হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন, 'বুদ্ধি' দ্বারা—আর এবম্বিধ মন্তব্য প্রকাশ করেন প্রকাশ্য দিবালোকে—তবে তার বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকাদের ওপর দেওয়াই ভাল। সাধারণ ভব্যতা ইহার অনুরূপ

প্রতি-উত্তর দেওয়া হতে আমাদিকে নিবৃত্ত করছে। তবে একটা কথা মনে হয়, বলেই ফেলি—। বলি কি, শরৎবাবু যদি মনুষ্য-চরিত্র না নিয়ে নিছক ছাগ-চরিত্র নিয়ে উপন্যাস রচনা করতেন কাজটা সহজ হ'ত। কেন না মনুষ্যজাতির আবার সৎ-অসৎ বিবেচনা-শক্তি আছে কি না! এবং কোন কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা এখনো তাদের "দেহের উপর সতর্ক পাহারা রাখে।" এরি জন্য কি শরৎ-বন্দনা? কত বড় বেয়াদপি ও বেহায়া লোক হ'লে আজকে এই তামাসা করতে পারে! বেচারী 'সতীত্ব'!

(৩)

আর একটি মহিলা লিখিতেছেন—

—"অদূর ভবিষ্যতে যে সমাজ-বিপ্লব আরম্ভ হইবে, যাহার প্রচণ্ড আবেগে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ দিশাহারা হইয়া পড়িবে, হয়ত তাহাকেই মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে, তাহারই কেন্দ্রীভূত শক্তি হইতেছে এই কমল।" এ একেবারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। যীশুখৃষ্ট! এর চেয়ে বর্ত্তমান নিয়ে কথা বললে, ভাল হ'তো না? হাতের কাছেই ত সবাই আছেন!

"আমাদের সমাজের বুকে কালভৈরবের প্রলয়-নাচন সুরু হইয়াছে, আমাদের সমাজ-সৌধ ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। একটির পর একটি করিয়া সমাজের বিভিন্ন অংশ খসিয়া পড়িতেছে—* * *।" শুধু ভৈরব নয় কাল-ভৈরবীও আছে। পদ্ম হাতে। কেন না চক্ষু থাকতে উপস্থিত ও প্রত্যক্ষকে অবিশ্বাস করি কি করে—? ঐ যে বলে না ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে আমাদের তাই। কি মর্ম্মঘাতী প্রত্যক্ষ, আর কি দারুণ ভবিষ্যৎ! রুদ্র পাহিমাং তে দক্ষিণমুখং। উপায় কি?

—"দেশের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—দুঃখকে মানুষ আর তাঁহার জীবনে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ অদৃষ্ট অথবা সমাজকে আর উচ্চ স্থান দিবে না। সম্পদ, ঐশ্বর্য্য * * * যেমন করিয়াই হউক আমরা তাহা উপভোগ করিবই—* * *।"

—"এই নূতন মনোবৃত্তি আজ সর্ব্বত্র প্রকটিত।"

—"সমাজের এই নূতন রূপ দেখিয়া সকলেই আজ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

[শ্রীলতিকা বসু পৃঃ ১৮৯-১৯০-১৯৩]

আহা, উঠ্‌বে না? এ যে ভয় পাইবার কথাই। সমাজে ছেলে, বুড়ো সব রকমই আছে ত? খালি 'মডেল নায়িকা' নিয়ে ত আর দেশ বা সমাজ চলে না। "ভীত", "সন্ত্রস্ত" ঠিক!

শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, তাঁহার সময়ের একটা সমাজ-চিত্র এই রকম দিয়ে গেছেন—

"এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত। * * * যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি পাইতেছে। সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যাসংখ্যা বৃদ্ধি।"

রাজনারায়ণবাবু "ভীত" ও "সন্ত্রস্ত" হয়েছিলেন এই চিত্র দেখে, আমরা "ভীত" ও "সন্ত্রস্ত" হচ্ছি "সমাজের এই নূতন রূপ দেখিয়া"। কিন্তু এই বক্ষ্যমান "নূতনরূপই" সমাজের সত্যরূপ এবং আসলরূপ কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে—বিস্তর।

শেষ-প্রশ্নের কমলই যদি বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ নারী সমাজের রাণী অর্থাৎ চরম অভিব্যক্তি হয়, তার চেয়েও গুরুতর কথা চরম আদর্শ হয়, যদি সবাই কমলের মত হব মনে করে এবং rehersal দেয় তবে বেশ্যাগমন-বৃদ্ধির জন্য রাজনারায়ণ বাবু যেমন উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, তেমনি সমাজে শ্রীমতী কমলা-দের আগমনও—তিনি নিশ্চিন্ত আলস্যে বা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করতে পারতেন না। 'সেকাল ও একালে'র লেখক কী সংকীর্ণ ধারণা নিয়েই না মারা গেছেন। আজকের 'একাল' যদি তিনি মৃত্যুর পরেও বেঁচে থেকে কোনও কৌশলে প্রত্যক্ষ করতেন, তবে ঐ প্রবন্ধ তাঁর বদলে লিখতে হতো। কেন না, একালে বেশ্যাই একমাত্র বিভীষিকা নয়।

শুধু বঙ্কিম নয়—স্বামী বিবেকানন্দের যুগও আজ কত দূরে বহুদূরে সরে গেল—! কেন না তিনি আবার একটা কুক্ষণে বলেছিলেন—"হে ভারত তুমি ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ"—থাক্ আর সে নামগুলো উল্লেখ করে শরৎ-উপন্যাস ও তৎপাঠে মগ্না মহিলা-সাহিত্যিকদের মনের উল্লাসকে বিষন্ন করতে চাই না। অবশ্য সহজে বিষন্ন হবার পাত্রী তাঁরা যে নন্—তা ত প্রত্যক্ষই করা গেছে। কেন না মহাত্মার প্রায়োপবেশন—যাঁদের একচুল টলাতে পারেনি—তাঁরা যে বাঙ্গলা দেশের—শরৎ-উপন্যাসের ঐ কী বলে, ভাবধারায়—কী পর্য্যন্ত না স্নাত এবং পরিপ্লুত—তা বুঝতে পেরেছি। তবু অতীতের সতী স্ত্রীলোকদের নামোল্লেখ এক্ষেত্রে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কেন না, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের জন্য যখন "সতীত্বের" আর কোনই প্রয়োজন রইল না তখন মিছে—? আধুনিক typeএর স্বরূপ কি? এরা কি সতী ও অসতীর মাঝামাঝি? না, এই দুইকে উপচে অতিক্রম করে—একটা নূতন কিছু? ভাবছি—এই "বিরাট জীবনের

অপরিসীম বিস্তারেরা" কি এরই মতন ? এবং সত্যি নূতন ? চেষ্টা করলে কি এদের চেনা এতই কঠিন ? চিনি চিনি যে মনে হয়— ? ভ্রান্তি ? হবেও বা।

(৪)

"স্বদেশ-বাসিনি-গণ"—তাঁরাও অবশ্য সকলেই মহিলা, এবং সেই তাঁরাই সমবেতকণ্ঠে শরৎ-আরাধনার পর সম্ভবতঃ মুদিত নয়নে উপাসনা করেছেন স্পষ্ট এই বলে—

—"হে নারীচরিত্রের নিবিড় রহস্যজ্ঞাতা! আমরা তোমার বন্দনা করি।"

—"হে সকল নারীর অন্তর্য্যামি! আমরা তোমায় * * * ইত্যাদি।"

—"হে নারী হৃদয়ের মরমী ঋষি! আমরা তোমায় * * * ইত্যাদি।" অবশেষে,—"তোমাকে আমরা ভালবাসি।" এর উপর আর কথা কি ? বলুন ?

প্রসঙ্গ-কথা

'শরৎবন্দনা' নামে যে ভাগ্যের পরিহাস গত মাসে শরৎচন্দ্রকে নিজ কর্ম্মফলে ভোগ করিতে হইয়াছিল, সে ঘটনা এমন বড় নয় যে সে সম্বন্ধে অধিক আলোচনা সঙ্গত; আবার এমন ছোট নয় যে সে সম্বন্ধে কোনও মন্তব্যের প্রয়োজন নাই। এই উপলক্ষ্যে এমন অনেক ট্র্যাজেডি, ট্র্যাজি-কমেডি ও কমেডির সৃষ্টি হইয়াছে

যাহার বিবরণ শ্রুতিরোচক ও শিক্ষাপ্রদ। সাধারণ ভাবে সংক্ষেপে বলা যায়, ব্যাপারটির যতটুকু সাহিত্যিক ততটুকুই ভাঁড়ামি ও বাঁদরামির চূড়ান্ত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ, সাহিত্য-বিলাসিনী জ্যাঠা-মেয়েদের জুটলাই হইয়াছিল বেশী—শরৎচন্দ্রের পূজায় দক্ষিণ চরণের ভার পড়িয়াছিল ইহাদেরই পদ্মহস্তে, বাকি শ্রীচরণটি ন্যস্ত হইয়াছিল বাংলার অতি আধুনিক তরুণবর্গের স্কন্ধে। ইহাই শরচ্চন্দ্রের মনোমত ব্যবস্থা—শরৎচন্দ্র তরুণ-তরুণীদের পূজা পাইলেই চরিতার্থ। সাহিত্য-ক্ষেত্রে যাহাদের স্থান নাই বলিলে হয়, যাহারা মূর্চ্ছিত শিবের বুকে উলঙ্গিনী কালীর মত, বাংলার এই আধুনিক বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র ও পৌরুষহীন পুরুষ-সমাজের বুকে নির্লজ্জভাবে নৃত্য করিতেছে, শরচ্চন্দ্র হইয়াছেন তাহাদের দরদী প্রাণ-সখা; এবং যাহারা বাংলা ভাষা ও তথা বাঙ্গালীর শিক্ষা দীক্ষা আচার সহবৎকে তাহাদের কুশিক্ষা, কু-মনোবৃত্তি, ও কু-সাহসের বশে নষ্ট করার কৃতিত্বে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, সেই তরুণদিগের নেতারূপে তিনি এই উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এই উপলক্ষ্যে যে দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও একটা সাহিত্যিক কেলেঙ্কারী—শরচ্চন্দ্রের মুখে চূন ও কালি। 'শরৎবন্দনা' নামক পুস্তকখানিতে শরচ্চন্দ্রের যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—রেলে ষ্টীমারে আমরা যে চেলী-টোপর-ধারী বরের সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পাই—তাহা তদ্রূপ। শরচ্চন্দ্র ইহাই চান—আহ্লাদে গদগদ! বুড়া বয়সে যদি এতই বিয়ে পাগলা হইয়াছিলে, তবে ক'নের জাতটা অন্ততঃ দেখিয়া লইলে না কেন? শরচ্চন্দ্রের নিজের যে রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত

হইয়াছে, সেগুলি মাসিকের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিলেই ভালো হইত, কারণ সেগুলি ভদ্রলোকের পাতে দিবার মত নহে. শরচ্চন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনা!—ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে? যে ব্যক্তি বারোয়ারী আসরে গান গাহিয়া ঢোল কাঁসির বাজনা বাড়াইয়া তোলে, সাহিত্যের মুদিখানায় বসিয়া তামাক-চর্চ্চা করে—সে করিবে সাহিত্যের যাচাই! শরচ্চন্দ্রের সাহিত্য-জ্ঞান যে কত গভীর তার একটা প্রমাণ. এই উপলক্ষ্যেই পাওয়া গিয়াছে, সেই কথাই বলি।

শরৎবন্দনায় 'শরচ্চন্দ্রের প্রতিভাষণ'টির মূল মর্ম্ম বা প্রেরণা বোধ হয় সকলে ভালো করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। শরচ্চন্দ্র যে নিজের সাহিত্য-কীর্ত্তির খাঁটিত্ব—অতএব শ্রেষ্ঠত্ব—সম্বন্ধে কত সচেতন; তাঁহার মতে, সাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি নিজ হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছু নহে, এবং সেই মাপ কাঠি দিয়া মাপিয়া দেখিলে তিনি যে কত বড লেখক তাহা সকলেই স্বীকার করিবে—ইহাই তাঁহার ঐ প্রতিভাষণটির মর্ম্ম। এ বিষয়ে মন্তব্য করিবার পূর্ব্বে এই প্রতিভাষণটির প্রেরণা সম্বন্ধে আমাদের—বিশেষতঃ শনিবারের চিঠির তরফ হইতে—কিছু বলিবার আছে। গত ফাল্গুন সংখ্যার শনিবারের চিঠিতে আমরা লিখিয়াছিলাম—

"তিনি মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে দেখেন নাই; গৃহপ্রাঙ্গণ বা সমাজসীমানার বাহিরে যে বিরাট জগৎ তাহার বিপুল রহস্য লইয়া বিরাজ করিতেছে তাহার দিকে তিনি কখনও দৃষ্টি করেন নাই; একমাত্র

শ্রীকান্ত ভিন্ন আর কোনও উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারের তেমন পরিচয় নাই—এবং শ্রীকান্তেও প্রকৃতির সে-রূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের রূপ হইলেও, তাহা যেন জীবনের বহির্দ্দেশে—সে যেন আগন্তুক, অন্তরঙ্গ নহে। এরূপ সংকীর্ণ কল্পনার পক্ষে সাহিত্যসৃষ্টির যে প্রেরণা যতটুকু সফল হইবার, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে তাহা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোনও রসিক পাঠকেরই নালিশ নাই। কিন্তু এ কল্পনা শীঘ্রই নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে; কেবলমাত্র emotion-এর শক্তি কবিকেও বেশি দিন জীয়াইয়া রাখিতে পারে না।"

ইহার পরেই শরচ্চন্দ্রের 'প্রতিভাষণের' এই অংশটি উদ্ধৃত করিলেই কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিবে না, শরচ্চন্দ্রের এ প্রেরণা আসিল কোথা হইতে—

"সংসারে সৌন্দর্য্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি, আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী-জাতি-যুথি, আসে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন, কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘট্‌লো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি শ্রুতি-মধুর শব্দ-রাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ করার ধৃষ্টতা আমি করিনি। এম্‌নি আরও অনেক কিছুই—এ জীবনে যাঁদের তত্ত্ব খুঁজে মেলেনি স্পর্দ্ধিত অবিনয়ে মর্য্যাদা তাদের ক্ষুন্ন করার অপরাধও আমার নেই। তাই সাহিত্য-সাধনার বিষয়-বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সঙ্কীর্ণ, স্বল্পপরিসরবদ্ধ। তবুও এটুকু

দাবী করি অসত্যে অনুরঞ্জিত করে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করিনি।”

হায় শনি! তুমি এমন করিয়া রবি-শশীর পশ্চাতে লাগিয়া আছ!—তোমার জ্বালায় ‘জয়ন্তী’ ‘বন্দনা’ উৎসবেও তাহাদের দুঃস্বপ্ন মুহূর্ত্তের জন্যও দূর হয় না! রবি পর্য্যন্ত শুক্ল ও কৃষ্ণ—পক্ষাপক্ষের—বিভীষিকায় অস্থির; শশীর ত’ কথাই নাই। এক প্রাচীন কবির উক্তি মনে পড়িতেছে—

> শশিদিবাকরয়োর্গ্রহপীড়নং
> গজভুজঙ্গময়োরপি বন্ধনং
> মতিমতাঞ্চ বিলোক্য দরিদ্রতাং
> বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ।

বড় সত্য কথা—‘বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ—আহা বড় সত্য কথা! আমাদের রবি-শশীর এই গ্রহপীড়ন দেখিয়া কার না সংসারকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়!

উপরি-উদ্ধৃত ‘প্রতিভাষণে’ শরৎবাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—‘সাহিত্য সাধনার বিষয়-বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সংকীর্ণ স্বল্পপরিসরবদ্ধ’—আমরাও তাহাই বলিয়াছি। একথার প্রতিবাদ করা চলে না। কিন্তু তার জন্য শরচ্চন্দ্রের সাফাই গাওয়ার অর্থ কি? ভালো করিয়া না পড়িলেও, এমনি চোখ বুলাইয়া দেখিলেই, শরচ্চন্দ্রের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য স্পষ্ট বুঝিতে

পারা যায়। তিনি বলেন, পরিধিটাই একটা বড় কিছু নয়—ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যেই প্রাণের গভীর খনিত্র-কর্ম্মই আসল জিনিষ।

"আমার সাহিত্য-সাধনা তাই চিরদিন স্বল্পপরিধি-বিশিষ্ট। হয়ত এ আমার ত্রুটি, হয়ত এই আমার সম্পদ,—আপনাদের স্নেহ ও প্রীতি পাবার সত্য অধিকার। হয়ত আপনাদের মনের কোণে এই কথাটা আছে,—এর শক্তি কম, তা হোক, কিন্তু এ কখনো অনেক জানার ভাণ কোরে আপনাদের অকারণ প্রতারণা করেনি।"

—ইহাকেই বলে ক্ষুদ্রের দম্ভ। সাহিত্য-সৃষ্টিতে কল্পনার পরিধি বা বিষয়-বৈচিত্র্যের নব নব বিস্ময় প্রতিভার লক্ষণ নহে! যদি কেহ বলে, রবীন্দ্রনাথের তুলনায় শরৎচন্দ্র ক্ষুদ্র, তাঁহার কল্পনা সঙ্কীর্ণ, বিষয়বস্তু স্বল্পপরিসর, সে কথার প্রতিবাদ করিবার কি আছে? ইহা যে সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। যদি কেহ বলে, শরচ্চন্দ্রের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর নহে, তাঁহার কল্পনার সীমা সুনির্দ্দিষ্ট, তবে সে কথার উত্তরে কোমর বাঁধিয়া আত্মসমর্থন করিয়া কিছু লাভ আছে? এমন কথা ত কেউ বলে নাই—যে শরৎচন্দ্রের রচনার কোনো গুণ বা মূল্য নাই। তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহার মধ্যে হৃদয়ের সত্য বা কল্পনার সত্য—অর্থাৎ সাহিত্যের সত্য, যেটুকু আছে তাহা কোন রসিক ব্যক্তিই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যের অপক্ষপাত বিচার, প্রতিভার উৎকর্ষ-নির্ণয়ে তোমার স্থান যদি যথোচিত নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হয় তবে কতকগুলা অন্তঃসারশূন্য 'হাবাতে'র দল জুটাইয়া তাঁহাদের নিকট দুঃখ করিলে বা আস্ফালন করিলে তোমার প্রতিপত্তি বাড়িবে? শরচ্চন্দ্রের ভাবখানা এই—আমি যাহা করিয়াছি কোনও সাধু সাহিত্যিক তাহার বেশী করিতে পারে না;

যাহাদের রচনার বা কল্পনার পরিধি যত বড় তাহারা তত ফাঁকিবাজ—সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে তাহাদের সততা ও আন্তরিকতা তত কম। তিনি বলিয়াছেন—

"কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে (রবীন্দ্রনাথ নাকি?) তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ করার ধৃষ্টতাও আমি করিনি।"

—আমরাও বলি, ভালো কাজই করিয়াছিলে, নহিলে যেটুকু করিয়াছ তাহাও ইলিশমাছের মত একটু বেলা বাড়িলেই পচিয়া উঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া যাহাদের কল্পনার ফাঁদ বড়, যাহাদের রচনার প্রসার বহুবিস্তৃত, তাহাদের উপরে এ আক্রোশ কেন? অন্য সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিই, এই অধম বাংলাসাহিত্যেও এরণ্ডের চেয়ে বড় বৃক্ষ আছে—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ আছেন। এই দুইজনের সহিত তুলনায় তোমার স্থান কোথায় তাহা নিরতিশয় আত্মাভিমানে বিস্মরণ বা অস্বীকার করিলে, কাল ত রেহাই দিবে না। আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হয়, হাতির বপু দেখিয়া টিক্‌টিকির পেট ফোলে—কিন্তু সে ত ভাল লক্ষণ নহে। কতকগুলা জেঠা ছোঁড়া ও ছুঁড়ি জুটাইয়া তাহাদের নিকট হাততালি লাভ করিবার প্রবৃত্তি যাহার হয়—তাহার নিজ মর্য্যাদা ও সাহিত্যিক মর্যাদাবোধ যে কতখানি তাহা কি কাহারও অগোচর অছে?

মাফ্ চাই

(ঠাকুরদাদার পত্র)

ওহে, বেচারা বঙ্কিমের ওপর মেয়ে-মদ্দর এত রাগ কেন বলতে পার? ব্রাহ্মণ কি অপরাধটা ক'রে গেছেন জান?

আমি ত জানি বেচারা খেটেখুটে রাত জেগে কয়েকখানা উপন্যাস লিখে গেছেন; আর কয়েকখানা বাজে বই—কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতি! তাতে সারা দেশতো বহুদিন ধ'রে আনন্দ উপভোগই ক'রে আসছে জানি।

এর মধ্যে কি এমন হ'লো যে লোকটাকে জাহান্নমে দেবার জন্যে পেল্লেয়ে পিটিশন সব পড়ে যাচ্ছে—মেয়ে-মদ্দের? লোকটা নাকি উপন্যাস লিখতে জানতো না, চরিত্রগুলো কাজ দেয় না,—তাদের জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না; সূর্য্যমুখী, ভ্রমর কেউই বৌদিদের স্বাদ দেয় না।

তাইতো, তবে কেন যে মিছে খেটে ম'লেন বুঝতে পারি না। বোধহয় অকেজো বেকারদের ঐ রোগেই ধরে, খুড়োর গঙ্গাযাত্রা না করে পারে না।

সেকেলে বাপও ছিল কেবল গুড়ুক পাশা আর বংশ রক্ষা নিয়ে—আর তাঁর সেই একমুখী গিন্নি—তিনি আবার সতীসাধ্বী! তাতে নটা রসের কটাই বা ফোটে, আর জীবনকে কতটুকুই বা ফোটায়? সুতরাং সে চ্যাষ্টিটির (chastity) মূল্য কতটুকু, সে কার কোন্ কাজে আসে? ফাইডালিটি (fidelity) আলবৎ ভাল জিনিষ বটে,—যার ফিল্ড খুব ফলাও। চ্যাষ্টিটি (chastity) আর ব্লাইণ্ড লেনের (blind lane) তফাৎটা কোথায়? তাতে দেশের দশের কোন্ উপকার? বঙ্কিম

কেবল যখের ধনের মতন ঐ চ্যাষ্টিটিই আগলে গেছেন। তার উপন্যাস দেশকে দিয়েছে কি? উপন্যাস তো নীতিবোধ নয়। দেখ না, সমাজকে তুষ্ট করবার জন্যে রোহিণীর এক বুক আকাঙ্ক্ষা থাকতে তিনি দুম ক'রে তাকে মারলেন, কোন্ অধিকারে? তায় তার প্রাণটা তখন একজনকে চেয়েচে,—তার পেছনে লাট খাচ্চে,—ছিঃ এমন কোথাও শুনেচ?

সত্যিই তো, এসব কথা তো কোনো দিন ভাবিনি, এখন তো বেশ জলের মত সোজা বোধ হচ্চে। তবে প্রায়ই তো এমন কাণ্ড ঘটতে খবরের কাগজে দেখতে পাই, বোধ হয় মিথ্যে, না হয় নিশ্চয়ই তারা সব বুড়ীই হবে। তাদের আবার আকাঙ্ক্ষা থাকবে কি, মলেই তো বাঁচে। তারা আর রোহিণী? বরং গোবিন্দলালের তাকে রেন্ কোটটা (Rain coat) অফার (Offer) করা উচিত ছিল। তা বোধ হয় সেটা রেণীডে (Rainyday) ছিল না। লেখকের সে মহাপ্রাণতা থাকলে তো?

কোন্ কথাটা বলবো? অন্ধ ছিলুম, এখন সব বুঝতে পারচি। দেখ না তাঁরা বরাবরই মেয়েদের মা ব'লে অপমান ক'রে গেছেন! মুখ ফুটে মহিলা বলতেও শেখেন নি, বা পারেন নি। দেশের কি দুর্দ্দিনই ছিল! এই জন্তেই তাঁকে 'মাফ' করতেই বলি,—কেউ পারবেন না কি?

কোন্‌টাই বা ক্ষমা করবেন? মিছে কল্পনা ছাড়া তো সত্যি দেখা-শোনা—করা-কম্মানো কিছু নেই। মার্সি (Mercy) চাওয়াও মুস্কিল।

তবে শুনেচি নাকি তিনিই না বাঙ্গালা উপন্যাস লিখলেন, ও তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন,—প্রথম? তাঁর আগের বা তা

ক'জনেই বা পড়েচেন, বা পড়ে আকৃষ্ট হয়েচেন, আর তা লেখবার আগ্রহ তাঁদের জেগেচে ? ঐ লোকটাই না প্রথম দেখালেন, শেখালেন লেখালেন—সাহিত্যের আস্বাদ দিলেন ! এখন দেখচি সেই লোকটাই হলো অপরাধী, যত দোষে দোষী।

বাপে দু'তিন মহল বাড়ী বানিয়ে যান ছেলেদের মুখ চেয়ে। কিন্তু অর্দ্ধবার্ষিক শতাব্দী পরে কত কি বদলে যায়,—শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, ভাব, ভঙ্গী। তখন সে বাড়ী পছন্দ হওয়া সম্ভব না হ'তেও পারে। তাতে জলের কল, শয়ন-কক্ষ-সংলগ্ন বাথরুম ও ফ্যানের ব্যবস্থা নেই। ড্রয়িং রুম, ওয়েটিং রুম নেই ? অর্দ্ধেক জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড পূজোর দালান দাঁড়িয়ে আছে ! এতে বাপের ওপর রাগ হয় না কার ? হতেই পারে। টাকাগুলো কেবল মাটী করে গেছেন,—না রিকোয়ারমেন্ট বুঝতেন, না ফেসিলিটি না কম্ফর্ট—কি বুদ্ধিই সব ধর্‌তেন ? বাড়ীখানা না হয় লেক্ রোডে কি বালীগঞ্জেই করুন ! একদম কিনা গোবর ডাঙ্গায় ? লায়েক সন্তানে এ কথা বলতেই পারে। অপরাধ কল্লে রে'ৎ করবেন কেন ?

তা এ আবার উপন্যাস লেখা ! দেশের কি অনিষ্টই করেচেন, একটা মনের মত সত্য কথা নেই। কমলমণির পত্রখানাই দেখ না, পড়লে হাসিও পায় লজ্জাও করে,—আমরা যেন পত্র লিখি না, ঐ কি পত্র লেখার ছিরি ? এরূপ হৃদয়হীন নীতিবাগীশের উপন্যাস লেখবার দুরাশা জেগেছিল যে কেন ! যে কুন্দকে বিষ খাওয়াতে পারে, সে পারে না কি ? যার রূপ আছে, যৌবন আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে সে মরতে যাবে কেন, কি দুঃখে ? দুনিয়ায় কি এক নগেন্দ্রনাথ ছাড়া সে ফুটনোন্মুখ পদ্মের প্রার্থী কেউ ছিল না ? মিথ্যা কথা,—হাজারো—লাখো ছিল। তবে ?

আহা যেতে দাও দিদি, মৃতকে ক্ষমা ঘেন্না করে ছেড়ে দাও।

আর দাদা-রথীরা এক খানা কমলাকান্ত লিখে তার কানটা ম'লে ছেড়ে দাও ভাই,—ওটার গুমোর আর থাকে কেন ? (১)

মোটের ওপর "মাফ চাই" !

জাতা

ঘর্ ঘর্ ঘোরে জাঁতা—
জাঁতা ঘর্ ঘর্ ঘুরিছে, ভাঙিছে অভাগা ডালের মাথা !
ভাঙা মাথা জোড়া না যায়, যায় না কোনও ইতিহাস রেখে,
আঁধার আকাশে কালো অক্ষরে মহাকাল কি যে লেখে,
লিখে যায় অবিরাম—
'বল হরি হরিবোল' অথবা সে 'সত্ হায় রাম নাম।'

ঘর্ ঘর্ ঘোরে জাঁতা—
আকাশ ফাটিয়া ঝরে জল, তার ধূলায় আসন পাতা।
সে জল পথের কাদায় বিলীন পথেই শুকায়ে থাকে,

---

(১) সম্পাদকীয় মন্তব্য
লেখক বোধহয় জানেন না
"যত ছিল নাড়াবুনে,
এখন সব হয়েচে কীর্ত্তনে
কান্তে ভেঙ্গে গড়িয়েছে কর্ত্তাল" !
শ, চি, ল,

প্রখর রৌদ্রে লাল ধূলা শুধু ঘুরিছে ঘূর্ণীপাকে !
মরুভূমি হ'ল গ্রাম—
'বল হরি হরিবোল' অথবা সে 'সত্ হ্যায় রাম নাম।'

ঘর্ ঘর্ ঘোরে জাঁতা—
রাজমহিষীর সকলি গিয়েছে সম্বল ছেঁড়া কাঁথা।
সেই ছেঁড়া কাঁথা বিষ্ণুচক্রে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পড়ে,
দেবীপাদপীঠ গহনে গহনে তার পরে ঘরে ঘরে।
এ পূজার ঋক্-সাম—
'বল হরি হরিবোল' অথবা সে 'সত্ হ্যায় রাম নাম।'

ঘৃতকুম্ভ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

বিমলা চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ বিহ্বলের মত ভবানী বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। কিন্তু কোন মতেই বিমলার এই ক্রোধের কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ভাবিতে ভাবিতে ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ভবানী রান্নাঘরের দিকে চাহিল, দরজায় কুলুপ। পকেটে হাত দিয়া দেখিল দুইটি পয়সা এবং একটি আধলা অবশিষ্ট। ক্ষণকাল তরে বিবেচনা করিয়া দেখিল তাহার ক্ষুধার অনুপাতে আড়াইটি পয়সা যৎসামান্য মাত্র। আড়াই পয়সায়

কোনও খাদ্যে—একমাত্র ছোলা ব্যতীত—তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ ছোলা খাইলে তাহার পেট কামড়ায়। আর ছোলা ভিজিতেও সময় আবশ্যক, ততক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। পা টলিতেছে আর অপেক্ষা করিলে মাথা ঘুরিয়া নিশ্চয় সে পড়িয়া যাইবে। অগত্যা সাহসে ভর করিয়া সে ডাকিল—'দিদি।'

কোনও উত্তর আসিল না। ভবানী আবার ডাকিল—উত্তর নাই। তখন ধীরে ধীরে দেয়াল ধরিয়া ভবানী দোতলার সিঁড়িতে গিয়া দাঁড়াইল। দোতলার সিঁড়ি ঘর হইতে বিমলার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া ভবানী ক্ষুধা ভুলিয়া তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠিল। দেখিল সিঁড়ি ঘরে বগলামুখী দেবীর একখানি বৃহদাকার ছবির উপর মাথা রাখিয়া একটি বস্ত্রাবৃত ক্ষীণমধ্য উদূখলের মত ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় বিমলা ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে আর তাহার মাথার কাছে কতকগুলি কাগজ-পত্র ছড়ান পড়িয়া আছে। ভবানীর ভয় হইল, ডাকিল, "দিদি।" বিমলা মুখ তুলিল, তাহার পর ভবানীর হাত ধরিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার ছবি জানিস?" ভবানী কহিল—"হুঁ, মা'র।" বিমলা চক্ষের জল মুছিয়া কহিল,—"এই ছবির পা ছুঁয়ে বল্ মিনুর সঙ্গে আর কথা বল্‌বিনি!" ভবানী কহিল—"খিদে পেয়েছে!" বিমলা কহিল—"চালাকী নয় ভবু! যদি না বলিস্ এ কথা, আমি না খেয়ে মর্‌ব ব'লে দিচ্ছি। আর সহ্য হয় না আমার।"

ভবানীর পক্ষে চট্ করিয়া প্রতিজ্ঞা করা শক্ত হইল। মিনু আজ তাহাকে যে ভাবে অপমান করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ না দিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ জন্মের মত বন্ধ করিয়া দেওয়া নিতান্ত কাপুরুষের পরিচয়। কিন্তু বিমলার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার

অবাধ্য হইতে তাহার সাহসেও কুলাইতেছিল না, তখন সে আমতা আমতা করিয়া কহিল,—"আর একদিন কথা বলেই আর বলব না!"

বিমলা দাঁতে দাঁত চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আর একদিন কেন?" ভবানীর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। সে চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল। বিমলা রুখিয়া উঠিয়া কহিল, "একেবারেই মাথা খারাপ হ'য়েছে তাহ'লে?" ভবানী মৃদুস্বরে কহিল—"খারাপ হবে না? যে অপমান করেছে মিনু!" বিমলা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "অপমান করেছে? কবে?"

ভবানী সার্টের আস্তিনে চোখ মুছিয়া কহিল, "আজ!"

"কি বলেছ মিনু আজ?" বিমলা উৎসুক হইয়া ভবানীর মুখের দিকে চাহিল। ভবানী কহিল, "আমাকে ভ্যাবা গঙ্গারাম বলেছে! আমি যদি এর শোধ না দিই—তাহ'লে!" বিমলার গলা হইতে যেন ইলিশ মাছের একটি তুষকাঁটা নামিয়া গেল। সে ভবানীর হাত ধরিয়া অশ্রু গদ্ গদ্ কণ্ঠে কহিল—"ভবু, রাগ করিস্‌নি ভাই। আমি মিছিমিছি বকেছি তোকে। তোর অপমানের প্রতিশোধ আমি নেব, তুই আর মিনুর সঙ্গে কথা কস্‌নি! বুঝ্‌লি?" ভবানী কহিল—"আচ্ছা। বড় ক্ষিদে পেয়েছে দিদি!"

"তুই বোস্ আমি আস্‌ছি—" বলিয়া বিমলা বিক্ষিপ্ত কাগজ ও চিঠিপত্রগুলি গুছাইয়া তুলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

ইহার পর কিছু দিন দুইটি প্রাণী নির্ব্বিঘ্নে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিল।

*　　*　　*

তাহার পর যে ঘটনা ঘটিল, সে ঘটনায় লিসবনের ভূমিকম্পে ইউরোপের মত বিমলার গৃহস্থালী টলমল করিয়া উঠিল।

ভবানীর বি, এ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিমলা কহিল, "আয় ভবু, তোকে সাজিয়ে দিই।" কিছু দিন হইতে ভবানীরও সাজগোজ করিয়া পথে বাহির হইতে কেন যেন দারুণ ইচ্ছা হইতেছিল। বিমলার প্রস্তাব শুনিয়া খুসী হইয়া সে কহিল—"আমারও আজ ক'দিন থেকে সাজতে ইচ্ছে কর্‌ছে দিদি!"

তখন বিমলা ভবানীকে সাজাইতে বসিল। ভবানীর মুখখানি ঘষিয়া ঘষিয়া রক্তবর্ণ করিয়া যশোরের চিরুণী সহায়ে তাহার চুল আঁচড়াইল এবং আধ ঘণ্টা ধরিয়া তাহাকে সাজাইয়া কহিল—"যা! কিন্তু সকাল সকাল ঘুরে আসিস্!" ভবানী রাজী হইয়া বাহির হইল।

ভবানীর সাজ হইয়াছিল ভালই। গায়ে চুড়িদার সিল্কের পাঞ্জাবী পরণে কালোপাড় ধুতি, পায়ে পাম্প সু, জামার পকেটে তাহার স্বর্গীয় পিতা ভীমচন্দ্র বাবুর বিবাহের যৌতুক—সোনার ঘড়ি ও মোটা একগাছি গার্ডচেন। ভবানীর ইচ্ছা হইল এই বেশে একবার মিনুদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু পারিল না, মনে হইতে লাগিল যেন বিমলার রক্তচক্ষু দুটি তাহার পিছু পিছু আসিতেছে।

* * *

কাষ্টমস্ গ্রাউণ্ডে লীগের কি একটা খেলা ছিল। দারুণ ভিড়। ভবানী সেই জনতারণ্যের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ঘাড় উঁচু করিয়া তন্ময় হইয়া খেলা দেখিতেছিল, অকস্মাৎ মনে হইল বুকের কাছে কি যেন সুড়্ সুড়্ করিতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য নিজের দিকে তাকাইতেই দেখিল পাঁচটি কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গুলি তাহার বুকের গার্ড চেন লইয়া নির্ব্বিকারভাবে খেলা করিতেছে। তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যেই অঙ্গুলিপঞ্চক মুষ্টিতে পরিণত হইয়া তাহার সঘড়ি

গার্ডচেনটি টানিয়া লইয়া উধাও হইল। ভবানী ভয়ে চীৎকার করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান একটি ভদ্র লোকের হাত টানিয়া কহিল—"আমার ঘড়ি চেন চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।"

ভদ্র লোকটি 'চোর চোর' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচজন লোক ভবানীর নির্দ্দিষ্ট পলায়মান ব্যক্তিটির পিছনে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর আর তাহারা ফিরিল না।

খেলা ভাঙিয়াছে। অন্ধকার হইয়াছে। একটি আমগাছের তলায় রবিবর্ম্মার অশোকবনবাসিনী সীতার মত গালে হাত দিয়া বসিয়া ভবানী কাঁদিতেছে। দিদির কাছে আজ মুখ দেখাইবে কি করিয়া? মায়ের সিন্দুক হইতে দিদি আজ ঘড়ি বাহির করিয়া দিয়াছে এবং তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিয়া কহিয়াছে—"দেখিস্ হারাস্নি যেন!" ঘড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কি বলিবে? মিথ্যা কথা বলিবার উপায় নাই—দিদি তাহার মুখের দিকে চাহিলেই চিনির গন্ধে পিপীলিকার মত মনের যত কথা সুড় সুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিবে। ভবানীর মনে হইল যদি মোটরের ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইত তাহা হইলে ভাল হইত—ঘড়ি ভাঙিয়াছে কিংবা তাহার অজ্ঞান অবস্থায় কেহ তুলিয়া লইয়াছে এইরূপ একটা কৈফিয়ৎ অনায়াসে দেওয়া চলিত। মনের অবস্থা যখন এইরূপ তখন পশ্চাৎ হইতে রুদ্র-মধুর কণ্ঠে কে কহিল—"বৎস! এ ঘড়ি চেন তোমার?" ভবানী স্প্রিংয়ের ঘোড়ার মত তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পিছনে চাহিল, দেখিল মাথায় জটা ও কপালে গোপীচন্দনের তিলক, রক্তবর্ণ বস্ত্রপরিহিত খড়্গনাসা ক্ষুদ্রচক্ষু কমণ্ডলুহস্তে

এক সন্ন্যাসী তাহার ঘড়ি চেন হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া! ভবানী প্রথমে স্তম্ভিত তাহার পর বিস্মিত এবং তাহার পর পুলকিত হইয়া ভক্তিগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কহিল—"হ্যাঁ আমার!" সন্ন্যাসী কহিলেন—"বৎস, এই লও।" বলিয়া নিজ হস্তে ঘড়ি চেন ভবানীকে পরাইয়া দিলেন। ভবানী ভক্তিতে আবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া কহিল—"প্রভু আপনি কে?"

সন্ন্যাসী কহিলেন—শ্রীমৎ দারুব্রহ্মানন্দ স্বামী!

জীবনে কোনও দিন কোনও সন্ন্যাসীর সহিত ভবানীর চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই, আজ অকস্মাৎ এই তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভবানীর মনে এক অপূর্ব্ব ভাবোদয় হইল। সে কহিল—"প্রভু কি করেন?"

দারুব্রহ্মানন্দ স্বামী আম্রবৃক্ষমূলে পদ্মাসনে বসিয়া কহিলেন "পরোপকার, পর্য্যটন ও প্রণবোচ্চারণ।"

শুনিয়া ভবানীর মনে হইল সন্ন্যাসী বোধ হয় মন্ত্রবলে ঘড়ি এবং চেন সৃষ্টি করিয়া তাহাকে দিয়াছেন এবং ট্রামে উঠিলেই আরব্যোপন্যাসের স্বর্গোদ্যানের মত তাহা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। তাহার একটু ভয় হইল—সন্ন্যাসীর পদমূলে বসিয়া সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভু ঘড়ি ও চেন আপনার হাতে—

সন্ন্যাসী ভবানীর মনের ভাব বুঝিলেন, কহিলেন—"মন্ত্রতন্ত্র নয় বৎস, ঘড়িটি তোমারি। তস্কর যখন তোমার চেন ও ঘড়িটি অপহরণ কর্চ্ছিল তখনই আমি তা দেখেছিলাম এবং সর্ব্বাগ্রে আমিই তার পশ্চাদ্ধাবন করি এবং লাটসাহেবের বাড়ীর সম্মুখে পশ্চাৎ থেকে প্রহারে তাকে ভূপাতিত করে' তোমার অপহৃত বস্তু উদ্ধার করি।"

ভবানী ভাবিল যদি সন্ন্যাসী ঘড়ি ও চেন লইয়া প্রস্থানও করিতেন

তাহা হইলে তো তাঁহাকে ধরিবার উপায় ছিল না—কিন্তু তাহা না করিয়া ভবানীকে খুঁজিয়া তাহার চেনঘড়ি তাহাকে তিনি ফেরৎ দিয়াছেন, অতএব সন্ন্যাসীর পরোপকার প্রবৃত্তিতে সন্দেহ করিবার হেতু থাকিতে পারে না। এই কথা ভাবিয়া ভবানীর সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি আরও ঘনীভূত হইল। সে কহিল—“প্রভু, যদি আমাদের বাড়ী যান তবে বড় ভাল হয়।”

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন—“কেন ?”

ভবানী কহিল—“খাওয়া দাওয়া—”

সন্ন্যাসী বাধা দিয়া কহিলেন—“বৎস এই জগৎ-সংসার সমস্তই আমার ঘরবাড়ী। সমস্ত হোটেলই আমার রন্ধনশালা।” হোটেলের নাম শুনিয়াই ভবানীর চিংড়ির কাটলেটের কথা মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার তৃতীয় রিপু প্রবল হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী তাহার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—“তোমার অসুবিধা বোধ হচ্ছে বৎস ?”

ভবানী লজ্জিত হইয়া কহিল—“আজ্ঞে না, তবে খিদে পেয়েছে।”

সন্ন্যাসী কহিলেন—“তুমি যাও আহার কর। আমি আর কোন দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্ব।”

ভদ্রলোককে কেমন করিয়া আপ্যায়ন করিতে হয় সে শিক্ষা ভবানীর ছিল, কহিল—“প্রভুর কি হোটেলে যেতে আপত্তি আছে ?”

দারুব্রহ্মানন্দ স্বামী গম্ভীর স্বরে কহিলেন—“আদৌ না। সন্ন্যাসীর পক্ষে হোটেল ও নারায়ণের ভোগমন্দিরে কোনো পার্থক্য নাই। চপ কাটলেট ও প্রসাদী লুচি একই পর্য্যায়ের। মুর্গীর ব্যঞ্জন ও কুমড়ার ডালনায় ভিন্ন দৃষ্টি দেওয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে অন্যায়। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। পাঁঠাতেও যে ব্রহ্ম, পটোলেও সেই ব্রহ্ম। অলুবখরা এবং আলুতে একই ব্রহ্ম বর্ত্তমান। অতএব কোন বস্তুতে

আসক্তি অথবা অনাসক্তি, রুচি এবং অরুচি আমার আছে তা ভেবো না। অতএব হোটেলে যদি তুমি আমার ভোগরাগের ব্যবস্থা কর্ত্তে চাও তাতে আমার আপত্তি নাই।”

সর্ব্ববস্তুতে স্বামীজীর সমজ্ঞান দেখিয়া ভবানী ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া আর একবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল—“তবে আসুন!”

ক্রমশঃ

গান্ধী

মা বলেন—গান্ধী···। বৌদি বলে—গান্ধী···। বিয়ের কথা কেউ পাড়ে না। অবনী অস্থির হইয়া উঠিল। ওদিকে প্রতিমার বাবা মা আর অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নন। সার্দ্ধ তিন বৎসরকাল ঢিল ছুঁড়িয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, ঝি ও পিওনের খোসামোদ করিয়া, প্রাচীর টপকাইতে গিয়া হাঁটুর চামড়া ছড়াইয়া, গাড়ী ও ট্রামের পিছনে ছোটাছুটি করিয়া তরী প্রায় তীরে ভিড়িয়াছে এমন সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত—গান্ধী! ভালোরে ভাল, গান্ধী তো গান্ধী—কি হইয়াছে? তাই বলিয়া লোকে হৃদয়ের এতবড় একটা সমস্যাকে তো বাতিল করিয়া দিতে পারে না, ঝড়ে জলে লীগের একটা খেলা কোনও দিন বন্ধ হইয়াছে? গান্ধী! ইলোপমেণ্ট নয়, গান্ধর্ব্ববিবাহ নয়, তিন আইন নয়, ইণ্টারকাষ্ট ম্যারেজ নয়—একেবারে আইনঘটিত সমাজঘটিত বিবাহ! তবু গান্ধী?

মা খাইতে বলিলেই বলে, ক্ষিদে নাই; রাত্রে যখন তখন উঠিয়া মায়ের ঘরের সামনে পায়চারি করিতে থাকে। কোনও দিন তিনি

জানিতে পারেন, কোনও দিন পারেন না। যেদিন জানিতে পারেন, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে হাঁকিয়া বলেন, কিরে অবু, এতরাত্রে পায়চারি কচ্ছিস্ কেন, ঘুমোগে যা না। অবনী বলে, ঘুম কি আস্‌ছে ছাই, বুকটা কেমন ধড়ফড় কচ্ছে। মা শঙ্কিত হইয়া উঠেন, বলেন, কালই তাহ'লে জগবন্ধু ডাক্তারকে—

অবনী বারান্দা হইতেই হাঁকিয়া বলে, ওসব ডাক্তারের কাজ নয় মা, ভাবছি চেঞ্জে যাব। ছেলের দীর্ঘশ্বাস বে-দরদী মাতার কানে যায় না। রাত্রিজাগরণ বৃথা যায়।

বৌদির সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা। অবনী বলে, বৌদি বিয়ে দিচ্ছ না, ভাবছি এবার মদ ধরব। বৌদি বলেন, ধর না, সেখানেও পিকেটার —এবং মেয়ে পিকেটার, তোমারই প্রতিমার বন্ধু, সুষমা চাটুয্যে এণ্ড কোং—

—বেশ, তাহ'লে বয়ে যাব—

—বড় তো স্থিতিশীল হয়ে আছ ঠাকুরপো, বয়ে গেলে তো বয়েই গেল!

—মিছেকথা বলো না বৌদি, আমার মত ভাল ছেলে—

—ভাল ছেলে তো ভলান্টিয়ার না হয়ে ঘরে কেন? জহরলাল, সুভাষ—

—বিয়েটা ঘটিয়ে দাও, সুড়সুড় করে জেলে যাব বৌদি।

—বেশ তাই বলো না তোমার দাদাকে, আমি বাপু এই দুঃসময়ে তোমার হয়ে ওকালতী করতে পারব না।

—তা পারবে কেন? হ'ত নিজের কেস! আর দাদারও কেমন ধর্ম্মভজ পণ, ওঁর পাকা ধানে তো কেউ মই দিচ্ছে না—বাংলা দেশের ছেলে, সামান্য একটা বিয়ে করব তাতেও—

দাদা কংগ্রেসকর্ম্মী, দু দুবার জেল খাটিয়া আসিয়াছেন, তিনি বলেন, একটা হেস্তনেস্ত কিছু না হয়ে গেলে বিয়ে কারু করা উচিত নয়। ‘ওয়ারে’র সময় বিয়ে হয় না।

—হয় না বৈকি! নিজে বৌ নিয়ে ঘর করতে লজ্জা হয় না?

নিরুপায় অবনী শেষে ভলান্টিয়ার হইয়া জেলে যাইবে স্থির করিল। কিন্তু দোকানে পিকেট করা, খদ্দর বেচা তাহার ধাতে সহিবে না তবু জেলে যাইতেই হইবে। অবনী উপায় ঠাওরাইতে লাগিল।

ভলান্টিয়ার হওয়া হইল না, অনেক চিন্তা করিয়া সে কিছু টাকা সংগ্রহ করিল এবং যথারীতি আটঘাঁট বাঁধিয়া একটা সাপ্তাহিক বাহির করিল, নাম দিল—গান্ধী। চার পয়সা দাম, নিজেই সম্পাদক, প্রকাশক, প্রিণ্টার, একটা নিতান্ত ওঁচা ছাপাখানায় টাকা আগাম দিয়া ছাপাইতে লাগিল। এক সংখ্যা, দুই সংখ্যা, তিন সংখ্যা। ক্ষ্যাপাকুকুর-মার্কা প্রবন্ধ, রক্তারক্তি কবিতা, বোমা বারুদ—

অবনী ধরা পড়িয়া জেলে গেল। ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড। যাইবার সময় বৌদিদিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বলিয়া গেল—এবার ফিরে এসে ফাঁসী। দেখব কোন সুখে দাদাকে নিয়ে ঘর কর। মা কাঁদিতেছিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল, ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

প্রতিমার বাবা মা দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, প্রতিমাও আসিয়াছিল। প্রতিমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, আমি তোমাকে ছুটী দিলাম, প্রতিমা, সেই নিতাই লাহিড়ীকেই বিয়ে কোরে সুখী হও। প্রতিমা জবাব দিল না। দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিল শুধু।

প্রেসিডেন্সী জেল, দশদিন লাপসি খাইতে না খাইতেই অবনী দেখে প্রতিমা, খদ্দর বেচিয়া জেল।

বিবাহের লোভ আবার অবনীকে পাইয়া বসিল, হরিধন চাটুয্যে আছে, পুরুতের বংশ। শালগ্রাম একটা কুড়াইয়া আনিলেই হইবে। জেলার শুনিয়া হাসিল, বলিল, দি আইডিয়া!

আইডিয়াই বটে, কিন্তু প্রতিমা রাজি হয় না, বলে আগে দেশ স্বাধীন হোক—

দাদার ভূত! জেলখানার দেয়ালে দেয়ালে বৌদিদির হাসিমুখ। অবনী মরীয়া, বলে, এবার আত্মহত্যা!

কিন্তু তার আগেই গান্ধী-আরউইন চুক্তি—খালাস। একই ভাড়াটে গাড়ীতে দুইজন, হাত ধরিয়া প্রতিমাকে নামাইয়া, হাত ধরাধরি করিয়া মায়ের কাছে গিয়া প্রণাম। চোখের জলে মায়ের আশীর্ব্বাদ। মাকে বলে, যাই প্রতিমাকে ওদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। বৌদিকে আড়ালে বলে, বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ী চল্‌লাম।

বৌদি বলে, সে তো সেরে এলে ঠাকুরপো।

ঠিক যেন মেয়ে-জামাই। প্রতিমার মার আনন্দ আর ধরে না। বলেন, এই মাসের সাতাশেই একটা ভাল দিন ছিল বাবা। ভাবছি তোমাদের বিয়েটা হয়ে গেলে কাশী যাব।

*

গান্ধীজি রাউণ্ডটেব্‌ল কনফারেন্সে, অবস্থা অনেকটা নর্ম্মাল। দাদা বলেন, যা করবে চটপট করে ফেল। রাউণ্ডটেব্‌লে সুবিধা না হলে কিন্তু—

অবনী বলে, সহর কলকাতা, দশঘণ্টার নোটিশে একটা কেন দশটা বিয়ে হয়ে যায়—

বিবাহ হইয়া গেল। ফুলশয্যার রাত্রি, ভিড় সরিয়া গিয়াছে। বিছানার উপর ফুল ছড়ানো—ফুলে পিপীলিকা। প্রতিমা আর অবনী। অবনী ডাকিল—প্রতিমা, শেষপর্য্যন্ত—প্রতিমার হাত ধরিয়া টানিল। প্রতিমা নড়িল না, জবাব দিল না। একটা ফুল লইয়া ছিঁড়িতে লাগিল। অবনী জেল পর্য্যন্ত সহিয়াছে কিন্তু আর নয়, বলিল, প্রতিমা—

প্রতিমা বলিল, গান্ধীজি—

অবনী তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল, আমি চল্লাম।

প্রতিমা বিস্মিত, বলিল, এতরাত্রে কোথায়? রাত তখন তিনটা।

অবনী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, বলিল, মহিষবাথান যেতে হবে, সেখানে তালগাছ কাটব। আবার পিছু ধাওয়া করো না কিন্তু। দাদার কথাই ঠিক, একটা হেস্তনেস্ত কিছু না হলে—

প্রতিমা ভুল করিয়া ডাকিয়া উঠিল, মা।

কিন্তু অবনী ততক্ষণে শিয়ালদা ষ্টেশন। সেখানে রাত কাটাইয়া ভোরবেলা বাড়ী। বৌদিদি সদর খুলিয়া দিয়া বলিল, এ কি ঠাকুরপো, পলাতক নাকি?

অবনী শুধু বলিল, গান্ধী।

মন-জুয়ান

চতুর্থ সর্গ

স্কট টমসন লিখিত

হে বন্ধু, পড়ে কি মনে, সেই একদিন,
শরতের সন্ধ্যা যবে সুপ্ত শেফালির
আনম্র গন্ধের ভারে দিগন্তে বিলীন
ধীরে ধীরে হতেছিল ; শুভ্র জাহ্নবীর
পরপারে বনচ্ছায়া তিমির-মলিন ;
সায়াহ্ন গগনে শুধু সূর্য্যাস্ত বহ্নির
আরক্ত কনক-পটে যায় বুঝি দেখা,
ভগ্ন দেবালয়-শিরে ত্রিশূলের রেখা ।

ক্ষণিক বর্ষণ-মুক্ত অন্তিম গগনে
সঞ্চারিছে শত শত পতঙ্গের পাল,
শেষ ডাক ডাকিতেছে ঘন তৃণবনে
ভীরু চড়ুয়ের দল, বায়ুস্তরে মাখা
পাটের উদ্ভিজ্জ বাস ; বনের গহনে
আনমিয়া পড়িতেছে শত শত শাখা
পূরন্ত সোনার ভারে ; আমনের শীষ
নুয়ে পড়ে' নবান্নের দিতেছে হদিস্ ।

বাঙ্গালার রাজধানী মুরশিদাবাদ!
বাঙ্গালার সৌভাগ্যের অস্তাচল তুমি!
বাঙ্গালার সৌভাগ্যের বিধ্বস্ত প্রাসাদ!
কীর্ত্তিস্রোত অবলুপ্ত শূন্য মরুভূমি!
ভারত-লক্ষ্মীর চির বৈকালী প্রসাদ!
একদা তোমার পালে বায়ু মউ-সুমী
লেগেছিল, নিয়েছিল সৌভাগ্যের ঘাটে,
বসাইয়াছিল তোমা রত্নময় পাটে॥

অদৃষ্টের ত্যাজ্য পুত্র অভাগ্য সিরাজ!
সৌভাগ্য-শিখরে তুমি শেষ শুকতারা,
তোমার প্রাসাদ ঘেরি করিত বিরাজ
একদা মুখর যেই ইতিহাস-ধারা,
বিশ্বাসঘাতক লুব্ধ সয়ে গিয়ে আজ
অপরের দুয়ারেতে হ'য়ে আত্মহারা
গাহিছে কতই গান, লিখিতেছে লিখা!
ইতিহাস-কীর্ত্তি তুমি অবাধ্য গণিকা॥

সিরাজ দেখিনি তোমা, দেখিয়াছি তব
কীর্ত্তি-যবনিকা আড়ে করুণ সমাধি!
তাহারে ঘিরিয়া আছে মৌন অভিনব
মর্ম্মর-গম্বুজ সম শুব্ধতা অনাদি!
ঊর্ণনাভ চন্দ্রাতপ বুনে দেয় নব;
ক্ষীণপ্রাণ খদ্যোতেরা আলো দেয় সাধি।

নিভে যায় জোনাকির বাতাসে পক্ষের
বিজেতার অনুগ্রহ-প্রদীপ তৈলের ॥

তারকিত অন্ধকারে আচ্ছাদিত সব ;
তিমিরার্দ্র ধরাতলে না চলে নয়ন !
কেবল ঘিরিয়া এই নিখিল নীরব
ক্ষীণ জাহ্নবীর স্বর করিছে বয়ন
ধ্বনির উত্তরী এক ; জ্বলে দব্ দব্
দূর নভে বৃহস্পতি ধ্যান-নিমগন ।
বাঙ্গালার সৌভাগ্যের সমাধিতে আজ
পুরী তুমি মর্ম্মন্তুদ মর্ম্মরের তাজ ॥

যদি কোনো মায়ামন্ত্রে এই নগরের
প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড লভিত ভাষণ,
হীরাঝীল, মোতিঝিল ভগ্ন প্রাসাদের
সজীব হইত যদি প্রতি ধূলিকণ,
বিগত শতাব্দী যদি ধ্বস্ত প্রাকারের
অশ্বত্থের মূল হ'তে মেলিত নয়ন,
দেখিত বাঙ্গালী আজ নিজ রাজ্যহারা
বিশ্ব-স্বর্ণ-মৃগয়ায় করিতেছে তাড়া ॥

এ যেন বেলুনে যেতে হইল খেয়াল,
ক্ষুদ্র এই দোলাটার 'নাগ্র' সুখ ভাই,
অসীম বিস্মৃত দেশ, অন্তহীন কাল,
পাইকারি ভাবে তারে বক্ষে ধরা চাই—

অতএব লক্ষ্য করি বিশ্বের মাকাল
শূন্তে মারিলাম লাফ! জগাই মাধাই!
চা, চুরুট, পেগ টেনে বেঁচে র'ল ভূমা,
সবেগে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে কাঁদি আমি উ মা॥

সোনার রাজত্ব হায় জলে ফেলে দিয়ে
ব্যালট বাক্সেতে বৃথা মর হাতড়িয়া,
কোহিনুর অপরের মুকুটে তুলিয়ে
মস্তকে বহিছ বৃথা কয়লা পাথুরিয়া!
নৌকার ভাতিয়া কাষ্ঠ জ্বালানি করিয়ে
পার হবে পারাবার শুধু সাঁতারিয়া।
স্বদেশেরে বলি দিয়ে বিদেশের পায়ে,
বিশ্বের বাজারে স্থান লইবে গুছায়ে?

মিছে দোষ দাও ভাই যবন-দস্যুরে
সেকেন্দারা গ্রন্থাগার পুড়াইল যারা,
নূতন ধরণে আজ যায় দেখ পুড়ে—
বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল জ্ঞানের সাহারা।
বাগীশ্বরী-সিংহাসন বসিল সে জুড়ে
কর্ত্তৃপক্ষে আছে যার খুড়া ও বাবারা।
মন্দ হ'ল চন্দ, নন্দ, কাতলা রোহিত—
ডিনারে ভর্জ্জিত হ'ল পুঁটিকা সহিদ্॥

কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সবে নিরপেক্ষ অতি
ডান হাতে দেখিতেছে সবার দলিল,
স্বয়ং ভাইপো ভাবে আজিকে দুর্গতি

আর তার আশা বুঝি নাই এক তিল।
(উঁকি মেরে দেখে ভায়া, কেবা কত সতী
টেবিলের তলে সব হাতে হাতে মিল।)
এ ডার্বি সুইপে কার আগালিব রাশ
তুমিও দিয়েছ যোগ, Thou too Brutus !

অতি উচ্চ প্রতিভার গৌরীশৃঙ্গে বসি
হে রবীন্দ্র, ফেলিতেছ রশ্মিজাল তব—
ধীরে ধীরে টানিতেছ দুই হাতে কসি
ডাঙ্গায় উঠিছে কত মৎস্য অভিনব।
সুধীবর ! কি স্বর্গীয় ক্রীড়ারসে রসি
নিতুই কতই আহা, খেলা করি' নব,
ধরো মাছ, মারো তায়, নাহি ছোঁও হাতে,
কতক সান্ত্বনা ছিল পড়িলেও পাতে॥

আপনারে ছাড়া তুমি আর কাহারেও
ভালবেসেছিলে যেন না হয় প্রত্যয় !
দেশব্যাপী উপবাসে কভু আহারেও
ভুলেও হল না হায় একটু ব্যত্যয়।
ভিক্ষার্থী যায় কি বল তোমার দ্বারেও !
সিন্ধুসম দুঃখ তব বিন্দুবৎ হয়।
সন্দ হয় হিয়া তব আছে কিনা আছে,
হয় তো এসেছ ফেলে মন্দারের গাছে।

আর তুমি গাজিবর ! বৃদ্ধ ওমরের
পেয়ালাবেহালাধারী নব্য অপভ্রংশ,

অসিরে করিয়া মসী বাঁধি কোমরের
কাব্য-বৃন্দাবনে তুমি মূর্ত্তিমান কংস।
কাব্য-বাগিচায় তুমি পুষ্প ডুমুরের,
ঘরে ঘরে ধোর' তুমি ঘোরী অবতংস॥
করিব না আমি আর সত্য অপলাপ,
তোমার কবিতাগুলা প্রেমের জোলাপ॥

গিয়েছিলে বটে তুমি যুদ্ধ করিবারে
খেয়েছ উদর ভরি আরবী খেজুর।
মারিবার উপলক্ষ্যে গেলে মরিবারে
এনেছ জুড়িয়া পিছে সৈনিক লেজুড়।
বিস্ফোটক হয়ে শেষে প্লীহা ও লীভারে
পুনরমূষিক হয়ে হলে চানাচুর!
লড়াই করেছ বটে সাথে করি ফ্রেঞ্চ,
নিন্দুকেরা বলে শুধু খুঁড়েছিলে Trench.

আমরা নিরীহ দাদা, নহিক জার্ম্মান,
অপরাধ শুধু মোরা বঙ্গভাষা জানি,
দূরে থেকে রাখি মোরা যার যার মান,
মোদের কাঁদাও কেন কাব্য-শেল হানি!
নির্ভয়ে শোনাও গান, পেয়েছ ফার্ম্মান
কোন্ জন্মে ছিলে তুমি আবরী, ইস্পানী—
তারি সত্য স্মৃতিখানি গেয়ে চল আজি,
শুনে যাবো ঠা'য়ে বসে উদ্গার পেঁয়াজী॥

আর যদি সত্য কথা শুনিতে সাহস
দীর্ঘ অধীনতাতেও হারায়ে না থাকো,
এসো, সাথে ; সত্যকার দেখ বীর রস,
মিহি-মাজা জন কয় তরুণেরে ডাকো।
হেন দৃশ্য একবার হলেও দরশ
প্রাণ পাবে ; মনে করে রাখো নাই রাখো।
সেই দিন বঙ্গবাসী জানিত বাঁচিতে,
আজিকে দশায় পড়ে সবুজে-হরিতে ॥

সেই পলাসীর মাঠ ! পলাশী প্রান্তরে
দাঁড়াইয়া কোনদিন বাঙালীর যদি
অতর্কিতে অকস্মাৎ নিঃশ্বাস না পড়ে,
যদি তার মুগ্ধ নেত্রে নাহি বহে নদী,
সে দিন হে ইতিহাস, বিস্মৃতির ক্রোড়ে
স্থান দিয়ো স্থান তারে দিয়ো নিরবধি ॥
যেখানে সঁপেছে তারা দেহের সম্বল,
সেথা শুধু অশ্রুপাত ! ধিক্ অশ্রুজল ॥

অদূরে গঙ্গার তীরে ক্লাইবের দল,
লক্ষবাগ তরুচ্ছায়ে শিবিরের সারী,
তেলিঙ্গি ফিরিঙ্গী যত হয়েছে চঞ্চল,
সেনাপতি শিবিরের সম্মুখেতে দ্বারী !
একাকী ক্লাইব বসি ভাবিছে কৌশল—
নবাবের সাথে আজ যুদ্ধ হবে ভারি ।

কেহ কেহ বলে, বীর নিদ্রায় মগন,
(সম্পাদক দায়ী নহে) ইতি ম্যালিসন ॥

মাপ করো হে পাঠক শুধু ক্ষণতরে
অবশ্যম্ভাবী এই তথ্য ইতিহাস।
মাপ করো ভুলে যদি কবির অধরে
চাপা পড়ে গিয়ে থাকে কাব্য-প্রীতি-হাস।
গায়ক বলেই কি গো সারাদিন ধরে
করিবে তাহার কাছে শুধু গীতি-আশ ?
স্বর্গের চাইতে রূঢ় স্বর্গের সিঁড়িটা
খাদ্যের মতন নয়, বসার পিঁড়িটা ॥

উপেক্ষিয়া ফিরিঙ্গির কামান-গর্জ্জন,
উপেক্ষিয়া তেলিঙ্গির অশ্ব প্রতিরোধ,
উপেক্ষিয়া অনলের মৃত্যু বরিষণ,
কে ওই ছুটেছে অশ্বে, কে ওই নির্ব্বোধ,
প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস যে করেছে অর্জ্জন,
প্রাণ দিয়ে আজ তা সে করিবেই শোধ !
ধূমধূলি কোলাহলে হ'ল অন্তর্দ্ধান,
চমকিল একবার উষ্ণীষ কৃপাণ ॥

কে ওই পাতিয়া জানু একাকী কামানে,
পলিতায় অগ্নি দেয় আগুনের মুখে,
ফিরিঙ্গির গোলা তার পড়ে বামে ডানে,
একটা ফাটিয়া তার চোখেরি সম্মুখে

বাম বাহুমূলে তীব্র মৃত্যুঘাত হানে।
বুকে ভর করি তবু কামানেতে ঝুঁকে
কামানের মুখে ঠাসে বারুদের তাল
—রক্তস্রাবী বাম হাত নাহিকো খেয়াল।

তুমিও করেছ যুদ্ধ, (অন্তত তোমার
স্বপক্ষেতে সাক্ষ্য দেয় 'বেদনার দান',)
সত্যি কথা বল দেখি, কখনো বোমার
লক্ষ হস্ত দূর থেকে গেয়েছ কি গান!
পেয়েছ বুকের ব্যথা, ঠিকা-বউমার
অভিমানে, কিন্তু কবি নাহি তব জ্ঞান,
প্রেম ব্যথা বেশি বটে, বিষম আঘাত
কিন্তু তারো চেয়ে শক্ত কোমরের বাত।

হৃদয় ভাঙিলে তবু যায় চলা ফেরা
নিতান্ত অশক্ত হলে, ট্রামে ও ট্যাক্সিতে!
কোমর ভাঙিলে হায়, বাঁচায় বাপেরা
সাধ্য নাই! কাবু করে' ফেলে এক শীতে!
(আরও মুস্কিল দেখ,) ভগ্ন-হৃদয়েরা
সে দুঃখ রটায় কাব্যে দিবসে-নিশীথে
কিন্তু সে চরম দুঃখ ভগ্ন-কোমরের
মোটেই প্রকাশ্য নয়, নহে গুমরের॥

অতএব কবিবর, শোনো কথা মোর
করো না বড়াই কভু ভগ্ন হৃদি নিয়া,

তারো বড় ব্যথা আছে, কিবা নাম ওর
ডাক্তারীতে বলে যারে নিউর‍্যালজিয়া !
কাব্যঅভিষেকহীন সে বেটা পামর
আপাদমস্তক সদা ফেরে সঞ্চারিয়া।
তার হাতে বাঁচিবারে যুক্তি কহিলাম,
সর্ব্বদা সঙ্গেতে রেখো ওরিএণ্ট বাম ॥

ইচ্ছা করে তোমা লয়ে এবং ত্বদীয়—
এবং—(দাঁড়াও, দেখি ব্যাকরণ টারে
কোনো সূত্রে মদ থেকে হয়কি মদীয় ?)
তাই লয়ে ঘর করি কাব্যের সংসারে !
কিঞ্চিৎ আপত্তি ইথে রয়েছে যদিও
সম্মত করাতে হবে গোবর্দ্ধন দারে।
কবি ও কবিনী যার বাহিরে অন্দরে
কাব্য তার গুঞ্জনীয় মণে কি হন্দরে ?

ইচ্ছা করে শতাব্দীর বন্ধন টুটিয়া
ছুটে যাই যেথা আজো পলাশী-প্রান্তরে,
মোহনলাল, মীরমদন আছে অপেক্ষিয়া
ডাকিতেছে বাঙ্গালীর অন্তরে অন্তরে,
যেথায় যুগল রক্তে গিয়েছে ভিজিয়া
শূন্য পলাশীর মাঠ চিরদিন তরে।
তাদের সমাধি পরে হিন্দু মুসলমান
পরস্পরে কণ্ঠ চাহি শাণায় কৃপাণ।

একটি আরবী ঘোড়া, একটি কৃপাণ
সবেগে চাবুকি অশ্বে দুরন্ত উল্লাসে,
ছুটে চলে যাই যেথা গর্জ্জিছে কামান,
অজস্র ধারায় গোলা ফাটে আশে পাশে।
হয়তো অমর কীর্ত্তি, নতুবা শয়ান
জাহ্নবীর তটচারী ফেণ-শুভ্র ঘাসে।
সহস্র কাব্যের চেয়ে সে মরণ শ্রেয়,
হেন আস্বাদন লাগি কি আছে অদেয়।

কে ওই সিরাজ তুমি বঙ্গের নবাব,
কার পদপ্রান্তে রাখি সোনার মুকুট,
বৃথায় প্রতীক্ষা কর সদয় জবাব!
তোমার সৌভাগ্য যারা করিতেছে লুট
তাদের অগ্রণী ওই—মূর্ত্তিমান পাপ।
তাদেরো সৌভাগ্য-লক্ষ্মী রবে না অটুট,
বিধাতার অভিশাপ পাপের আপোষে
সবেগে পতিত হয় বজ্রাগ্নির রোষে।

পালাও পালাও শীঘ্র, পালাও সিরাজ!
কোথা যাও? রাজধানী? এই সেই পথ!
যে পথে আসিয়াছিলে পরি রাজসাজ
সে পথে ফিরিতে হ'ল ভিখারীর মত।
কে ওই আসিছে পিছে! প্রাতঃসন্ধ্যা আজ
একটি অদৃষ্টচক্র ঘুরাইল কত!

সকালে সিরাজ ছিল বঙ্গের দুলাল—
সন্ধ্যায় দেখিল সবে পথের কাঙাল।

হায় ইতিহাস, তুমি সদ্য গাঁট-কাটা
একের হরিয়া কীর্ত্তি অপরে সাজাও!
অক্ষয় কীর্ত্তিতে কত দেখা দেয় ফাটা,
রেহাই পায় না কভু সম্রাট রাজাও!
হে নির্ব্বোধ কীর্ত্তিলোভী! মিছামিছি খাটা—
তোমার কীর্ত্তিতে অন্যে মারিবেই দাঁও।
অঙ্কুর বুনিলে তুমি সেঁচি ঘর্ম্মজল
অপরে কাটিবে তার সুপক্ক ফসল।

তোমরা কবির দল! তোমরা বিনয়ী
সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বন্ধুবান্ধবের
(যদিও নিশ্চয় জানো, আমরা কি নই
সুযোগে হইতে পারি সম রবীন্দ্রের!)
ছাপাও সে কাব্য গ্রন্থ! (মাসিক—ঝিনই
সেঁচিতে পারে না যেই তল সমুদ্রের!)
আগে ছবি, পিছে ছবি, দাম তিন টাকা
কাগজ পাউণ্ড আশী—মাঝে সব ফাঁকা।

ফাঁকা হলে ছিল ভাল, ধোপার হিসাব
লিখিতাম; যদিও এমন রাজসূয়
কাগজেতে সম্রাটেও কোনো কালে, বাপ
লেখেনি রজক-কথা ভ্রমেই কভুও।

ওজনে বাড়িত যদি কাব্যের প্রতাপ
তা হলে স্বার্থক কিছু হইত তবুও ॥
চিত্রাবলী দেখি ভাবি কোথা আসিলাম,
Maximum নারী সংখ্যা, বস্ত্র minimum.

নারীর কথাই যদি উঠিল হঠাৎ
এ সব আশ্চর্য্য কথা আকস্মিক বটে
কারো প্রতি না করিয়া কোনো পক্ষপাত
বলিব বক্তব্য মোর ; যদি কেহ চটে
আমিও নাচার ; হয় হোক অপঘাত ;
বলুক নারীও মোরে নিতান্তই শঠ এ।
পনেরো পঁচিশ শুধু নারীর জীবন,
বাকি সব ভুষি-মোড়া,—পার্শ্বেল যেমন।

পনেরোয় উস্থুস্থু ; পুরুষের নাম
কখনো আনে না মুখে ; যেই হ'ল ষোল
দেখায়ে দেখায়ে আঁটে জামার বোতাম,
অর্থাৎ 'খুলিব না তা যতই না বলো'।
সতেরোয় দোলে চোখে হুটি মুক্তাদাম
পায় না তাহারে খুঁজে সঙ্গিনীর দল।
আঠারোয় অকারণে ব্লাউজের বুক
খুলে যায় মুহুর্মুহু—সেই এক সুখ ॥

উনিশ হইতে এক নূতন অধ্যায়,
এতদিন ছিল তারা ব্যাধবাণভীত ;

পুরুষেরে এড়াইত ভয়ে ও শ্রদ্ধায়,
এইবার ছাড়ে শর একান্ত নিশিত।
পুরুষে জেনেছে ভীরু, আর কোথা যায়,
আঘাত মাত্রেই জয়, একথা নিশ্চিত।
পরস্পরে বুঝে সুঝে করিয়া আপোষ—
ব্লাউজ খুলিয়া গেলে নাহি ধরে দোষ!

দূর হোক্ নারী-তত্ত্ব! বসিলাম এসে
ম্লান মৌন মোতিঝিলে নির্জ্জনে একাকী।
মণি-গলা জলতল; চারি তীর ঘেঁসে
ঘনতর পদ্মবনে শতলক্ষ পাখী
ডাক, চখা, বেলেহাঁস; প্রহরের শেষে
চকিত ডাহুক ডেকে ওঠে থাকি থাকি।
অদূরে ঝিলের মাঝে প্রাসাদ-ভবন
আপন ছায়ার চেয়ে মলিন এখন॥

শিশির-মন্থর সেই শরত সন্ধ্যায়,
স্তরে স্তরে ধূমলেখা পল্লীবেণুশিরে;
শেফালির স্তব্ধ শ্বাস; পতঙ্গ পাখায়
অতিক্ষীণ ধ্বনিটুকু; সায়রের নীরে
ক্ষুদ্রতম তরঙ্গটি গগন-সীমায়
গোধূলি ত্রিবলী-লেখা, নভঃ সীমা চিরে
দীর্ঘগ্রীবা দীর্ঘতর ধনুক হাঁসের
হঠাৎ নিজের ছায়া আলোতে চাঁদের॥

ইতি চতুর্থ সর্গ

চলচ্চিত্র

দেশে মানুষ কই ?

"যাঁরা জেলে যাচ্ছেন তাঁরা ভেবে দেখছেন না, জেলে গিয়ে শক্তির অপচয়ই হয় * · * · * · * " · · · · —বিচিত্রা-সম্পাদক

জয়েণ্ট ইলেক্টোরেট

মহাত্মা গান্ধীর উপবাস-ভঙ্গের পর

ভারতে বিপ্লববাদ

হাতী যদি চাইত পিছন ফিরে!

এক হাতে তার কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার

—'আমাকে ভালবাসবে না কেন?'

WHAT IS PLAY TO YOU—

—'আহা, কথাটা শুনছ না কেন ?'

চুম্বক
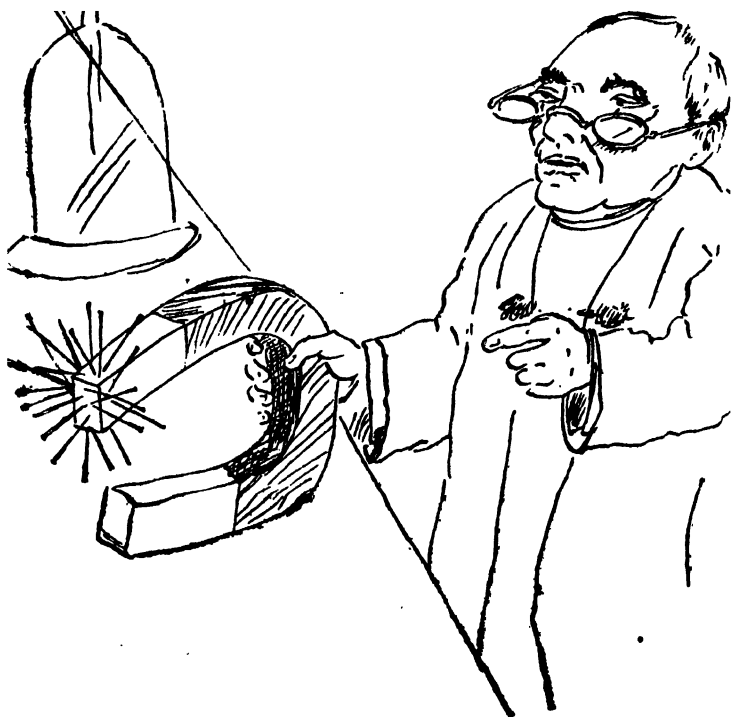
—'দেখ, এই যে আলপিনগুলি এক জায়গায় জমা হয়েছে এর কারণ আর কিছুই নয়—এই চুম্বক। চুম্বক সরিয়ে নাও—দেখ্‌বে * * *'

বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ

—'মুগ্ধবোধ বাবা !'

অতিরিক্ত

—'চিনি তো ছেলেমানুষ, আখই নাও।'

ক্ষ্যাপা কুকুর

—'ও রে বাপ্ রে!'

চিরদিন ক্ষ্যাপা থাকে না

—'আহা———'
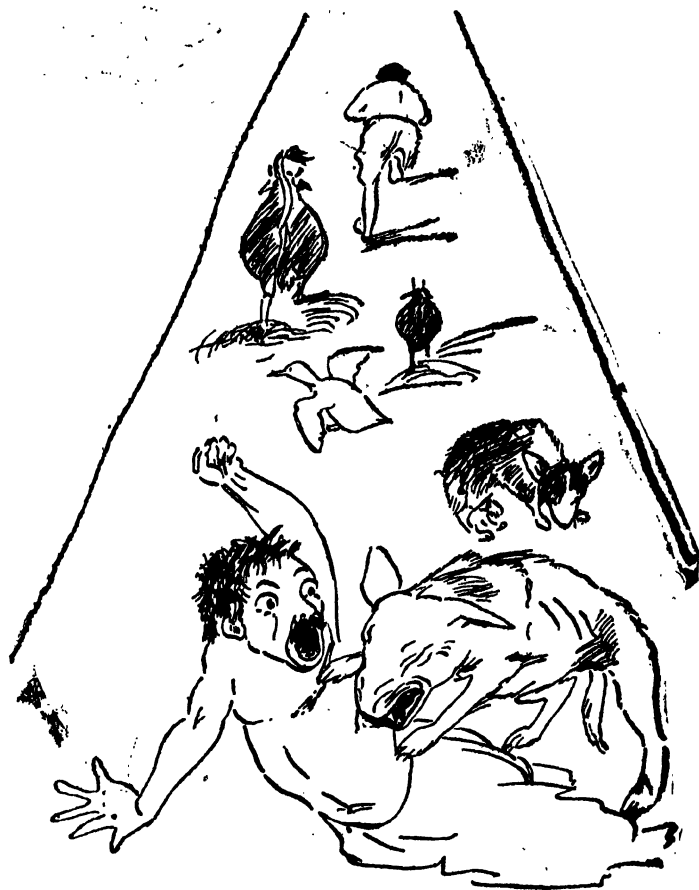
ভুতুড়ে গল্প

মাংস সিদ্ধ হইতে তখনও বাকী, ক্ষুধার জ্বালায় এক পরিতোষ ছাড়া সকলেই অস্থির। তাহার ডিসপেপসিয়ার ব্যারাম। পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমাদের কাতর ভাব দেখিয়া সে কৌতুক অনুভব করিতেছিল, অন্য সকলেরই মুখ অপ্রসন্ন। গতিক সুবিধার নহে দেখিয়া আমি সুরেশদাকে বলিলাম, রবীন্দ্রনাথ হইতে কিছু আবৃত্তি করিতে। বীরেশ গম্ভীর গলায় হুঙ্কার করিয়া উঠিল—খবরদার, খালিপেটে রবীন্দ্রনাথকে আসরে এনো না বল্‌ছি। কেলেঙ্কারী হবে। যতীন বলিল, তা হ'লে নজরুল্? বীরেশ আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, সাবধান, খুন করব। খুন করে ফাঁসী যাব। প্রমোদ বীরেশের অনুমোদন করিয়া বলিল, কাব্যটাব্য এখন চলবে না বাপু।

'শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম করিতে পান'—এসব কবিতাতেই সাজে। তার চাইতে খানিকটা কাঁচা মাংস আনো, চাখা যাক্।

বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন শ্যামদাদা। বলিলেন, ভূতের গল্প শুন্‌বি—সত্যিকারের ভূত? সকলেই 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিলাম।

ভাদ্রের শেষ। তবুও আকাশে মেঘ থম্ থম্ করিতেছিল। বাহিরের অন্ধকারে মেঘরাজ্যের বিপর্য্যয় চোখে দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু গর্জ্জনে ও বিদ্যুৎঝলকে অনুভব করিতেছিলাম, রাত্রিটা ভূতের গল্প শুনিবার উপযুক্ত বটে। ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়া সকলেই

একটু ঘনিষ্ঠভাবে বসিলাম। শ্যামদাদা বলিতে লাগিলেন,—নামো-পাড়ার মাধব চাকীকে তো জানিস্? যার খোল বাজানোর ঠেলায় মাঝে মাঝে আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে হয় সেই। লোক এমনিতে বেশ, কিন্তু কীর্ত্তনানন্দে যখন সে মাতে তখনই ভাবি, দি' মাথাটা ফাটিয়ে। শেষে ভগবান তাকে শাস্তি দিলেন। লোকটা ভূতের কবলে পড়ল।

রতন একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিয়া উঠিল, কেন শ্যামদা, এই কালও ত দেখলাম, মাধব চাকী তার বারান্দায় একা বসে খোল বাজাচ্ছে, আর অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা নাড়াচ্ছে।

শ্যামদাদা একটু রাগতভাবে বলিলেন, আমি কি বলেছি সে শিঙে ফুঁকেছে? ওর ওই মাথা নাড়াটাই তো ভূতের খেলা। কিছুদিন আগে দেখেছিস কেউ ওকে এভাবে মাথা নাড়তে?

মাধব চাকীর মাথা লইয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে কেহই মাথা ঘামাই নাই। চুপ করিয়া রহিলাম। শ্যামদাদা বলিতে লাগিলেন—

বেশীদিনের কথা নয়। একদিন বিকেলবেলায় নামো-পাড়ায় গেছি কিছু গুগলির সন্ধানে। ছিদাম জেলের বাড়ীর পরেই মাধব চাকীর আস্তানা। দেখি ব্যাটা বারান্দায় একা বসে খোল বাজাচ্ছে, আর গুণ্ গুণ্ করে গান গাইছে। আমাকে দেখেই সে সুরভাঁজা ছেড়ে খোলে চাঁটি মারতে মারতে বল্‌লে, পেন্নাম হই দাদাঠাকুর। নরোত্তম দাস ঠাকুরের একটা পদ নতুন শিখেছি। তোমার কি সময় হবে?

মনে মনে রাগ হলেও বল্‌লাম, একটু চটপট্ সারিস তো শুনি। হাতে কোন কাজ ছিল না, ভাবলাম লোকটাকে না হয় একটু খুসীই করা যাক্। মিনিট পনেরো ধরে' পাঁয়তাড়া ভেঁজে মাধব সুরু করলে—

কাঞ্চন দরপণ বরণ সুগোরা রে
বর বিধু জিনিয়া বয়ান,
দুটি আঁখি নিমিখ, মুরুখ বড় বিধিরে
নাহি দিল অধিক নয়ান।
হরি হরি কেনে বা জনম হৈল মোর—

শেষের পদটি সে বার বার ফিরে ফিরে গাইতে লাগল। 'কেনে বা' 'কেনে বা' শুন্‌তে শুন্‌তে মন্‌টা বিরক্ত হয়ে উঠল। ভাবলাম কোনও একটা অছিলায় উঠে যাই। আফিমের মৌতাতে একটু ঝিমও আস্‌ছিল। হঠাৎ দেখি মাধবের তাল কাটছে—পদ থেমে থেমে যাচ্ছে। একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি, একটা মাছি বারবার ঘুরেফিরে মাধবের নাকের ডগায় বসতে যাচ্ছে; মাধব মাথা ঝাঁকিয়ে খোলে চাঁটি মারার ফাঁকে ফাঁকে হাত নেড়ে মাছিটাকে তাড়াবার চেষ্টা করছে। সেটা বোঁ বোঁ করে তার মুখের চারদিকে উড়ে উড়ে আবার ঠিক এসে নাকের ডগায় বস্‌ছে। ভারী হাসি পেল আমার। বল্‌লাম, মাধব মাছিটা ত ভারী রসিক, কীর্ত্তনের রস ছেড়ে ব্যাটা নড়তে চাইছে না। মাধব এতক্ষণে প্রায় ক্ষেপে উঠেছিল। খোল ছেড়ে সে লাফিয়ে উঠে বললে, দাঁড়া ত শা—, তোর নাকে বসা বের করছি। তারপর রীতিমত একটা কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। দুটো হাত দিয়ে নাকে চাপড় মারতে মারতে মাধব বারান্দাময় লাফালাফি সুরু করে দিলে। হাসি চাপতে চাপতে আমি ত এদিকে মারা যাই আর কি! শেষে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর নিজের নাকে এক প্রচণ্ড বিরাশিশিক্কা ওজনের কিল বসিয়ে মাধব মাছিটাকে একেবারে থেঁতলে দিয়ে ধপ করে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল। সেদিন

গান আর জমল না। মাধবের অবস্থাটা স্মরণ করে সারা রাস্তা আপন মনে হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরে এলাম।

দিন তিনেক পরে, ঘুম থেকে উঠে দাঁতন ভাঙতে চাটুয্যেদের বাগানে ঢুকতে যাচ্ছি,—দেখি, ঝড়ের মত মাধব এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে সুরু করে দিলে। অস্থির ব্যাপার! বললাম, মাধব, পা ছাড়, ব্যাপার কি বল? মাধব কাঁদতে কাঁদতে বললে, দাদাঠাকুর, আমাকে বাঁচাও। তুমি না ব্যবস্থা করলে আমি মারা গেলাম। বল্‌লাম, ব্যাপারটাই কি বল্ ছাই? মাধব বল্‌লে—মহাপাপ করে ফেলেছি ঠাকুর, বোষ্টম হয়ে জীবহত্যা করেছি। আমার কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে? তার ফলও ত এই ভুগছি।

ভাবলাম, ব্যাটা রাগের মাথায় কাউকে খুন করে থাকবে। সদর রাস্তার ধারে সে আলোচনা ঠিক হবে না ভেবে বল্‌লাম, চল্, চণ্ডীমণ্ডপে বসে সব শোনা যাক্। একেবারে কি মেরে ফেলেছিস্?

মাধব সাশ্রুনেত্রে বল্‌লে, হ্যাঁ দাদাঠাকুর।

চণ্ডীমণ্ডপে দু'জনে একটু নিরিবিলি বস্‌লাম, চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, লাস সরিয়ে ফেলেছিস্ তো—লোকটা কে? মাধব নিজের মাথার চুল টানতে টানতে বলল, কি জানি দাদাঠাকুর, হয়তো কোনও বৈষ্ণব মহাজনই কীর্ত্তনের রসে আকৃষ্ট হয়ে এসেছিলেন। হায় হায়, কি মহাপাতকই করেছি!

বল্‌লাম, ভনিতা ছাড় মাধব, তার সময় নেই। কাকে মেরেছিস্ বল্ না? মাধব চোখ মুছতে মুছতে বলল, তোমার সামনেই ত সেই মহাপাতক করেছি, তুমি ত জান।

মাধবের সেদিনের মাছিমারা চেহারাটা মনে পড়ে গেল, আমার

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বল্‌লাম, ওঃ সেই মাছিমারার কথা বল্‌ছিস্‌ বুঝি! আমার আবার হাসি পেল। মাধব বল্‌ল, উপেক্ষা করো না দাদাঠাকুর, সে মাছি নয়, কোনও মহাজন ছলনা করে মাছিরূপ ধরে কীর্ত্তন শুনতে এসেছিলেন—আমি তাঁকে হত্যা করেছি। হায়, হায়, আমার কি হবে?

ভাবলাম, মাধব পাগল হয়ে যায়নি তো! বল্‌লাম, বৈষ্ণবের পক্ষে জীবহত্যা পাতক বটে, কিন্তু নিতান্ত অনবধানতাবশতঃ যদি এরূপ কাণ্ড বৈষ্ণবের হাতে ঘটেই থাকে, তা হলে দোষ হয়, এমন কথা তো শাস্ত্রে লেখে না।

মাধব আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে, দোষ একটু আধটু নয় দাদাঠাকুর, দোষ হয়েছে চারপোয়া। হায়, হায়, হয়তো নরোত্তম দাস ঠাকুরই মাছির বেশে এসেছিলেন। আমি নরোত্তম দাসকেই হত্যা করেছি।

ভাল জ্বালায় পড়্‌লাম। বল্‌লাম, যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন এ নিয়ে মাথা খারাপ করে কি হবে—বরঞ্চ একটা প্রাশ্চিত্তি—

—মাথা খারাপ কি আমি সাধে করেছি দাদাঠাকুর, তিনি যে আর আমার সঙ্গ ছাড়ছেন না। অপদেবতা হয়ে আমার নাকের ডগায় ভর করেছেন—কীর্ত্তন গাইতে সুরু করলে ঠিক নাকের কাছে উড়তে থাকেন। মাঝে মাঝে নাকের ডগায় বসেনও—

বুঝলাম পাগলের সঙ্গে কথা বলছি। হাসিও পেল। অনেক রকম ভূতের কথা শুনেছি, কিন্তু মাছিভূত! বললাম, তোমার ও মনের ভ্রম মাধব, সেদিন যে মাছিটা মেরেছিলে সেটার কথা সব সময়েই ভাব বলেই মনে হয় সেটা তোমার নাকের কাছে—

—তা নয় দাদাঠাকুর! তাই যদি হবে তা হলে কেত্তন ছাড়া অন্ত

সময়ে তিনি আসেন না কেন? হায়, হায়, আমি কোন্ রসিক মহাজনকে না জানি বধ করেছি!

মাধব কিছুক্ষণ আপনার আবেগে মাথা নেড়ে চুপ করে রইল, তার মুখ চোখ অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ, সত্যিকারের মানুষ খুন করলে লোকের যে রকম অবস্থা হয়, তারও ঠিক সেই অবস্থা! খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে মাধব কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—দাদাঠাকুর আমাকে বাঁচাও, একটা স্বস্ত্যয়ন টস্ত্যয়ন কিছু করলে যদি উপায় হয়, পুঁজিপাটা ভেঙ্গে তাই না হয় করছি, কিন্তু এতো আর সহ্য হয় না।

আমরা অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম, সকলেরই মুখ গম্ভীর ও লম্বা হইয়া আসিয়াছিল, নিমন্ত্রণ-বাড়ীর কথা, মাংস সিদ্ধ হওয়ার কথা সকলেই একরকম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শ্যামদাদা একটু চুপ করিয়াছিলেন—বীরেশ প্রশ্ন করিল, তারপর?

শ্যামদাদা এক টিপ নস্য লইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে আবার সুরু করিলেন, সেই থেকেই মাধব পাগল হয়ে আছে। এমনিতে বেশ সহজ মানুষটি, কিন্তু যেই কীর্ত্তন সুরু হয়েছে অমনি তার সেই অস্বাভাবিক মাথাঝাঁকানি আর পাগলের মত নাকের সামনে হাতনাড়া—এ ব্যারাম তার কিছুতেই গেল না। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কত ওষুধ কত ডাক্তারি করা হল, গিরীন্দ্রশেখর বসু দেখলেন, ডব্লিউ, সি, রায়— কিছুতেই কিছু হ'ল না। সেই মাছিভূত আজও তার নাকে ভর করে আছে। বিজ্ঞান যাই বলুক, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হলেও একটা যে কিছু মাধবের ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই, হয়তো, সত্যসত্যই মাছিভূত—

যতীন বলিল, খুব সম্ভব, এ রকম আর একটা ঘটনার কথা আমরা জানি কিনা—

সকলে সমস্বরে বলিলাম, কিরকম ?

—ব্যাপারটা ঘটেছিল বর্দ্ধমানে, ভরা বর্ষার মধ্যে আমরা একবার শরৎবাবুর মোটরে চেপে বেড়াতে বেরিয়েছি, বর্দ্ধমান ছেড়ে প্রায় ৮৭৷৯০ মাইল গিয়েছি, আকাশে দুর্য্যোগ ঘনিয়ে এল—রাত্রিও প্রহর খানেক অতীত হয়ে থাকবে। সেই আঁকাবাঁকা অপরিসর রাস্তায় কাদা আর জলের মধ্যে গাড়ী তো দৈত্যের মত দু'চক্ষু পাকিয়ে গোঁ গোঁ করে ছুটেছে—মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ড্রাইভারকে হুঁসিয়ার হতে বলে আমরা যতটুকু পারি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছি। কারো মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নেই—

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ, জনমানব কোথায়ও নাই—কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল, হঠাৎ এক জায়গায় এসে গাড়ী ঘষ্ ঘষ্ করতে করতে থেমে গেল। আমরা আতঙ্কে ঘেমে উঠলাম। এই দুর্য্যোগের রাত্রি, বাঘ ভালুকের কথা ছেড়েই দি—যদি ডাকাতে ধরে তা হলেও আর রক্ষা থাকবে না—

বিজু ছিল সঙ্গে, বল্লে, দেখ রামবরণ বোধ হয় তেল নেই—টায়ারগুলো ঠিক আছে কি না দেখ—

রামবরণ টর্চ্চ হাতে সেই বৃষ্টির মধ্যেই নেমে সব দেখে শুনে বল্লে, টায়ার ঠিক আছে হুজুর, তেলও আছে ৫ ইঞ্চি—

—তা হ'লে—

—কুছ তো সমঝ্ মে নেই আতাহৈ বাবু—

তারপর সকলে মিলে প্রাণপণে গাড়ীটাকে ষ্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম—কিছুতেই কিন্তু হয় না, মেশিন ঠিক, তেল আছে,

অথচ গাড়ী ষ্টার্ট হয় না। আমাদের অবস্থা বুঝতে পারছ—সেই অবস্থায় সেই দুর্য্যোগের মধ্যে ভোরের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত আমাদিগকে সেইখানেই কাটাতে হ'ল। ভোর হতেই দেখি অদ্ভুত ব্যাপার—

আমরা উৎসুক হইয়া একটা ভয়ঙ্কর কিছু শুনিবার প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হইলাম। যতীন বলিল, আমাদের ঠিক বিশ হাত আগে একটা নদীর সাঁকো, একেবারে ফাঁক—আগের রাত্রে বন্যাবেগে এক্কেবারে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। সকলকেই স্বীকার করতে হ'ল—গাড়ীর ভূত আমাদের রক্ষা করেছে। তখন ষ্টার্ট দেওয়া হ'ল—কোনও গোলযোগ নেই—সুবোধ বালকের মত গাড়ী ষ্টার্ট নিলে।

শ্যামদা হাসিলেন, বলিলেন, কি গাড়ী হে?

যতীন বলিল—ফোর্ড।

গল্প শুনিয়া আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছি, এমন সময় খবর আসিল, পাতা প্রস্তুত, আমাদের গা তুলিতে হইবে। মাছিভূত ও গাড়ীভূতকে নমস্কার নিবেদন করিয়া আমরা গাত্রোত্থান করিলাম।

আলোচনা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও "বিলাসের আমোদ"

"আমার বয়স তখন ১৮ আঠারো বৎসর। * * এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই। ধর্ম্ম কি, ঈশ্বর কি, কিছুই জানি নাই, কিছুই শিখি নাই। * * * আমার চারিদিকে কেবল বিলাস ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল।"

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। পৃঃ ৪০-৪১-৪৪]

৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী এই প্রসঙ্গে মহর্ষির বৃহৎ জীবনচরিত গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন ;—

—"চৌদ্দ বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কালেজে প্রবেশ করেন, এবং বোধ হয় ষোল কি সতেরো বছর বয়সে হিন্দু কালেজ ছাড়িয়া থাকিবেন। সুতরাং এই ষোল হইতে আঠারো বছর পর্য্যন্ত তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে তিনি 'বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলেন'।" * *

—"প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বড় ছেলে—তাঁহার নবযৌবনের চঞ্চল দৃষ্টির সাম্‌নে তখন সম্পদের স্বর্ণচ্ছটা দিক্‌দিগন্তকে রাঙা করিয়া মোহ বিস্তার করিয়াছে। তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য ভোগের সকল আয়োজন তাঁহাকে চারিদিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ঘিরিয়াছিল। তিনি নিজে লিখিয়াছেন :—'আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলাম।'"

—"তাঁহার কালের কোন প্রাচীন লোকের কাছে শুনিয়াছি যে,

কলিকাতা সহরে তখন তাঁহার 'বাবু' খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। জগদ্ধাত্রী ভাসানের সময়ে তিনি যেমন বেশভূষা পরিয়া বাহির হইতেন অনেক বড় লোক তাঁহার অনুকরণ করিতেন।" * *

—"এই সময়ে একবার তিনি প্রায় লাখ টাকা খরচ করিয়া খুব ধূমধামের সঙ্গে বাড়ীতে সরস্বতী পূজা করিয়াছিলেন। সেই পার্ব্বণে সহরে গাঁদাফুল ও সন্দেশ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। গাঁদা ফুল দিয়া তিনি প্রকাণ্ড এক সামিয়ানার মত তৈরি করিয়াছিলেন।" * *

—"ভোগের যজ্ঞশালায় নূতন নূতন ইন্ধন জোগানোর মত অর্থ ও সামর্থ্য দুইই তাঁহার ছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তাহা নয়। কালেজ ছাড়ার বছর দুই পরে, এবং যৌবনের এই ভোগবিলাসিতার আরম্ভেই দেবেন্দ্রনাথের আঠারো বছর বয়সে এমন এক ঘটনা ঘটিল, যাহা তাঁহার সমস্ত জীবনের গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া দিল।"

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।—৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। পৃঃ ৪৬-৪৭-৪৮]

১৮১৭ খৃঃ দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ১৮৩৫ খৃঃ তাঁহার দিদিমার মৃত্যু হয়। সেই সময় তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর। সুতরাং ১৮৩৪-৩৫ অর্থাৎ ১৭ এবং ১৮ এই দুই বৎসর ৺অজিতবাবুর গণনায় দেবেন্দ্রনাথের ভোগবিলাসের কাল। "বছর দুই"—বলিয়াই ৺অজিত বাবু অনুমান করিয়া গিয়াছেন।

১৮৩৪-৩৫ এই দুই বৎসর, দ্বারকানাথের ব্যবসা, অর্থাগম ও রাজার মত মান-প্রতিপত্তির সূত্রপাত দেখা যায়। "কার ঠাকুর কোম্পানী" ১৮৩৪ খৃঃ জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫ খৃঃ দ্বারকানাথ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া দেবেন্দ্রনাথকে ঐ ব্যাঙ্কের সহকারি কোষাধ্যক্ষের পদে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এবং ঐ বৎসরেই দ্বারকানা

পশ্চিমে ভ্রমণে চলিয়া যান। দেবেন্দ্রনাথ তখনই সংসারের কর্ত্তা হইলেন।

(১) যৌবন (২) ধনসম্পত্তি ও (৩) প্রভুত্ব—দেবেন্দ্রনাথে এই সময় একত্রে মিলিত হইয়াছিল। এবং এই সময়ই তাঁহার "বিলাসের আমোদে" ডুবিয়া যাইবার কাল। ৺অজিত বাবু একটি কথা লিখিয়াছেন যে, সহরে তখন দেবেন্দ্রনাথের "বাবু" খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। [পৃঃ ৪৬ ছত্র ১২]

"বাবু" বলিতে তখন কি বুঝাইত, এবং কতটা বুঝাইত তা শুধু এখনকার বাবু দেখিয়া অনুমান করা নিরাপদ হইবে না। সুতরাং যতটা সম্ভব একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি। তখনকার দিনের "বাবু" সম্বন্ধে ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

—"এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে "বাবু" নামে এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতিও কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা-রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরিচুল, দাঁতে মিসি, পরিধানে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী, ও পায়ে বগলস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা।

—এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এস্‌রাজ বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া; কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদে করিয়া কাল কাটাইত। এবং খড়দহের

মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা, প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।"

[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃঃ ৫৫-৫৬]

শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণবাবুও বলিয়াছেন, "সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা **বাবুগিরির** অঙ্গ বলিয়া গরিগণিত হইত।"

ইহা তখনকার সাধারণ "বাবু" শ্রেণীর একখানি অতি নিখুঁত চিত্র। সন্দেহ নাই। দ্বারকানাথ যদিও তখন "প্রিন্স" নন তথাপি তিনি দ্বারকানাথ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের যদি "বাবু" খ্যাতিই রটিয়া গিয়া থাকে,—এবং শুনা যাইতেছে যে গিয়াছিলও—তথাপি যে-দেবেন্দ্রনাথ লাখ টাকা খরচ করিয়া সরস্বতী পূজা করিয়াছিলেন—তিনি এইরূপ "সাধারণ বাবু" শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না। তাঁহার ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য ও সৌন্দর্য্যবোধ—দেবেন্দ্রনাথকে "বাবু" শ্রেণীর মধ্যেও এমন একটা অসাধারণত্ব ও বিশেষত্ব দিয়াছে—যাহার সত্য ইতিহাস ও খাঁটি চিত্র ইচ্ছা করিয়াই লুপ্ত করা হইয়াছে। ফলে তখনকার বাঙ্গালী সমাজের একদিকের একটা চিত্রের অনেকটা অংশ আজ মুছিয়া গিয়াছে।

৺অজিত বাবু দেবেন্দ্রনাথের এই কালের বাবুয়ানার একটু সামান্য আভাস মাত্র দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই "সাধারণ বাবু" শ্রেণী হইতে তাঁহার রুচির ও আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

—"একবার এক বিখ্যাত ধনী লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় * * পোষাক তৈরী করাইলেন এক সাদাসিধা ধরণের সাটিনের লম্বা জোব্বা—তাহাতে কেবল সাচ্চা রূপালি জরির

কাজ করা। আর ইচ্ছা করিয়া গায়ে না পরিয়া তাঁহার (দেবেন্দ্রনাথের) জুতায় বসাইলেন যত রাজ্যের মণিমুক্তা জহরৎ! এই জিনিষগুলি পায়ে করিয়া তিনি নিমন্ত্রণ সভায় গিয়া হাজির হইলেন"—* * *"

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃঃ ৪৬-৪৭]

এ ছবি দেবেন্দ্রনাথের "বিলাসের আমোদের" এক উজ্জ্বল বহিরাবরণ। সমস্ত ছবি, ইহাতে আমরা পাই না। অথচ জানিতে কৌতূহল হয়। গত শতাব্দীর ইতিহাসে স্মরণীয়, এতবড় একটা চরিত্রের,—সমস্তটাই আমাদের দৃষ্টি ও মনকে লুব্ধ করে। কিন্তু সমস্তটা কোথায় পাই?

এই প্রসঙ্গে ৺দেশবন্ধু দাস সম্পাদিত "নারায়ণ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ৺অজিত বাবুর গ্রন্থ ছাপা হইবার পর, যেন অনেকটা প্রতিবাদস্বরূপ গিরিজাবাবু "নারায়ণে" দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ দীর্ঘকাল আলোচনা করেন। গিরিজাবাবু লিখিয়াছিলেন—

"বিলাসের আমোদ"

—"রাজা রামমোহন যখন ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন, দেবেন্দ্রনাথ তখন কলিকাতার ধনী গৃহের একজন অপরিণতবয়স্ক ১৬ বৎসরের বালক মাত্র। সেই বৎসরেই তিনি হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কি রামমোহন, কি ডিরোজীও—ইহাঁদের কাহারও কথা যে তিনি তখন ভাবিতেছিলেন, আমাদের তাহা মনে হয় না। তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ তখনকার দিনের ধনিসমাজে একজন প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী, ভোগপরায়ণ, বিলাসী ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা ধনিসমাজের বিলাসের উপকরণাদি তখন খুব আধ্যাত্মিক রকমের ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নয়। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজ ছাড়িবার

সঙ্গে সঙ্গে, যৌবনের উন্মেষকালে, সেই অপরিণত বয়সে তাঁহার ভোগ-স্পৃহাকে চরিতার্থ করিবার যথেষ্টই সুযোগ পাইয়াছিলেন। কেন না, তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ভোগ-প্রবৃত্তিকে অনশনে রাখিয়া মারিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী ত ছিলেনই না; পরন্তু আদর্শ ও আচরণে ইহার বিপরীত মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা। দ্বারকানাথ ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে ও বিলাসের কুসুম-সজ্জায় নিজেও যেমন নিমজ্জিত হইতে ভালবাসিতেন, পুত্র দেবেন্দ্রনাথকেও তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি সাক্ষ্য দেয় না। দ্বারকানাথের প্রশ্রয়ে, অথবা তৎকালীন কলিকাতার ধনী যুবকদের সংসর্গে,—অথবা স্বীয় ভোগপ্রবৃত্তির স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত তাড়নায় দেবেন্দ্রনাথ যে এই সময় ভোগবিলাসে মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই। এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে—"আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলাম।" তখনকার দিনের কলিকাতার ধনী যুবকদের বিলাসের আমোদ বলিতে কতখানি বুঝায়, তাহা আমরা ভাবিতে পারি না, এমন নয়। তাঁহার লাখ টাকা খরচ করিয়া সরস্বতী পূজা, তাঁহার "সাচ্চা রূপালি জরির কাজ করা সাটিনের লম্বা জোব্বা" আর "মনিমুক্তাজহরৎ-খচিত জুতা—" ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপোল্লাস ও সৌন্দর্য্যপিপাসা, বিলাসীদের মজলিসে তাঁহার "বাবু" খ্যাতি রটিয়া যাওয়া সম্বন্ধে যে সমস্ত জনশ্রুতি আজিও আমাদের কাছে ভাসিয়া আইসে, তাহাতে যদি নীতিবাদীরা নাসিকা কুঞ্চন করেন,—আর জীবনচরিত লেখকেরা তাহা যথাযথ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন,—তথাপি জীবন-বাদীরা এই উভয় দলকেই ভ্রুক্ষেপ না করিবার সাহস হারাইবেন না,—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে

এই "বিলাসের আমোদ" অধ্যায়টি জোর করিয়া লুপ্ত করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহার ধর্ম্মজীবনকে যথাযথরূপে বুঝিয়া উঠা ক্রমেই কঠিন হইবে, এবং তাহা যে হয় নাই, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। যাহা হউক, যদি এই সময়ে তাঁহার দিদিমার মৃত্যু, সহসা তাঁহাকে 'বিলাসের আমোদ' হইতে ধর্ম্মজীবনের জন্য উদ্বুদ্ধ না করিয়া দিত, তবে কে জানে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি কোন্ দিকে ধাবিত হইত?"

[নারায়ণ পৃষ্ঠা ৩৪৬-৩৪৭। ১৯১৮।]

আজ পাঁচ বৎসর হইল শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহর্ষির 'আত্ম-জীবনী' গ্রন্থখানিকে নূতন করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে নিজের অভিমত এবং ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের 'বিলাসের আমোদ' প্রসঙ্গে সতীশবাবু লিখিয়াছেন—

—"আমাদের ধারণা, ১৮৩৪ সালের শেষভাগ হইতে ১৮৩৫ সালে পিতামহীর মৃত্যু পর্য্যন্ত, ন্যূনাধিক এক বৎসরকাল দেবেন্দ্রনাথের বিলাসের আমোদে মগ্ন থাকিবার সম্ভাবনা।" * * *

—"এই সময় (১৮৩৪ খৃঃ) হইতে তাঁহাকে (দ্বারকানাথকে) ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য দেশীয় ও য়ুরোপীয় পদস্থ লোকদিগকে লইয়া নাচ ও ভোজের ব্যবস্থা করিতে হইত। * * * অনেক সময়ে সামাজিকতার খাতিরে পুত্রদিগকে এই সকল প্রমোদ-সভার খানা খাওয়া, বাইনাচ ও সুরাপানের সংশ্রবে লইয়া যাইতে হইত।

কিশোর দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে প্রলোভনের অনলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইহার ফলে—

—সুরা—
—নাচ ও
—ধনীপুত্রদিগের কুসঙ্গ—

কিছুকালের জন্য তাঁহাকে অধিকার করিল।" * * *

—"বিষয় :বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দ্বারকানাথ যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন, তাহার ফলে যখন প্রিয় পুত্রের অনিষ্ট হইতে লাগিল, তখন তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বারবার ভৎ´সনা ও অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের অর্থব্যয়ের অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া দিতে তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় সম্মত হইল না।" * * *

—"এই অবস্থায় বিলাসের আবর্ত্তে পতিত হওয়াতে দেবেন্দ্রনাথকে দোষী করা যায় না ; বরং আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, এমন অবস্থা হইতেও ঈশ্বর তাঁহাকে এত শীঘ্র ধর্ম্মের দিকে টানিয়া লইলেন।" * * *

"ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে মানুষের জীবন পরিবর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘটনা, ও ভগবানের করুণার সর্ব্বাপেক্ষা জ্বলন্ত প্রকাশ। সেই জ্বলন্ত প্রকাশ দেবেন্দ্রনাথের জীবনে সমুজ্জ্বল।"

[আত্ম-জীবনী।—পৃঃ ৩১৮-৩১৯-৩২০]

১৬ বৎসর হয় ৺অজিত বাবুর গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে। ১৪ কি ১৫ বৎসর হয় গিরিজা বাবুর দেবেন্দ্রনাথ—'নারায়ণে' বাহির হইয়াছে। ৫ বৎসর হয় সতীশবাবু মহর্ষির আত্ম-জীবনী সম্পাদন করিয়াছেন। সুতরাং ৺অজিত বাবু ও গিরিজা বাবুর ১০।১১ বৎসর পরে সতীশ বাবু আলোচনা করিয়াছেন। ৺অজিত বাবুর গ্রন্থ তিনি দেখিয়াছেন। গিরিজাবাবুর আলোচনা গ্রন্থাকারে ছাপা হয় নাই। নারায়ণ পত্রিকায় উহা সতীশবাবু দেখিয়াছেন—এমন ত মনে হয় না। উল্লেখ নাই। প্রমাণও পাইলাম না।

মহর্ষির জীবনে "বিলাসের আমোদ" অধ্যায় সম্পর্কে উপরিউক্ত তিনজন লেখক একমত নহেন।

প্রথমে দেখা যাক, কতদিন এই "বিলাসের আমোদ" চলিয়াছিল ?

—৺অজিত বাবু বলেন 'দুই বছর'। গিরিজা বাবুরও তাই মত। কেননা ১৬ বছরে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজ ছাড়িলেন, আর ১৮ বছরে দিদিমার মৃত্যুর পর হইতে বিলাসের আমোদ ছাড়িলেন। কাজেই গিরিজা বাবুও দুই বৎসরই স্থির করিয়াছেন। পড়িলেই বুঝা যায়। হিন্দু কলেজ ছাড়িবার বয়স ৺অজিত বাবু বলেন "ষোল কি সতেরো"। গিরিজা বাবু বলেন ১৬ বৎসর। সম্ভবতঃ তিনি ৺অজিত বাবুকে সংশোধন করিয়া লিখিয়াছেন।—কিন্তু সতীশ বাবু বলিতেছেন "১৮৩৪ সালের শেষ ভাগ হইতে ১৮৩৫ সালে পিতামহীর মৃত্যু পর্য্যন্ত···একবৎসরকাল, "বিলাসের আমোদে" মগ্ন থাকিবার সম্ভাবনা।"

সতীশ বাবু তাঁহার পূর্ব্বগামী দুইজন প্রসিদ্ধ লেখকের অভিমতের বিরুদ্ধে স্পষ্ট মত দিলেন। "দুই বছরকে," "এক বৎসরকাল" করিলেন। কিন্তু কেন করিলেন তার কোনই কারণ দিলেন না! আশ্চর্য্য! যা দিলেন—তা এই—"আমাদের ধারণা" (?) এবং "সম্ভাবনা" (?)। কিন্তু কেন যে ঐরূপ 'ধারণা' আর ঐরূপ 'সম্ভাবনা' তার কিছুই বলিলেন না। বাংলা সাহিত্যের এতবড় একখানা মূল্যবান গ্রন্থের সম্পাদন করিতে বসিয়া, পূর্ব্বগামীদের মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়া কেবল 'ধারণা' আর 'সম্ভাবনা', এ ত ভাল নয়। ৺অজিতবাবু এবং গিরিজাবাবু দুইজনেরই গণনা ভুল হইতে পারে। সে কথা নয়। সতীশবাবুর গণনাই ঠিক হইতে পারে। সতীশবাবু যে গণিয়াছেন তাও বুঝিলাম "১৮৩৪ সালের শেষভাগ হইতে"। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন '১৮৩৩ সালের প্রথমভাগ হইতে' কেন নয়? কেন তিনি ১৮৩৪ সালের শেষভাগ হইতে গণিলেন? কি প্রমাণে তিনি ঐরূপ গণিলেন? 'ধারণায়' আনিবার পূর্ব্বে একটা

কিছু তাঁহার মনে ক্রিয়া করিতেছিলই। কি সে প্রমাণ, এবং কিই বা সে ইতিহাস ? ইহার স্পষ্ট উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। সুবোধ লোক অবশ্যই ইহা বিবেচনা করিবেন।

অনুল্লেখিত কারণ, 'ধারণা' আর 'সম্ভাবনা'কে অহেতুকী করে। অহেতুকী 'ধারণা' আর 'সম্ভাবনা'র মূল্য নাই। এবং আবার উহার উপর দাঁড়াইয়া পূর্ব্বগামীদের—তাঁহারাও বিশেষ অ-প্রসিদ্ধ নহেন—মত খণ্ডন করিতে যাওয়া উত্তম গ্রন্থ সম্পাদন নহে। বিবেচনা কেন না করেন ?

দ্বিতীয় কথা দেবেন্দ্রনাথের "বিলাসের আমোদের" সত্য চিত্রটি কিরূপ ? অর্থাৎ কি কি উপকরণ লইয়া তিনি বিলাস করিতেন ? তা সে "বছর দুইই" হোক আর "ন্যূনাধিক একবৎসরকাল"ই হউক। এবং এই সত্য চিত্রটিকে সাহিত্য ও জীবনচরিত দাবী করিতে পারে কি না ? যদি না পারে ত চুকিয়াই গেল। আর যদি পারে, তবে দেখিতে হইবে আমরা উহা যথাযথরূপে পাইয়াছি কি না ? উহা আমরা পাই নাই। এক গিরিজাবাবু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে উহা পাওয়া দরকার। আমরাও বলি দরকার।

বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারকে অতিক্রম করিয়া একজন প্রথম ও প্রধান ভাষা-শিল্পী। আত্ম-জীবনী গ্রন্থখানিই তার প্রমাণ। তিনি লিখিয়াছেন, "**আমি ডুবিয়াছিলাম**" অর্থ তিনি নিজে বুঝিয়াই লিখিয়াছিলেন। আমরা যদি ভুল বুঝি, দোষ তাঁহার নয়, আমাদের! আত্ম-জীবনী লিখিতে বসিয়া এমন সংযত ভাবে সত্য কথা আর কোন বাঙ্গালী লেখেন নাই।

বিলাসের উপকরণ কি কি ছিল ইহা ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "বাবু" শ্রেণীর দৃষ্টান্তে দেখিতে গেলে বলিতে হয়, মোটামোটি

সব ছিল। তবে একটু নবাবী ও সাহেবীয়ানা মিশ্রিত ধরণের। দ্বারকানাথ পুত্রের পক্ষে তাই স্বাভাবিক, সুশোভন ও সঙ্গত।

৺অজিতবাবু সুরা, বাইজি বিলাসের উপকরণ ছিল কিনা, স্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই। গিরিজাবাবু ইঙ্গিৎ করিয়াছেন, যদিও সাবধানে, তথাপি তাঁহার ইঙ্গিৎ একটুও অস্পষ্ট নয়। কেবল সতীশবাবুই খুব স্পষ্ট করিয়া খোলসা লিখিয়াছেন **সুরা, নাচ, ধনী-পুত্রদের কুসঙ্গ, কিছুকালের জন্য তাঁহাকে অধিকার করিল।** আশা করি, সতীশবাবু ইহা শুধু মনে মনে "ধারণা" করেন নাই। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে এত ঠিক ঠিক "সুরা ও নাচে" দেবেন্দ্রনাথের ডুবিয়া যাইবার খবর সতীশবাবু পাইলেন কোথা হইতে? ইহা যথাযথ প্রকাশ করা উচিত ছিল। এতটা দায়িত্ব শুধু নিজের "ধারণার" উপর রাখা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় নাই। এখনও তিনি তাহা প্রকাশ করিতে পারেন, এবং করুন—এই আমাদের অভিপ্রায় ও অনুরোধ।

তৃতীয় কথা—দেবেন্দ্রনাথের বিলাসের আমোদে ডুবিয়া যাওয়া ব্যাপারে, পিতা দ্বারকানাথের কতখানি প্রেরণা ছিল—বা ছিল কি না,—সে সম্পর্কে ৺অজিতবাবু নীরব। গিরিজাবাবু স্পষ্ট বলিয়াছেন যে দ্বারকানাথের প্রশ্রয়ও, ইহার একটি কারণ। সতীশবাবু দ্বারকানাথের প্রশ্রয়ের কথা যদিও বলেন না, তবে তাঁর উক্তি দ্বারা—ইহা প্রমাণ হয়। কিন্তু সতীশবাবু আর একটা গুরুতর কথা বলেন যে, দেবেন্দ্রনাথ বিলাসের আমোদে ডুবিয়া যাওয়ার পর, পিতা দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে "বারবার ভর্ৎসনা ও অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন।" সতীশবাবু ইহা কোথায় পাইলেন? তাঁহার পূর্ব্বগামী

৺অজিতবাবু ও গিরিজাবাবু উভয়েই দ্বারকানাথের "অসন্তোষ" ও "ভৎর্সনা" সম্পর্কে কিছুই বলেন না! তাঁহারা জানিলে অবশ্য বলিতেন ; তাই আমাদের জিজ্ঞাস্য—সতীশবাবু ইহা জানিলেন কিরূপে, এবং কোথা হইতে? কারণ, যেখান হইতে সতীশবাবু জানিলেন, সেখান হইতে, হয়ত আরো অনেক খবর পাওয়া যাইতে পারে। আশা করি এ ক্ষেত্রেও সতীশবাবু তাঁহার 'ধারণা' ও 'সম্ভবনার' উপর নির্ভর করেন নাই।

চতুর্থ কথা,—বিলাসের আমোদে ডুবিবার কারণ,—৺অজিতবাবু বলেন, পিতা দ্বারকানাথের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ;—এই ঐশ্বর্য্যই যুবক দেবেন্দ্রনাথের সাম্‌নে বিলাসের রঙীন মোহ বিস্তার করিয়াছিল। গিরিজাবাবু বলেন—তিনটি কারণ—(১) তৎকালীন ধনী যুবকদের কু-সংসর্গ (২), দ্বারকানাথের প্রশ্রয় এবং (৩) দেবেন্দ্রনাথের নিজের "ভোগ প্রবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাড়না"। সতীশবাবু বলেন—

—দ্বারকানাথ **ব্যবসার সাফল্যের** জন্য বড়লোকদের লইয়া বাগান পার্টি দিতেন। তাতে ভোজ, সুরা, বাইনাচ থাকিত।

—"**সামাজিকতার খাতিরে** দ্বারকানাথের পুত্র-**দিগকে** (?) "বাইনাচ ও সুরাপানের সংশ্রবে লইয়া যাইতে হইত"।

—"দেবেন্দ্রনাথ **এইরূপে** প্রলোভনের অনলে **নিক্ষিপ্ত হইলেন**।—এজন্য—দেবেন্দ্রনাথকে দোষী করা যায় না"।

দোষী করিতেছে কে? আত্ম-জীবনী সম্পাদকের মনের ক্রিয়াটি আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। সতীশবাবু নিজের মনেই দেবেন্দ্র নাথকে দোষী করিয়া, আবার নিজের মনেই তাহা কাটাইয়া দিতেছেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অযথা ওকালতী করিতে গিয়া

তিনি যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিতেছেন—তাহা অত্যন্ত মিথ্যা এবং অসঙ্গত।

—দ্বারকানাথের যে বিলাস তাঁহার পুত্রে সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা শুধু ব্যবসার সাফল্যের জন্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। কলিকাতা লণ্ডন ও প্যারিসে প্রিন্স দ্বারকানাথের বিলাস—একটা কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস। বাঙ্গালীর বিলাসের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। অগৌরবেরও নয়, আর বিস্মরণ হইবার বস্তুও নয়। সুতরাং শুধু ব্যবসার সাফল্যের জন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ বিলাস করেন নাই। বিলাসের জন্যই বিলাস করিয়াছেন। সতীশবাবুর ওকালতীমূলক যুক্তি ভ্রান্ত!

—দেবেন্দ্রনাথ যেন হাত পা বাঁধা অবস্থায়—অনেকটা সতীদাহের মত—"প্রলোভনের অনলে নিক্ষিপ্ত হইলেন"। ইহা সত্য কথা নয়। লাখ টাকা খরচ করিয়া সরস্বতী পূজা যিনি করেন [৺অজিতবাবুর মতে দ্বারকানাথও ইহা একটু বাড়াবাড়ি মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি অন্যরূপ। দ্বারকানাথ নাকি বলিয়াছিলেন—এইবার আমার পুত্রের মত একটা কাজ দেবেন্দ্র করিল] আর জুতার উপর মণিমুক্তাজহরৎ যিনি বসান, আত্ম-জীবনী সম্পাদক মহাশয় কেন না বিবেচনা করেন যে, এইরূপ কর্ম্ম "নিক্ষিপ্ত" বা প্রক্ষিপ্ত অবস্থায় কেহ করে না। আপন ইচ্ছাতেই করে। গিরিজাবাবু যে বলিয়াছেন, —"ভোগ-প্রবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাড়না"—এই ব্যাখ্যাই এখানে অধিকতর মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

'আত্ম-জীবনী' সম্পাদক মহাশয় একটা বিশেষ ধর্ম্ম ব্যবসায়ী ও সম্ভবতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তিও বটেন। দেবেন্দ্রনাথ সেই ধর্ম্মের একজন গুরু এবং আচার্য্য। তাঁহার অসুবিধা আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। কিন্তু বিলাসের আমোদ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথকে এতটা

নিরুপায় ও নিঃসহায় কল্পনা করিলে যে তাঁহার মানসিক বলের সত্য পরিচয়টি পাওয়া যাইবে না। যে ইচ্ছা করিয়া বিলাসের আমোদে ডুবে নাই, সে কখনও আপন ইচ্ছায় তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। দেবেন্দ্রনাথ প্রবল প্রচণ্ড এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ইহা ত বিস্মরণ হইবার কথা নয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত বিরোধ করিয়া যিনি অপৌত্তলিক পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন, আর আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া যিনি বেদকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কেবল "নিক্ষিপ্ত" হওয়াতে বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলেন, ইহা সৎ-যুক্তি হয় না। দেবেন্দ্রনাথের মানসিক বিকাশের ধারায় এরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গতি উপস্থিত করে নিশ্চয়।

পঞ্চম কথা "বিলাসের আমোদ" হইতে এতবড় একটা আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্ভব হইল কি করিয়া? "আশ্চর্য্য"! তা বটে! কিন্তু একটা ব্যাখ্যাও ত চাই। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না, ইহা নিশ্চিত। আমরা জানি বা না জানি।

৺অজিতবাবু বলেন, দেবেন্দ্রনাথের মগ্ন চৈতন্যের রাজ্যে এই আধ্যাত্মিকতার বীজ, বিলাসের আমোদে ডুবিবার পূর্ব্বেই অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছিল। বিলাসে কিছুদিন চাপা পরিয়াছিল। পুনরায় দিদিমার মৃত্যুজনিত আঘাতে তাহা ফিরিয়া আইসে। আধ্যাত্মিকতা তাঁহার স্বভাবের মধ্যে ছিল। স্বভাবই জয়ী হইল। ব্যাখ্যা অযৌক্তিক নয়।

গিরিজাবাবু বলেন, দেবেন্দ্রনাথের দিদিমার মৃত্যুতে যে আঘাত তিনি পাইলেন সেই আঘাতের বেদনাই দেবেন্দ্রনাথের জীবনের গতিকে ধর্ম্মের দিকে মুখ ফিরাইয়া দিল। যদি এই মৃত্যুর আঘাত এই

সময় না আসিত, তবে জীবনের গতি কোনদিকে যাইত, কেহ বলিতে পারে না। ইহাও আশ্চর্য্য নয়। সম্ভব।

—সতীশবাবু বলেন—"ইহা ভগবানের করুণার জলন্ত প্রকাশ"। * * * "ঈশ্বর তাঁহাকে ধর্ম্মের দিকে টানিয়া লইলেন"। যদি তা লইয়াই থাকেন, তবে একালে ঐরূপ ঈশ্বরের 'করুণা' বা 'টানাটানি' দিয়া ত বিজ্ঞব্যক্তিরা কি ব্যক্তির জীবনের, কি সমাজের জীবনের কোন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেন না। অস্মদ্দেশে, ১:০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহনই পৃথিবীর জ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রণী হইয়া, ঐরূপ শ্রেণীর ব্যাখ্যাকে দূরীভূত করিয়া, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার প্রবর্ত্তন এ যুগে করিয়া গিয়াছেন। "আত্ম-জীবনী" সম্পাদক মহাশয়ের কি তাহা এতাবৎ গোচরে আইসে নাই ?

মানময়ী গার্লস্ স্কুল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাণিকতলার মোড়। ল্যাম্প পোষ্টে একখানি বিজ্ঞাপন আঁটা; বি, এ, পাশ মানসমোহন মুখোপাধ্যায়—বয়স, চব্বিশ পঁচিশ বৎসর—বিজ্ঞাপনটি তাঁহার নোট বুকে নকল করিতেছিলেন। দুই একজন কৌতূহলী পথিক ঘাড় উঁচু করিয়া বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া গেল।

মানস। ভরসা নেই তবু—(টুকিতে লাগিলেন) চোখ বুজে ঢিল

ছুঁড়িতে লাগে লাগ্‌বে না লাগ্‌লে পাঁচ পয়সা গেল! এর চেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে খতম করাই ছিল ভালো। তবু একটা কিছু পাওয়া যেত। পনেরো কুড়ি যা হয়। গ্র্যাজুয়েট শুন্‌লেই বলে গ্র্যাজুয়েট পুষবার পয়সা নেই! থাক্‌বে কি করে? টাকা তো সব নোট হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু এত মাইনে এরা দেবে কোত্থেকে? চুরি ক'রে দিক ডাকাতি ক'রে দিক্ আমার মাস গেলে পকেটে এলেই হ'ল। প্রথম মাসটা দেখে পর মাস থেকে নতুন নিয়মে পড়াব। একেবারে ভারতীয় পদ্ধতিতে।

(বৈকুণ্ঠ সরকারের প্রবেশ)

মানস। (নোট বুক দিয়া বিজ্ঞানটি আড়াল করিয়া ধরিয়া) কি চান মশাই আপনি?

বৈকুণ্ঠ। খাতা সরাও!

মানস। আপনার কি দরকার বলুন।

বৈকুণ্ঠ। বিজ্ঞাপনটা দরকাব।

মানস। ওটা বাতের ওষুধের বিজ্ঞাপন নয়, আপনার কাজে লাগবে না।

বৈকুণ্ঠ। ভাল উৎপাত! খাতা সরাও না, আমাকে আবার তাগাদায় যেতে হবে। কর্ত্তার বুড়োকালে ধেড়ে রোগে ধরেছে—পয়সা বেশী হ'য়েছে কিনা। খাতাটা সরাও না!

মানস। কি পাশ আপনি?

বৈকুণ্ঠ। সে খোঁজে তোমার কি কাজ হে ছোক্‌রা? সরাও বল্‌ছি— (মানসের নোট বুক টানিয়া সরাইয়া) এইটে সেঁটে দিই তারপর ভাল ক'রে লেখ। (কাগজ আঁটিয়া দিলেন) কাল দিলেন

বিজ্ঞাপন আবার আজ পাঠালেন এক চুট্‌কি। এখন সারা সহর ভর চুট্‌কি সেঁটে বেড়াই আর কি!

(প্রস্থানোদ্যম)

মানস। মশাই দাঁড়ান, নমস্কার। আপনার মনিবের স্কুল বুঝি?

বৈকুণ্ঠ। ইস্কুল নয় বাপের পিণ্ডি। বিয়ে করেছ?

মানস। আজ্ঞে না।

বৈকুণ্ঠ। তবে পিণ্ডি গিল্‌তে পার্‌লে না, ঘরের বাছা ঘরে যাও!

(প্রস্থান)

মানস। ওর বাবাঃ, তাইতো! সত্যি দেখ্‌ছি স্ত্রী ভাগ্যে ধন। মুখের কাছে এসে ভাতের গ্রাস খস্‌ল! বিয়ে কর্ল্লেও নাজেহাল, না কর্ল্লেও—তবু টুকে নিই!

(নকল করিতে লাগিলেন)

(নীহারিকা গাঙ্গুলী ডায়োসেশনের নবীনা গ্র্যাজুয়েট্, ম্লান মুখে হাতে ব্যাগ ঝুলাইয়া প্রবেশ করিলেন)

নীহা। দশটাকার জন্যে রোজ তিন ক্রোশ! আর পারিনে! (মানসের পিছনে আসিয়া) ঘাড়টা একটু সরাবেন!

মানস। (মুখ না ফিরাইয়া) ঘাড়তো এখানে ব'সে থাক্‌বার জন্য আসেনি! একটু পরেই সরবে।

নীহা। ক্ষমা কর্ব্বেন, ওটা কি Wanted?

মানস। (মুখ ফিরাইয়া) ওঃ, মাফ কর্ব্বেন আমি ভেবেছিলাম আর কেউ!

নীহা। ওটা কিসের——?

মানস। বিজ্ঞাপন একটা, শুন্‌বেন?

Wanted a tutor and a tutoress both graduates on

Rs 100 and 120 respectively for my newly founded Girls' school.

নীহা। ঠিকানা ?

মানস। এই রে সেরেছে ! পার্ডন ! আপনার স্বামীও কি গ্র্যাজুয়েট্ ? বেকার ?

নীহা। কেন, বলুন তো ?

মানস। লেজুড় আছে শুনেছেন ? দেখুন, must be husband and wife. বাংলা করে বোঝাব ?

নীহা। না, বুঝেছি, থ্যাঙ্কস্ ! (প্রস্থানোদ্যম)

মানস। ঠিকানাটা নিয়ে যান।

নীহা। দরকার নেই। (প্রস্থান)

মানস। এও বেকার ! ব্লাউসের হাতায় আর পায়ের জুতোয় তালি পড়েছে ! একটা স্বামী থাক্‌লে—দি আইডিয়া ! (উদ্দেশে) দেখুন ! দাঁড়ান ! শুন্‌ছেন ! শুনুন—

(নীহারিকার পুনঃ প্রবেশ)

নীহা। কি হ'য়েছে ?

মানস। দুটো কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব, মনে কিছু করবেন না তো ?

নীহা। আমার সময় নেই ন'টায় ছাত্রী আছে।

মানস। অল্পকথায়—দুটো। আপনি গ্র্যাজুয়েট ?

নীহা। ডায়োসেশন থেকে—

মানস। যেখান থেকেই হোক ! একটা কথা বল্‌তে চাই। একটা কথা বল্‌ব, কোনও মৎলব আছে ভাববেন না। আমিও গ্র্যাজুয়েট এবং গরীব—তবে ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে পার্টনারসিপে—

নীহা। (হাতঘড়ি দেখিয়া) ন'টা প্রায় বাজে।

মানস। ন'টা দশটা যা ইচ্ছে বেজে যাক্। আমার কথা মত চল্‌লে আর টুইসনি কর্ত্তে হবে না। আর কেউ জানবে না। আমি আর আপনি আর আপনার বুড়ো বাপ মা ইচ্ছে করলে—

নীহা। বাপ মা নেই।

মানস। সে আরো ভাল। শুনুন, বলব ?

নীহা। বলুন।

মানস। দেখুন, (কাশি) দেখুন (কাশি) যদি আপত্তি না থাকে—দেখুন—দু'জনে (থামিয়া) বল্‌ব ? ভাববেন না কিছু ?

নীহা। কি বল্‌বেন, বলুন না !

মানস। সাহস হচ্ছে না। তবু—তা হ'লে শুনুন—আইডিয়াটা দেখুন একবার ! আচ্ছা আগে জিজ্ঞাসা করি—এ চাকুরী হ'লে আপনার সুবিধে হয় ?

নীহা। তামাসা কর্ব্বার জন্য ডাকলেন ?

মানস। মোটেই না। আপনার অবস্থা বুঝছি, আমার অবস্থাও বুঝ্‌ছেন। যদি দু'জনে পার্টনারসিপে—

নীহা। পার্টনারসিপ !

মানস। আরও স্পষ্ট ক'রে বলি তাহ'লে। এই ধরুন—বল্‌ব ?

নীহা। বলুন না ! দেরী হচ্ছে—

মানস। ধরুন চাকুরীর খাতিরে আমি যেন আপনার স্বামী—রাগ কর্ব্বেন না—পেটের দায়ে বল্‌ছি—আপনি স্ত্রী এই রকম একটা অভিনয় করা যায় না ? সেটা—

নীহা। রাস্কেল !

মানস। যা খুসী বল্‌তে পারেন কিন্তু সদর রাস্তা না হ'লে আপনার গা ছুঁয়ে বল্‌তে পার্ত্তাম—

(নীহারিকা বিনাবাক্যে প্রস্থান করিলেন)

কিছু না থাক্ রিষ্টওয়াচটা তো আছে—চল্‌বে হপ্তাখানেক। কিন্তু বুঝে দেখবেন—আইডিয়াটা! ফেল্‌বার নয়। এই যে বুঝেছেন তাহ'লে ?

(নীহারিকার পুনঃ প্রবেশ)

নীহা। নাঃ সেজন্যে আসিনি। আপনাকে অন্যায় বলে ফেলেছি ক্ষমা কর্ব্বেন! আর (একখানি কাগজের টুক্‌রা ফেলিয়া দিয়া) ঠিকানা এই রৈল। দরকার হ'লে বাড়ীতে খবর কর্ব্বেন। নমস্কার!

(প্রস্থান)

মানস। নাঃ সেজন্যে আসেন নি! সেক্সপীয়ার পড়ে' হজম কর্ল্লাম আর এই ছলনাময়ী নারীজাতিকে চিনিনে? তোমার মনে যে তুফান উঠ্‌ছে জানি গো জানি! কিন্তু আইডিয়া—বাস্তবিক কি চমৎকার আইডিয়া! ঠিক মনে হচ্ছে লেগে যাবে! আর কারো চোখে পড়বার আগেই—(বিজ্ঞাপন ছিঁড়িয়া) এখন সবগুলো গ্যাসপোষ্ট খুঁজতে হবে! সহরময় সেঁটেছে বোধ হয়! তাঁর কাছেও আবার যেতে হবে। (স্লিপখানি দেখিয়া) একেবারে হোলী বাইবেল,—সেণ্টমেরিস হোষ্টেল, চার্চ্চ রোড! হোক্— কিছুতেই অরুচি নেই! নাম ঠিক আছে—নীহারিকা। সাজাহান্‌নেছা যে হয়নি—তাই বাপের ভাগ্যি।

(প্রস্থান

২য় দৃশ্য

পথ

(যষ্টিহস্তে হারানিধি)

হারা। আর এ ব্যবসা পোষায় না! সব বেটা চালাক ব'নে গেছে। দেবে তো একটা আধলা, তার আবার সাতপুরুষের খবর! কেন বাবা? দিবি দে, মুখবুঁজে দে, না দিবি কে বাবা তোর সিন্ধুক ভাঙ্গতে যাচ্ছে! কৈফিয়ৎ! কৈফিয়ৎ! তারপর আবার পাহারা-ওয়ালা বাবার খৈনির চাঁদা, জমাদার ঠাকুর্দ্দার সেলামী, বাড়ীওয়ালী গুরুঠাকুরুণের বখরা! সব দিয়ে থুয়ে টাকা পিছু বাঁচে তিন আনা। তার নিজেই বা কি খাই—পটলিকেই কি দিই? তিনি আবার বাপের বাড়ী থেকে ভয় দেখাচ্ছেন নথ না দিলে ভেক নিয়ে বষ্টমী হবেন! হ'গে না বষ্টমী—যে রূপ—লোক ভিক্ষে দেবে, না, নাথি দেবে! ভিক্ষে করা কি সোজা কথা—রে মাণ—এই ছাখ না—অন্ধ নাচার হ'য়ে হাত পেতেছি অম্‌নি ঝড়াক্ সে এক সিকি! বৌনিটা এবেলা হ'য়েছে ভালই! (সিকিতে চুমা দিতে গিয়া) ওরে বাবা! একেবারে সীসের! গরীব অন্ধনাচারকে ঠকিয়ে গেলে বাবা, পরকালে ভাল হবে না। ঐ যে আসছে একজন। (অন্ধের মত লাঠি ভর দিয়া) (গান) ভজমন নন্দ ঘোষের নন্দনে—

(মানসের প্রবেশ)

অন্ধনাচার বাবা—একটা পয়সা।

মানস। বেড়ে কারবার ফেঁদেছ তো বাপধন!

হারা। অন্ধনাচার বাবা!

মানস। —বাবা তুমি যদি অন্ধ হও তবে আমি এই কালিঘাট থেকে হেঁটে আসছি—আমিও খোঁড়া।

হারা। অন্ধ নাচার—

মানস। অন্ধ নাচার! এই না কি একটা নাকের ডগায় নিয়ে উল্‌টে দেখছিলে মাণিক!

হারা। দেখে ফেলেছে! দেখিনি বাবা শুঁক্‌ছিলাম।

মানস। কি শুঁক্‌ছিলে ধন? যাক্ তুমি অন্ধের পার্ট মন্দ কর না, চাকুরী কর্ব্বে?

হারা। কাণা মানুষ!

মানস। বটে! পদ্মআঁখি খোল তো বাপধন দিনকাণা কি রাতকাণা একবার পরখ করি! চাকুরী কর্ব্বে?

হারা। কি কাজ বাবা?

মানস। এখন যেমন কাণা সেজেছ, তেমনি বোকা সেজে থাক্‌তে হবে।

হারা। আমার বাপের নামই ছিল বক্কেশ্বর, সে আমি খুব পার্ব্ব।

মানস। তবে এই ঠিকানা নাও—গিয়ে দেখা কর্ব্বে বিকালবেলা। (কাগজ দিয়া) আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

হারা। মাইনে?

মানস। তখন ঠিক হবে। (প্রস্থান)

হারা। দেখি না ব্যাপারটা, না পোষায় হাবড়া পুলের ধারে উড়ে ঠাকুর হয়ে বস্‌ব। পাঁচসিকের ফুলের মালা কিন্‌লে রোজ বারো গণ্ডা মারে কে?

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(সেণ্টমেরীস্ হোষ্টেলের সম্মুখের রাস্তা)

ভিতর হইতে কৃষ্ণবর্ণ সাহেব মিঃ ফার্ণাণ্ডেজ ও নীহারিকা গাঙ্গুলী বাহির হইয়া আসিলেন।

নীহা। সে হয় না মিঃ ফার্ণাণ্ডেজ!

ফার্ণা। না হয়, টাকা ফ্যালো!

নীহা। বল্‌ছি তো আগষ্টে দিয়ে দেব, দয়া ক'রে এ ক'টা দিন অপেক্ষা করুন।

ফার্ণা। আর চল্‌বে না! ডিসেম্বরে টাকা নিয়েছ, কথা ছিল পরীক্ষার পর দেবে। পরীক্ষা গেল, পাশও হ'লে, এখন বল্‌ছ আগষ্ট! তখন যদি ফিজটা ধার না দিতুম—পরীক্ষে দিতে কি ক'রে?

নীহা। আগষ্টে দেব, আপনি ঠিক জানবেন।

ফার্ণা। আগষ্টে না দাও, ইউ বিকাম্ মিসেস্ ফার্ণাণ্ডেজ কিংবা সিভিল জেল, নিশ্চয় জেনো! (ফার্ণাণ্ডেজের প্রস্থান)

নীহা। কি অপমান! কি ভুলই করেছি! মাঝে শুধু একটি মাস সময়। কি করি? এর চেয়ে সে ভদ্রলোকের কথা শুন্‌লেই ভালো ছিল! অন্ততঃ লোকটা যে ভদ্র তাতে সন্দেহ নেই, আর আইডিয়াটাও ছিল চমৎকার! বুদ্ধি খুব! ঠিকানাটা চেয়ে নিলে ভালই কর্ত্তাম দেখছি—এ চাকুরী হ'লে অন্ততঃ একমাস খেটেই ফার্ণাণ্ডেজের হাত থেকে বাঁচতাম তারপর—

(মানসের প্রবেশ)

মানস। নমস্কার, মিস্ গাঙ্গুলী!

নীহা। এই যে! নমস্কার মিষ্টার…

মানস। মুখাৰ্জ্জী। মানসমোহন মুখোপাধ্যায়।

নীহা। (স্বগত) বেশী গরজ দেখানো ঠিক নয়! (প্রকাশ্যে) দেখুন, আপনার আইডিয়াটা মন্দ নয়, কিন্তু মন কিছুতেই সাড়া দিচ্ছে না।

মানস। মনকে সব সময় বিশ্বাস কর্ত্তে নেই মিস্ গাঙ্গুলী!

নীহা। আপনিও আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনিনে, এ অবস্থায়—

মানস। আমি আপনাকে একবার দেখেই চিনেছি। আমাকে না চিনলেও আমি ভদ্রলোক এ কথা মানেন তো?

নীহা। মানি কিন্তু তবু—দেখুন রাগ কর্ব্বেন না, জীবনে অনেক দাগা পেয়ে—

মানস। আমার কাছ থেকে পাবেন না। দেখবেন গুড্ কণ্ডাক্ট সার্টিফিকেট? (পকেটে হাত দিলেন)

নীহা। না থাক্! তবু সঙ্কোচ হয়—কাজটা নীচ, অত্যন্ত—

মানস। সত্যিকার মিসেস ফার্ণাণ্ডেজ হবার চেয়ে, মিথ্যে মিসেস্ মুখাৰ্জ্জী হওয়া নীচ কাজ ভাবছেন?

নীহা। (চমকিত হইয়া) আপনি জানলেন কি ক'রে?

মানস। বাঁদরটা যখন শাসাচ্ছিল তখন আমি ওই শিরিষ গাছটার আড়ালে—

নীহা। তাহ'লে তো সবই শুনেছেন। সেই জন্যেই বিশেষ ক'রে —ইচ্ছা না থাকলেও আমি অন্ততঃ একমাসের জন্যেও—আপনার—আপনার—

মানস। বুঝেছি। ব'লে আর লজ্জা দেবেন না। তবে প্রকৃতপক্ষে স্বামী হবেন আপনিই—কারণ আপনারই মাইনে হবে বেশী,—একশো বিশ।

নীহা। তাহ'লে দরখাস্ত দিন্, আমি সই দেব। কিন্তু—কিন্তু কি বল্‌তে চাচ্ছি বুঝছেন ?

মানস। বুঝছি। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন। এই চার্চ্চের সম্মুখে শপথ কর্চ্ছি—

নীহা। চার্চ্চ মানেন ?

মানস। সব মানি। হিষ্ট্রির পরীক্ষার দিন গীর্জ্জা দর্গা আর কালী-বাড়ী সকলের কাছেই পাঁচ পয়সা মানৎ করেছিলাম। একশো সাতাশ মার্কের উত্তর লিখে পাশ করেছি। একটা—হয় গীর্জ্জা, নয় দর্গা, নয় কালীবাড়ী নিশ্চয় জাগ্রত, নৈলে পাশ কিছুতেই হতাম না।

নীহা। আপনাকে বন্ধু ব'লে স্বীকার কর্চ্ছি দেখবেন—

মানস। সামনে এই সেণ্টমেরিস চার্চ্চ! প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি কাগজে, কলমে এবং চাকুরী বজায় রাখবার জন্য যতটুকু স্বামী হবার দরকার ততটুকু ছাড়া আমি—

নীহা। আর বল্‌বেন না, লজ্জা পাব। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।

মানস। তবে এই নিন দরখাস্ত, একেবারে টাইপ শেষ।

নীহা। একেবারে রেডী হ'য়ে এসেছেন, দেখছি!

মানস। নশ্বর মানব জন্ম, মিস্ গাঙ্গুলী! একটা দিন যাচ্ছে—আর আয়ু এক ডিগ্রী করে নীচে নাম্‌ছে! দেরী করা বোকামী। সই দিন!

নীহা। আপনি ?

মানস। লেডীজ ফার্ষ্ট! (নীহারিকা হাসিয়া সহি করিলেন)

নীহা। সরে পড়ুন! মেয়েরা আস্‌ছে!

মানস। তৈরী হয়ে থাক্‌বেন, এ গুলি লাগবেই !—(উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান)

(দুই তিনটি মহিলা কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রস্থান করিলেন)

(নীহারিকার পুনঃ প্রবেশ)

নীহা। ছিঃ ! ছি ! কি কল্লুম ! (চারিদিক্‌ চাহিয়া) না, চলে গেছেন। লোভের মাথায়—ছিঃ ! ছিঃ ! ঠিকানাটাও চেয়ে নিইনি যে নিষেধ কর্ব্ব ! (একটু ভাবিয়া) যাক্‌গে যা হ'বার হয়ে গেছে—একমাস বৈ ত' নয় ! (প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য

(মানময়ী গার্লস স্কুলের প্রাঙ্গণ। মানময়ী দেবী স্বয়ং তিনজন প্রতিবেশিনী বামী ও চপলা প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পিছনে প্রথমে একদল বালিকা শ্লেট এবং ধারাপাত বগলে মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ও তৎপর একদল কিশোরী ছাত্রী বহি হাতে প্রবেশ করিলেন)

মান। আজ তোমার মেয়েদের কিসের খেলা ?

১মা প্র। কাপড় কাচা খেলা।

মান। আচ্ছা বল। বসি আগে একটু। (সকলে বসিলেন) এইবার বল—

১ দল বালিকা (সমস্বরে ও অঙ্গভঙ্গি সহকারে)

প্রথমেতে ঠাণ্ডাজলে ভিজায়ে রাখিবে।
তারপর পাৎলা ক'রে সাবান মাখিবে।

মান। স্বদেশী সাবান কিন্তু—

১ বালিকা। তারপরে রোদ্দুরেতে ফেলিয়া রাখিবে।
সাবান শুখায়ে গেলে তুলিয়া আনিবে।
তারপরে কোঁচায়ে নিয়ে পাটে আছড়াইবে।
পাট না থাকিলে একখানা পিঁড়ি পেতে নিবে।
তারপর চিপিয়া জল বাহির করিবে।
তারপর দড়ির উপর শুখাইতে দিবে।

মান। বেশ! পশমী কাপড় হ'লে ?

বালিকা। পশমী কাপড় হ'লে সাবান না দিবে
করিয়া রীঠার জল তাতে ডুবাইবে।

মান। এরা বেশ শিখেছে। তারপর তোমার মেয়েরা, রাজুর মা ?

চপলা। আজ আমাদের রান্নার খেলা—আমাদের নিরামিষ আর ওদের (কয়েকজনকে দেখাইয়া) মাছের।

মানময়ী। আচ্ছা আগে নিরামিষ-রা এসো।

চপলা ও আর তিনটি কিশোরী—অঙ্গভঙ্গী সহকারে

গান—

জগতে জন্মে যত তরকারী তার মাঝে সেরা ওল।
মাটির তলায় গজায় তাহারা লম্বা কেহবা, গোল।
বঁটি পেতে নিয়ে কাট ছোট ক'রে
সাবধান! হাতে রস নাহি ধরে—
রস লেগেছে কি অমনি মরেছ হাত ফুলে হবে ঢোল।

মানময়ী। হাতে তেল মাখতে বলনি যে রাজুর মা ?

২য় প্র। ঘরে তেল না থাকে যদি—

মানময়ী। তা হ'লে তো রান্নাই হবে না। যাক্ বল বাছা,—

কিশোরীরা। পাথর বাটিতে ভাল জল নিয়ে কুটিয়া থুইবে তাতে

চাকা চাকা ক'রে কাটিয়া লইবে যদি দিতে হয় ভাতে।

ডাল না রাঁধিতে কড়াই চাপাও

তাতিয়া উঠিলে তেল ছেড়ে দাও

সম্বরা দিও কালজীরা আর দুটি তেজপাতা সাথে।

ঘৃত দারুচিনি দিয়া ফুটাইলে হবে পরিপাটি ঝোল।

মান। নারকেল বাঁটা দিতে বলনি যে রাজুর মা?

বামী। যে মাগ্‌গি, কাল কিনতে গেনু একজোড়া—বলে দু' আনা।

মান। তুই চুপ কর বামী। নারকেল বাঁটা—

চপলা। আমি যে নারকেল ভালবাসিনে মা।

মান। তবে থাক! ঘেমে যে নেয়ে উঠ্‌লাম, হাওয়া দে। (বামী পাখা লইল) এবার মাছ রান্না—এস তোমরা।

(জনকয়েক কিশোরীর অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান)

চিতল মাছে মেথির গুঁড়া ইলিশ মাছে আদা

তুমি দিও না—দিও না।

জীরে ছাড়া চিংড়ি আর, সর্ষে ছাড়া চাঁদা

তুমি খেও না—খেও না।

কপি দিয়ে রুইয়ের মাথা রাঁধতে যদি যাও

হাতার মাথায় একটু খানি লঙ্কাবাঁটা নাও

ধ'নে নিও, মৌরী নিও—এলাচ বাঁটা যেন

তুমি নিও না, নিও না!

মান। বেশ!

বামী। বেশ কিগা! দুটো পুঁই ডগা দিতে বল্লে না?

মান। তুই থাম্ বামী! ঐযে উনি আস্‌ছেন—চাদর দিয়ে দে মাথায়।

চপলা। কেন মা, মাথায় চাদর দেবে? বাবা তো বাবা হ'য়ে আস্‌ছে না প্রেসিডেণ্ট হ'য়ে।

মান। আমাকে শেখাচ্ছিস।

(দামোদর বাবু ও তৎপশ্চাৎ এক গাদা চিঠি লইয়া রাজেন্দ্র বাড়রী প্রবেশ করিলেন সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।)

দামো। স্কুল শেষ হ'য়েছে?

মান। এই হোল।

দামো। তবে সব বাড়ী যাও। মাষ্টার আর মাষ্টারনীর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। দু' পাঁচ দিনেই———

মান। এলেই বাঁচি।

দামো। হুঁ! চেষ্টা কর্চ্ছি! বদনের ইস্কুলে ওরা মাইনে দিচ্ছে পঞ্চাশ আর পঞ্চান্ন। আর তোমার ইস্কুলের জন্য দেব একশ' আর একশ বিশ। বাজার এমন চড়িয়ে দেব যে এক মানময়ী ইস্কুল ছাড়া আর কেউ মাষ্টার রাখ্‌তে পার্ব্বে না। কি বল রাজু?

রাজেন। যথার্থ।

মান। মাষ্টার মাষ্টারনী এলে এঁদের সব—(প্রতিবেশিনীদের দেখাইয়া)

দামো। মহাকালী পাঠশালায় ভর্ত্তি ক'রে দেব। তুমিও সেখানে পড়্‌বে। বিদ্যের তো বয়স নেই। আর তা' ছাড়া গোড়ায় পাকিয়ে না দিলে শেষে সব গরমিল হ'য়ে যাবে।

চপলা। দেখ্‌ব মা। তুমি আগে পাশ কর, কি আমি পাশ করি!

রাজেন। (স্বগতঃ) কি তেজস্বিনী নারী!

মান। দ্যাখ্! আমি তোকে পেটে ধরেছি। আমার সঙ্গে—

দামো। আচ্ছা যাও! যাও! সব বাড়ী যাও! আমাদেব আপিসের কাজ আছে।

(দামোদর ও রাজেন্দ্র ব্যতীত সকলে প্রস্থান করিলেন)

দামো। দ্যাখো রাজু, তোমার মোক্তারী বুদ্ধি আমি বুঝিনে। স্বামীস্ত্রী কি গ্র্যাজুয়েট পাওয়া যাবে ?

রাজেন। অঢেল, অঢেল! যথার্থ আজকাল পথে ঘাটে ফিমেল আর মেল গ্র্যাজুয়েট ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যে বেলায় ধর্ম্মতলা দিয়ে যাবেন; দুই ফুটপাথ ভর্ত্তি গ্র্যাজুয়েট। যত গাড়ী চাপা পড়্ছে সব গ্র্যাজুয়েট্। গ্র্যাজুয়েটের কি অভাব আছে ?

দামো। তবে দরখাস্ত আস্ছে না কেন ?

রাজেন। এই দেখুন না চিঠির বাণ্ডিল। সবইতো দরখাস্ত।

দামো। গ্র্যাজুয়েট স্বামী স্ত্রীর দরখাস্ত কৈ? মাঝ থেকে এক ফ্যাকড়া বের ক'রে চার পাঁচ দিন দেরী ক'রে দিলে! এ দিকে বদনের ইস্কুল মেয়েতে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। গ্র্যাজুয়েট না পেলে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিতে পাচ্ছিনে। কাল দেখি বদন সরকার তার ইস্কুল এণ্ট্রান্স কর্ব্বার জন্য দরখাস্তে তার পাড়ায় লোকের সই নিচ্ছে। তার মেয়েটা বি. এ পাশ করেছে কিনা, বুকের ছাতি বেড়েছে—আমার চপলাকে যদি—

রাজেন। যথার্থ! তার পেছনে ভালো ক'রে লেগে থাক্লে তিন বচ্ছরে ডবল বি, এ হ'য়ে যাবে। একথা আমি সমস্বরে বলতে পারি।

দামো। বুঝ্লাম তো! কিন্তু গ্র্যাজুয়েট্ না পেলে যে হচ্ছে না!

রাজেন। আমার প্র্যাকটিশ না কর্ত্তে হ'লে—

দামো। তুমি পার্ব্বে না, গ্র্যাজুয়েট্ ছাড়া হবে না। এতদিন তিনচার গণ্ডা গ্র্যাজুয়েট্ আমদানী হ'ত—তোমার খেয়াল হ'ল স্বামী স্ত্রী।

রাজেন। যুবতী নারীরা পড়্‌বেন কি না—

দামো। যুবতী নারীরা যুবক মাষ্টারের কাছে বেশী মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। বুড়ো মাষ্টারকে তো কেয়ারই কর্ব্বে না।

রাজেন। সে তো যথার্থ! কিন্তু একটা স্ত্রী সঙ্গে থাক্‌লে মাষ্টারের কি জানেন—

দামো। ভালো ছেলে হ'লে সেটা তো এখানেও—না হয় দু' হাজার খরচই কর্ত্তাম। গাঁয়ে তো সুশ্রী মেয়ের কম্‌তি নেই।

রাজেন। (স্ব) ওই খানেই তো গোল!

দামো। চুপ্ ক'রে রইলে যে! আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে! বদন সরকার নাকি বাস্ করেছে দু'খানা। বাগবাজারের যত মেয়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে ইস্কুল ভর্ত্তি কর্চ্ছে! স্বামীস্ত্রী গ্র্যাজুয়েট হেঁকেই তুমি ডোবালে আমাকে! ওকি মিলবে?

রাজেন। যথার্থ মিলবে।

দামো। হুঁ! মিলবে যখন বদন সরকারের ইস্কুল হবে কলেজ, তার আগে নয়।

(খট্‌মট্ সিং প্রবেশ করিয়া)

দামো। কেয়া?

খট্‌মট। চিট্‌ঠি হুজুর, সেগরটোরী বাবুকা।

(রাজেন চিঠি লইলেন—খটমট সিং সেলাম করিয়া চলিয়া গেল)

দামো। কিসের চিঠি?

রাজেন। (স্ব) বয়স আমার চেয়েও কম, তবে স্ত্রী আছে, সাহস পাবে না।

দামো। চিঠি কিসের ?

রাজেন। দরখাস্ত। (স্ব) যদি স্ত্রীর চোখে ধুলো দিয়ে—

দামোদর। কি মুস্কিল, কার দরখাস্ত ?

রাজেন। গ্র্যাজুয়েট স্বামীস্ত্রীর দরখাস্ত—

দামোদর। এ্যাঁ! কৈ দেখি (চিঠি লইয়া) এখুনি জবাব লেখ—এখুনি—

রাজেন। বয়স বড় কম দেখছি।

দামোদর। ইস্কুলটা ডোবাবে রাজু! বয়স কম! আমি চাই গ্র্যাজুয়েট—বয়স চাইনে। জবাব লেখ এখুনি!

রাজেন। ভাল ক'রে দেখুন আগে!

দামো। দেখেছি! না জবাব নয় একেবারে তার ক'রে দাও—লেখ প্রেসিডেন্ট ভেরী গ্ল্যাড, কাম অন্!

রাজেন। কাল—

দামো। এখুনি, এখুনি, আবার হয়তো বদনের ইস্কুল টেনে নেবে। তার ক'রে দাও। না, সেই সঙ্গে টেলিগ্রামে গাড়ীভাড়াও পাঠিয়ে দাও—কি জানি যদি টাকা পয়সা না থাকে। যে দুর্ব্বৎসর—

রাজেন। সে তো যথার্থ! চলুন, কিন্তু—

দামো। আবার কিন্তু, তুমিই ইস্কুলটা ডোবাবে দেখছি রাজু। একেবারে ডোবাবে!

পঞ্চম দৃশ্য

দামোদর চৌধুরীর কাছারী ঘর।

(মানময়ীর প্রবেশ)

মান। কৈ, উনি কোথায় গেলেন! আমি আর পারব না কিন্তু। দুপুরবেলা পা' ছড়িয়ে একটু বসতে পারিনে—ইস্কুল, ইস্কুল,

ইস্কুল! কি সব ছোটলোকের মত রেষারেষি! আচ্ছা, করেছে না হয় বদন সরকার ইস্কুল, তোমাকে রাখেনি। বেশ! ঘরে এসে বসে, খাও দাও, কাজ কর্ম্ম দ্যাখো—ফুরিয়ে গেল। একি! দিন নেই রাত নেই ইস্কুল! ইস্কুল! পয়সা যাচ্ছে যাক্‌গে কিন্তু দেহটা যে আধখানা করে ফেল্‌লেন!

(চপলার প্রবেশ)

চপলা। মা ডাক্‌ছিলে?

মান। না।

চপলা। মুখ গোঁজ ক'রে আছ যে মা! আজ বুঝি তোমার সেলাইয়ের ক্লাশ?

মান। বিড়্ বিড় করিস্‌নে চপল! ভাল লাগছে না বল্‌ছি।

চপলা। ভাল লাগছে না, ছুটি নাও—প্রেসিডেন্ট তো ঘরের লোক!

মান। যা মুখে আসে তাই বল্‌ছিস্ চপল?

চপলা। বাঃ তুমিই তো বাবাকে বল—ঘরের লোক! এই তোমাকে খেতে বল্লুম, তুমি বল্লে, ঘরের লোক্‌টা খায়নি।

মান। যা আমি বল্‌ব, তুইও তাই বল্‌বি! হতভাগী!

চপলা। বক্‌ছ! বেশ বাবাকে বলে দিচ্ছি— (প্রস্থান)

মান। উনিই মেয়েরা মাথাটা খেলেন! ষাট ষাট! বালাই মাথা খাবেন কেন? নষ্ট কল্লেন মেয়েটাকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে—তারপর ওই রাজু ছোঁড়াটা! কিছু যদি বলেছি মেয়েকে, অমনি মুখ কালো ক'রে বলে, মাসিমা কিছু বল্‌বেন না! বল্‌ব না! একশ' বার বল্‌ব! কাল তরকারী কুটতে হাতখানা দুটুক্‌রো ক'রে ফেললে! রাতে ভয়ে আমার ঘুম হোল না—আজ মাথাটা টন্‌টন্

কচ্ছে! বামীকে বল্লাম একটু তেল দিয়ে দিতে, সে যে সেই পুকুরে দাঁত মাজতে গেল, গেল তো গেলই। বুঝি কানাইয়ের মা'র সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে আছে! জ্বলে মলাম এদের জন্যে!

(রাজেন্দ্র বাড়রীর প্রবেশ)

রাজেন্দ্র। চপ—কর্ত্তা কোথায় মাসীমা!

মান। দেখছিনে তো, কোথায় বা গেছেন।

রাজেন্দ্র। মাষ্টার আনতে ষ্টেশনে যাননি তো?

মান। জানিনে, নায়েববাবুকে জিজ্ঞেস কর দেখি।

রাজেন্দ্র। ওঁর এক কি বাতিক হ'য়েছে—গ্র্যাজুয়েট মাষ্টার মাষ্টারনী নৈলে—

মান। সে কথা তো ঠিকই রাজু। মানী লোক, তাঁর কেমন লাগছে বল দেখি। ঠাকুরের অন্ন খেয়ে মানুষ খোদন সরকার, তারই ছেলে বদন সরকার দুটো পেঁয়াজ-বেচা পয়সার দেমাকে ওঁকে বলে কিনা, ওসব ইস্কুল চালানো গেঁয়ো লোকের কর্ম্ম নয়! উনি যা কচ্ছেন ভালই কচ্ছেন, ঠাকুরের ছেলের মতই কাজ কচ্ছেন। ঠাকুর একবার বদরতলার হাটে গিয়েছিলেন,—একটা কাৎলা-মাছের দর বলেছিলেন সাত সিকে। ন'সিকে দিয়ে সেই মাছ বদরতলার জমিদার বাবুর ছোট ছেলে তুলে নিয়ে গেল। পর-দিনই ঠাকুর এসে বাবলাহাটির হাট বসালেন—সে পনেরো ষোল বছরের কথা—চপল আমার তখন পেটে। সে কি ধুমধাম! বাপের ছেলে যদি বাপের মত না হয় তবে তার না জন্মানোই ভাল।

রাজেন। যথার্থ। সেই জন্যে আমিও তো মামলা মোকর্দ্দমা ছেড়ে ইস্কুল নিয়ে লেগে পড়েছি। দেখি—

মান। হ্যাঁ, তোমরা দশজনে ছাখো বাবা, বুড়োর মান যাতে থাকে। বিয়ের সময় আশীর্ব্বাদী যা পেয়েছিলাম সব সিন্ধুকে তোলা আছে। তাই দিয়ে আমি তিন মহলা ইস্কুলবাড়ী ক'রে দেব। ওঁর বড় মুখ যেন ছোট না হয়।

রাজেন। যথার্থ দেখব মাসিমা, আমার কজীর রক্ত দিয়েও যদি—

মান। তাই কর বাছা তাই কর।

(তেলের বাটী লইয়া বামী)

এত দেরী হ'ল কেন বামী? আমাকে তোরা দশজনে পাগল না ক'রে ছাড়বিনি?

বামী। ছুটো পান্তা খেয়ে নিলুম, আমাকে আবার বঁটি কাটারী নিয়ে তো স্কুলে ছুটতে হবে। আজ আবার কচুর শাক রাঁধার পড়া আছে!

মান। তাই তো, দে, তবে তাড়াতাড়ি একটু মাখিয়ে দে—

(বামীর সহিত প্রস্থান)

(চপলার প্রবেশ)

চপ। রাজু দা! মা চ'লে গেছে?

রাজেন। চপল!

চপ। হ্যাঁ, আমি।

রাজেন। মাসিমাকে খুঁজছ?

চপ। বল্লুম তো।

রাজেন। ভাল ক'রে শুনিনি, আচ্ছা বল্‌ছি।

চপ। মা চ'লে গেছে কিনা এইটুকু তো বল্‌বেন, তার জন্যে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখছেন কেন?

রাজেন। যথার্থ। কিন্তু বড় মনোযন্ত্রণা দিলে চপল!

চপ। যন্ত্রণা আমি দিলুম কি করে? যাকৃগে—আপনার সঙ্গে দেখা হ'লেই কেবল আপনার যন্ত্রণা হয়, আর কথাই কইব না।

রাজেন। তা বল্‌ছিনে, তা বল্‌ছিনে চপল! তুমি দাঁড়াও আর যথার্থ যন্ত্রণা বল্‌ব না। একটুখানি দাঁড়িয়ে যাও। কি জিজ্ঞেস কচ্ছিলে?

চপ। বাঃ রে! ঐ তো বল্লুম মা কি চ'লে গেছে?

রাজেন। কোথায়?

চপ। যমের বাড়ী! পারিনে মিছিমিছি কথা কইতে—(প্রস্থানোদ্যম ও ফিরিয়া) হ্যাঁ রাজু দা, গ্র্যাজুয়েট কাকে বলে?

রাজেন। (স্ব) উঃ! গ্র্যাজুয়েট না হ'য়ে সমস্ত জীবন জর্জ্জরিত হ'য়ে গেল!

চপ। চুপ ক'রে রইলেন? আপনার কাছে জিজ্ঞেস কর্লে কোন কথার জবাব পাইনে। শুধু দাঁড়াও, শোন, একটুখানি—

রাজেন। এইবার যথার্থ বল্‌ছি। গ্র্যাজুয়েট মানে যারা এন্ট্রেন্স পাশ ক'রে ভয়ে মোক্তারী পরীক্ষা না দিয়ে বরাবর এলে আর বিএ পাশ ক'রে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—তারাই গ্র্যাজুয়েট।

চপ। রাস্তায় ঘোরে কেন?

রাজেন। পয়সা কড়ি না থাকলে যথার্থ আর কি করবে?

চপ। তবে বাবা গ্র্যাজুয়েট আন্‌ছেন কেন?

রাজেন। কেন? কেন? তা' কেন বলব'খন।

চপ। একটা কথাও সোজা ক'রে বল্‌তে পারেন না। ঐ জন্যেই তো ভাল লাগে না আমার!

(প্রস্থান)

রাজেন। উঃ গ্র্যাজুয়েট না হ'লে জীবনে যথার্থ শান্তি নেই! গ্র্যাজুয়েট

হ'লে কি কথা ছিল আজ! ইয়া বুকের ছাতি ফুলিয়ে বল্‌তে পার্‌তাম, চপলাকে আমি চাই—

(দামোদর চৌধুরী প্রবেশ করিলেন)

দামো। ওকি কর্চ্ছ রাজু?

রাজেন। (স্ব) পদে পদে বাধা! (প্রকাশ্যে) একটু ব্রিদিং একসারসাইজ—

দামো। ওসব এখন থাক্! স্থির হ'য়ে বোস। ইষ্টিশানে গাড়ী পাঠিয়েছি—তাঁরা এলেন ব'লে। আচ্ছা ইষ্টিশান কতদূর হবে রাজু?

রাজেন। প্রায় চার মাইল।

দামো। কখ্‌খনো নয়। দু'মাইল! দু'মাইলের বেশী তো নয়ই। লোক্যালে আস্‌বে তার করেছে না? লোক্যাল তো ন'টায় এসে গিয়েছে—আস্‌বার সময় হ'ল। হুঁ, ওই যে গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি। স্থির হ'য়ে বোস। খুব সম্‌জে উত্তর দেবে। আবার ইস্কুল ভাল নন ব'লে পালিয়ে না যায়!

রাজেন। আপনি কেন যথার্থ ও রকম ভয় কর্চ্ছেন?

দামো। সাবধানের বিনাশ নেই। (খট্‌মট্ সিং প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল) আয়া?

খট্। জী, হুজুর আয়া।

দামো। কাঁহা?

খট্। গাড়ী মে বৈঠে হ্যায়।

দামো। ভদ্রতা জান্‌তা নেই! (চেয়ার ছাড়িয়া) চল, হামারা সাথ। (প্রস্থানোদ্যম।)

রাজেন। আপনি কেন যাচ্ছেন, যথার্থ আপনি প্রেসিডেন্ট!

দামো। প্রেসিডেন্টের বুঝি ভদ্রলোক হ'তে নেই? তুমিই ইস্কুলটা ডোবাবে রাজু! (খট্‌মট্‌সিং সহ প্রস্থান)

রাজেন। আমি তো ইস্কুল ডোবাব না যথার্থ ইস্কুলই আমাকে ডোবাবে। কি কর্ব্ব? · যতদিন চপলা পড়বে ততদিন সেক্রেটারী থাক্‌বই। তারপর যা হয় হবে।

(আগে দামোদর চৌধুরী তৎপশ্চাৎ নীহারিকা সর্ব্বপশ্চাতে মানস প্রবেশ করিলেন।)

দামো। এই যে রাজু! এঁরা এলেন। ইনি হচ্ছেন আমাদের সেক্রেটারী—বাবু—

রাজেন। রাজেন্দ্রলাল বাড়রী, মুক্‌টিয়ায় ইন্ দি কোর্ট অফ হিজ অনার দি সাব্ ডিভিশ্যনাল অফিসার অফ বদরতলা—রেভেনিউ পাশ।

মানস। নমস্কার!

দামো। বসুন আপনারা! আপনি বসুন না, লক্ষ্মী—! আচ্ছা রাজু! তুমি যাও তো এঁদের চাকরটা আছে দাঁড়িয়ে—তাকে সঙ্গে নিয়ে আমার নদীর ধারের বাগানবাড়ীটাতে জিনিষপত্তর—এঁদের সব—বুঝলে? (নীহারিকার প্রতি) আপনি একটুখানি বসুন। আপনি—চলুন ইস্কুলটা দেখিয়ে আনি একবার!

(মানসের সহিত প্রস্থান)

রাজেন। (স্ব) চপলার মত অত ফর্সা নয়। কিন্তু চোখ দুটো—

নীহা। (স্ব) কি মানুষরে বাপু! কট মট ক'রে চাইছে—

রাজেন। (স্ব) ঘাড়ের উপর খোঁপাটা যথার্থ ঝুল্‌ছে—কি চমৎকার!

নীহা। (স্ব) ভালো জ্বালাতো দেখছি ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে কি আবার! (প্র) আপনি সেক্রেটারী বুঝি?

রাজেন। যথার্থ। নমস্কার!

নীহা। কতদিনের স্কুল ?

রাজেন। ইচ্ছে অনেকদিনেরই ছিল যথার্থ খোলা হ'য়েছে দু'মাস।

নীহা। মেয়ে ক'টি ?

রাজেন। একত্রিশ, তবে দয়া ক'রে থাকেন যদি তবে দু'মাসে একষট্টি হবার আশা আছে। চারপাশের গ্রামের লোক শুধু—ঐ ওঁরা আস্‌ছেন—আমি চল্লাম তাহ'লে আপনাদের বাড়ীটা যথার্থ পরিষ্কার ক'রে দিইগে। (দ্রুত প্রস্থান)

(দামোদর চৌধুরী ও মানসের প্রবেশ)

মানস। সেইদিন থেকে বুঝি ?

দামো। হ্যাঁ সেই থেকে বদনের ইস্কুলের কমিটির কাজে ইস্তাফা দিলাম। বাড়ীতে ফিরে এসেই গিন্নীর নামে কর্ল্লাম ইস্কুল। বদনও দেখাদেখি—তার মা বিন্দুবাসিনীর নাম পাল্‌টে দিয়ে তার স্ত্রী ক্ষীরোদাসুন্দরীর নামে ইস্কুল কর্ল্লে। শুন্‌ছি সেটা জোর চল্‌ছে! চলুক্, ক'দিন চলে দেখি! এই জন্যেই তোমাকে—আপনাকে আনা—

মানস। আপনি আমাকে 'তুমি'ই বল্‌বেন, আমার দাদামশায়ের নামও ছিল দামোদর।

দামো। বটে! বটে! গিন্নী বলেন এ নাম নাকি পচা, সেকেলে—কেউ রাখে না! এখন আসুন শুনে যান!

মানস। হ্যাঁ, তারপর ?

দামো। তারপর এই ইস্কুল আর কি ? শুন্‌লাম বদন একটা গ্র্যাজুয়েট রেখেছে। আমি আনলাম একজোড়া! হেঁ! হেঁ! একেবারে লক্ষ্মীনারায়ণ! (নীহারিকা মুখ ফিরাইলেন)

(মানময়ীর প্রবেশ)

মান। ওগো শুনছ—ওমা! (প্রস্থানোদ্যম)

দামো। আরে যাচ্ছ কোথায় গিন্নী! একজোড়া গ্র্যাজুয়েট—টাটকা তাজা কর্ত্তা-গিন্নী গ্র্যাজুয়েট—এই তোমার মাষ্টার মাষ্টারনী! আরে যেও না—লজ্জা নেই। সম্পর্ক শুদ্ধ পাতানো হ'য়েছে—নাতি ঠাকুর্দ্দা। নাৎবৌয়ের সঙ্গে একটু আলাপ কর।

(নীহারিকা হাঁচিলেন)

মান। খোকা-খুকুরা আসে নি?

(নীহারিকা রুমালে চোখ মুছিলেন)

মান। আহা! ভগবান রাখেননি বুঝি!

মানস। না, কেবল সেদিন—

নীহা। ছিঃ! ছিঃ!

দামো। ছিঃ ছিঃ! কেন ভাই! আমাদের যখন বিয়ে হ'ল—আমার বয়স বারো আর ওঁর সাত—আমাকে দেখলেই গলা জড়িয়ে ধরতেন।

মান। কি যে বল—লজ্জা কচ্ছে না!

দামো। চুরিও করিনি ডাকাতিও করিনি যে লজ্জা কর্ব্বে। এদের দেখে পুরোনো কথা আরো বেশী করে মনে পড়্ছে গিন্নী! এরা এখন তোমার ইস্কুলের বরাতে টিকে থাকে তবে তো হয়।

মানস। আপনার ইস্কুলের জন্যে আমরা প্রাণপণ কর্ব্ব—

মান। কর্ত্তার বড় মুখ যেন ছোট না হয় দেখো ভাই! ওঁর বড় সাধের ইস্কুল। বড় দাগা পেয়ে—

দামো। আর বোলো না গিন্নি! তোমার মুখে ও কথাগুলো শুন্‌লেই

আমার চোখে জল আসে। তুমি বরং বোন্‌টিকে সঙ্গে ক'রে ওঁদের বাড়ীতে নিয়ে যাও। ওঁর আবার সংসার পাততে হবে।

(নীহারিকা মুখ ফিরাইলেন)

মান। তুমি মুখ ফেরালে কেন? লজ্জা কচ্ছে বুঝি? লেখাপড়া শিখলে লজ্জাসরম এমনি হয়—দেখাও তোমার মেয়েকে ডেকে! এসো বোন্ (চিবুক ধরিয়া) একি! তোমার চোখে জল কেন?

মানস। (স্ব) এইরে ছিচকাঁদুনি সেরেছে! (প্রকাশ্যে) ওর চোখের কি জানেন একটা ব্যামো আছে! মাঝে মাঝে জল আসে, সেই সঙ্গে নাকের ডগাও কুঁচ্‌কে যায়।

দামো। বেশী প'ড়ে প'ড়ে হ'য়েছে আর কি! ভয় নেই আমি সহর থেকে ডাক্তার এনে দেখাব। দু'দিনে সেরে যাবে।

মান। যত্ন আত্তি কর্ব্বার লোক নেই তাই। সধবা মানুষ কপালটা একেবারে খাঁ খাঁ কর্চ্ছে। একটা সিঁদুরের ফোঁটা কেউ দিয়ে দ্যায়নি, হায়রে কপাল! ওলো বামী! ও বামী!

নীহারিকা। আমার মাথাটা বড় টন্ টন্ কচ্ছে। স্নান করব এখন।

মানময়ী। আচ্ছা এসো তবে—

মানস। না! না! আপনার কষ্ট কর্ব্বার দরকার নেই। আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

দামো। দ্যাখো গিন্নি! দেখছ—

মান। তুমি দেখে শেখো! সেদিন খাজনা আদায় কর্ত্তে গিয়ে পনেরো দিন কাটিয়ে এলে—তোমারই শেখা দরকার— (প্রস্থান)

দামো। কি পনেরো দিন! মিছে কথা বোলো না! দাঁড়াও! দাঁড়াও, পনেরো দিন বল্লে যে? ন'দিন নয়? চালাকী!

(মানময়ীর পশ্চাৎধাবন)

নীহা। আমি পার্ব্ব না মিষ্টার মুখার্জ্জী, পরের গাড়ীতেই যাতে—

মানস। সর্ব্বনাশ ডেকে আন্‌বেন না মিস্ গাঙ্গুলী। অনেকদূর এগিয়েছি—পা ফসকালেই একেবারে—

নীহা। তা'হোক! কি সব উৎপাত! এত কিসের? চোখের জল সিঁদূরের ফোঁটা কি এ সব? এত সইতে পার্ব্ব না এ আমি বলে দিচ্ছি!

মানস। চুপ করুন! চুপ করুন! বুড়ো আসছে আবার!

(দামোদরবাবুর প্রবেশ)

দামো। হাঃ হাঃ শুন্‌ছ মাষ্টার, গিন্নি বলেন তোমার কাছে নাকি ভালবাসা শিখতে হবে আমার!

মানস। তা বেশ প্রাইভেট পড়্‌বেন!

দামো। বাঃ বেশ বলেছ! বেশ বলেছ! দিদিমণির আবার পড়া বন্ধ না হয়। হাঃ হাঃ! এসো! (প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ মানস)

নীহারিকা। উঃ! হাতে তুলে ছাই খেয়েছি!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মানসের বাসাবাড়ীর বাহিরের ঘর। এক কোণে একটি অর্গ্যান। নীহারিকা উত্তেজিত হইয়া প্রবেশ করিলেন।]

নীহা। নাঃ, এত আমি পার্ব্ব না! জোর ক'রে আলতা পরানো কপালে সিঁদুর দেওয়া এত সইবে না আমার! আমার সম্পর্ক ইস্কুলের সঙ্গে। দশটায় যাব চারটেয় ফিরব। তা নয় প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী, সেক্রেটারীর মা তাঁদের সঙ্গে গোলোকধাম খেল, ঘর সংসারের

কথা বলো! তাও না হয় সয়, কিন্তু দিনের মধ্যে দশবার নাৎবৌ! নাৎবৌ! নাৎবৌ! কি সব বিশ্রী অসভ্য কথা! উঃ, এই দশটা দিন কেমন ক'রে কাটাচ্ছি জানেন ভার্জ্জিন মেরী! আর দিন কুড়ি কোনমতে—

(হারানিধির তান ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রবেশ—
ভজ মন নন্দঘোষের নন্দনে!)

নীহা। আর এক যন্ত্রণা! ত্যাখো হারু—

হারু। গিন্নিমা!

নীহা। আবার গিন্নি মা! বলিনি তোমাকে যে গিন্নিমা বোলো না।

হারু। তবে কি বল্‌ব?

নীহা। কি বল্‌বে? বল্‌বে মিস্—মিসি বাবা। আবার যদি কখনও গিন্নিমা বল্‌বে তা হ'লে চাকুরী থাকবে না!

হারু। (স্ব) হুঁ! চাকুরী থাক্‌বে না! বোকা সেজে ব'সে আছি বলে কিছু বুঝিনে বুঝি? এমন প্যাচেই ফেলব একদিন বুঝতে পার্ব্বেন মজাটা— (প্রস্থানোদ্যম)

নীহা। আর শোন।

হারু। বলুন।

নীহা। ও গান গাইতে পার্ব্বে না—নন্দ ঘোষের নন্দন চলবে না এখানে। বুঝ্‌লে?

হারু। আমি যে টপ্পা জানিনে।

নীহা। টপ্পা নয়। গাইবে—মেরীমাতার নন্দনে—ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে।

হারু। আজ্ঞে তা বেশ! (তান ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান।)

নীহা। আল্‌তা, সিঁদুর, নন্দঘোষ সব মিলে একেবারে হিঁদু বানিয়ে

ছাড়লে ! কাল আবার উনি—মানসবাবু বলছিলেন যে পাঁউরুটি খাওয়া আর হবে না, তার বদলে লুচী—আজ পাঁউরুটি না আন্‌লে কালই আমি ইস্তাফা দেব। অত হিঁদুয়ানী সইবে না আমার !

(চপলার প্রবেশ, হাতে গানের খাতা)

চপলা। টিচার মাসী ?

নীহা। আবার মাসী বল কেন বার বার চপল ? আজকাল ওসব কেউ বলে না, শুধু টিচার বোলো।

চপলা। মা যে বকে তা হ'লে।

নীহা। মা বড়, না টিচার বড় ? আমি যা বলি তাই শুন্‌বে।

চপলা। আচ্ছা মার সামনে মাসী বলে আপনার সামনে শুধু টিচার বল্লে হয় না ?

নীহা। তোমার মার সামনে যা খুসী বোলো আমার কানে না এলেই হোলো।

চপলা। বেশ। এইবার সেই গানটা, একটু দেখিয়ে দিন।

নীহা। আচ্ছা বোস।

(চপলা টেবিল হার্মোনিয়ামের সম্মুখে বসিল)

চপলা। (খাতা খুলিয়া) এই জায়গাটায় কি হবে ঠিক ধর্ত্তে পাচ্ছিনে।

নীহা। ঠিক এইখানটায় গিয়ে কড়ি মধ্যমে ঘা দেবে—এই ধর—

কাজল শ্রাবণ ঘন ঘন মেঘ গরজন—

বুঝলে ?

চপলা। পুরোপুরি গেয়ে দিন না ! আমি সুর মেলাই—

নীহা। আচ্ছা। (গান)—

কাজল শ্রাবণ ঘন ঘন মেঘ গরজন
অধীর কেকারবে মুখর নীপবন।

চপলা। আচ্ছা স্বরটা কি ?

নীহা। কেদারা। কিন্তু তা শুনে লাভ নেই। তুমি শুধু গলা সাধো। শুধু বাড়ী ব'সে খুব ভোরে ঘরে দরজা বন্ধ করে সারিগম করবে।

চপলা। খুব ভোরে ?

নীহা। তাতে কি হ'ল ?

চপলা। ভোর হ'লেই যে খিদে পায় আমার।

নীহা। তবে খেয়ে নিয়েই করবে।

চপলা। খেলেই আবার ঘুম পায় যে !

নীহা। তবে তো মুস্কিল। কিন্তু সারিগম সাধা না হ'লে গান তো ঠিক হবে না।

চপলা। তবে সন্ধ্যে বেলা এখানে নদীর ধারে ছোট্ট হার্ম্মোনিয়ামটি নিয়ে পা' ছড়িয়ে ব'সে—

নীহা। এ সব খেয়াল কোত্থেকে হ'ল তোমার ?

চপলা। একটা বইতে পড়েছি—আমার বয়সী একটা মেয়ে এলোচুলে পা' ছড়িয়ে বসে নদীর ধারে——

নীহা। থাক্! ও সব বই আর প'ড়ো না!

চপলা। রাজু দা যে পড়তে দিলে!

নীহা। কে ? রাজু দা ? রাজেন বাবু—সেক্রেটারী ?

চপলা। হ্যাঁ! বল্লে খুব ভাল ক'রে পড়।

নীহা। হুঁ! বুঝ্ছি, বইটা এনে দিও তো একবার! ভাল শিক্ষা দিচ্ছেন দেখ্ছি!

(মানসের প্রবেশ)

মানস। কে গাইছিল মিস্—মিস্ চপলা দেখ্ছি যে! তুমি কতক্ষণ ?

চপলা। একটা গান শিখ্তে এসেছিলুম।

মানস। শেখা হয়েছে ?

চপলা। বাড়ী গিয়ে ঠিক করব এখন দেখিয়ে নিলুম। যাই তবে—
(নীহারিকাকে নমস্কার করিয়া)

মানস। তুমি তোমার বাবাকে বলবে আমি বিকেলের দিকে যাব—
উনিও যাবেন।

চপলা। আচ্ছা। (প্রস্থান)

নীহা। আমি কিছুতেই যাব না! আমি যাব এ কথা কেন বল্লেন
আপনি ?

মানস। গেলে দোষ কি ?

নীহা। জানেন না আপনি! গেলেই মাথায় আউন্স খানেক সিঁদূর,
পায়ে আধ বোতল আলতা মেখে সং সাজতে হয়! তার পর গিন্নি
যে সব নাম ধ'রে ডাকেন তা মুখে আন্‌তেও লজ্জা করে আমার!
পেটের দায়ে আপনার কথায় রাজী হ'য়ে এখন আমার প্রাণ যায়!
কোন রকমে দিন কুড়ি আর কাটাতে পার্লে বাঁচি। এ সব শুধু
আপনার জন্যে—

মানস। রোজই আমাকে দুষ্‌ছেন কেন? আমি কি কর্লাম
বলুন তো ?

নীহা। আপনিই সব করেছেন! গোড়া থেকে এসেই দাদামশাই
দিদিমা পাতিয়ে নিলেন—এখন আমায় নিয়ে টানাটানি।

মানস। একটু স'য়ে থাকুন মিস্ গাঙ্গুলী—সব স'য়ে যাবে। টাকা
পেলে মানুষ পুত্রশোক ভুলে যায়। এক মাসের মাইনে যখন
ক্যাশ বাক্সে উঠ্‌বে তখন আর এসব কিচ্ছু মনে থাক্‌বে না। বরং—

নীহা। মানের চেয়ে টাকা বড় নয়! আমার মত হোত আপনার,
বুঝ্‌তেন—

মানস। এ আপনার inferiority complex! আপনি জানেন যে আপনি আমার—মানে আমার সঙ্গে আপনার সে সম্বন্ধ নয় তবু কেউ যদি সে কথা বলে অমনি আপনি চটে যান! কেন বলুন তো?

নীহা। মেয়ে মানুষ হ'য়ে জন্মালে কথাগুলো কেমন লাগে বুঝ্‌তে পার্ত্তেন। [বেগে প্রস্থান]

মানস। হুঁ! মেয়ে মানুষ হ'য়ে জন্মালে! মেয়ে মানুষেরই মান আছে পুরুষের নেই আমার স্ত্রী পরিচয়েই ওঁর মানের হানি হচ্ছে আর আমি যে ওঁর স্বামী সেজে ব'সে আছি তাতে আমার পিতৃপুরুষ উদ্ধার হচ্ছেন! কিন্তু কোন দিন সব ফাঁস হ'য়ে যাবে দেখ্‌ছি।

(গান গাহিতে গাহিতে হারুর প্রবেশ—)

হারু। ভজ মন মেরীমাতার নন্দনে—

মানস। এই রে মেরী মাতার নন্দন! এ গান কোথায় শিখ্‌লে যাদুমণি?

হারু। মিসি বাবা শিখিয়েছেন।

মানস। মিসি বাবা!

হারু। গিন্নি মা—

মানস। তোমার গিন্নিমার মুণ্ডু! চাকরীটা আর রাখ্‌তে দিলে না দেখ্‌ছি! যদি এ গান গাইবি আবার তা হ'লে মাথা ভেঙ্গে দেব।

[প্রস্থান]

হারু। হুঁ! হুঁ! সব বুঝি, সব বুঝি! কে কার মাথা ভাঙ্গে দেখ্‌ব— জাল টান্‌ব যখন চিংড়ি, পুঁটি, কৈ সব উঠে আস্‌বে ডাঙ্গায়—

[প্রস্থান]

[নীহারিকার প্রবেশ]

নীহা। একটু শক্ত-ই-বলা হ'য়েছে। ওঁর কি দোষ? বাস্তবিকই তো ওঁর কোন দোষ নেই।

মিষ্টার মুখার্জ্জী—মিষ্টার—

[মানসের প্রবেশ]

মানস। ডাক্‌ছেন?

নীহা। দেখুন—

মানস। আর কিছু বল্‌বেন না। আপনার অসুবিধে হচ্ছে সমস্তই আমি বুঝ্‌ছি।

নীহা। আমি সে কথা বল্‌ছিনে।

মানস। নতুন আর কি বল্‌বেন? কিন্তু একটি কাজ কর্ব্বেন না। নিতান্ত দুঃসময়ে একটা আশ্রয় যখন পাওয়া গেছে তখন সেটাকে হারানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আপনি যা কর্চ্ছেন তাতে আর এক মাসও অপেক্ষা কর্ত্তে হবে না দেখ্‌ছি।

নীহা। কি কর্চ্ছি আমি?

মানস। হারুকে যীশুর গান শিখিয়েছেন। হঠাৎ যদি বুড়োর কানে যায়—

নীহা। কেন, যীশুর গান শেখাব না? দিনরাত নন্দঘোষের নন্দন শুন্‌তে শুন্‌তে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল। আপনারা আমাকে হিন্দু কর্ত্তে চান নাকি? আলতা, সিঁদূর, নন্দ ঘোষের গান, পাঁউরুটির বদলে লুচি—সে রকম মতলব থাক্‌লে আগে থাক্‌তে বলুন!

মানস। আপনি অপাকে অপমান কর্চ্ছেন! যা খুসী করবেন আপনি! শুধু যীশুর গান কেন, স্বচ্ছন্দে আপনি বাড়ীতে salvation

Armyর হেড্ কোয়ার্টার খুলে দিতে পারেন আমি তার মধ্যে নেই। যাইবার হোক্! [প্রস্থান]

নীহা। [নিস্তব্ধ থাকিয়া] দোষ আমারি। কি বলতে কি ব'লে ফেল্লুম। হাজার হোক্ ভদ্রলোক তো।

[নেপথ্যে দামোদর—তোমার কর্ত্তাগিন্নী কোথায় ?]

ঐ আবার! ছিঃ ছিঃ! বিষ খেয়ে মর্ত্তে ইচ্ছে কর্চ্ছে আমার!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মানময়ী গার্ল‍্স্ স্কুলের সম্মুখের পথ। ফ্ল্যাটফাইল বগলে রাজেন।)

রাজেন। অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুখায়ে যায়। যথার্থ মোক্তার না ষাঁড়ের গোবর। ঘুঁটে ছাড়া কোন কাজেই লাগে না। সেক্রেটারী হ'য়েছি সেক্রেটারীতেই শেষ হব! চপলাকেও শেষে গ্র্যাজুয়েটে পেয়েছে! সে আর কথাই কয় না। যা এঁচেছিলাম যথার্থ দেখ্‌ছি তাই হ'ল। বুড়োকে বল্লাম—বল্লে, মাষ্টার লোক ভাল। বুড়ী বলে, মাষ্টারের মত মানুষ হয় না! নিজের যথার্থ স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে যে আর একজনের ভালবাসার—ইয়ে—ইয়ে—র উপর যথার্থ চোখ দ্যায় সে মানুষ! আর চপলাও এতখানি যথার্থ সহৃদয় তা জান্‌তে পারিনি! কেবল ইস্কুল আর মাষ্টারের বাড়ী। আমাদের বাড়ীমুখো হয় না। নারকেলের লাড়ু আর ভালো লাগে না তার। মা ডাক্‌লে বলে, গান শিখতে যাচ্ছি। গান শিখেই যথার্থ দেশ উচ্ছন্ন গেল, আবার সেই গান! যাও—চপলা, গান শেখ কিন্তু জান্‌বে রাজেন বাড়রী যদি প্রকৃত তোমাকে যথার্থ

ভালবেসে থাকে তবে তার প্রতিফল তোমাকে দিতেই হবে! আর তুমিও মনে রেখ মানস মাষ্টার, আমি যথার্থ যদি রাজেন মোক্তার হই তবে পিনাল কোডের একধারায় তোমাকে ফেলবই ফেলব! চপলাকে নিতে তুমি পার্ব্বে না। প্র্যাকটিশ বন্ধ করে এখানে পাহারা দেব তবু—

(দামোদরের প্রবেশ)

দামোদর। কি রাজু গালাগাল দিচ্ছ কাকে ?

রাজেন। এই দেখুন না ফাইলটা বলেছি যথার্থ দিতে সকালবেলা—

দামোদর। যাক্‌গে সে সব কথা! দেখছ তো ?

রাজেন। বলুন।

দামোদর। দ্যাখো, চোখ থাক্‌লেই দেখতে পাবে।

রাজেন। বলুন যথার্থ—

দামোদর। দেখেছ তো গ্র্যাজুয়েটের হাতে পড়লে কি রকম অবস্থাটা হয় ?

রাজেন। হুঁ। ইস্কুল—

দামোদর। শুধু হুঁ বল্‌লে ? ইস্কুল দ্যাখনি তাহ'লে ? দেখগে চেয়ার টেবিল আলমারী বেঞ্চি কেমন ঝক্‌ঝকে ফিটফাট। দশটার সময় মেয়েরা ইস্কুলে আস্‌ছে! আচ্ছা, আজ ক'জন ভর্ত্তি হ'ল নতুন ?

রাজেন। হ'য়েছে একরকম জনকয়েক—

দামো। জনকয়েক! জনকয়েক কি রাজু! তুমিই ডোবাবে ইস্কুলটা! এগারো জন নয় ?

রাজেন। সে আর যথার্থ বেশী কি ?

দামো। বেশী না ? একত্রিশ থেকে দশদিনে তেবট্টিজন মেয়ে হ'ল,

বেশী না ? বদনের ইস্কুলে এখনও পঞ্চান্ন হয়নি। তোমার মোক্তারী বুদ্ধি বুঝিনে রাজু !

রাজেন। যথার্থ বুঝবেন—

দামো। তারপর হাঁ শোন, মাষ্টারের সঙ্গে গোপনে কথাটথা হয়েছে ? টিঁকবে তো ?

রাজেন। টিকবে না আবার ! যথার্থ যাবে কোথায় বেটা—

দামো। বেটা !

রাজেন। এই—বেটা বদন সরকার ! যথার্থ তাক লাগিয়ে দেব একেবারে !

দামো। তাই বল। হ্যাঁ তারপর মাষ্টার বলে কি, কেমন লাগছে এ জায়গা।

রাজেন। ভালো লাগতেই হবে। যথার্থ যতদিন—না দেখুন আমি ফাইলটা দেখিগে একটু—যথার্থ শরীরটা আজ ভাল নেই।

(প্রস্থান)

দামো। রাজুর কি হ'য়েছে যেন ? না ওকে আর আটকে রাখব না, পসার নষ্ট হবে।

(নীহারিকার প্রবেশ)

দামো। আরে এস নাৎ-বৌ ! একা যে ?

নীহা। (স্ব) অসভ্য ! (প্র) এলুম একটা কথা জিজ্ঞেস কর্ত্তে।

দামো। বেশ, গোপনীয় ?

নীহা। না, এমন গোপনীয় নয়।

দামো। তুমি সর্ব্বনাশ কল্লে আমার নাৎ-বৌ ! ভেবেছিলাম কথাটা গোপনীয় হবে, একটু মিষ্টি মিষ্টি—

নীহা। দেখুন ওরকম ক'রে বল্‌বেন না, লজ্জা করে আমার।

দামো। কর্ব্বে না? লজ্জা স্ত্রীলোকের অলঙ্কার! যার গয়না নেই লজ্জায় সে সাত হাত ঘোমটা দ্যায়। বল।

নীহা। আমাকে দিনকয়েকের ছুটি দেবেন?

দামো। ছুটি!

নীহা। আজ্ঞে আমাকে একবার কলকাতা যেতে হবে।

দামো। তুমি ছুটি নিলে ইস্কুলটা চলবে না তো ভাই।

নীহা। মিষ্টার—হেডমাষ্টার থাক্‌বেন।

দামো। মিষ্টার হেড্‌মাষ্টার তুমি ছাড়া কিছু নন নাৎ-বৌ। শক্তি ছাড়া শিব, হাকিম ছাড়া আদালত, আর স্ত্রী ছাড়া স্বামী সমান। আজ তুমি ছুটি নাও, কাল তোমার হেড্‌মাষ্টার মিষ্টারের মাথা ঝিম ঝিম্ কর্‌বে, পায়ে বাত হবে, মুখে ঘি রুচবে না, অন্ধকারে বিছানা হাতড়াতে হাতড়াতে—

নীহা। ছিঃ ছিঃ।

দামো। ছিঃ ছিঃ নয়, সত্যি কথা। আচ্ছা উনি আস্‌ছেন, জিজ্ঞেস্ কর—

(মানময়ীর প্রবেশ)

মান। কি জিজ্ঞেস কর্ব্বে?

দামো। আচ্ছা বলতো গিন্নি। একদিন তুমি রায়বাড়ীতে রাত্রে যাত্রা শুন্‌তে গেছ্‌লে আমি পাশাখেলে এসে তোমার বিছানা হাতড়াতে হাতড়াতে—

মান। হ্যাঁ, আমার বেড়ালটার গলা চেপে ধরেছিলে আর সে তোমাকে কামড়ে দিয়েছিল। তার পরদিন মিছিমিছি তুমি ঠাকুরুণের কাছে লাগালে—আমি তোমাকে কাম্‌ড়ে দিয়েছি।

ঠাকরুণ আমাকে পেত্নীতে পেয়েচে বলে কেঁদেকেটে ওঝা পুরুত ডেকে বাড়ীশুদ্ধ তোলপাড় কর্‌লেন। মিথ্যেবাদী!

দামো। ঐ তো তোমার দোষ! সেই পঁচিশ বছর আগেকার কথা মনে ক'রে রেখেছ? সে সব ভুলে যাও, এখন যে বিপদ হ'ল আমার!

মানময়ী। কি হ'ল?

দামো। নাৎবৌ ছুটি চাচ্ছেন। উনি গেলেই নাতির আমার—

মানময়ী। ইস্ গেলেই হ'ল! কাল বুঝি ঝগড়া হ'য়েছে—

নীহা। মানমর্য্যাদা আর রইল না! (রুমাল চক্ষে দিলেন)

মানময়ী। কাঁদছ কেন ভাই—ঘরকন্নায় ওরকম হ'য়েই থাকে। আমি খুব ক'রে ব'কে দেব। এস। (নীহারিকাকে জড়াইয়া ধরিলেন)

(মানসের প্রবেশ)

মানস। কি হ'ল ওঁর?

দামো। গরু মেরে জুতো দান! কাল ব'কে স'কে আদর দেখাতে এসেছ!

মানস। হুঁ বুঝছি। তা এমন বিশেষ কিছু বলিনি তো।

দামো। না বিশেষ বলনি। ওরকম কর্ব্বে যদি আর তাহ'লে বল্‌ছি আমি ওকে দ্বিতীয়পক্ষ করে ফেলব!

(নীহারিকার প্রস্থানোদ্যম)

মানস। দিন ওঁকে ছেড়ে। ওঁর মাঝে মাঝে অমন হয়।

দামো। উনি যে ছুটি চাইছেন!

মানস। ছুটি!

দামো। হ্যা গো মাষ্টার, ছুটি!

মানস। জানিনে তো।

দামো। জানবে কি ক'রে তুমি তো ওর কেউ নও।

মানস। (স্ব) সর্ব্বনাশ ! সব ব'লে দিয়েছে নাকি ?

দামো। কি ভাবছ ?

মান। ভাব্বে আর কি ? যা ভাব্বার তাই ভাবছে, সবাই তো তোমার মত নয় যে, স্ত্রী বাপের বাড়ী পাঠিয়ে প্রজা ঠ্যাঙ্গানোর কথা ভাব্বে !

দামো। মিছে কথা ! তা কখনও ভেবেছি ? জিজ্ঞেস্ কর নায়েবকে, তুমি সেদিন শাশুড়ী ঠাক্রুণের শ্রাদ্ধে গেলে আমি সেরেস্তায় বসেছি কখনও ? মন খারাপ হবে ব'লে শুধু গাঙ্গুলীদের দরদালানে ব'সে জগুঠাকুরের সঙ্গে দাবা খেলিনি ? কানায়ের মাকে জিজ্ঞেস কর, সে রোজ সেখান থেকে আমাকে ডেকে আনেনি ? মিছিমিছি এদের সাম্নে—

মানস। আমি ওঁকে নিয়ে যাই। বুঝিয়ে, সুঝিয়ে—

মান। সেই ভালো ভাই—যার ধন তারে সাজে। এস (নীহারিকার হাত মানসের হাতে দিয়া)

নীহা। আমি সব খুলে বল্ছি।

দামো। আর শুনব না ! ওসব অজাশ্রাদ্ধে লঘুক্রিয়া ! তোমরা দু'জনেই বলাবলি কর। কেমন মজা, চাইবে আর ছুটি ?

(নীহারিকার গালে তর্জ্জনী স্পর্শ করিলেন)

নীহা। কি ও ?

দামো। গিন্নি পালাও ! নাৎবৌয়ের চোখ দেখছ—এখন আর তোমাকে আমাকে ভাল লাগবে না ! (মানময়ীর হাত ধরিয়া প্রস্থান)

নীহা। আপনার পায়ে পড়ি মানসবাবু আমাকে রেহাই দিন, আমি পার্ব্ব না আর। পার্ব্ব না। (রুমালে মুখ ঢাকিয়া প্রস্থান)

মানস। বিশ বছরের ধিঙ্গি তবু খুকীপনা গেল না! খৃষ্টানীটা মহা মুস্কিলে ফেল্লে দেখছি! বাংলাদেশে কি হিন্দুর মেয়ে বি, এ পাশ করে না? (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(দূরে মানসের বাসাবাড়ী। একটি আমগাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া রাজেন।)

রাজেন। ঠিক্ দেখেছি ঐ ঘরটাতে ঢুকেছে! চপলার জন্যেই আমি মর্ব্ব! এ বাড়ীতে ও এলেই যথার্থ বুকের মধ্যে এমন করে ওঠে —মামলা হেরেও কোনোদিন তেমন হয়নি। আর রোজ কি সন্ধ্যাবেলা যথার্থ ওৎ পেতে এই জঙ্গলে মশার কামড় সওয়া যায়? এত জামরুল গোলাপ জাম নারকেলের লাড়ু সব ভুলে গেল চপলা! কি করি? বুড়ো বলেছে মহকুমায় যেতে—পসার নষ্ট হচ্ছে! ছল ক'রে যথার্থ আমাকে তাড়ানোর মৎলব—যুক্তি দিচ্ছে মাষ্টার! চপলাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা কল্লাম কিন্তু পেটের কথা বের হয় না। দশধারার আসামীর চেয়েও শক্ত। এখানে করে কি সে? ওই আসছে চাকরটা, ওকে যথার্থ জিজ্ঞেস ক'রে দেখি।

(হারানিধির তাল ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রবেশ)

হারা। ভজ মন নন্দঘোষের নন্দনে—

রাজেন। ওহে, নাম যেন কি তোমার শুনছ?

হারা। কে? সিক্রিটিরি বাবু দেখছি! এই জঙ্গলে?

রাজেন। একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি বাপু। বাড়ী থেকে এলে নাকি? একটা যথার্থ খবর জানো.?

হারা। সব খবরই জানি বাবু। ম'রে আছি, কথা কইতে পাচ্ছিনে।

রাজেন। যথার্থ মাষ্টার বাড়ীতে আছেন?

হারা। হুঁ। বাড়ীর ছাড়া যাবেন কোথা?

রাজেন। আছেন তাহ'লে! আর যথার্থ আছেন কে কে?

হারা। (স্ব) হুঁ, এদিকেও ডাল টগবগ ফুটছে দেখছি। আচ্ছা—

রাজেন। ভাব্‌ছ কি? আর কে কে আছেন বল্‌তে পার?

হারা। কেন পার্ব্ব না? কর্ত্তা আছেন, দিদিমণি আছেন—

রাজেন। দিদিমণি! যথার্থ কে তিনি?

হারা। তিনি যথার্থ বড়বাড়ীর আহ্লাদি। ওই আপনাদের বুড়ো কর্ত্তার বেটী।

রাজেন। চপলা!

হারা! হুঁ, তিনিই।

রাজেন। আহ্লাদী! বেশ যথার্থ বলেছ—আহ্লাদীই বটে! আর কেউ নেই—মাষ্টারণী?

হারা। তিনি বিছানায়। ইস্কুল থেকে এসে সেই যে বিছানা নিয়েছেন আর ইংরিজি বকৃছেন—

রাজেন। দিদিমণি আর মাষ্টার কি কর্চ্ছে? যথার্থ বল্‌তে পার—

হারা। (স্বগত) এবার শুম্ভ নিশুম্ভের পালা হবে বুঝি! সাম্‌লে জবাব দিতে হবে। গরজ বড্ড বেশী—দেখি যদি খসে।

রাজেন। কি যথার্থ চুপ করে রইলে যে বাপু?

হারা। কেন ওসব ঘরোয়া কথা জিজ্ঞেস্ কচ্ছেন? বড় মানুষের কথায় আমার কি কাজ? (প্রস্থানোদ্যম)

রাজেন। বল যথার্থ—(হাত ধরিয়া)

হারা। হাত টানাটানি কর্ব্বেন না, ভদ্দরলোক—

রাজেন। তুমি যদি সব খবর দাও—যথার্থ তাহ'লে—(পকেট হইতে টাকা বাহির করিলেন)

হারা। দু'টাকায় পার্ব্ব না। আর তা ছাড়া মনিব— (প্রস্থান)

রাজেন। তোমাদের মনিবেরই ভাল হবে বাপু—ওহে শোন যথার্থ— (পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(স্কুলের একটি কক্ষ)

প্রতিবেশিনীদ্বয় ও রাজুর মা।

১মা প্র। কি জানি বাপু লেখাপড়া শিখলে অম্নি বুঝি হয়! সোয়ামী গালাগাল দিলেই বুঝি মাথাধরে!

২য় প্র। গালাগাল তো গালাগাল, উনি ভাত রাঁধতে দেরী হ'লেই চুলের মুঠো ধ'রে মার্তেন আমায়—আর সে কি মার! হাতের কাছে যা পেতেন—খন্তি, হাতা, ছাতি, চণ্ডীর পুঁথি তাই দিয়ে ভরদুপুরবেলা—আমি বসে কাঁদতাম তার পরেই আবার উঠে—পান্তাভাতের থালা নিয়ে বস্তাম। গায়ে গতরে ব্যথাও হ'ত না।

রাজুর মা। একালে ভাই সবই আলাদা। বয়েস কালে কত যে মারই খেয়েছি ভাই ওঁর হাতে! যদি রাগ ক'রে পড়ে থাক্তাম

তাহ'লে কি আর এ সংসার থাকৃত, না, ছেলের কামাই খেতে পার্ত্তাম ?

১মা প্র। কি জানি বাপু! দুটো কথা শুনেই যদি এত মান তবে বিয়ে করা কেন? আইবুড়ো হ'য়ে খোসখেয়ালে থাক্‌লেই হয়! সোয়ামী নয় কার্ত্তিকমাস, সকল বেলায় রোদ্দুর, সাঁঝের বেলায় শীত। কখনও বক্‌বে সক্‌বে কখনও আদর কর্ব্বে, তা নৈলে কি সোয়ামী ?

রাজুর মা। সে কথা খুবই সত্যি। শুধু আদর আর কদিন ভাল লাগে বল্? রোজ মধু খেলে মধুতেও অরুচি ধরে।

(বামীর প্রবেশ)

বামী। অরুচি ব'লে অরুচি! এমন যে মাখনের মত গুলে মাছ তার গন্ধে বমি আসে, মাগো মা! না খেয়ে খেয়ে গতর কাঠ হ'য়ে গেল!

রাজুর মা। দ্যাখ বামী, মাষ্টারণীর হয়েছে কি লো?

বামী। কি জানি বাবা খৃষ্টানী কাণ্ড! দু'দিন তো পায়ে মোজা আর মাথায় গলাবন্ধের পাগ জড়িয়ে পড়ে রইলেন—মাথায় ব্যথা, খিদে নেই! আর এমন হাভাতে সোয়ামীও দেখিনি—রেলগাড়ীর উনুনে নিজে লুচি ভেজে নিয়ে গিয়ে দ্যায়—বেহায়া! ইস্তিরির আবার অত খোয়ার কিসের লা? এক যাবে আর হবে—সোয়ামী না গোলাম! হ'ত ক্যাবলার বাবার মত সোয়ামী—স্বর্গে গেছে সেখানে সুখে থাক্! একদিন বলেছিনু রাঁধতে পার্ব্ব না, কোমরটা কন্ কন্ কর্চ্ছে, হেঁই ব'লে এক লাথি—কোমরের ব্যথা উঠস বেহ্ম চাঁদিতে! হ'ত অমন—

রাজুর মা। মাষ্টারণী আস্‌বে না ইস্কুলে ?

বামী। বল্‌লে, আস্‌বে কাল। মাষ্টার আসবে ঘণ্টাখানেক পর। ধোয়াবে মোছাবে পুতুল সাজাবে—তারপর তো আসবে—ঝাঁটা মারি অমন ইস্তিরিকে—(প্রস্থানোদ্যম ও ফিরিয়া) কিন্তু কর্ত্তাবাবু আস্‌বে এক্ষুণি— (প্রস্থান)

রাজুর মা। যে যার ঘরে গিয়ে বোস গো কর্ত্তা আস্‌বে।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

মানসের বাসাবাড়ীর অন্দর, ভিতরের বারান্দা। দুই প্রান্তে দুইটি কক্ষ—দ্বারে পর্দ্দা। বারান্দায় একখানি বেতের ছোট গোল টেবিল তাহার চারিধারে চেয়ার।

(মানসের প্রবেশ)

মানস। আচ্ছা ভোগানটাই ভুগিয়েছে খৃষ্টানীটা! এই দুটোদিন কাটল যেন ভাঙ্গের নেশায়! কি গলগ্রহই জুটিয়েছি, বাপরে বাপ! কান্না কেবল কান্না! জর্ড্যান নদীর জল আর নেই! হাতখানা লুচি ভাজতে গিয়ে পুড়িয়েছি। কি করি, উপায় তো নেই—বুড়োবুড়ী খাড়া পাহারা—স্বামীত্ব দেখাতে হবে তো? খৃষ্টানী কষ্ট দিয়েছে তবু তার বুদ্ধি আছে। ভেবেছিলাম ফাঁস করেই দেবে বুঝি সব কিন্তু খুব সামলে গেছে। যা'ক্ আর দিন চোদ্দ কাটলেই দেব ছুটি—বল্‌ব বাপের বাড়ী গেছেন তারপরেই সেখানে তাঁর নিউমোনিয়া হবে—তারপরেই হোলী গোষ্ট! শাস্ত্রমতে তখন একটা গ্র্যাজুয়েট হিন্দুর মেয়ে নিয়ে এসে কায়েম হ'য়ে বস্‌ব

আর কি? বুড়োবুড়ী টেরও পাবে না। কিন্তু—কিন্তু—ওঁর যাবারই বা দরকার কি এত? যেরকম আছেন তেমনই তো থাকতে পারেন! একটু অসুবিধে—কর্ত্তাগিন্নী নাৎ-বৌ নাৎ-বৌ বলেন, সেটা গায়ে না মাখলেও তো পারেন। এত সেণ্টিমেণ্ট্যাল হ'লে একালে চলে?

(হারানিধির প্রবেশ)

হারা। চায়ের জল দেব বাবু?

মানস। উনি কোথায়?

হারা। মিসিবাবা?

মানস। হ্যাঁ বাবা, তোমার মিসিবাবা, তোমার চোদ্দপুরুষের গুরুঠাকরুণ, কোথায় তিনি?

হারা। বাগানে ফুল তুলছেন।

মানস। নাঃ, জ্বালালে দেখছি, নির্ঘাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা না করে আর ছাড়বে না। (প্রস্থান)

হারা। গুরুঠাকরুণ নয়তো কি? ওঁর দৌলতেই আমার পটলির নথ হবে—চাই কি—

(আঙ্গিনার খিড়কী দড়জা দিয়া নীহারিকা একরাশ গাঁদা ফুল হাতে লইয়া প্রবেশ করিল)

নীহা। তোমার বাবু কোথায় হারু?

হারা। এই আপনাকে খুঁজতে গেলেন—বাগানের দিকে।

নীহা। ডেকে আন। (হারুর প্রস্থান) ভদ্রলোক আমার জন্যে সত্যিই কষ্ট পাচ্ছেন। তখন বুঝতে পারিনি যে অজ পাড়াগাঁর স্কুল, যত গেঁয়ো লোকের সঙ্গে কাজ কর্ত্তে হবে। তাহ'লে আসতুম না আমি, আর ওঁরও এত কষ্ট পেতে হ'ত না।

(মানসের প্রবেশ)

মানস। আমি আপনাকে খুঁজে এলাম। এত ঠাণ্ডায় বাগানে বেড়ানো ঠিক নয়!

নীহা। কিছু হবে না, মর্‌ব না সহজে! জানলা দিয়ে দেখ্‌লুম অজস্র গাঁদা ফুল, লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লাম না। যাক্—আপনি তো খুব কষ্ট পেলেন দু'দিন! যথেষ্ট খেটেছেন আমার জন্য, ধন্যবাদ!

মানস। ধন্যবাদের কাজ কিছুই করিনি। কর্ত্তব্য করেছি—আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে টেনে এনে বিদেশে বিপদে ফেলিছি আপনাকে। দায়িত্ব তো আমারই।

নীহা। বিপদ্ মনে করিনে, আপনার যা কর্‌বার আপনি করেছেন—অসম্মান করেন নি আমাকে কখনো কিন্তু এঁরা—বিশেষ ক'রে বুড়োবুড়ী আদর ক'রে আর ওই বিশ্রী নাম ধ'রে ডেকে ডেকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌লে আমাকে!

মানস। আমি কিন্তু মোটেই বিরক্ত হইনে। মনে মনে হাসি আর ভাবি যে চমৎকার অভিনয় কর্চ্ছি।

নীহা। পুরুষে যা পারে, আমরা তা পারিনে। মেয়েছেলের পক্ষে এ রকম অভিনয় করা শক্ত—আর—আর—

মানস। লজ্জাও হয়। কিন্তু কি কর্ব্বেন—ফার্ণাণ্ডেজের হাত থেকে উদ্ধার পাবার মত অবস্থা হ'লেই অপনার ছুটি।

নীহা। ওঁরা যদি ও রকম না করেন আমার সঙ্গে, তা হ'লে আমি বরাবরই থাক্‌তে পারি। আপনার উপর আমার—আমার—এতটুকু বিশ্বাস আছে যে আপনি অন্যায় কিছু কর্ব্বেন না আমার।

মানস। আমি চার্চ্চের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেছি, জানেন তো? আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখ্‌ব—আপনার কোনও ক্ষতি হ'তে দেব না।

আপনি চোখ্‌কান বুঁজে কোনও রকমে আর দিন কয়েক কাটিয়ে দিন—এই জুলাই মাসটা। পয়লা আগষ্ট মাইনে নিয়ে ফার্ণাণ্ডেজের আশী টাকা ফেলে দিয়েই—বাস্! ফার্ণাণ্ডেজের সে কথা গুলো আপনার মনে আছে কি না জানিনে কিন্তু আমার কানে তা ইন্‌জেক্‌সনের স্থঁচের মত বিঁধ্‌ছে। হাতের কাছে তাকে আজ যদি পাই—সে আপনাকে বলে কিনা মিসেস্ ফার্ণাণ্ডেজ হ'তে হবে!

নীহা। (ঈষৎ হাসিয়া) আপনার কি হিংসে———থাক্—তারপর—হ্যাঁ—

মানস। [চমকিতা হইয়া] হিংসে কি বল্‌লেন ?

নীহা। কিছু না। শুনুন মানস বাবু, ফার্ণাণ্ডেজের ধার শোধ হওয়া পর্য্যন্ত আপনি যা বল্‌ছেন মানব, কিন্তু দোহাই আপনার দেখ্‌বেন আপনি তারপর একদিনও যেন আমাকে এখানে থাক্‌তে না হয়। বুড়োবুড়ীই আমার মাথা খারাপ ক'রে দিলে—সিঁদুর দিয়ে দিয়ে সিঁথিটা কর্‌করে করে দিয়েছে' ছ'খানা 'ভিনোলিয়া' ঘসেও পায়ের আলতার দাগ তুল্‌তে পার্ল্লুম না। আপনিই বলুন না এত কি সহ্য হয়? তারপর দেখা হ'লেই বুড়ো যা বলে তাতো শুনেছেন! কি যে মনে হয় সে সময়—গা শির্‌শির্ করে———হ্যাঁ গা বেগুনের দাম কত ?

মানস। [আশ্চর্য্য হইয়া] বেগুন! বেগুন কি মিস্——

নীহা। ঐ বুড়ো! (দামোদর বারান্দার দ্বার পথে মৃদু হাস্য করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।)

নীহা। হ্যাঁ গা, বেগুনের দাম কত আজ ?

দামো। শুনে ফেলেছি! সব শুনে ফেলেছি! (নীহারিকা ও মানস

সভয়বিস্ময়ে চাহিল) বুড়োর কথা শুন্‌লেই গা শির্‌ শির্‌ করে! হাঃ হাঃ নাৎ-বৌ! কর্ব্বে না? গিন্নি বলেন যে আমার হাসি দেখ্‌লে এখনও তাঁর আবার চেলী প'রে নাকি নতুন বৌ হ'তে সাধ যায়। আর তুমি তো শুনেছে মুখের কথা! গা শির্‌ শির্‌ কর্ব্বে না? গায়ে হাত দিলে কোনো দিন ভির্‌মি লেগে আমার বুকেই ঢ'লে পড়্‌বে! কেমন আছ নাৎ-বৌ আজ? ইস্কুলের পথে দেখ্‌তে এলাম একবার! কি কথা হচ্ছিল?

নীহা। (স্বগত) বাঁচলুম। (প্রকাশ্যে) ভালই। (মানসের প্রতি) কিন্তু হ্যাঁ গা বল্‌লে না, বেগুনের দাম কত?

মানস। বেগুন! তা বেগুন, পাঁচ আনা সের।

দামো। ঠকিয়েছে, নিশ্চয় ঠকিয়েছে! বেগুনের সের পাঁচ আনা! বাবলাহাটিতে পাঁচ আনা বেগুন! নিশ্চয় সেই দেবু নাপিত বেটার দোকান থেকে এনেছ! আমার বাজারে আমারই ইস্কুলের মাষ্টারকে ঠকাবে—পাঁচ আনা সের বেগুন! জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব আজ! দেখিয়ে দাও তো মাষ্টার কোন বেটা বেগুন বেচেছে তোমার কাছে—

(মানসের হাত ধরিলেন)

মানস। থাক্! থাক্! যৎসামান্য ব্যাপার—

দামোদর। যৎসামান্য নয় মাষ্টার! হাট শায়েস্তা কর্ত্তে পারে না যে জমিদার তার জমিদারী এক পুরুষে খতম! পাঁচ আনা সের বেগুন! জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব আজ—দামু চৌধুরীর জমিদারী মগের মুলুক পেয়েছে বেটা!

(মানসের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

নীহা। উঃ ভগবান্! মানমর্য্যাদা আর রাখ্‌লে না! (টেবিলে

মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন) না পার্ব্ব না ! পার্ব্ব না ! আজই চ'লে যাব। ছিঃ ছিঃ—(ক্রন্দন)

(মানসের পুনঃ প্রবেশ)

মানস। বাবা, বহু কষ্টে হাত ছাড়িয়েছি। সন্ধ্যাবেলা সে বেগুনের দোকান দেখাতে হবে—আবার! বড্ড বাঁচিয়েছেন আজ আপনি—কি কাঁদ্‌ছেন না কি ? কি হ'ল !

নীহা। অনেক হ'য়েছে মানস বাবু ! আর নীচে নাম্‌তে পারিনে— পারিনে। (প্রস্থান)

মানস। দেখুন ! আবার কান্নাকাটি ক'রে অসুখটা—(পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান) [দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত]

মান-ভঞ্জন

মান ত্যাগ কর ওগো মানিনী,
বিবাহ অবধি হাম জপিনু তোমার নাম,
তোমা ছাড়া কাহারেও জানিনি।
মন সঁপিয়াছি তব চরণারবিন্দে,
স্ত্রৈণ বলিয়া সবে করে কত নিন্দে,
তুমিই শ্রীরাধা মোর তুমি মোর বিন্দে,
তুমিই কলাপ তুমি পাণিনি।
তোমারই লাগিয়া কাল করিয়াছি হরতাল,
করি নি চা-পান, হুঁকা টানিনি।

চাহ যদি কর পদদলিত,
মহাকালী রূপ ধরি জানি সে মহেশ্বরী
করিয়াছে বহু ঢলাঢলি তো !
রেখেছে চরণ তার শঙ্কর-বক্ষে,
হর দেখে সরিষার ফুল দুই চক্ষে,
নেহাৎ ন্যাংটা ছিল তাইতেই রক্ষে—
তা না হলে কি কাণ্ড চলিত !
যদি কোপ তবু কর জেনো আমি নহি হর,
নহি আমি কৈলাস-স্খলিত ।

যাহা পার কর দুই নয়নে,
আঁধার না যদি চাও জেলে রাখ দীপটাও,
থেকো না বিমুখ নিশি-শয়নে ।
ভয় করি নাক' তব চোখে রোষ-বহ্নি,
যত কাল তুমি প্রিয়া অকরুণ তন্বী—
ভয়ে নয়, ছল করে মাঝে মাঝে কোণ নি',
তব আঁখি-ঝরা মণি-চয়নে ।
বৃথা নিশি নাহি যায় প্রিয়া-পাদপের ছায়
বসে থাকি রাগ-মালা-বয়নে ।

রাগ যাবে ভৎর্সনা করিলে,
যেয়ো না বাপের ঘর বলো না, 'গেল গতর,
নাই কোন পদার্থ শরীলে !'
অভিমান ভরে প্রিয়া ছেড়ো নাক' রান্না,
ধোঁয়ার করিয়া ছল ঢাকিয়ো না কান্না,

চেয়ো না সময় বুঝে হীরামণিপান্না,
নাই বা সোনার চুড়ি গড়িলে—
মোরে যদি বধ প্রিয়া কি হবে গহনা নিয়া
শাঁখাও রবে না আমি মরিলে।

তার চেয়ে চল ঘুরি মোটরে,
দুজনে দুমুখে বসি আকাশে দেখিব শশী,
বসে' বসে' ছোট আর ছোটরে!
বহুদূরে যাব ধীরে গাঢ় হবে রাত্রি,
আমি যেন মাষ্টার তুমি মোর ছাত্রী,
আমি যেন বর তুমি বয়স্থা পাত্রী—
বিহঙ্গ-দম্পতী কোটরে।
তোমার নয়নে ঘুম আদরে হানিবে চুম
আগুন জ্বলিবে মোর জঠরে।

তারপরে ঘরে ফিরে আসিয়া,
তোমারে বুকেতে ধরি কহিব, 'প্রাণেশ্বরী,
ঘরে চল'—অতি ভালবাসিয়া।
আসিবে বাগান হতে কুসুমের গন্ধ,
খুলিবে পাদুকা তুমি, আমি গলাবন্ধ,
মিলহীন কাব্যের মিলে যাবে ছন্দ
তুমি যবে ফিক্ করে হাসিয়া—
বলিবে, 'হয়েছে রাত শুকাইছে বাড়া ভাত'—
মানিনীর মান যাবে ফাঁসিয়া।

রাগ ছেড়ে দাও ওগো রাগিণী,
যদি মনে হয় সাধ ঘটাইতে পরমাদ—
মুখে ছোবলাও হয়ে নাগিনী।
জানই তো আজ কেউ নয় অস্পৃশ্য,
প্রেম-প্রেমারায় তুমি কর মোরে নিঃস্ব,
পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য—
বাঘে যেন কামড়ায় বাঘিনী—
যদি হয় পরাজয়, মনে মানিও না ভয়,
নিজেরে ভেবো না হতভাগিনী।

শরৎ-বেদনা

বসন্ত পড়িতে লাগিল—

"মলিন ও শতছিন্ন শয্যার শিয়রে একটা মাটির প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, ঘরে অন্য আলো নাই। এইটুকু আলো রক্তশূন্য বিবর্ণ শীতল মুখের পরে লইয়া হারানের জীবন্ত মৃতদেহটা পড়িয়া আছে।.........

"দ্বারে মৃত্যুদূতের প্রহরা পড়িয়া গিয়াছে। সমস্তদিকে চাহিয়া সতীশ বারম্বার শিহরিয়া উঠিল। অনতিদূরে বধূ দাঁড়াইয়াছিল, সেদিকে একবার চাহিয়াই সে আরো যেন ভয় পাইয়া গেল। কোথায় গেল ঐ অতুল রূপ! কোথায় গেল ঐ হাসি! তাহার দৃষ্টির সম্মুখে যেন কোন এক প্রেতলোকের পিশাচ উঠিয়া আসিল। সে

ভাবিতে লাগিল স্বামী যার এই, সে আবার হাসে, পরিহাসে যোগ দেয়, খোপা বাঁধে, টিপ পরে! এক মুহূর্তের জন্ত তাহার সমস্ত নারীজাতির উপরেই ঘৃণা জন্মিয়া গেল।"

[শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ৪র্থ ভাগ ৫২ পৃষ্ঠা]

পড়া শেষ করিয়া বসন্ত একবার সমস্ত ঘরটার উপর চোখ বুলাইয়া লইল। বাইরের ঘরের সহিত অন্দরের যোগ রক্ষা করিতেছে একটিমাত্র ক্ষুদ্র দরজা—বসন্ত তাহার নাম দিয়াছিল খাইবারপাস্। 'খাইবার' বহু অর্থে, ঐ দরজা দিয়া দিনে ও রাত্রে বার চারেক খাইবাব উদ্দেশ্যে ভিতরে যাইতে হয় এবং গৃহিণী এই দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া চাবির গোছা নাড়িয়া অথবা নিঃশব্দে ঘরের ভিতরকার শ্রাব্য ও অশ্রাব্য কথা শুনিয়া তাহার মাথা খাইবার সুবিধা করিয়া লন।

ঠিক এখন খাইবারপাসের সম্মুখে একটা ভারী পরদা ঝুলিতেছে, কিন্তু দরজা ও পরদার ফাঁক দিয়া একটি গৌরবর্ণ কনকবলয়িত হাতের খানিকটা দেখা যাইতেছে—একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে একটা ঝাঁটাও যেন দেখা যায়। সম্ভবতঃ ঘর ঝাঁট দিতে দিতে কৌতূহলী হাতের মালিক বিশ্রামসুখ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে একটু মজা উপভোগ করিয়া লইতেছিলেন। ঘরের ভিতরে সুবিস্তৃত ফরাসে একপাল ছোট বড় মাঝারি সু, চলনসই ও কুৎসিৎ লোক, কেহবা একটা তাকিয়া অধিকার করিয়া তাহাতে হেলান দিয়া, কেহবা লম্বাভাবে শুইয়া, কেহবা কোলে তাকিয়া লইয়া বসিয়া। আলবোলার নলে মুখ দিয়া কেহবা অর্দ্ধনিমীলিতচক্ষু, কেহবা নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৈনিক সাপ্তাহিক বা মাসিকের পাতা উল্টাইতেছে। সুবৃহৎ শরৎ-গ্রন্থাবলী সম্মুখে খুলিয়া বসন্ত এই ফরাসেরই একধারে উপবিষ্ট। ঘরের কোনে একটি টেবিলের দুই পাশের দুই চেয়ারে

কোটপ্যাণ্ট পরিহিত কালো নিশমিশে দুই মূর্ত্তি—আওয়াজটা হইতেছিল, ইহাদেরই একজন টেবিলের নীচে অবস্থিত একটি কেরোসিন কাঠের বাক্সের উপর অত্যধিক আবেগে মাঝে মাঝে ঠোক্কর মারিতেছিলেন বলিয়া! যে দুরূহ বিষয় লইয়া আজিকার আলোচনা, তাহার উপযুক্ত অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার যেন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। মনে রাখিতে হইবে তারিখটি ৩১শে ভাদ্র, ইংরাজি ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, বৈকাল সাড়েচারিটা।

উপস্থিত সভ্যদের দুইচারিজনের নামোল্লেখ প্রয়োজন, কারণ মাঝে মাঝে আলোচ্য প্রসঙ্গে ইহারা যোগ দিবে।

একনম্বর—বসন্ত—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও কৃষ্টি' বিভাগের বক্তা (lecturer), গৃহকর্ত্তা, পৈত্রিক যাহা ছিল সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের চা, চুরুট ও পাখার হাওয়া জোগাইতে বালুঘড়ির বালুর মত অতি ধীরে ধীরে নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। খাইবারপাসের পরদার অন্তরালে বসন্তেরই পত্নী।

দুই নম্বর—নলিনী ওরফে ভুতু। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে থার্ডইয়ারে পড়িতে পড়িতে একদা বিশেষ কারণে চকমাখানো ড্রইং বোর্ডের উপর ড্রইং মাষ্টারের নাক ঘষিয়া দিয়া সদর দিয়া সেই যে সে কলেজের বাহিরে আসিয়াছিল—'যে পথ দিয়া পাঠান এসেছিল, সে পথ দিয়ে ফিরল না ত আর'। পৈত্রিক পয়সা এবং সাহিত্যপ্রীতি আছে, বর্ত্তমানে যেখানে যেখানে সাহিত্যসভা বা এমেচার ড্রামাটিক ক্লাবের অভিনয় হয় সেখানে স্বতঃই উপস্থিত হইয়া প্যাণ্ডাল ও মঞ্চের প্ল্যান তৈয়ারী করে। বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমারের বিশেষ ভক্ত।

তিন নম্বর—যতীন, বাজে শিবপুর অ্যাংলোভার্ণাকুলার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক। ফণীন্দ্র পাল ও বিজয়রত্ন মজুমদার ইহার আইডিয়াল।

সুদক্ষ অভিনেতা, গনেশ অপেরা পার্টিতে যোগ দিলে মাসিক বেতন কম করিয়া একশত টাকা হইত।

চার নম্বর—সুরেশ, টার্ণার মরিসন কোম্পানীর ক্যাশবিভাগে কাজ করে। আলুলায়িত কেশপাল। সিনেমা পাগল, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার একমাত্র দেবতা।

পাঁচ নম্বর—ললিত, খদ্দরিষ্ট, অহিংস, হাওড়া কংগ্রেস কমিটীর একজন কর্ম্মী, নুন তৈয়ারী করিতে গিয়া জেল খাটিয়া আসিয়াছে।

ছয় নম্বর—হারানিধি, পাটের দালাল, মিসকালো চেহারা—দিন ও রাত্রের সকল প্রহরে কোটপ্যাণ্ট শোভিত, মুখে গোল্ডফ্লেক সিগারেট ও ইংরাজী সুর 'মাই বনি বনি ব্রাইড'—লাগিয়াই আছে, পায়ে তাল। গান্ধীবাদী। টেবিলের ধারে দুই চেয়ারের এক চেয়ারে উপবিষ্ট।

এতদ্‌ব্যতীত, বিনয়, হাব্‌লু, পঞ্চা, জ্ঞান, দেবেন—সকলেই সাহিত্যসেবী। আলোচ্য বিষয় 'শরৎ-বন্দনা'। ললিত একদা কংগ্রেসের কার্য্যে শরৎচন্দ্রের সহকর্ম্মী ছিল বলিয়া নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিল কিন্তু দেশের এই দুর্দ্দিনে এই অনুষ্ঠানে সে যোগ দিবে না বলিয়া নিমন্ত্রণ-পত্র সমেত বসন্তের গৃহে হাজির হইয়াছিল। ললিত নিমন্ত্রণ পত্রখানি আসরের মাঝখানে ফেলিয়া দিয়া একটু ব্যথিত, অহিংসকণ্ঠে বলিয়াছিল। মারামারি হয় এ আমি চাই না, কিন্তু এই যে প্রবেশপত্রের উপর ছাপা হয়েছে—শরৎ-বেদনা—আসলে ব্যাপারটা শরৎ-বেদনায় পর্য্যবসিতহলে মন্দ হয় না, লোকটার শিক্ষা হয়। যতীন বলিয়াছিল—হবে হবে, দেখে নিও। দেখতে পাবে দেশে এখনও মানুষ আছে, সবাই অমানুষ নয়! হুঁ হুঁ, দেখে নিয়ো।

হাব্‌লু আপত্তি করিয়াছিল, বলিয়াছিল, আগে থাকৃতেই তোমরা চট্‌ছ কেন হে? দেখই না ভদ্রলোক শেষপর্য্যন্ত কি করেন।

সুরেশ বলিয়াছিল, কর্ব্বেন আবার কি, মুণ্ডু করবেন ? ষাট বছর বয়সে বিয়ে করতে গিয়ে বরকে কখনও ফিরে আসতে দেখেছ ? গান্ধীজির উপবাসের কথা আজ কাগজে বেরিয়েছে চারদিন, শরৎবাবুর বুদ্ধি থাকলে এর ভেতরেই মতিস্থির করে ফেলতে পারতেন। আজ সকালের কাগজ দেখেছ ? নাচ-গান, অভিনয়, আনন্দবৈঠক সবই রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে কাল রাত বারোটা পর্য্যন্তও এই সব করার মতলব ছিল। দুর্গাদাসবাবু বলছিলেন যে তাঁরাও একটা—

বিনয় বলিয়াছিল, এমন হতে পারে, ভদ্রলোককে কেউ এ বিষয়ের গুরুত্বটা বুঝিয়ে দেয় নি। আত্মভোলা সাহিত্যিক লোক !

অহিংস ললিত বাধা দিয়া বলিয়াছিল, আত্মভোলা নয় হে, বামুনের হুঁস ঠিক আছে। সেবার হাওড়া কংগ্রেসের তরফ থেকে—

বসন্ত বলিয়াছিল, এ নিতান্ত বাজে কথা, কাগজে প্রতিবাদ করে দুটো চিঠি বেরিয়েছে, শরৎ বাবুর কাছে আর নির্ম্মলচন্দ্রের কাছে লোক গিয়েছিল এও আমি জানি। তাঁরা জবাব দিয়েছেন, এ তো আর ছেলেখেলা নয়, এতদূর যখন এগিয়েছে তখন বন্ধ হতে পারে না। এত খরচপত্র হয়েছে, তাছাড়া গান্ধীজি উপবাস সুরু করবার আগেই সব শেষ করে দেওয়া হবে।

হারানিধি বলিয়াছিল, বাহবা যুক্তি, ঘরে আধমণ মাছ মজুত, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, হবিষ্যি করি কি করে'—মাছ গুলো নষ্ট হবে ! জয় নির্ম্মলচন্দ্র, জয় শরৎচন্দ্র ! এরা পাটের দালাল হ'লে সর্ব্বনাশ হত বাবা !

যতীন বলিয়াছিল, তবু শেষ রক্ষা হবে না দাদা, দেখে নিয়ো। বসন্ত একটু গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, সত্যিই কাজটা শরৎবাবু ভাল করলেন না, চরীত্রহীনের কিরণময়ীর অবস্থা হয়েছে তাঁর। স্বামী

মৃত্যুশয্যায়—আর কিরণময়ী ফিটফাট সেজে অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে রাসলীলা করছে, এ যেন ঠিক তাই। জায়গাটা পড়ে শোনাচ্ছি।

পড়া হইয়া গেলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বসন্ত বলিল, কিন্তু কিরণময়ীও ভাল, তার নিজের জ্ঞান ছিল সে কি করছে। কারণ কিছু পরেই সে উপেন্দ্রকে নিজেই বলছে—

"হায়রে পোড়া কপাল! এ ঘরে স্বামী মর মর, ও ঘরে গেলুম তাকে (অনঙ্গ ডাক্তারকে) নিয়ে ভালবাসার সাধ মিটোতে।"

[পৃঃ ১২২]

রবীন্দ্রনাথ হলেও বা কথা ছিল, তাঁর সম্বন্ধে অন্য বিচার। তিনি বিশ্বকবি, মাটি ছাড়িয়ে মেঘলোকের উর্দ্ধে তাঁহার বিহার। তিনি এই দুর্দ্দিনে জয়ন্তী করাতে মর্ম্মাহত হয়েছি কিন্তু বিস্মিত হইনি। কিন্তু দেশের এই দুর্দ্দিন, গান্ধীজি মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন, এমন সময়ে আমাদেরই ধূলোমাটির শরৎচন্দ্র গেলেন কি না বন্দনা-বিলাসে যোগ দিতে!

রূঢ় কণ্ঠে হারানিধি বলিল, যাবেন না কেন? গান্ধীর ওপর কি তাঁর শ্রদ্ধা আছে, তাঁর মৃত্যুতে শরৎবাবুর কিছু যাবে আসবে? 'বেনে' 'টিকিতে চরকা' ইত্যাদি বলে ইনিই তো একদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চেয়েছিলেন! এ সব বলতে তো আর দালালি দিতে হয় না!

বসন্ত বলিল, তবু পথের দাবীর শরৎচন্দ্র, হাওড়া কংগ্রেস কমিটির শরৎচন্দ্র দেশের সম্বন্ধে এতটা হৃদয়হীন হবে কে ভাবতে পেরেছিল? দশজন অপদার্থ পুরুষ আর পাঁচজন অপদার্থ স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়ে তাঁর বুদ্ধি যে এমন ঘোলাটে হয়ে উঠবে কে জানত!

নলিনী ওরফে ভুতু বলিল, ওহে এ সাইকলজীর কথা, গুড়মুড়িতে

যার লোভ তাকে রাজভোগের লোভ দেখালে সে যাবে না? চন্দ্রমুখী, সাবিত্রীর চরিত্র এঁকে যাঁর দিন গেল তিনি যদি হঠাৎ লতিকা বসু, রাধারাণী দেবী ইত্যাদির বন্দনা পাওয়ার কথা শোনেন, লোলুপ হবেন না? তাছাড়া আরো পাঁচটা আনুসঙ্গিক ব্যাপার আছে, গান আছে, থিয়েটার আছে। আবুহোসেন দেখনি? সে বেটা ক্ষেপেই গিয়েছিল। দেখ, তোমাদের শরৎচন্দ্রকে ফিরে পাও কিনা!

বসন্ত বলিল, সেই কথাই তো বলছি, সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন'-এর বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র 'শিক্ষার বিরোধ' বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়হীন বলতে কসুর করেননি, আজ তিনি নিজে কি করছেন? দেশের দুর্গতি আরও সাংঘাতিক হয়েছে, মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে, এমন দিনে একদিন যিনি কেরাণী ছিলেন তিনিই সিংহাসন লোলুপ হয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বস্‌লেন! অদৃষ্টের পরিহাস একেই বলে!

ললিত বলিল, তোমরা শরৎচন্দ্রকে এতটা বড় ভাবছ কেন? তিনি দেশের জন্যে করেছেন কি? হাওড়া কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর যোগ দেওয়ার ইতিহাস আমি জানি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দোষ, তিনি লোক চিন্‌তে পারেননি। চেয়ারে বসে ফাউণ্টেনপেন হাতে গরম গরম দু'টো বুকনি আওড়ালেই যদি বড় হওয়া যেত তাহলে ভাবনা ছিল কি? দেশটা বিচিত্র বলেই এখানে শরৎচন্দ্রের মত নিছক ঔপন্যাসিককেও দেশনেতার আসনে বসানো হয়, এটা তোমাদের দেশেরই দোষ, শরৎচন্দ্রের নয়।

বসন্ত জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ নলিনী বলিয়া উঠিল, শরৎচন্দ্র চুলোয় যাক্ বাবা, এক কাপ করে' চাও কি জুটবে না! দিনে দিনে কি যেন হচ্ছে সব!

থাইবারপাসের পরপারে বলয়িত হাতখানি আর দেখা গেল না,
বসন্ত হাঁক দিল, রামধনিয়া, চা আর পান নিয়ে আয়রে। সম্মুখে দৈনিক বসুমতী একখানা পড়িয়াছিল, গান্ধীজীর অনশন, বড় বড় অক্ষরের হেডিং—প্যাট প্যাট করিয়া চাহিয়া যেন সকলকে খোঁচা মারিতে লাগিল।—

এমন সময়ে হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া শচীনের দল প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই দুই বাহু উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মিলিটারী ভঙ্গীতে শচীন বলিল, বন্দেমাতরং, বন্দেমাতরং বন্দে—

বসন্ত বলিল, গৌরচন্দ্রিকা রাখ শচীন, ব্যাপার কি ?

শচীন বলিল, মাতরং—ব্যাপার ? একেবারে ওয়াটারলুর যুদ্ধ, মারামারি ফাটাফাটি ব্যাপার, শরৎচন্দ্র লোপাট, বন্দনা বন্ধ, মেয়েরা ত্রস্ত, বাবুরা বিবস্ত্র—

ললিত বলিল, তাহলে শেষটা শরৎবন্দনা না হয়ে শরৎ-বেদনাই হল ?

শচীন বলিল, বেদনা ব'লে বেদনা, গর্ভবেদনার চাইতেও বেশী, পেন্ হ'ল কিন্তু ডেলিভারী ষ্টপ্‌ট্।

যতীন কোলের তাকিয়াটাকে সপ্রেমে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, সবিস্তারে বল শচীন, হৃদয় অধীর হয়ে উঠেছে।

ইতিমধ্যে একথালা নিম্‌কি, চা ও পান আসিয়া পড়াতে শরৎচন্দ্র চাপা পড়িলেন। জলের ঘটি ও গেলাস হাতে রামধনিয়া বিদ্যুৎগতিতে এদিকে ওদিকে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। নিম্‌কি চিবাইতে চিবাইতে দালাল হারানিধি বলিয়া উঠিল—রাইট্‌লি সার্ভ্‌ড, বামন হয়ে চাঁদে হাত, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে টেক্কা ! হ্যাঁ হে শচীন তিনি এসেছিলেন, জিহোভা ?

অনেকটা পথ আসিয়া শচীন একটু বেশী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রাক্ষসের মত একসঙ্গে অনেকগুলা নিমকি মুখে পুরিয়া সে তখন ধুঁকিতেছে, বিষম খাইতে খাইতে জবাব দিল, পাগল, তুমি ক্ষেপেছ হারানিধি, তিনি কি কম চীজ, গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়ার এমন ওস্তাদ ত আর দ্বিতীয় নাই। তিনি আস্‌বেন? এতো জানা কথা, শরৎচন্দ্র যদি ভেবে থাকেন রবীন্দ্রনাথ ঋণপরিশোধ করতে আসবেন তাহলে বল্‌তে হবে তিনি বুদ্ধিমান নন্।

সুরেশ বলিল, তাহ'লে সভাপতি?

শচীন। আরে বাপু সভা কোথায় যে সভাপতি? তবে সভা-উপপতি হওয়ার কথা হয়েছিল চৌধুরীজীর—তোমাদের প্রমথ চৌধুরী হে।

যতীন। তাহ'লে সভাই হয়নি বল? খাওয়া রাখহে, বিস্তারিত বলই না! 'বল বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে'—

কিন্তু বসন্তের বাহিরে যাইবার তাড়া ছিল, গৃহিনীর কি একটা করমাসে। খাইবারপাসের পরদা ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছিল, বসন্ত বলিল আজ থাক্, তা'ছাড়া মুখে বল্‌তে গেলে অনেক রস মাটি হয়ে যাবে, তার চাইতে শচীন আজ রাত্রে সমস্ত ব্যাপারটার একটা 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' লিখে ফেলুক, বঙ্গবাণীতে কিছুদিন ট্রেনিং নিয়ে এসেছিস, ও পারবে। কালকে সকালে এখানেই সেটা পাঠ করা হবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ললিত বলিল, এমন ব্যাপারটা এখন চাপা রাখলে হে, রাত্রে ঘুমই হবে না হয়তো।

সুরেশ আরও একটু করুণস্বরে বলিয়া উঠিল, বেচারা শরৎচন্দ্রের জন্য দুঃখ হয়, ভদ্রলোক অনেক আশা করেছিলেন হে!

হারানিধি ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, কপাল কপাল—সবই নসীব দাদা, নইলে পাটের দর পঁয়ত্রিশ থেকে বাইশে নামে!

* * *

সভা সরগরম, বোঁ বোঁ করিয়া বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছে, খাইবারপাসের ওপারে কি আছে বুঝিবার জো নাই। শচীন চেয়ারের ওপর একপা তুলিয়া টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, বামহাতে 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ'। সবাই আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া। শুধু কোটপ্যান্টশোভিত হারানিধি শচীনের সামনের চেয়ারে। শচীন পড়িতে সুরু করিবার পূর্ব্বেই হারানিধি বলিয়া উঠিল, দেখো, বাবা থুথু ছিটিয়ো না—

শচীন রোষকষায়িত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, দালাল কি গাছে ফলে হে. গোড়াতেই টুকে দিলে?

বসন্ত বলিল, নাও নাও সুরু কর।

শচীন বাঁহাতে কাগজগুচ্ছের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রথমটা সুরেন বাঁড়ুয্যের ষ্টাইলে সামনে পিছনে বামে ও দক্ষিণ যথাক্রমে ঈষৎ হেলিয়া সুরু করিল, বন্ধুগণ, আজিকার বঙ্গবাণী ও লিবার্টিতে কল্যকার ব্যাপারের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, বেতনভোগী কর্ম্মচারীরা, এই ব্যাপারে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত কর্ত্তৃপক্ষকে, চটাইতে ভরসা না পাইয়া মিথ্যা কথা লিখিয়াছে। এই কথা বলা এইজন্য আবশ্যক যে আমার বিবরণ ও প্রকাশিত বিবরণে গরমিল হইবে; পাছে ছাপার অক্ষরের মোহে ভুলিয়া আপনারা হাতের লেখাকে অবিশ্বাস করেন, এইজন্যেই আপনাদিগকে সাবধান করিতেছি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমি এবার মল্লিখিত বিবরণী পাঠ করিতেছি।

উৎসুকদৃষ্টিতে খাইবারপাসের নিরেট অন্ধকারের দিকে চাহিয়া শচীন সুরু করিল—

কালাদীঘির ডাকাতি

বঙ্কিমচন্দ্র আজ বিস্মৃত অবহেলিত। তাঁহার উপন্যাস লিখিবার ভঙ্গী ও ভাষা দেখিয়া আজকালকার স্কুলের থার্ডক্লাসের ছেলেরাও হাস্য করিয়া থাকে। যে যুগে শরৎচন্দ্র জীবিত আছেন সে যুগে দুই চারজনে যে ভুল করিয়াও বঙ্কিমচন্দ্রের নামোল্লেখ করে ইহাতেই আশ্চর্য্য হইতে হয়। বঙ্কিম—বঙ্কিম মাত্র। শরৎচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র। গতকল্য সেই শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মদিনে বন্দনা হইবার কথা ছিল; আয়োজন সব ঠিক, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দল নয়, হয়তো রবীন্দ্রনাথের দলও নয়, কোন্ দল যে ঠিক বলিতে পারি না, সব আয়োজন পণ্ড করিয়া দিল। দুঃখের কথা সন্দেহ নাই, কারণ এই সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মদিন শরৎচন্দ্র আর ফিরিয়া পাইবেন না। তাঁহার বয়স বাড়িয়া যাইতেছে। তিনি স্থবির হইতেছেন। আজ তিনি যাহা উপভোগ করিতে পারিতেন কাল তাহা তাঁহার ভোগে নাও আসিতে পারে, আজ তাঁহার যে কটি দাঁত আছে, আগামী বৎসরে সে কটি দাঁত থাকিবে না, অধিক সংখ্যক চুল পাকিয়া যাইবে। চোখের দৃষ্টি কিছু আবিল হইবে; আজিকার চন্দ্রমুখীদের মুখমণ্ডল তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন না; আগামী বৎসরে এত পদ্মফুল নাও ফুটিতে পারে। চাঁদমালার দাম বাড়িয়া যাওয়া সম্ভব, কর্পোরেশনের যে অবস্থা, গবর্ণমেণ্ট যেভাবে কড়াকড়ি সুরু করিয়াছেন, আগামী বৎসরে হয়তো বালিকা বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যাইবে, সুতরাং দ্বিতল হইতে ভূমিতলে লম্বমান এই সুন্দরী বালিকামাল্য শরৎচন্দ্র আর দেখিতে পাইবেন

না; সিঁড়িতে পাতা সালু ধূলায় কলঙ্কিত হইবে। হয়তো টাউনহলই আর থাকিবে না। দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, তাহা দুই-চার বৎসরেই সমাপ্ত হইতেছে না। এক গান্ধী গেলে শত শত গান্ধীর উদ্ভব হইবে, কিন্তু লতিকা বসু, বিধানচন্দ্র, নির্ম্মলচন্দ্র, কিরণশঙ্কর যুগে যুগে আবির্ভূত হইবেন না। তাঁহাদের মতিগতিও বরাবর সমান না থাকিতে পারে। এবং তাঁহাদের মতিগতি বদলাইলে আর নূতন করিয়া বন্দনা সম্ভব নয়। দেশ? হায়রে, দেশ কি শরৎচন্দ্রের নয়, তিনি কি পথের দাবী লেখেন নাই? তিনি কি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন না? তিনি কি জেলে যাইবার জন্য জুতার শুকতলা পর্য্যন্ত বদলাইয়া লইয়া প্রস্তুত হন নাই? দুষ্টলোকে বলে, তিনি শেষে ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু পিঠ দেখাইবার পূর্ব্বে বুক তিনি দেখাইয়াছিলেন তো!

তাই বলিতেছিলাম, শরচ্চন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মদিন আর ফিরিয়া আসিবে না। নির্ম্মম মহাকাল সব কিছু লেপিয়া মুছিয়া চলিতেছে। আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন, সাতান্ন বৎসর বয়সটি নির্দ্ধারণ করা হইল কেন? বেদে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ নাই, সুতরাং ইহা বৈদিক নহে, উপনিষদে নাই, তন্ত্রে নাই, গীতায় নাই, বাইবেল কোরাণেও সম্ভবতঃ নাই। যতদূর জানি, সাতান্ন বৎসর সম্বন্ধে এরিষ্টটল, লাওৎসে বা লারসফুকোও কিছু লেখেন নাই। নাই লিখিলেন? চিরদিন পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর শুনিয়া আসিয়াছেন, তেপ্পান্ন, সাতান্ন, তেয়াত্তর শুনিতে শিখুন; নূতনের প্রতি আপনারা বিরূপ কেন? ভুট্টার বেলা কচি খুঁজিবেন, কচি আমের অম্ল খাইতে অরুচি নাই—কচি পাঁঠা শুনিলে জিহ্বায় আপনাদের জল আসিবে, নূতনের বেলাতেই আপনাদের যত আপত্তি! কেন?

কিন্তু সাতান্নর কি কোনই অর্থ হয় না? তেপ্পান্নর অর্থ সহজ, তেপ্পান্নে পঞ্চাশ তামাদি হয়; সাতান্নে 'ষাট' সোনা হইবে না কেন? সাতান্নও যা ষাটও তাই। রাম না হইতে রামায়ণ লেখা হইয়াছিল, ষাট না হইতেই ষাটের বাছার বন্দনা হইলেই যত অপরাধ! মোটের উপর নিন্দুকদের কথা শুনিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

যতীন হঠাৎ হাঁকিয়া উঠিল, ওহে তোমার কালাদীঘির ডাকাতিতে এস, বার্ণার্ড্ শ এর মত ভূমিকা নাই করলে।

শচীন চটিয়া উঠিয়া, বলিল, তুমি থাম হে, প্লোটা মাটি করে দিলে! হ্যাঁ—তাই বলিতেছিলাম দেশ বড় নয়, দেশের নামে এই অনাচার, এই অত্যাচার, এই গুণ্ডামি—ইহা জাতির কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক; এই কলঙ্ক মহাত্মা গান্ধীর নামে অনুষ্ঠিত হইল। তিনি এই খবর জানিতে পারিলে উপবাসের মাত্রা বাড়াইয়া দিবেন, ইহা আমি জোর গলায় বলিতে পারি। বন্ধুগণ, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলিতেছিলাম, তিনি চীজটি সহজ ছিলেন না। তাঁহার প্রতি ভক্তি শরচ্চন্দ্রের নাই রহিল, কিন্তু 'ইন্দিরা' নামক তথাকথিত উপন্যাসে তিনি যে কালাদীঘির ডাকাতির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহাই তো হইল কাল! শরচ্চন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশত জন্মদিনে কালাদীঘির ডাকাতি স্মরণ করিয়াইতো ছোকরারা গোল বাধাইল! বঙ্কিমচন্দ্র বড় প্রতিশোধ লইয়াছেন। আমি সেই কালাদীঘির ডাকাতি হইতেই সুরু করিতেছি, আপনারা অবহিত হউন।

শচীন এইবার বাঁ হাতের কাগজগুলি লইয়া পড়িতে সুরু করিল।

আমি শ্বশুরবাড়ী যাইব—

"অনেকদিন পর আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম। তথাপি এ পর্য্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই।... ...

আমার পিতা হরমোহন দত্ত বনিয়াদি বড় মানুষ, হাসিয়া বলিলেন, "মা ইন্দিরে! তোমাকে আর রাখিতে পারিলাম না। এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। আঙুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না। (১)

মনে মনে বাবার কথার উত্তর দিলাম, বলিলাম, 'আমার প্রার্থনাটা বুঝি আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল; তুমি যেন বুঝিতে পারিয়া হাসিও না।'

আমার ছোট বহিন কামিনী বুঝি তা বুঝিতে পারিয়াছিল—বলিল, 'দিদি, আবার আসিবে কবে?' আমি তাহার গাল টিপিয়া ধরিলাম। কামিনী বলিল, "দিদি, শ্বশুরবাড়ী কেমন, তাহা কিছু জানিস্ না?"

আমি বলিলাম, 'জানি। সে নন্দনবন, সেখানে রতিপতি পারিজাত ফুলের বাণ মারিয়া লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে পা দিলেই স্ত্রীজাতি অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণে বাতাস বয়, অমাবস্যাতেও পূর্ণচন্দ্র (২) উঠে।'

কামিনী হাসিয়া বলিল, 'মরণ আর কি!'

ভগিনীর এই আশীর্ব্বাদ পাইয়া আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। ...তোমরা হাসিতেছ? আমার মাথার দিব্য, তোমরা হাসিও না, আমি ভরাযৌবনে প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম।......পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। দীঘির ঘাটে বটতলায় আমার পাল্কী নামাইল। আমি হাড়ে জ্বলিয়া গেলাম। কোথায় কেবল

(১) শরৎচন্দ্রের অভিভাষণে ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সতর্কবাণী দ্রষ্টব্য।

(২) টাউনহলে শরৎচন্দ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনের ঠিক পিছনের দেওয়ালে পূর্ণচন্দ্রের ছবি অঙ্কিত ছিল।

ঠাকুরদেবতার কাছে মানিতেছি, শীঘ্র পৌঁছি—কোথায় বেহারা পাল্কী নামাইয়া হাঁটু উঁচু করিয়া ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল! কিন্তু ছিঃ স্ত্রীজাতি বড় আপনার বুঝে! আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা কাঁধে আমাকে বহিতেছে; আমি যাইতেছি ভরাযৌবনে (১) স্বামীসন্দর্শনে—তারা যাইতেছে খালিপেটে একমুঠা ভাতের সন্ধানে··· ধিক্ ভরাযৌবন! এই ভাবিতে ভাবিতে আমি ক্ষণেক পরে অনুভবে বুঝিলাম যে, লোকজন তফাৎ গিয়াছে।······

পাল্কীর অপরপার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থিত বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সেদিকের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম, কে একজন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য।······দেখিতে দেখিতে আর একজন, আবার একজন। এইরূপ চারিজন প্রায় এককালেই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পাল্কী কাঁধে করিয়া উঠাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা 'কোন্ হায়—কোন্ হায়রে?' রব তুলিয়া···দৌড়িল। তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যুহস্তে পড়িয়াছি। তখন আর লজ্জায় কি করে? পাল্কীর উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। আমি লাফাইয়া পড়িয়া পলাইব মনে করিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের সকল লোক অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পাল্কীর পিছনে দৌড়াইল।······লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। নিতান্ত হতাশাস হইয়া মনে করিলাম লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যেরূপ দ্রুতবেগে যাইতেছিল—তাহাতে পাল্কী হইতে নামিলে আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

(১) বরত-বন্দনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য।

বিশেষতঃ একজন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া বলিল যে, 'নামিবি ত মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।' সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।......"

বন্ধুগণ, শরচ্চন্দ্রের উপর গতকল্য অপরাহ্নে যে আক্রমণ হইয়াছিল তাহা এবম্প্রকারই বটে, হয়তো বা অধিকতর রোমাঞ্চকর। আমার বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহায্য লইতে হইল, ইন্দিরার কালাদীঘির ডাকাতির মত তিনিও ডাকাতের হস্তে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইয়াছেন।

এইবার আয়োজনের বর্ণনা করিব। কিন্তু কেমন করিয়া করিব? এই অনুষ্ঠানের বিরাটত্ব আমাকে মূক করিয়াছে, বধির করিয়াছে, অন্ধ করিয়াছে, আমি ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ম্যুনিসিপাল মার্কেটে চ্যাটার্জ্জি কোম্পানীর ফুলের ষ্টল আমি দেখিয়াছি, সিঁড়ির উপর ধাপে ধাপে মেয়েদের বসিয়া থাকিতেও প্রায়শঃই দেখিতে পাই, আমাদের ষষ্ঠীদাদা একজনকে আশী গজ শালু কিনিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং শালুও জানি, কিন্তু মোটমাট এমন একটা ব্যাপার, এমন একটা টোট্যাল এফেক্ট—ক্বচিৎ কদাচিৎ দুই একটা বিলাতি চলচ্চিত্রে দেখিতে পাই। আমি কিছুই শুনিতে পাইতেছি না—হংসবলাকার ঝঞ্ঝা-মদরসমত্ত পক্ষগুঞ্জন আমি শুনিয়াছি, দক্ষিণেশ্বরের কাছে গঙ্গার কল-কল্লোল শুনিয়াছি, কিন্তু সেই স্ত্রী-পুরুষ জনতার কলগুঞ্জন! আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, সন্ধ্যাকাশের বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়াছি, হল এণ্ড এণ্ডারসনের দোকান দেখিয়াছি, যাদুঘর দেখিয়াছি, আর রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীও দেখিয়াছি কিন্তু একধারে সারি সারি বালিকা, কিশোরী, তরুণী, যুবতী ও প্রৌঢ়ার সমাবেশ এবং অন্যধারে ধুতি, চাদর, কোট, মের্জ্জাই শোভিত তরুণ ও প্রৌঢ়ের এমন জীবন্ত শোভা—হরি হরি, আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব! সেই বলি-বলি-

বলিতে-পারি-না সভার—স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করিতেছি, তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম আমার স্কন্ধে ভর করুক!

কোথা হইতে সুরু করিব? গবর্ণমেণ্ট প্যালেস হইতে? কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন, প্রাচীরগাত্রে বিজ্ঞাপন, নিমন্ত্রণপত্র, প্রবেশপত্র কয়দিন ধরিয়া দেখিতেছিলাম, গুরুগুরু কম্পিত হৃদয়ে গবর্ণমেণ্ট প্যালেসের ধারে আসিয়া বাস হইতে অবতরণ করিলাম। কাতারে কাতারে সকলে চলিয়াছেন, মোটরে, ট্যাক্সিতে জোড়ে জোড়ে—পায়ে হাঁটিয়া তীর্থযাত্রী সাধুর দল! নীল লাল সবুজ হলদে সাড়ীর রঙে চক্ষু ধাঁধিয়া গেল—টাউনহলের গেটে আসিয়া পৌঁছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়িল; বাহিরের প্রাঙ্গণে চাঁদোয়া নাই, কিন্তু পানের দোকান বসিয়াছে; ভলাণ্টীয়ারদের কাঁধে কাঁধে সেই সিল্ক ব্যাজ—হাওয়ায় উড়িতেছে। আদিপর্ব্বে একবার প্রবেশপত্র দেখাইতে হইল—'দেখি মশাই!' দেখাইলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন অনুভব হইল হাস্যমুখ উৎসাহী ভলাণ্টীয়ারদের পিছনে পিছনে, চন্দ্রের পিছনে রাহুর মত, কায়ার পিছনে ছায়ার মত, ম্লানমুখ খদ্দরপরিহিত এক একজন যুবক; 'শেম শেম' এই কথাটা যেন তাহাদের মুখে লেখা রহিয়াছে, গতিক সুবিধার মনে হইল না। ওস্তাদজী সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাকে বলিলাম—বোধ হইতেছে সায়েস্তাখাঁর রাজ্যে শিবাজী পরিচালিত বরযাত্রের দল। তারপর সভাপর্ব্ব—তরুণীগুচ্ছলাঞ্ছিত মোটর আর ট্যাক্সিতে প্রাঙ্গণ মুখর, এক কোণে একদল পুলিশ এবং সভাপর্ব্বের ঠিক মুখে একপার্শ্বে মহাব্যস্ত সিল্কব্যাজ-শোভিত ভলাণ্টীয়ারদল, অন্যপাশে জনতার সঙ্গে মিশিয়া তাহারা—চন্দ্রালোকিত আকাশে কালো মেঘ।

'টিকিট স্যার?' টিকিট দেখাইয়া প্রবেশ করিলাম, টাউনহলের

গাড়ীবারান্দা, তারপর সিঁড়ি, সিঁড়ির মুখে অরণ্যপর্ব্ব, জনারণ্য। 'টিকিট স্যার?' এবারে প্রবেশপত্র হাতেই রাখিলাম। তারপর দালান, দালানের একটি দরজা পার হইলেই নীচের হল—দুধারে সিঁড়ি। 'এইদিকে এইদিকে, টিকিট্ স্যার?' টিকিট পকেটে পূরিতে না পূরিতেই দেখি আমাদের গিরিজাদাদা ও নরেনদা; বুঝিলাম, একটা অঘটন নিশ্চয়ই ঘটিবে। হাসিহাসি মুখে গিরিজাদাদার অভ্যর্থনা শেষ হইতে না হইতেই—

স্বর্গের সিঁড়ি, নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত শালুমণ্ডিত। প্রত্যেক ধাপের দুইধারে দুইজন বালিকা, এলাইয়া লতাইয়া বসিয়া আছে। প্রত্যেকের হাতে লীলাকমল—শ্বেতপদ্ম। 'মুগ্ধ বিস্ময়ে' চাহিয়া রহিলাম। পিছনের জনতা পিছনে ঠ্যালা মারিল, মনে হইল সশরীরে স্বর্গে উঠিতেছি। সিরাজউদ্দৌলাকে মনে পড়িল। সিরাজউদ্দৌলার সময় কি শালু ছিল?

পা চলে চলে চলে না, চলিবে কেমন করিয়া? পিছনে আকর্ষণ, সম্মুখে আকর্ষণ, টারবাইনের মত পাক খাইবার বাসনা জন্মিল কিন্তু চাপিয়া গেলাম, অসংখ্য চেনা লোক, তাছাড়া পিছনের ধাক্কা। সিঁড়ি ছাড়িয়া দোতালার হলঘরে উঠিতেই দেখিলাম—আহা কি দেখিলাম, আমি কেমন করিয়া বলিব কি দেখিলাম? একমুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলাম—ডি, এল, রায়ই জাতীয় কবি—ধনধান্যে পুষ্পে ভরাই বটে—গান্ধী উপবাস করিয়া মরিতেছে কেন?

কি দেখিলাম? বন্ধুগণ, আমার এই কেমন দোষ, বঙ্কিমচন্দ্রকে ভুলিতে পারিতেছি না। দেখিলাম দেবীচৌধুরাণীর বজরা। আমি ব্রজেশ্বর।—কিন্তু গণিয়া দেখি নাই। কর্ত্তৃপক্ষের একজন বলিলেন, 'তনশত পঁচাত্তর। বেশী তো কম নয়। ছোট বড় মাঝারি।

একদিকে ফুলের বাগান, অন্যদিকে আস্‌শ্যাওড়ার ঝোপ; সমস্ত সভাটি হরগৌরী সাজিয়া বসিয়া আছে। পিছনে দূরে নন্দীভৃঙ্গীর দল—মাঝে মাঝে বোম্‌ (বন্দেমাতরং) বোম্‌ বলিয়া হাঁকিয়া উঠিতেছিল। ফুলবাগান ও আস্‌শ্যাওড়ার জঙ্গলের মাঝ দিয়া সরু পথ; কর্ম্মকর্ত্তারা ও কর্ত্রীঠাকরুণ এই পথেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে ছোটাছুটি করিতেছেন। এই সরুপথ ধরিয়া নাকবরাবর গেলেই একটি উচ্চ কাষ্ঠমঞ্চ—তাহার উপর দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি সিংহাসন, তোষকে গদিতে তুল্‌তুল্‌ করিতেছে, সিল্কের আস্তরণ, সিল্কের বালিশ তাকিয়া, আস্‌লি ফুল এবং তাহারই পিছনের দেওয়ালে যেন নীল আকাশের গায়ে, একটি সুবৃহৎ পূর্ণচন্দ্র অঙ্কিত। সিংহাসনের দুইপাশে মঞ্চের উপরে দুইধারে সমানভাবে ভাগাভাগি হইয়া—ভগবান যেন ফরমায়েশ দিয়া তাঁহাদের গড়িয়া পাঠাইয়াছেন, শাড়ী ব্লাউজএর রঙ পর্য্যন্ত মিলাইয়া—বাছা বাছা ডজন দুই করিয়া এবং ইঁহাদেরই পাদমূলে বুড়াশিব শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে ধৌত করিয়া আমাদের বাল্‌সে তরুণের দল কুলু কুলু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। যেদিকটায় জাহানারা, বীরবল সেইদিকেই বসিয়াছিলেন, বসিয়া বসিয়া হাসিতেছিলেন, হাসিতে হাসিতে চুরুট ফুঁকিতেছিলেন। সমস্ত অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্বরূপা শ্রীযুক্তা লতিকা বসু মঞ্চের উপর ঘন ঘন আবর্ত্তিত হইতেছিলেন, কখনও রামের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, কখনও শ্যামের নাকের নীচে হাত নাড়িয়া, এই মহীয়সী মহিলা একাই ঝড়বৃষ্টিবজ্রপাতের সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে বক্ষসংলগ্ন সেপ্‌টিপিনে হাত বুলাইতেছিলেন। শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় ছুটিতেছিলেন, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ছুটিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ছুটিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মঞ্চের ঠিক সম্মুখেই বসিয়াছিলেন

লতিকাদেবীরই বিপরীতরূপিণী শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। এটা ওটা করিবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে মঞ্চের উপরও উদিত হইতেছিলেন—ঠিক যেন আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণের স্নিগ্ধ তুলসীতরু—তাঁহার পরনের চওড়া দগদগে লালাপাড় সাড়ী অকুস্থলে সমাগত যাবতীয় কুমারী ও বিধবাগণের বক্ষে চমক তুলিয়া যাইতেছিল। হলের দুইপাশের বারান্দার একটিতে মেয়েরা ও অন্যদিকে পুরুষেরা ঘুরিয়া বেড়াইবার অবসরে পরস্পর কুশল-সম্ভাষণ করিতেছিলেন। সে সম্ভাষণের রূপ স্বতন্ত্র, অনুচ্চারিত হুঁ হুঁ, দেখেছ আমার সাড়ীটা, ম্যাকেঞ্জি লায়ালের সেলে কেনা, নয়নজোড়ের রাজকুমারীর সাড়ী এটা—মাগো মা, এই প্যাটার্ণের হার নাকি আজকাল কেউ পরে! অথবা ওরে বাপরে, অচিন্ত্যকে ছাখ, একেবারে প্রমথ চৌধুরীর ঘাড়ে হাত দিয়ে বসেছে, যেন ইয়ার!—হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেচিস মাইরি—থার্ড ফ্রম দি লেফ্‌ট্‌, মার্ভেলাস্ না!

দেখিতে দেখিতে সময় হইয়া আসিল, রবীন্দ্রনাথ আসিবেন না পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল—চারিদিকের চাঞ্চল্য দ্বিগুণ হইয়া উঠিল, সভার গম্‌গমে থম্‌থমে ভাব যেন অকস্মাৎ বাড়িয়া গেল, সকলেই উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন,—শাঁখ বাজিবে, হুলুধ্বনি হইবে, মাল্যচন্দনে সুশোভিত শরৎচন্দ্র—

কোনও একটা বায়োস্কোপের দল ক্যামেরা লইয়া হাজির ছিল—ছবি তোলার অজুহাতে তাহারা সন্ধানী-আলোর মত একটা তীব্র আলোক সিংহাসনের দুই পাশের মঞ্চের উপর ফেলিয়া, ফোকাস করিয়া দর্শকদের ধন্যবাদভাজন হইতেছিল; কখনও কুমারী চৌধুরীর কানের দুলে, কখনও চৌধুরীজীর প্রশস্ত ললাটে, কভুবা অচিন্ত্যকুমারের

বিকশিত দন্তপংক্তিতে প্রতিফলিত হইয়া সেই আলোক বহুবিধ বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি করিতেছিল।

আরও দুই মিনিট—বর্ষণারম্ভের ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যেন—হলে লোক আর ধরে না। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ও 'ওই আস্‌ছেন ওই আস্‌ছেন' রব, সন্ত্রস্ত হইয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। হৃদয় আশায় উদ্বেল—আমাদেরই একজন তো এই রাজসম্মান লাভ করিতেছেন, যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর লোক নয়, হরিপুরের চৌধুরীবংশও নহে। এ এক বিচিত্র অভাবিত ব্যাপার, বিড়ালের ভাগ্যেও তাহা হইলে শিকা ছিঁড়িয়া থাকে!

হঠাৎ যেন একটা দমকা ঘূর্ণীহাওয়া বহিয়া গেল, খবর আসিল শরৎচন্দ্র আসিবেন না, তাঁহাকে আসিতে দেওয়া হইতেছে না—বাহিরের সেই কালো ছায়ার দল তাঁহাকে লইয়া উধাও হইয়াছে। পুলিশ ডাকিয়াও কোনও কাজ হয় নাই।—লতিকা বসু চঞ্চল হইয়া লাট্টুর মত পাক খাইতে লাগিলেন, নির্ম্মলচন্দ্র ছুটিতে লাগিলেন, বিধান রায় ছুটিতে সুরু করিলেন, কিরণশঙ্কর রায় ছুটিলেন—অবনী রায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ ঘোষাল ও নাম-না-জানা ভলাণ্টীয়ারগণ মহরমে হাসানহোসেনী বীরেদের মত হাঁপাইতে লাগিলেন। নির্ম্মলচন্দ্র নিক্ষিপ্ত, বিধান রায় বিক্ষিপ্ত, মনীন্দ্রনাথ রায়কে চিনিতে পারি নাই, শুনিলাম তিনিও নাকি উৎক্ষিপ্ত হইয়া বলিতেছেন—শরৎচন্দ্র না আসুন, তাঁহার বন্দনা হইবেই। ফটো রাখিয়াও এই কার্য্য করিতে হইবে। জেদীলোক সব, আমাদের আশা হইল। এই সময়ে নরেশচন্দ্রের গোঁফজোড়াও যেন চকিতের মত দৃষ্ট হইল, জলধর দাদা ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়া এক চেয়ার হইতে অন্য চেয়ারে স্থান পরিবর্ত্তন করিলেন, শুধু নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত নট্ নড়ন চড়ন্

ঠকাস মার্বেল হইয়া বসিয়া রহিলেন উত্তরা-সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

তারপর কেমন যেন সব তালগোল পাকাইয়া গেল, নীচে ঘন ঘন বন্দেমাতরং ধ্বনি—ভিতরে হলের পিছনে উপবিষ্ট লোকদের মধ্যেও তাহার তরঙ্গ আসিয়া লাগিল, তারপর একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল—ঘন ঘন হুইস্‌লধ্বনি; ভলান্টীয়ার্স ফল্ ইন্—মেয়েরা এদিকে চলে আসুন—কোনও ভয় নাই···ইত্যাদি। তারপর কি যে হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, ছোটাছুটি দৌড়ধাপ—ইট ছুড়ছে, রক্ত দেখছেন—ওইদিকে—ইত্যাদি শুনিতে শুনিতে প্রত্যেকে যতটা পারি নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হইল।

আধঘণ্টার মধ্যেই সব চুপচাপ, সতর্কভাবে নীচে অবতরণ করিয়া সমবেত জনতার 'শেম শেম' ধ্বনি শুনিতে শুনিতে নতমস্তকে বাহিরে আসিলাম এবং ওস্তাদজীকে সঙ্গে লইয়া সটান উটরামঘাটে গিয়া সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে বহুবিধ গবেষণা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

বন্ধুগণ, শরৎ-বেদনার ইহাই যথার্থ বিবরণী। দিনেদুপুরে সহরের বুকের উপর এই যে কুৎসিৎ কাণ্ডটি ঘটিল ইহার জন্য দায়ী—

হাবলু বলিয়া উঠিল—দায়ী তুমি এবং তোমার মত নিরেট শরৎ-ভক্তেরা যাহারা কৌশলে এই বিপদ এড়াইতে পারিল না। অমল হোম থাকিলে এই ব্যাপার যে ঘটিত না তাহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। তা'ছাড়া শরৎ-বন্দনার জন্য তোমরা যখন এতটাই উদ্বিগ্ন ছিলে—গায়ের জোর ছিল না তোমাদের?

শচীন ঘর্ম্মাক্তকলেবরে এতক্ষণে আসন গ্রহণ করিয়াছে, হাসিতে হাসিতে বলিল, বাপরে, কে যাবে তার মধ্যে মাথা গলাতে? শুনলাম—

বিধান রায়, নির্ম্মলচন্দ্র, নরেন্দ্র দেব সকলেই অপমানিত হয়েছেন—তাঁদের ওস্তাদীই যখন খাটল না তখন—তাছাড়া বর্ত্তমানে 'চাচা আপন বাঁচা'ই হচ্ছে পলিসি।

হারানিধি প্রশ্ন করিল, আচ্ছা শচীন, শরচ্চন্দ্রের মনের অবস্থাটা কি বল্‌তে পার?

শচীন বলিল, পারি না আবার, খুব পারি। ইন্দিরার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া আটকাতে পেরেছিল ডাকাতরা? দেখো তুমি, ব্রাহ্মণ শেষ পর্য্যন্ত বন্দনা নেবেনই। শুনলাম কালই তাঁর চোখ ফেটে জল বের হয়েছিল। হবার কথাই, চায়ের পেয়ালা মুখের কাছ পর্য্যন্ত তুলে নামিয়ে রাখতে হল হে।

অহিংস ললিত একটা প্রগাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কিন্তু ভদ্রলোক চালাক হ'লে কি নামটাই করতে পারতেন! মানুষের তৃতীয় রিপুটা যে এতো মারাত্মক হয় তা'তো ভাবতে পারিনি।

আপিসের তাড়ায় সেদিনের সভা ভঙ্গ হইল।

*

সুরেশ। তাহলে শচীনের কথাই ঠিক হ'ল, শেষ অবধি কণ্ঠীবদল পর্য্যন্ত গড়াল। 'দেনাপাওনার' দুর্গাদাসের জীবানন্দ দেখেছ?

বসন্ত। কিন্তু এতখানি লোভ যাঁর মধ্যে তাঁর অভিভাষণটা পড়ে দেখ—

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে

আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে। সংসার সৌন্দর্য্যসম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি, আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা মালতী জাতি যুথী, আনে গন্ধব্যাকুল দক্ষিণা পবন,...ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটল না।"

বসন্ত বলিল—

এই দুর্দ্দিনে দক্ষিণাপবন, মল্লিকা মালতী জাতি যুথীর লোভে যিনি দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছেন তাঁর মুখে উৎপীড়িত মানুষের, বঞ্চিতের কথা রবীন্দ্রনাথের দুর্গতদের দুঃখহরণের চাইতেও নিষ্ঠুর শোনায়। শুনলাম শরৎ-বন্দনায় ২৮০০৲ টাকা খরচ হয়েছে। বর্ত্তমানে সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত শরচ্চন্দ্র এই ২৮০০৲ টাকার মূল্য বুঝবেন না জানি কিন্তু যিনি বঞ্চিতদের কথা লিখেছেন বলে আজও বড়াই করছেন তাঁর পক্ষে তাঁর নামে এই অপব্যয় ঘটতে দেওয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ—পাপ। যা খুসী করুন তোমাদের শরচ্চন্দ্র—বঞ্চিতদের, উৎপীড়িতদের নিয়ে এই উৎকট রসিকতা কর্ব্বার অধিকার তাঁকে কে দিলে? লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, বেদনাবোধ পর্য্যন্ত নাই। ভারতবর্ষের এমন দুর্দ্দিন কখনও আসে নি—এই দুর্দ্দিনেই হতভাগ্য বাংলাদেশের একজন সাহিত্যস্রষ্টা এমনই হৃদয়হীন হতে পারলেন!—তুমি আমি হয়তো এ কথা ভুলে যাব কিন্তু ইতিহাস এ কথা ভুলবে বলে তো মনে হয় না।

হারানিধি। তোমার বাপু সবতাতেই বাড়াবাড়ি—তুমি আমি সকলেই যখন নিশ্চিন্তমনে এই দিনে খাওয়া দাওয়া কর্চ্ছি শরচ্চন্দ্র

না হয় একটু অতিরিক্ত কিছুই করলেন। তিনিও মানুষ তো, তিনিও তো এতকাল নানা ভাল ভাল জিনিষ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে এসেছেন, তা'ছাড়া রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তিনি এমন করলেনই বা কি ?

যতীন। সে কথা ঠিক। শুনলাম শরৎ-বেদনার পরের দিনই নাকি শরচ্চন্দ্র দুঃখ করে বলেছেন, বামুনের ভাগ্যে এ সইবে কেন, পীরিলি হলে সইত। ভদ্রলোকের অবস্থা সত্যিই বড় করুণ হয়ে উঠেছিল, হয়তো হার্টফেল করেই মারা যেতেন। শেষ পর্য্যন্ত বন্দনা হয়ে ভালই হয়েছে। শরচ্চন্দ্র মারা যান এটা তো আর কেউ চায় না।

বসন্ত। শরচ্চন্দ্রকে নিছক সাহিত্যিক হিসেবে যদি দেখতে পারতাম তাহলে সান্ত্বনা থাকৃত। তিনি যে দেশের নামে অনেক কিছুই করেছেন !

ললিত। ছাই করেছেন ! গান্ধীজীর ছাগলদুধ খাওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছাড়া আর কিছু করেছেন বলে তো আমি জানি না।

হারানিধি। আরে রেখে দাও তোমাদের বাজে কথা। এই দুর্দ্দিনে পাটের কথা ভাব, চড় চড় করে পাটের দর নাম্‌ছে—দেশের যে কি দুর্গতি হবে কল্পনা করতে পার ?

পঞ্চা। পারি না আবার ? আফিমের দর চড়বে। তাহলেই তো বিপদ !

হাব্‌লু। কিন্তু চায়ের দর কি চড়েছে বসন্তদা ? আমাদের তাড়ানোরই যদি মতলব হয়ে থাকে স্পষ্ট বলে দাও; শরচ্চন্দ্রের ওজুহাতে গম্ভীর হয়ে চায়ের পাটটা তুলে দেওয়া হচ্ছে এটা কি আর বুঝছি না ?

খাইবার পাসে প্রলম্বিত পর্দ্দা নড়িয়া উঠিল। রামধনিয়া গলা বাড়াইয়া প্রশ্ন করিল—ক' কাপ্‌ বাবু !

সংবাদ-সাহিত্য

কলিকাতার 'প্রবাহ' ঢাকায় পৌছিয়া 'আবর্ত্তের' সৃষ্টি করিয়াছ। পঙ্কিল আবর্ত্ত! এদিকে কলিকাতায় 'জোয়ার' আসিয়া 'প্রলয়' ঘটাইল বলিয়া!

—আবর্ত্ত-সাহিত্যসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র আই-ই-এস—ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলি ইতি খ্যাত। সভাপতি বলিতেছেন—

"আর আমরা? কত কেন্দ্রের চতুঃপার্শ্বে বিচরণ করছি। কাহারও জীবনে বহুকেন্দ্র; কাহারও বা এক।" অর্থাৎ আবর্ত্তসাহিত্যসভার ব্রাহ্ম-মুসলমান সদস্য ও হিন্দু সদস্য দুইই আছে কিন্তু বিচরণ তো নয়, 'কিলবিল করছি' বলিলেই ঠিক হইত।

"এই মন্থনেই অমৃতের উৎপত্তি, গরলের উদ্‌ভব। প্রতি জীবনেই একএকটি 'মন্দর'কে অবলম্বন করে সুরাসুরের মন্থলীলা চলচে।"

সুরাসুর? না, সুরাশূর!

—

মন্থনশেষে কিরূপ অমৃত উঠিয়াছে পাঠকের তাহা জানিবার বাসনা হইতে পারে। প্রথম কবিতা 'সাধারণ'—শ্রীবিষ্ণু দে তাঁহার প্রিয়া 'নারী মাত্র' এবং 'পৃথিবীরই মেয়ে' একজন সম্পর্কে একটি তথ্য নিবেদন করিয়াছেন—সেই মেয়েটি 'স্বার্থ আর প্রত্যহের জীবক্রিয়া জানে শুধু'। 'প্রত্যহের জীবক্রিয়া'—শ্রীবিষ্ণু শক্তিমান পুরুষ!

নীহাররঞ্জন ঘোষালের 'অদল-বদল'—"রমণাটা একেবারে ভিজে গেছে।...রমণার রগে রগে বৃষ্টি ঢুকে..."ক্রমশঃ। 'অশুভ-কি-শুভদিন' কবিতা শ্রীসুধীর সরকারের।

তুমি আমি জ্যোছনাতে বসে পাশাপাশি।
বক্ষে মোর অতৃপ্ত সুধা—জর জর দেহ তৃষাতুর
নিঃশেষ ভোগের তরে........................
দেহগন্ধ, কেশগন্ধ ইন্ধন যোগ্য কাম-অনলে।
কী জানি কি ভাবান্তর—দাঁড়াইলে সম্মুখে আমার।
স্তনদ্বয় বস্ত্র-নিষেধ উপেক্ষিলো বিদ্রোহ-ভরে।
....
সর্ব্ব সঙ্গ পরশ-পাগল, মম সর্ব্ব অঙ্গ তরে।
ভোগ-উন্মাদনায় তব তনুলতা চাপি বক্ষ'পরে
কামকলঙ্করেখা আঁকি দিনু বক্ষে, অধরে, **অঙ্গে**।
আদি-অন্তহীন চরম তৃপ্তি লভেছিনু ক্ষণতরে,
স্বর্গ-জ্যোতি জ্বলেছিলো দুই দীপ্ত নয়নে রঙ্গে।
সুখমুগ্ধ চাহিলাম পুনঃ প্রেম—তব দেহখানি;
দেখালে অসংখ্য বাধা, শতবিঘ্ন, অখণ্ড বিধান
সরমে—নয় ঘৃণায় পালাইলে দূরে সাবধানী—
প্রেম মোর বৃথা কেঁদে মরে—নাহি দিলে স্থান।

প্রেমই বটে! কিন্তু মেয়েটিরও অন্যায়, অমন অবস্থায় 'অখণ্ড বিধানের' কথা তোলা বা সাবধানী হওয়া গাছে তুলিয়া মই কাড়িয়া লওয়ার চাইতেও নিষ্ঠুর, এমনই যদি মতলব ছিল 'পরশপাগল সর্ব্ব অঙ্গ' আগাইয়া দেওয়া ঠিক হয় নাই।

কিন্তু ইহাই শেষ নয়, আবর্ত্তে আরও অনেক মাল আছে!

অতি-আধুনিক সাহিত্যের প্রভাব বাংলার সমাজকেও যে নাড়া দিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ সঞ্জীবনীর এতদিনকার এত আন্দোলন বিফলে যাইতেছে, প্রবাসীসম্পাদক মহাশয় সাবধান হইয়াছেন। সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া না চলিলে যে বিপদের আশঙ্কা আছে সকলেই ইহা অনুভব করিতেছেন।

প্রতিকার শুধু বিরুদ্ধ সমালোচনার দ্বারা হয় না, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দ্বারা যে অধিক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে! এরূপ একটি প্রমাণ আমরা হাওড়া হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'শক্তি' হইতে (২৪শে সেপ্টেম্বর) উদ্ধৃত করিতেছি।

"বরের বাট্না বাটা

(সত্য ঘটনা)

হাওড়া সালিখা নিবাসী নব্য তন্ত্রের জনৈক পাত্রের পিতা, পাত্রী দেখিবার সময় পাত্রীকে প্রশ্ন করেন, "কেমন মা, গান্‌টান্ গাইতে পার ত? নাচ্ টাচ্ আসে ত?" পাত্রীর পিতা সেকেলে প্রাচীনপন্থী, সুতরাং উক্ত প্রশ্ন শুনিয়াই মনে মনে ভীষণ চটিয়া প্রকাশ্যতঃ পাত্রীর পক্ষে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, একালের চালচলন সমস্তই মায়ের আমার রপ্ত আছে। নাচ গান বেশ ভালই শিখিয়েছি, তবে আজ ক' দিন হ'ল শরীরটা মায়ের আমার অসুস্থ, সর্দ্দি কাশীতে আওয়াজটাও ক' দিনে বন্ধ হয়ে পড়েছে, কাজেই আজ ত আপনাদের কোনও কিছুই দেখাতে বা শোনাতে পার্চ্ছি না। তা পাত্র বাবাজী হাল ফ্যাসান অনুযায়ী যেদিন নিজে পাত্রী দেখতে আসবেন সেই দিনই মায়ের আমার নাচগান দেখিয়ে শুনিয়ে দোব।"

উত্তর শুনিয়া পাত্রের পিতা সেদিনকার মত নিরস্ত হইলেন, পাত্রীর পিতাও পাত্র দেখিবার দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। পাত্র দেখিতে যাইয়া পাত্রীর পিতা পাত্রকে প্রশ্ন করিলেন, "বাবাজীর কি এবার বি-এ পাশ করা হয়েছে?" সস্মিতভাবে পাত্র উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এইবার বি-এল দিয়ে ওকালতি কর্ব্বার মনস্থ করেছি।" পাত্রীর পিতা সোল্লাসে বলিলেন, "তা বেশ বেশ! তা বাবাজীর বাটনা-টাটনা বাটা, রান্নাবান্না, বাসন কোসন মাজা—এসব আসে ত?" বলা বাহুল্য যে পাত্রের পিতা সম্মুখেই উপস্থিত ছিলেন। পাত্রীর পিতার এবম্বিধ বিসদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি মহাশয়, পাত্রের বাটনা বাটা কুটনো কোটা, রান্নাবান্না ইত্যাদি জানার কি দরকার?" হাসিয়া পাত্রীর পিতা স্বীয় অন্তরস্থ হলাহল উদ্গীরণ করিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ, দরকার নয়? বাবাজীবন ত এই সবে বি-এল দিয়ে ওকালতী কর্ব্বার মনস্থ করেছেন। এখনও বি-এল একজামিনে পাশ হতে হবে, তবে ওকালতি, তারপর পসার বা অবস্থার উন্নতি! তা অবস্থার গতিকে যতদিন না বাবা-জীবন ঝি চাকর, রাঁধুনি প্রভৃতি রাখতে পারেন (বাবাজীবন নব্য-তন্ত্রী, বাপের পয়সায় নিশ্চয়ই পরিবার প্রতিপালন করবেন না!), ততদিন ত আর পাত্রীর নাচগান ওঁর বাড়ীতে বন্ধ থাকবে না! পাত্রী নিত্য নিয়মিত নাচতে গাইতে থাকবেন। সুতরাং সে অবস্থায় বাবাজীকেই ত রান্নাবাড়া বাটনাবাটা কুটনো কোটা ইত্যাদি কর্ত্তে হবে।" কথা শুনিয়া পাত্রের পিতা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, অগত্যা পাত্র উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না, বাটনাবাটা কুটনো কোটা রান্নাবান্না আমার মোটেই জানা নেই।" পাত্রীর পিতা প্রত্যুত্তরে পাত্রকে অবাধে বলিয়া বসিলেন, "তবে নাচগানওলা আমার মেয়ের সঙ্গে

তোমার বিয়েও আমি দিতে পারব না বাপু!" বলিয়াই ক্রোধে ত্বরাগতি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

ঘটনাটি প্রকৃত; নামোল্লেখে নানা বিড়ম্বনার জন্ম হইতে পারে আশঙ্কায় নামধাম গোপন রাখিয়া ঘটনাটিরই উল্লেখ করিলাম। দিনকাল যেরূপ পড়িয়াছে তাহাতে প্রাচীনপন্থী বনাম নব্যতন্ত্রীর ঘর্ষণে অনেক কিছু বিড়ম্বনার জন্ম হওয়াই একালে স্বাভাবিক।"

—

এরূপ বিড়ম্বনা ঢাকাতেও ঘটিয়াছে। উপরি-উল্লিখিত আবর্ত্ত-সাহিত্যসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়কে সাধারণে ভুল করিয়া তরুণ ও নব্যপন্থী বলিয়া জানে। অবশ্য সাধারণের দোষ নাই। কাগজে লেখা ছাপা হইলে লোকে লেখাটাই দেখিতে পায়, লেখকের টাক আছে কিনা, লাম্বেগোয় তিনি শয্যাশায়ী হইয়া থাকেন কিনা তাহাদের এসব জানিবার জো নাই। মোহান্ধ মৈত্র মহাশয়ও এতকাল ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলিটি ঢাকিয়া ঢুকিয়া চলিতেছিলেন। আবর্ত্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কালে তাঁহার এই মনোভাবই ছিল, হঠাৎ আবর্ত্তের তারুণ্যের মাত্রা অত্যধিক হইয়া পড়াতে নব্যপন্থী এই প্রাচীন ব্যক্তিটি শঙ্কিত হইয়া 'সড়া অণ্ডা' বলিয়া ফেলিয়াছেন। 'ইষ্ট বেঙ্গল টাইম্‌সে' এক পত্র লিখিয়া ইনি 'আবর্ত্তে'র সহিত সকল সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যে সকল সাহিত্যিক তৃতীয় পক্ষ লইয়া কারবার করিতেছেন তাঁহাদেরও সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে।

—

আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে তুলনায় বাংলার তরুণীরা তরুণদের চাইতে তারুণ্যে অনেকখানি পিছাইয়া আছেন—তরুণেরা তাঁহাদিগকে যেভাবেই চিত্রিত করুক না, আসলে তাঁহারাই এখনো

মিডিভাল ; অন্ততঃ তাঁহাদের লেখা পড়িয়া এইরূপই মনে হয়। অবশ্য নবশক্তি নামক সাপ্তাহিকে কল্পিত নারীর নামে পুরুষেরা যে সকল গরম মশলা পাচার করিয়া থাকেন আমরা তাহা গণনায় আনিতেছি না। কিন্তু শ্রীঅমলা দেবীর 'মা' গল্পটি পড়িয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইল যে আমরা ভুল করিয়াছিলাম।

গল্পটি হয়তো লেখিকার নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লেখা, কিন্তু হইলে কি হয়, স্ত্রীলোকের কলমে এতখানি কদর্য্যতা প্রচার বাংলা দেশের পক্ষে বিচিত্র বটে। কালে কালে আরও অনেক কিছু হইবে। স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া আমরা শুধু উদ্ধৃতই করিব, কোনও মন্তব্য করিব না।

(১) সবাই বলে মা! মায়েরও মা ছিলেন তিনি ডাকতেন মহাকালী বলে। অনেকগুলি ছেয়েমেয়ে……ঘরে জানালার কাছে মহাকালীর বিধবা কন্যা অনঙ্গমোহিনী দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল, মহাকালী পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সে ফিরে দাঁড়াল। তিনি অধিক বাক্যব্যয় না করেই গালের উপর একটা হাতের খোঁচা মেরে বল্লেন—"আঃ মর।" বলেই বাইরের দিকে চাইতেই পাশের বাড়ীর উমাপদকে তাদের বাগানে পায়চারী করতে দেখা গেল। মহাকালী জ্বলে উঠলেন—"হারামজাদী—ওকে দেখবার জন্যে ছুক ছুক করে ছুটে এসে জানালায় দাঁড়িয়েছিস। নিলজ্জের একখানি! বলি ভাতার আছে? আজ যদি একটা কিছু ফ্যাসাদ বাধে ত ঢাকবি কি করে লা? একটু ভয় ডর নেই।"

---

(২) সতীশ মহাকালীর ছোর্ট ছেলে।

ছোট বৌর ভাইঝির বিয়ে। ভাই নিতে এল, ছোট বৌ বাপের বাড়ী গেল। তার দিন কয়েক পরেই সতীশের জ্বর হ'ল। রাত্রে মহাকালী শান্তর (বাড়ীর ঝি—'বয়স উনিশ কুড়ি হবে, দেখতে বেশ সুশ্রী, খুব ফিটফাট।') খাওয়া দাওয়ার পর বল্লেন—"দেখ শান্ত, সতীশের আজ জ্বর, রাত্রে জলটল যদি চায় দিবি ;

বাতাস টাতাস করবি, তুই ঐ ঘরের মেঝেয় বিছানা করে শো, আমি এপাশের ঘরে শোব'খন মাঝে পরদা ফেলাই থাকে দরজাটা খুলে শোব।"

ঘরে সতীশ যন্ত্রণা সূচক স্বরে বল্লে,—উ মাঃ।"

মহাকালী ঘরে ঢুকে খাটের পা[illegible]াড়িয়ে জিজ্ঞেস কল্লেন—"কি কষ্ট হচ্ছে? হাত পা কামড়াচ্ছে?" সতীশ পাশ ফিরে শুয়ে বলে—'হুঁ, মাথাব্যথা করছে।"

"আলোটা নিভিয়ে দেব?"

"দাও।"

মহাকালী আলোটা নিভিয়ে বেরিয়ে এলেন, বাইরে শান্তমণি দাঁড়িয়েছিল, মহাকালী একটা চিমটি কেটে বল্লেন—"ওর মাথায় বড্ড কষ্ট হচ্ছে, তুই গিয়ে টিপে দে।" * * *

ফুটকিও লেখিকার।

—

অতি আধুনিক সাহিত্যিকের দুর্ব্বার কাম এবার ধরার দুলালীদের ছাড়িয়া প্রকৃতি-সতীকেও তাড়া করিয়াছে, আর রক্ষা নাই। ঋতু-বালারাও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—

আসঙ্গ-লালসা-ভরা কামার্ত্ত শ্রাবণ

তবু ভাল, এটা আশ্বিন!

—

আচ্ছা, আপনারা তো পাঁচজন আছেন, বাতায়ন-সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের চিকিৎসার ভার কেহ লইতে পারেন না? ভদ্রলোক তো দেখিতেছি একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন! অবশ্য সময়টা খারাপ—আশ্বিন কাবার হইলে আশঙ্কার কারণ না থাকিতেও পারে! তবু আপনাদের পাঁচজনকে খবরটা দিয়া রাখিলাম।

শরৎ-সপ্তাহে তাঁহার অপরিসীম বদান্যতার খবর আপনারা জানিতে পারিয়াছেন—তিনি যে কত মহৎ তাহা বোধ করি এখনও আপনাদের উপলব্ধি হয় নাই। হইবেই বা কি করিয়া,

আপনারা তো আর কিছু খবর রাখিবেন না! ঘরের অন্ধকারেই বসিয়া থাকিবেন, 'বাতায়ন' খুলিয়া কোনও দিন কিছু দেখেন? শরৎসংখ্যা 'বাতায়ন' দেখিয়াছেন? প্রথম পৃষ্ঠা খুলুন—পৃষ্ঠাটি দুইটি 'কলমে' বিভক্ত; বামে বাতায়ন-সম্পাদককে লিখিত শরচ্চন্দ্রের একটি পোষ্ট কার্ডের ব্লক ছাপা হইয়াছে; ডাহিনে, বাতায়ন সম্পাদক ও সহঃ সম্পাদক শরচ্চন্দ্রকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন।

আশ্চর্য্য, অবিনাশ ঘোষালকে আপনারা এখনও চিনিতে পারিলেন না! শরচ্চন্দ্র তাঁহাকে পোষ্টকার্ড লিখিয়াছেন—তাহাতে কি লেখা আছে জানেন? "অবিনাশ তোমার চিঠিটা খুঁজে পাচ্চি না এই জন্যে নবযুগ কার্য্যালয়ের ঠিকানায় এই পোষ্টকার্ড খানা পাঠাইলাম। আমি ত কখনো কোন বইয়ের ভূমিকা লিখিনি—ও আমি জানি তা ছাড়া অন্য দুই একটা লেখা নিয়ে আমি ব্যস্ত হয়ে আছি। পূজোর মধ্যে তোমাদের অনুরোধ কি করে পালন কোরব ভেবে পাইনে।" অবিনাশচন্দ্র কি কম লোক! এই চিঠি শরচ্চন্দ্র তাঁহাকে লিখিয়াছেন। ইহাতে বাংলা সাহিত্য-সেবীর জানিবার উপযুক্ত কত খবর! ১। অবিনাশচন্দ্র এত বড় যে শরচ্চন্দ্র তাঁহাকে পোষ্টকার্ড লেখেন। ২। শরচ্চন্দ্রের নিকট পত্র লিখিলে তাহা হারাইবার সম্ভাবনা আছে। ৩। অবিনাশচন্দ্র ভূতপূর্ব্ব নবযুগের কার্য্যালয়ে যাতায়াত করিতেন। ৪। শরচ্চন্দ্র কোন বইয়ের ভূমিকা কখনও লেখেন না ও লিখিতে জানেন না। ৫। শরচ্চন্দ্র লেখা লইয়া ব্যস্ত থাকেন। আরও একটি খবর আছে সেটি পোষ্ট-কার্ডের শিরোনামায় তারিখে, চিঠিটি ২২ শে ভাদ্র ১৩৩৪ সালে লিখিত, এখন ১৩৩৯ সালের আশ্বিন। অর্থাৎ উভয়ের পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ যে গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে পত্র-ব্যবহার নাই!

এত খবর ঘটা করিয়া প্রচার করারও আবশ্যকতা ছিল !

—

ডাহিনে লেখা আছে—'ঠিক এমনি একদিনে যেদিন ধরণীর আলোর সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় ঘটে, সেদিন নিজেকে প্রচার করবার কোন সম্পদই তোমার সঞ্চিত ছিল না।"

ছিল না নাকি ? জ্যেষ্ঠতাত অবিনাশচন্দ্র তখন কোথায় ছিলেন ?

—

আশ্বিনের পূর্ব্বাশার 'দুর্ব্বাসা' বিভাগে ভাদ্রের উত্তরায় প্রকাশিত কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। দুর্ব্বাসা বদ্‌মেজাজী হইলেও রসিক।

"ভাদ্রের উত্তরায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় পঞ্চাশটি গান পুনর্মুদ্রিত করিয়া কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব একটি জবর খবর দিতেছেন। কবিতাগুলি ভারি সুন্দর হইয়াছে, কবির প্রকৃতি বর্ণনার কৃতিত্ব অসাধারণ !

"বাস্তবিক, কাজী সাহেবের এই প্রশংসাটির অপেক্ষায়ই রবীন্দ্রনাথকে এতদিন বঙ্গদেশ বুঝিতে পারিতেছিল না !"

'আমাদের পাগলা জগাই দিলীপকুমার ও ডন কুইকসোটের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?' প্রশ্ন করিলেন গোপালদা। আমরা জবাব দিতে না পারিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছি গোপালদা বলিলে, 'হাঁদারা কোথাকার, ডনকুইক্‌সোট্ লড়েছিল উইণ্ডমিলের বিরুদ্ধে, জগাই লড়ছে ছন্দ-মিলের বিরুদ্ধে। দুজনেরই সমান উৎসাহ।"

আশ্বিনের পূর্ব্বাশায় দিলীপকুমারের 'ছন্দসমস্যা' পড়িয়া একথা মানিতে হইল।

পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম 'মরীচিকা'র কবি যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত মহাশয় আর কবিতা লিখিবেন না। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' ও 'মরুমায়া' লিখিয়াই তো শেষ হইবার কথা নয়! এখনও 'মরুভূমি' বাকী আছে। 'মরুভূমি'র গোড়ার কবিতা 'বৈশাখ' তো লেখাই আছে!

—

শারদীয়া সংখ্যা 'ছোট গল্পে' পরশুরামের 'প্রেমচক্র' বাহির হইয়াছে। খাজা-তরুণেরাও (রবীন্দ্র-শরৎ-প্রমথ-নরেশ প্রমুখ) যে কথা বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিলেন না, পরশুরাম তাঁহাদের মনের সেই কথাটা ফাঁস করিয়া দিয়াছেন।—

> কিন্তু, আমরা যে সতী, হারিত-দা—
> আমরাই কোন্ অসৎ। চল চল, বেলা বয়ে যায়।

হায়রে, আমাদেরই কেবল বেলা বৃথা বহিয়া গেল!

—

বাংলা সাহিত্যে বড় নাম-বিভ্রাট ঘটিতেছে। এক নামের দুই তিনজন করিয়া লেখক হওয়াতে আমরা পাঠকসম্প্রদায় এমন মুস্কিলে পড়িতেছি, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া কত অনাচারই হয় তো করিয়া ফেলিতেছি! এক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লইয়াই তো সেদিন পর্য্যন্ত বিপদের অবধি ছিল না। শেষে হীরকদুল প্রণেতা শরচ্চন্দ্র স্বয়ং আমাদের বিপদ নিবারণ করিয়াছেন। সম্প্রতি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লইয়া বিপদে পড়িয়াছি! আমরা এক বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানি; তিনি 'পথের পাঁচালী' লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার লেখার সহিত আমাদের পরিচয় আছে। হঠাৎ সেদিন একটি নূতন সাপ্তাহিক পত্র চোখে পড়িল—নাম 'দীপক'। দুইজন সম্পাদকের একজনের নাম শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদকের লেখা 'মহাজ্ঞানী' নামক একটি গল্পও তাহাতে আছে। প্রথমটা মনে হইল পথের পাঁচালীর বিভূতি বাবু, পত্রিকাটি গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত উল্টাইয়া আমাদের ভুল ভাঙিল। পথের পাঁচালীর রচয়িতা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া এমন একখানা বাজে কাগজ বাজারে বাহির হইতে পারে না। ইনি নিশ্চয়ই অন্য বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়। বোধ হয় সেই 'মোতির নোলক'-এর প্রণেতা।

—

গোলযোগের অন্য কারণও আছে। এই পত্রিকার একটি বিভাগের নাম দেওয়া হইয়াছে—'মেঘ-মল্লার।' 'মেঘমল্লার' পথের পাঁচালীর বিভূতিবাবুর প্রিয় নাম, তাঁহার একখানি গল্পগ্রন্থের নাম মেঘমল্লার। তাহা হইলে কি আমাদের বিভূতিবাবুই? সন্দেহ নিরসনার্থ গল্পটি পড়িলাম। পথের পাঁচালীর লেখকের ভাষা এরূপ হওয়া অসম্ভব। গল্প পড়িয়া মনে হইল অনুবাদ, অথচ তাহার উল্লেখ নাই; যিনি কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি এরূপ করিতে পারেন না। গল্পটির ভাষা স্থানে স্থানে তুলিয়া দিতেছি।

"খুব যে বেশীদিনের কথা তা নয়। তবে কোনো এক সময়ে এক সুন্দর সুসজ্জিত প্রাসাদের মত অট্টালিকায় একটি লোক বাস করতেন। তিনি মনে করতেন এবং পরিচিতদিগকে ভাবে ইঙ্গিতে জানাতেন যে, সেই জায়গায় সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা জ্ঞানী যদি কেউ থাকেন তো তিনিই।

ভক্ত না থাকলে ঠাকুরের থাকা না থাকা দুইই সমান—তেমনি এই জ্ঞানীটির

অনেক ভক্ত জুটেছিল কৃষক ও অর্দ্ধশিক্ষিতের মধ্যে।...শেষকালে তিনি মূল্য নির্দ্ধারণ করে দিলেন তাঁর উপদেশের বিনিময়ে। সকলের চেয়ে তাঁর বুদ্ধি কেন যে অধিক পরিমাণে বেশী সে সম্বন্ধে সকলকে তিনি তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করতেন।...দূরে অজ্ঞাতে মানুষের জানতে পারার সীমার বহুদূরে তারা পড়ে আছে।...কিন্তু এই পথ খুঁজে পাওয়ার জন্তে যে একটা চেষ্টা কি তার জন্তে ক্রিয়াশীল হওয়া সেটা তাদের মনের কোণে স্থান পায় নি—থেকে গেছে শুধু পাবার ইচ্ছেটুকু—স্থাবর সম্পত্তির মতো·········"

অসম্ভব, আর উদ্ধৃত করা যায় না। মোটের উপর অত্যন্ত অক্ষম চতুর্থশ্রেণীর লেখকের নাম যদি একজন প্রথমশ্রেণীর লেখকের নামের সহিত এক হয় তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর লেখকটির অবহিত হওয়া উচিত। তাঁহার উচিত তাঁহার নামের পাশে (১) কি (২) অথবা ক কিম্বা খ এইরূপ কোনও নির্দ্দেশক চিহ্ন দেওয়া। পথের পাঁচালীর বিভূতিবাবুকে অতঃপর আমরা শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১) বলিয়া উল্লেখ করিব।

—

'বাথরুম-কাপড়ছাড়া' সাহিত্যের যাঁহারা পোষক তাঁহারা এই সাহিত্যের একজন পাণ্ডা শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল মহাশয়ের পরিবর্ত্তনে খুসী হইবেন না। কিন্তু প্রবোধবাবুর পরিবর্ত্তন হইতেছে। তিনি ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। ইহার মূল সংসারের ঘাত প্রতিঘাত না অন্য কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য তাঁহার আছে তাহা বলা কঠিন; কার্ত্তিকের উপাসনায় 'ঝড়' নামক গল্পের শেষে তাঁহার মতামত মূল্য দিয়া হয়তো মেট্রপলিটান-উপাসনা কোং খরিদ করিয়াছেন কারণ খরিদ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে। ৺মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকেও যাঁহারা অর্থানুকূল্যে বাজারে প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারা প্রবোধ সান্যালের 'ঝড়'কে যে গ্রেসিয়ারে পরিণত করিবেন তাহা মোটেই বিচিত্র নহে।

'ঝড়' গল্পের শেষে লেখক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল মন্তব্য করিতেছেন—

"শুধু নির্দ্দয় নির্ম্মম বলিয়াই তাহাকে আখ্যাত করা যায় না, শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অপরিণামদর্শী বলিয়াই তাহাকে মার্জ্জনা করা চলে না,—আধুনিক কালের যে ছন্নছাড়া উচ্ছৃঙ্খল যৌবন এই পৃথিবীতে পাপ, অন্যায়, দুর্নীতি ও দুঃশাসন আনিয়াছে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই পশু-প্রকৃতির যুবকটি তাহার অতি নিকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাদের দুরন্তপণার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াই জগৎ-সমাজের এত বড় শোচনীয় অধঃপতন!"

জয় জগদীশ হরে! শোচনীয় অধঃপতনই বটে! রূপেয়াকা খেল্!

—

কিন্তু 'চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ' নিশ্চয়ই পয়সা দেয় নাই, দেখিতেছি প্রবোধ বাবুর মত্য সত্যই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সেখানে 'পাঁচিল' গল্পের শেষে তিনি লিখিতেছেন—

"প্রেমের গল্প বিনাইয়া বিনাইয়া লেখাই সাহিত্যের একমাত্র বিষয়-বস্তু নয়।"

জীতারহো ভাই, নয়ই তো!

—

কিন্তু এক যায় আর আসে; একজন বদলায় অন্যে তাহার স্থান দখল করে। ও রক্তবীজের ঝাড় শেষ হইবার নহে। আর একজন উঠিতেছেন, 'কামনার আগুনের' তিনি। এবারকার গল্পের নাম 'জলকেলি'—গল্পটি ভয়ঙ্কর, এইজন্য পাঠককে প্রস্তুত হইতে বলি।

"বিপ্লব রায় সন্তরণ সমিতির সভ্যগণের Common বিপ্লবদা ও সভ্যাগণের মিঃ রয়! তরুণীরা বিপ্লবদা বলতে অজ্ঞান।

দীঘিতে সেদিন তরুণ-তরুণী সন্তরণ-সমিতির বার্ষিক জলকেলি। সবার চেয়ে আশ্চর্য্য হল তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী শেফালিকা তার খুড়তুতো দাদা বিপ্লব রায়ের সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি দেখে, ঠিক সেইদিন থেকে দাদার উপর কেমন একটা টানের মাত্রা বেড়ে গেল······

বিপ্লব একটা সিগার দাঁতে চেপে দেয়াশলাইটা দিতে শেফালিকাকে ইঙ্গিত করে। দেয়াশালাই কাঠি জেলে শেফালিকা নিজেই ঝুঁকে পড়ে বিপ্লবদার সিগার ধরিয়ে দেয়। সিগারেটের তুলনায় সিগার ধরাতে একটু বেশী সময়ই লাগে। আগুনের ভাপ লাগায় আঙুলটা মুখে পূরতে পূরতে শ্রীমতী বলে ওঠেন, বাপ রে বাপ, সিগার ধরাতে পুড়ে মনু।

কৈ দেখি?

মৃণালনিন্দিত সুগোল সুন্দর হস্তখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বিপ্লব ফুঁ দিতে থাকে, ফুঁয়ে জ্বালার বিশেষ উপশম না হলেও শেফালিকা নিজের হস্তখানিকে বিপ্লবদার স্পর্শসুখ হতে বঞ্চিত করতে চায় না।

বিপ্লব দা?

কেরে—শেফালী? মার মার টপাত করে লাফ মার। শেফালিকার costume আঁটা সারা অঙ্গে লোক দেখান শিহরণ বয়ে যায়······ বিপ্লব বিংশতি বর্ষীয় তরুণীকে পিঠের ওপর নিয়ে তার প্রতি মাংসপেশীর স্পন্দন-স্পর্শটুকু পূরামাত্রাতেই অনুভব ও উপভোগ করতে করতে ইচ্ছাসত্ত্বে, দেরী করে—তীরের নিকট আসতে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে শ্রীমতী উপরে ওঠেন। পূর্ণনিতম্বের থর থর মৃদুমন্থর গতি' উন্নতবক্ষের দ্রুত স্পন্দন, প্রতিমাংসপেশীর লীলায়িত মধুমাখা মনোহর ভঙ্গিমা, সিক্তউষ্ণ বসনান্তরালে ঢেকে থাকা যৌবনোদ্দীপ্ত লাবণ্যভরা দেহের রূপচ্ছটা। বিপ্লব চেয়ে থাকে নির্গিমেষলোচনে! ভুলে যায় এই তরুণী তারই ভগিনী শেফালিকা।··· মদ্যপানের জন্য মাতাল কি একাই দোষী! নারীর স্পর্শসুখে লালায়িত রংদার বেশ্যাপরায়ণ তার অনন্ত পিপাসার জন্য কি সে একাই দায়ী!

●

আর একদিনের কথা। বিপ্লব শেফালিকাকে দুহাতে জলের ওপরে ধরে চিৎ সাঁতার শেখায়······উঁ···হুঁ! বুকটা অত উঁচু নয়—হাত জোড়া কাজেই বিপ্লব নিজের থুতনিবনাম মুখে দিয়ে শেফালিকার স্থূল মাংসপিণ্ড ভরা বুকের ওপর চাপ দেয় জোরে—খুব নয় অল্প।

*

একে একে উঠে যায় সকলেই, শেফালিকা চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে লজ্জামাখা চোখে বিপ্লবের দিকে চায়।······

কণিকা বোস কি বল্‌লে জান্‌লে? বল্লে—বিপ্লবদা কি এবার Cousins are the best target পন্থা অবলম্বন করলেন নাকি?

তবে একবার Experiment করেই দেখা যাক, এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব রায় দুইহাতে দৃঢ়ভাবে শেফালিকাকে আলিঙ্গন করে সত্য সত্যই চুম্বন করে। চুম্বনস্পর্শ সুখের পরিবর্ত্তে ঠোঁটে যেন বিদ্যুতের তীব্র জ্বালা অনুভব করে। * * * *

শ্রীমতী ও শ্রীমানের সেদিন নিরালা চায়ের টেবিলের চির-প্রকাশিত অথচ চির অপ্রকাশ্য অপূর্ব্ব লীলা শশধরের দৃষ্টি এড়ায়নি আরও সহজ

সত্য কথা যে শ্রীমান শশধর শেফালিকাকে নিরালায় ডেকে নিয়ে 'বলে দেবো' এই ভয় দেখানোর ভাণ করে একটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেওয়া চুম্বন শেফালিকার কাছ থেকে আদায় করে নিতে কার্পণ্য করে না। * * * ঠক বাছতে বাছতে গাঁ প্রায় ওজড় হয়ে আসে! শেফালিকা ও বিপ্লবের গুপ্ত প্রেমরহস্য আর কারো নিকট রহস্যময় থাকে না। মজা হল এই যে প্রত্যেকেই, মনে করে—আমি ছাড়া একথা আর কেউ জানে না।

কথামালার চোর কুকুরের মুখ বন্ধ করাবার জন্যে মাংসের টুকরার সাহায্য নিয়েছিল, শেফালিকা মোহমদমত্ত তরুণের মুখ বন্ধ করতে তাদের অনন্ত কামনার ক্ষুধার নৈবিদ্যস্বরূপ নিজ দেহখানির সাহায্য লয়। সময় নেই—অসময় নেই, পাত্র নাই—অপাত্র নাই, মুখ নেই—অমুখ নেই—ক্ষুধার উপকরণ কামনার ইন্ধন প্রতি মুহূর্ত্তে অভাগিনীকে নিজের পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যোগাতে হয়! * * *

যাদের সতীপনার হাঁড়ি এখনও হাটের মাঝে ভাঙা হয়নি সেই তথাকথিত সতীর দল জোর গলায় বলবেন—ও কালামুখীর আবার মুখ দেখতে আছে, দূর করে দাও কলকাতায়—অনেক 'গাছি' আছে।"

লেখক কোন 'গাছি'র ?

—

বালীগঞ্জের মেয়েরা সত্যই বাপু ভাল নয়; যে গিরিজা দাদা অপত্যনির্ব্বিশেষে বিনা বাধায় উত্তর কলিকাতার যাবতীয় কন্যাদের জয় করিয়া আসিলেন তিনি নিশ্চয়ই বালীগঞ্জে কাহারও দ্বারা jilted হইয়াছেন। তাঁহার রাগ হইয়াছে, রাগ না হইলে এমন কবিতা কেহ লেখে না। মেয়েটি গিরিজাদাদাকে দিয়া কাজ আদায় করিয়া লইয়া

তাঁহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া থাকিবেন। কবিতাটির নাম—
'বালিগঞ্জের উপকণ্ঠবাসিনী'।

খানিকটা এইরূপ—

"মুখে মাখা সরলতা মরমে গরল
শিরায় শোণিত আঁকা সীমাহীন ছল
কথা বলে কম যেন বিনয় আধার
মিছরীর ছুরী, ফুলে কীট অনিবার।
সমুখে হাসিয়া বলে, ফিরিলে পিছন
চোখের মাঝারে জাগে স্বভাব কোপন
বাংলার তির্য্যক উচ্চারণের
ন্যাকামিতে পরিচয়, মেকী জীবনের।
প্রয়োজনে পদানত কাজ হলে শেষ
দেখাবে যে জানা শোনা নাহি যেন লেশ,
উপকার আদায়ের কায়দাটি জানে
বিনিময়ে মিথ্যার চোখা শর হানে।"

সত্যই, গিরিজিদা আমাদের বড্ড সরল, তবে সহগুণ আর এক জনের আছে বলিতে হইবে।

—

পূজা সংখ্যা দুন্দুভিতে একটি ত্রিবর্ণচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে! নীচে ইংরাজী বড় বড় অক্ষরে নাম দেওয়া হইয়াছে—Maternal Love. বাঁ দিকে ছোট অক্ষরে নাম 'স্তনদায়িনী'—Maternal Loveএর বাংলা 'স্নুনদায়িনী' হইতে পারিত না?

"বসে' বসে' সেই উন্মুখর উগ্রোচ্ছসিত তীক্ষ্ণ মুহূর্ত্তটির প্রতীক্ষা করছি। চীৎকারের তাপে সমস্ত বাবু মণ্ডল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে"—বঙ্গবাণীর কি দুর্দ্দশা হইতেছে অচিন্ত্য বাবু তাহা লেখেন নাই।

—

যত গোলযোগ কি প্রেমেন্দ্রবাবুর বেলাতেই হইবে?—তিনি স্বয়ং লিবার্টি-ভবনে কাজ করেন অথচ শারদীয় সংখ্যা নবশক্তিতে তাঁহারাই কবিতা অপরূপ হইয়া উঠিল!

"সাগর পাখীরা সব উড়ে যায়,
রজনী শিহরে যত ভালো খায়।"

শিহরিবে কেন, রজনীর মোটা হইবার কথা।

—

নাটুকে মন্মথ রায়, এম-এ, কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি গোপনে শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন; এবার হঠাৎ পূজার বাজারে তিনি বোমার মত ফাটিয়া পড়িয়াছেন তাঁহার একটি একাঙ্কিকা (অপরাজিতা) লইয়া। যে সকল স্ত্রীলোকের উপর বন্ধ্যাত্ব অপবাদ চাপাইয়া তাহাদের সন্তানকামী স্বামীরা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করে এই নাটিকাটি তাহাদের কাজে লাগিবে: অবশ্য প্রথমেই নানা এক্সপেরিমেণ্টের সাহায্যে তাহাদিগকে স্থিরনিশ্চয় হইতে হইবে যে স্বামীরা সত্যসত্যই সন্তান উৎপাদনে অক্ষম।

স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার পরিশ্রম হইতে মুক্তি দিবার যে উপায় আমাদের মন্মথবাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা কঠিন উপায় নহে; হাতের কাছে একটা ঠাকুর-পো প্রত্যেক বাড়ীতেই থাকে; সহোদর-ঠাকুরপো না থাকিলেও মাসতুতো পিস্তুতো দ্বারাও কাজ চলিতে পারে। ইহাতে সতীত্ব নষ্ট হইবার কোনই আশঙ্কা নাই—

অথচ মাতৃত্ব যথাসময়ে আসিয়া পড়িতে পারে। ভাবিতেছি, এমন সহজ উপায় থাকিতে আগেকার লোকে পোষ্যপুত্র লইয়া মরিত কেন ?

—

সূর্য্যকান্ত চৌধুরী ও বিশ্বজিৎ চৌধুরী দুই ভাই জমিদার। সূর্য্যকান্তের স্ত্রী অপরাজিতা। সূর্য্যকান্তের সন্তান হয় না, বিশ্বজিৎ রটনা করে, সূর্য্যকান্ত চোখ বুঝিলেই তাহার সম্পত্তি বিশ্বজিতের। সূর্য্যকান্ত স্ত্রী অপরাজিতার নিকট কাতর প্রার্থনা জানায়—শেষে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে মনস্থ করে।

অপরাজিতা সতী স্ত্রীলোক, স্বামীর কাতরতা তাহাকে পীড়া দেয় and then she managed semehow to be a mother. ছেলের নাম চন্দন। চন্দনের বয়স যখন সাতবৎসর, সূর্য্যকান্ত মৃত্যুশয্যায়—বিশ্বজিতের সঙ্গে অপরাজিতার দেখা—চন্দন হারাইয়া গিয়াছে, তাহার খোঁজ চলিতেছে।

"বিশ্বজিৎ। তবে আমিও যাই—খুঁজে দেখি—

অপ।—না।

বিশ্ব। না! কেন ?

অপ। আমার স্বামীর ইচ্ছা নয়।

বিশ্ব। কিন্তু তোমারও কি ইচ্ছা নয় ?

অপ। স্বামীর ইচ্ছাই স্ত্রীর ইচ্ছা।

বিশ্ব। বটে! [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী তুমি সব…স…ব কাজ কর, না ?

অপ। হ্যাঁ।

বিশ্ব। এখানেও যে দেখছি মাধবীলতা! তোমাদের বাগানে সেই দীঘির ধারে সেই বেদীপীঠে ওর চাঁদোয়া দেখেছিলুম। সেই যে···সেইদিন···সেদিনও এমনি কাঁচা জ্যোৎস্না ছিল মনে পড়ে?

অপ। হাঁ·········আমি এখন স্বামীর কাছে······যেতে পারি বোধ হয়?

বিশ্ব। স্বামীরই ইচ্ছা বুঝি?

অপ। আজ্ঞে হ্যাঁ।···কিন্তু ঐ কথাটাই বা বারে বারে তোলা কেন? [ক্ষণেক থামিয়া] এই প্রশ্ন তুলেই তো আমায় লজ্জা দিতে চাইছ যে সাত বছর পূর্ব্বে······সেই যে হঠাৎ একদিন···তোমায় সেই মাধবীলতা কুঞ্জে ডেকে এনেছিলুম···'সেও কি স্বামীরই ইচ্ছায়'?

বিশ্ব। তা কেন? তোমার স্বামী তো সেদিন গৃহে ছিলেন না, কলকাতা গিয়েছিলেন, একলা থাকৃতে তোমার ভয় পেয়েছিল। বিশেষ···রাত্রে,—তাই।

অপ।······স্বামীর অজ্ঞাত ইচ্ছাতেই আমি তোমায় সেই একরাতে আবাহন করেছিলুম।···স্বামী কামনা করেছিলেন ঐ চন্দনকে কিন্তু তাকে গঠন করবার শক্তি তাঁর ছিল না বলেই—

বিশ্ব।—তুমি আমাকে······

অপ। চুপ······আমি তাঁকে পোষ্যপুত্র নিতে বললুম! *তিনি বল্‌লেন্ বরং মৃত্যু ভালো, তবু অপৌরুষের ঐ অপবাদ···বলেই প্রস্তাব করলেন, দ্বিতীয়বার বিয়ে করবেন।

বিশ্ব। করলেন না কেন?

অপ। ······আমি জানতুম, তাই বাধা দিলুম। শুধু তাও তো নয়। তিনি যদি অপৌরুষের সত্য অপবাদ মাথায় তুলে নিতে রাজী নন, আমিই বা কেন বন্ধ্যাত্বের মিথ্যা কলঙ্ক মাথায় নেব?

বিশ্ব। তাই।—

অপ। হাঁ তাই, তাঁর স্ত্রীর বুকে যে সক্ষমা নারী ঘুমিয়েছিল সে জেগে উঠল। তাঁর স্ত্রী ছিল্ সতী, কিন্তু এ নারী ছিল মা।” ...

যাক্—দায়ভাগ ও মিতাক্ষরিণ-এর অনেক সমস্যার সমাধান হইয়া গেল!

—

“টাউনহলে ভদ্রমহিলাদের প্রতি ছাত্রদের পাশবিক আচরণ

শরৎচন্দ্রের গভীর অনুশোচনা”

[বাতায়ন]

পাশবিক আচরণ দেখিতে হইলে পশুর চোখ থাকা আবশ্যক, আমাদের তা নাই কিন্তু সেদিন আমরা উপস্থিত ছিলাম। এক বাতায়ন-সম্পাদক ও নবশক্তি-সম্পাদক ছাড়া ‘পাশবিকতা’ তো কাহাকেও দেখিতে দেখিলাম না। বাতায়ন (৭ই আশ্বিন) ও নবশক্তি (৭ই আশ্বিন)—উভয়েই ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। বাতায়ন ‘যতীন্দ্রনাথ (?) বাগচী ও তাঁহার পার্শ্বচর কালিদাস রায়’ All Bengal Students Association—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, Advance পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মিঃ জে সি গুপ্ত, আনন্দবাজার পত্রিকার দল, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে কুৎসিৎ ভাষায় গালিও দিয়াছেন দেখিলাম। গালি দেওয়া সহজ; ধরিয়া লওয়া যাউক ইহারা সকলেই শরৎবন্দনা না হওয়ার পক্ষে ছিলেন, হয়তো ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনও কিছু

করিয়া থাকিবেন—কিন্তু তাহাতে অপরাধ হইয়াছে কি? যে বন্দনা-অনুষ্ঠান স্বয়ং শরৎচন্দ্রের বন্ধ করা উচিত ছিল এবং অপরিণামদর্শী সুবিধাবাদী লোকের পাল্লায় পড়িয়া দেশের এমন অবস্থায় তিনি শেষপর্য্যন্ত যে ব্যর্থ বন্দনা লইয়া ছাড়িলেন—তাঁহার হইয়া তাঁহারই বন্ধুজন যদি তাহা রোধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন শরচ্চন্দ্রের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল। গান্ধীজীর ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তাহা দেখিবার সবুর সহিত না? যাঁহার পঞ্চাশত জন্মোৎসব তেপান্ন বৎসরে অনুষ্ঠিত হয় তাঁহার একটা তারিখের প্রতি এত নিষ্ঠা কেন? রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ, তাঁহার জয়ন্তী হইয়াছিল পৌষে। দু'দশ দিনের জন্য কিছু তাঁহার বন্দনা তামাদি হইয়া যাইত না। বন্দনা-অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্যে নষ্ট হইবার মত এক জিনিষ ছিল ফুল—মহাত্মা গান্ধীর সঙ্কল্প ১৩ই তারিখে সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়—তাহার পরেও এই আয়োজন করার ধৃষ্টতা যাহাদের হইয়াছিল তাহারা অন্যের পাশবিক আচরণের কথা লেখে! নির্লজ্জ আর কাহাকে বলে!

—

শরচ্চন্দ্রের কথা আর কিছু লিখিব না; তিনি যে স্তরে নামিয়াছেন সেখানে আমাদের অনুযোগবাণী তাঁহার নিকট পৌঁছিবে না। শুধু একটি কথা বলিতে চাই, কোনও একটা অপ্রীতিকর অনুষ্ঠান যদি একপক্ষ করিতে চায় এবং অন্যপক্ষের বাসনা হইয়া থাকে তাহা ঘটিতে না দিবার তাহা হইলে সংঘর্ষ স্বাভাবিক। কোনও সাহসিকা যদি এই সংঘর্ষকালে ঘটনাস্থলে যাইতে সাহসী হন তাঁহার নিগৃহীতা হইবারও আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমরা জানি নিগৃহীতা কেহ হন নাই; যাঁহারা শরৎবন্দনায় যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা যে যাঁহারা শরৎবন্দনা বন্ধ করিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক ভদ্র

এবং শিক্ষিত তাহা মনে করিবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। শেষোক্তদের দেশপ্রীতি লইয়া প্রথমোক্তেরা ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ব্যঙ্গ করিবার কথাই বটে! বাতায়নের লেখক লিখিয়াছেন—

"ব্যাপারটি যখন শরৎচন্দ্রের গোচর করা হইল তখন মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি পাষাণে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন।"

বাতায়ন-সম্পাদক কলিতে-রামচন্দ্র-দেহধারী অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের পাদস্পর্শে পাষাণ শরচ্চন্দ্র প্রাণ পাইলেন বুঝি! তবু রক্ষা এমন লোকও ছিল! আমাদের ধারণা হিজলীদিবস ও মহাত্মা গান্ধীর উপবাসের দোহাই দেওয়া সত্ত্বেও শরচ্চন্দ্র যখন লোলুপ হইয়া বন্দনা লইতে যাইতেছিলেন তখনই পথে তাঁহার পাষাণ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল।

—

কথায় বলে, শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি; শরৎবন্দনা উপলক্ষ্যে তাহাও আমরা দেখিলাম, দেখিয়া দেহমন পবিত্র করিলাম। সেয়ান শরচ্চন্দ্র "শ্রুতি মধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালাগাঁথার" শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়া যে কায়দা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, তদধিক সেয়ান রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশীর্ব্বাদী পত্রে তার তুলনায় অল্প কায়দা দেখান নাই—শব্দব্রহ্মের নিকুচি করিয়া ছাড়িয়াছেন। পত্রখানির স্থূল মর্ম্ম এই;—আমার জয়ন্তীর দেখাদেখি তোমার এ ক্ষ্যাপামি কেন? তুমি ত বাপু এখনও তেমন কিছু কর নাই; যাহা করিয়াছ তাহাতে দেশবাসীর নিকট এ ধরণের সম্বর্দ্ধনা আদায় করিতে যাওয়া হাস্যকর! আমার সমান হইতে এখনও ঢের দেরী। এখনই তোমার হইয়াছে কি?—ঘাটের কোঠায় পা দিয়াছ বইত নয়! নিতান্তই ছেলেমানুষ! এই ত মোটে আরম্ভ;

এখনও ঢের লেখা লিখিলে তবে আমার পাছ ধরিতে পারিবে। 'লিখে যাও, লিখে যাও! দেখ পারো কিনা।' রবীন্দ্রনাথের মত, এমন অমায়িক ভাবে এত বড় রসিকতা আর কেহ করিতে জানে? সে রসিকতার ভাষা কি সূক্ষ্ম, কি সুমার্জ্জিত! স্থূল মর্ম্ম উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি—সূক্ষ্ম ভাষার নমুনাও দিলাম।—

"তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয়নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনো স্তব্ধ হবার অবকাশ নেই তোমার ফলশস্যবহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করচে।

সেই দাঁড়ি-টানা সময় তোমার নয়। এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। * * * * অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্ব্বজনহস্তে চত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সে দিন বহুদূরে থাক্। * * * * জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয়; নিশ্চিত মনে রেখো।"

কথাগুলি কি শোভন সুন্দর, কি সুমিষ্ট! সখি! এমন না হইলে লোকে তোমাকে প্রিয়ম্বদা বলিবে কেন?

রবীন্দ্রনাথ এমনই ন্যাকা সাজিয়াছেন যে, শরচ্চন্দ্রের দৃষ্টিশক্তি যেন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে—সাতান্ন বৎসর বয়সের পরেও বাঙ্গালী

লেখকের নিকটেও খুব বড় নূতন কিছুর প্রত্যাশা করা যায় না, ইহা তিনি যেন জানেন না! রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি, শরচ্চন্দ্রের আধুনিকতর রচনাগুলি পড়িয়া তাঁহার কি বিশ্বাস হইয়াছে যে শরত-প্রতিভা ক্রমশই উর্দ্ধতর স্তরে উঠিতেছে? তিনি কি সত্যই মনে করেন সে প্রতিভা এখনও কাঁচা, এখনও রং ধরে নাই—তাহা পাকিয়া ঝরিয়া পড়িতে বহু বিলম্ব আছে? রবীন্দ্রনাথের লেখনীর আড়ালে যে নিপুণা নটিনী প্রায়ই উঁকি মারিয়া থাকে, তাহাকে তারিফ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—"শিখে হো ছল ভালা!"

—

এবারকার পূজার বিশেষ সংখ্যা 'লিবার্টি' পত্রিকায় আমরা শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর বি, এ (অক্সন্) এম্, এ (ক্যাল্) লিখিত "Caste" শীর্ষক একটি ছোট গল্প ও সম্পাদকমহাশয় কৃত তাহার ভাবার্থ পাঠ করিলাম। বারান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—

শনিবারের চিঠির কার্ত্তিক সংখ্যা ১৫ই কার্ত্তিক তারিখে বাহির হইবে।

ব্রজ-বাসী

কলিকাতা কেন এত ভাল লাগে, ত্যজিয়াছি ব্রজবন,
নিগূঢ় সে কথা কহি প্রিয়ে হেথা, শোন হয়ে একমন।
সমাজের শিরে শতমুখী হানি সে এক স্বনাম ধন্যা,
প্রগতির লীলা-বাহিনী মহিলা প্রবল প্রণয়-বন্যা!

মম বংশের পরমা প্রকৃতি কুল-অধিদেবী তিনি,
কুল ভাঙ্গি কবে রঙ্গে ভাগিলা কালা-প্রেমগরবিনী।
ছিল সেই নারী প্রদীপের প্রাণ অর্থাৎ কলু জাতি,
কালা ছিলা এক জোলার তনয় পলিতার ছিল ভাতি।
একদা উভয়ে দিলা পিঠ্‌টান্‌ সটান্‌ বৃন্দাবনে,
হরিদাসী আর হরিদাস বলি জানিত সকলজনে।
উঠিয়া বস্ত্রহরণের ঘাটে কুঞ্জ রচিয়া এক,
ফিরি বাড়ী বাড়ী রচি মাধুকরী সুখে কাল কাটিলেক।
পিতামহ মোর তাঁদের তনয় নাম শ্রীচরণ দাস,
চাঁড়ালের বধূ বৈষ্ণবী তাঁর আছে আরো ইতিহাস।
জনক আমার স্বকুতভঙ্গ ত্যাগ করি বাঙ্গালিনী,
পশ্চিমা এক চামারের মেয়ে করিলেন স্বগৃহিণী।
সঞ্চিত পুঁজি খুঁজিয়া মেলে না তারপরে এই কাজ,
বড় দুর্ণাম রটে' গেল সখি ব্রজবাসীদের মাঝ।
পয়সার জোরে "দাদাবাবাজীরে" যাহারা করিত মান,
আজি তারা তাঁরে দেখিলে খেদাড়ে কভু মলি দেয় কান।
যৌবন যায় দেহ না বিকায় হস্তে হইয়া ঘুরি,
বিবাহ অথবা মালাচন্দনে জুটিল না মোর জুড়ি।
তারপর প্রিয়ে, মনে আছে কিহে মোদের মিলন কথা,
আমিতো আজিও ভুলিনি যদিও তেহিনো দিবসা গতাঃ

চারি চক্ষের নব সৌখ্যের সে মধুর ইতিহাস,
পারি কি ভুলিতে মনের জমিতে সে ভালবাসার চাষ।
আমাদের দশা দুর্দ্দশা হ'য়ে এল যবে নব সাজে,

বাবা পাঠালেন ব্রজবাসীদের গরু চরাবার কাজে।
সৌভাগ্যের সিঁড়ি সে আমার প্রথম বাড়াতে পা,
ব্রজ-বীথিকায় কি দেখিনু হায় বাহবা বাহবা বা!
দেখি মোর মুখ আঁৎকে উঠিলে উভরড়ে দিলে ছুট্‌,
বাঁদর হ'লেও না হয় ছড়াতে মুঠোমুঠো ডালমুট্‌!
এ যে জম্বুক জাম্বুবানেরে জিনিয়া জলুষশালী,
তাই তুমি শুধু পালালে সজনি, ভুলেও দিলে না গালি।
তব হাতে ছিল 'তগর পাদুকা' (১) পাদুকা আমার হাতে,
ফিরে একদিন যমুনার ঘাটে সাক্ষাৎ তব সাথে,
তুলিতে লাগিলে সমুদ্রফল (২) গণিতে লাগিনু ঢেউ,
দৈবযোগেতে সেথা সকালেতে তেসরা ছিল না কেউ
হঠাৎ ছিট্‌কে পড়িলে সলিলে বাঁদরের তাড়া খেয়ে,
সেথা কচ্ছপে হানিল কামড় ত্রস্তে ছাড়ানু যেয়ে।
স্থান বিশেষের ক্ষত শুকাইলে ফিরে কামড়িনু আমি।
আর ছাড়াবার লোক মিলিল না হ'য়ে গেনু তব স্বামী।
শ্রীরামচন্দ্র সোনারের সহ জননী তোমার আসি।
আশীষ করিলা মোদের যুগলে নয়নের জলে ভাসি।

গরু চড়ানো ও গোবর কুড়ানো হাত যোরা প্র্যাকটিসে,
বাবাজীর ছেলে খোল বাজানোটা শিখে গেলে বিনা 'ফিসে'।
কিন্তু ব্রজেতো ফাঁকি চলিল না পেটে জুটিল না ভাত,
তাই চলে এনু আজব সহরে তোমারে লইয়া সাথ।

---

(১) তগর পাদুকা—পানাড়ি, লীলাকমলের কলির সংস্করণ
(২) সমুদ্রফল—গাছবিশেষের ফল

শুনেছিনু হেথা কেরাণীর পোলা নিয়ে প্রভুপাদ নাম,
সরস্বতীর সতিনী হইয়া গড়িয়াছে গুরু ধাম।
যুগি জেলে জোলা গলে নিয়ে মালা কাঁধে পৈতের গোছা,
শ্রীপাদ সহিতে গোলকের পথে বোঁ বোঁ চলিয়াছে চোঁচা।
শুনেছিনু হেথা চিনুয়া চামার সন্নিসী হয়ে এসে,
বিলেত ফেরতা শিষ্য বাগায়ে স্বামী বনে গেছে শেষে।
হেথা বাবুদের বৌঝিরা নাকি নেচে গেয়ে থিয়েটারে,
এ হেন মন্দাবাজারেও পথ করিয়াছে রোজগারে।
এ কলিকাতার নব গোকর্ণে কেবা কড়ি ধারে কার,
যার যা ইচ্ছে সেই সেটা করে কেবা খোঁজ রাখে তার।
যাহা শুনেছিনু আসিয়া দেখিনু তারো চেয়ে আজগুবী,
আজব সহরে নিত্য যা ঘটে তাজ্জব তাহা খুব-ই।
তাই চট্ কাঁধে পৈতে চড়ায়ে ব্রাহ্মণ পরিচয়ে,
খোলের ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিনু খোলন্দাজিয়া হ'য়ে।
রটায়ে দিয়েছি ব্রজে মোর আছে চৌতল চবুতরা,
তব কাছে নয় বাহিরে বয়সে দিই নাই আজো ধরা।
মাছরাঙ্গা খগে বাহন লভেছি তুজনে করেছি শলা
সে আমার পিঠ দিবে চুল্‌কিয়া আমি দেব তার গলা।
নাম রটে গেছে শ্রেষ্ঠ বাদক গায়ক দ্বিতীয়হীন,
পদসংগ্রহে নাস্তি তৃতীয় বাখানে চৌধুরীন্।
আচারে চরিতে 'পঞ্চম' কোথা খ্যাতি রটিয়াছে কত,
পয়সার সহ বাড়িছে পসার বেল্লা বাড়িতেছে যত।
যত না ছাত্র আসে যায় লয় সাগ্রহে পদধূলি,
এর পর সখি তুমি বল দেখি বলা চলে ব্রজবুলি?

ব্রজবন হেতু মন কাঁদে তব সাবেক স্মৃতির লাগি,
আমার সে কথা মনে হলে পরে বুকে জ্বলে উঠে আগি।
যদিও তোমারে এতদিন পরে হারাব নাহি সে ভয়,
তবুও সেথায় সহ্য নাহি যায় বাবাজী আমারে কয়।
ব্রজ ছেড়ে বেশ সুখে আছি এই রাজধানী মথুরায়
বারে বারে আর ফিরিতে ব'ল না ধরি তব দুটি পায়।
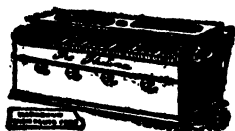
———

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৫-সি, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তৃতীয় সংখ্যা] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ [৫ম বর্ষ

বাঙ্গলাদেশে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ

মহাত্মা গান্ধীর উপবাসের পর থেকে, দেশে খুব ব্যাপকভাবে, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের আন্দোলন চলছে। বাংলাদেশেও চলছে। খুব তেমন চলছে না, যেমনটি হয় ত চলা উচিত ছিল। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করতে গিয়ে জাতিভেদের কথাও এসে পড়ছে। কান টানলেই মাথা আসে। কেন না, জাতিভেদের মধ্যে অস্পৃশ্যতার ছোঁয়াচ আছে। ভাল রকমই আছে। বৈদ্য কি কায়স্থের হাতে খায়? যে সব বৈদ্য সত্যি জাত মানে তারা খায় না, বিবাহ দেওয়া ত দূরের কথা। প্রত্যেক জাতি এবং উপ-জাতি এক একটা পৃথক জীব বা জন্তু।

কেউ বলছে, জাতিভেদ যে না থাকুক—এ ত মহাত্মা চান না। কেউ বলছে জাতিভেদ থাকুক এই হচ্ছে মহাত্মার স্পষ্ট অভিমত।

তা না হ'লে জাতিভেদের মহিমা অমন করে বর্ণন করেন! বর্ণাশ্রম বলে মহাত্মা তাঁর নিজের মনগড়া একটা কাল্পনিক পদার্থের ছায়া কখন কখনো দেখেন। কিন্তু তা শাস্ত্রেও নাই আর লোকদের সমাজ-ব্যবহারেও তা প্রত্যক্ষ হয় না। কেন না, যা নাই—তা প্রত্যক্ষ হবে কি করে? মহাত্মা জাতিভেদের সঙ্গে বর্ণাশ্রমকে পৃথক করে দেখতেই পারেন নাই। এখন পারছেন বলে নিজেই অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার কচ্ছেন। অন্যে হলে করত না। কেন না, তাঁরা মহাত্মা নন।

কেউ বলছে, মহাত্মা জানেন যে, কালে জাতিভেদ থাকবে না, থাকতে পারে না;—অথচ এই সত্য কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পাচ্ছেন না। মহাত্মা ভীরু। আর একজন প্রতি-উত্তরে বলছেন, না, ঠিক ভীরু বলা যায় না, তবে উচ্চ জাতিদের মধ্যে আহার আর বিবাহ বিষয়ে যে গণ্ডীভাগ প্রচলিত আছে তা এখুনি উঠিয়ে দিতে বললে—তাঁরা রাজীও হবেন না, কাজে করা ত দূরের কথা—অথচ মহাত্মার রাজ-নীতির আন্দোলন থেকে তাঁরা বেরিয়ে পড়বেন। ফলে, রাজনৈতিক আন্দোলন—যা এখন পর্য্যন্ত প্রধানত জাতিভেদের গণ্ডীতে আবদ্ধ ভদ্রলোকদের নিয়ে এবং দিয়ে চলছে—তা অচল না হলেও, তেমন চলবে না।

তাই মহাত্মা শিক্ষিত এবং পল্লীবাসী অর্দ্ধ শিক্ষিত উচ্চ জাতিদের চটাতে চান না। কাজেই তাঁকে ঠিক ভীরু বলা যায় না। বরং বলা যায় হিসেবী, চতুর এবং কাজের লোক। বোম্বের মিলওয়ালাদের মুখ চেয়ে তিনি তাঁর জগদ্বিখ্যাত আন্দোলনকে এমনভাবে পরিচালিত করেছেন—যা নিছক এবং নিরেট কোন আদর্শবাদী করতে পারতেন না—কখনো করতেন না। মহাত্মা বহুবার এবং বহু ক্ষেত্রে বোম্বের মিলওয়ালাদের স্বার্থের কাছে ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ বলি দিয়েছেন।

দ্বিধা করেন নাই। তিনি রাজনীতিবিদ বা রাষ্ট্রের সংস্কারক। তিনি ভীরুও নন, ভুয়ো আদর্শবাদীও নন—তিনি কাজ বোঝেন। কাজের লোক। বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ।

অস্পৃশ্যতা আর জাতিভেদ আজকের এই আন্দোলনের মুখে ঠিক একই বস্তু বলে দেখা দিচ্ছে না, স্পষ্ট দুটো পৃথক বস্তু বলে বোধ হচ্ছে। জাতিভেদ থাকে থাকুক! অস্পৃশ্যতা যাক্। মহাত্মা মরতে বসেছিলেন। তিনি ত আর জাতিভেদ জোর করে উঠিয়ে দিতে বলছেন না। অতএব এস, জাতিভেদ যেমন আছে রেখে—অস্পৃশ্যতা তুলে দেই। ভাবটা এই রকম। কাজেই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, জাতিভেদ থেকেও অস্পৃশ্যতা যেতে পারে। তা কি পারে?

মুসলমান সমাজে অস্পৃশ্যতাও নাই, জাতিভেদও নাই। মুসলমান নাপিতের সঙ্গে, মুসলমান মৌলভীর শ্রেণীভেদ আছে। কিন্তু একত্রে খাওয়াও চলে, ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়াও চলে। হিন্দুদের মত গণ্ডীবাঁধা জাতিভেদ নাই। মুসলমানদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা থাকলে জাতিভেদও থাকতো। হিন্দু-সমাজ থেকে যদি এখন গান্ধী-আন্দোলনে অস্পৃশ্যতা উঠে যায়, তবে খুব দ্রুত হিন্দু-সমাজ থেকে জাতিভেদও উঠে যাবার সম্ভাবনা আছে। অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-আন্দোলনে জাতিভেদের কথা যে উঠেছে—এই তার প্রমাণ। নইলে জাতিভেদের কথা উঠতো না। ধাঙ্গর, মেথর দিয়ে পরিবেশন করিয়ে ছত্রিশ জাত একত্রে বসে পংক্তি-ভোজনও চলতো না। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের জন্যেই সকলের একসঙ্গে খাওয়ার আয়োজন ও ব্যবস্থা চলছে। প্রতি দিনই খবর পাওয়া যাচ্ছে।

অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন রাজনৈতিক প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করে মহাত্মা গান্ধীই নিয়েছেন। তাঁর আগে কোন কংগ্রেসনেতা এমনতর ব্যাপক

ভাবে নেন নাই। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকেরা নিয়েছেন বটে। কিন্তু কি অস্পৃশ্যতা, কি জাতিভেদ কিছুই তাঁরা সমাজ থেকে ব্যাপকভাবে তুলে দিতে পারেন নি। তাঁরা নিজেরাও, বড় কেউ, জাতিভেদের সংস্কার থেকে খুব বেশি মুক্ত ছিলেন না। গেল শতাব্দীর এক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছাড়া, রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস—এমন কি স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত—প্রত্যেকেই এবং সকলেই জাতিভেদ লোক-ব্যবহারে স্বীকার করে গেছেন। তাঁদের মনের উদারতা এবং প্রসারতা এত বেশী ছিল, যে তাঁদের মধ্যে যে আবার বিবাহাদি ব্যাপারে প্রচলিত জাতিভেদের সংকীর্ণতা সত্যি সত্যি ছিল, এ লোকের চোখে পড়ে না। কিন্তু ছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর ধর্ম্ম-সাধনায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েও যদি সুস্থ শরীরে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করতেন তবে তিনি ঠিক ঐ বামুনের মেয়েই বিয়ে করতেন। জাতের বাইরে গিয়ে বিয়ে করতে তাঁর সাহস হওয়া ত দূরের কথা, ইচ্ছে পর্য্যন্ত হ'ত না; ভাবতেই পারতেন না যে কায়েতের মেয়েকে তিনি বিয়ে করবেন। তেমনি রাজা রামমোহনেরও যদি রক্ষিতা একটি যবনী না থাকতো তবে হয়ত বা তিনি শৈব বিবাহের অবতারণা করে—, ব্রাহ্মণের সহিত মুসলমানীর শৈব মতে বিয়ে হ'লে তা স্মার্ত্তমতে প্রচলিত বিয়ের মতই শাস্ত্রীয় এবং সদাচার বলে গ্রহণীয় হবে; এমন কথা এমন করে বলতেন না। অন্ততঃ এ ত সত্যি যে শেষ পর্য্যন্ত তিনি গলায় পৈতে নিয়ে ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর পরেও তাঁর দেহ জাতি-ভেদের চিহ্ন, সগৌরবে বক্ষে ধারণ করে গেছে। ব্রাহ্মণ বলে রাজা লজ্জিত ছিলেন না। অথচ জাতিভেদ সর্ব্বপ্রকার অনৈক্যের মূল, জাতীয় পরাধীনতার কারণ,—রাজনৈতিক

উন্নতির পরম বিঘ্ন—এমন বিশদ বিশ্লেষণ করে,—একশো বছরের উপর হ'তে চললো—এপর্য্যন্ত আর কেউ ভারতবর্ষে রাজার মত বলেন নাই। এবং সে রকম করে দেখেনও নাই। রামমোহনের দৃষ্টি যতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল আর কারও তেমন ছিল না। আজো নাই।

মুখে জাতিভেদ না মেনে, কাজে জাতিভেদ মেনে গেছেন এবং যাচ্ছেন এমন লোকের সংখ্যা হিন্দু-সমাজে এক আধজন নয়, বিস্তর আছে। আজকের এই ধাক্কায় তাঁদের দোলায়মান অবস্থাটা তাকিয়ে দেখবার মতন। এই দোলায়মান অবস্থায় পতিত লোকদের মনস্তত্ত্ব, এপর্য্যন্ত ভাল রকম বিশ্লেষণ করে কেউ দেখেও নি—সুতরাং বলেও নি। মুসলমান বাবুর্চ্চি রেখে রাঁধিয়ে খাবে—অথচ জাতিভেদ রক্ষা করবে।

কারণ খুব স্পষ্ট। কেন না, ঐ দোলায়মান অবস্থায় পতিতেরাই—অস্পৃশ্যতার হাত থেকে হিন্দু জাতিকে উদ্ধার করবার জন্য বক্তৃতা কচ্ছেন। এই দারুণ সমস্যার তাঁরাই একমাত্র বক্তা। নিজকে বাঁচিয়ে কে-না বলে? তাঁরা নির্ব্বোধ নন্। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তাঁরা তেমন বলছেন না। কি করে বলবেন? কাজেই জাতিভেদ যেমন আছে তেমনি থাক্। কিন্তু অস্পৃশ্যতা এখুনি যাওয়া চাই। নইলে—আবার উপবাস। আমৃত্যু উপবাস। মনে রাখতে হবে জাতিভেদ উঠিয়ে দেবার জন্য এ উপবাস নয়—, শুধু অস্পৃশ্যতা উঠিয়ে দেবার জন্যই এ উপবাস।

এখন দেখা যাক, বাংলা দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকেরা—গত শতাব্দীতে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে কতদূর কী করে গেছেন।

রাজা রামমোহন হ'তেই আমাদের দেশে—রাজনীতি বল, ধর্ম্ম বা সমাজ-সংস্কার বল, সংবাদ পত্র বা সাহিত্য বল, সমস্ত দিকেই একটা সাজ-সাজ ভাব, জাগ-জাগ রব—শোনা গেছে। রাজা জাতিভেদকে—ধর্ম্মের সঙ্গে একত্র করে দেখেছেন। তাঁর মতে এই নানা রকম মূর্ত্তিপূজার প্রশ্রয়দাতা হচ্ছে ব্রাহ্মণ। এতে তাঁদের ঐহিক লাভ আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণেরাই জাতিভেদের প্রধানত পক্ষপাতী। অতএব জাতিভেদ তুলতে হ'লে—হিন্দুর প্রচলিত ধর্ম্মকেও পরিবর্ত্তন করতে হবে। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলে মিলে এক নিরাকার পরব্রহ্মকে ডাকলেই—মূর্ত্তিপূজা ছাড়াও হিন্দুধর্ম্ম, উপনিষদের আদি ও অকৃত্রিম ধর্ম্ম রক্ষা পেল—আর জাতিভেদও থাকল না। সব জাতি সমান ও এক হয়ে গেলে, একতা বৃদ্ধি পাবে। রাজনৈতিক উন্নতিও বৃদ্ধি পাবে। সামাজিক সুখ-সচ্ছন্দতাও বেশী হবে। রাজনৈতিক উন্নতির জন্যই জাতিভেদ যাওয়া উচিত। হিন্দুরা যে মুসলমানদের অধীন হয়েছিল, রাজা বলেন, এর অন্যতম কারণ হিন্দুসমাজের জাতিভেদ। রাজার যুক্তির মধ্যেও কোন ঘোর-প্যাঁচ নাই—আর তাঁর মনের অভিপ্রায়টিও বেশ সুস্পষ্ট রকমে বোঝা যায়।

জাতিভেদ সম্পর্কে এই ত ছিল রাজার মনের অভিপ্রায়। কিন্তু এই অভিপ্রায় অনুসারে কি রকম কার্য্য হয়েছিল—সেটাও একবার দেখা দরকার। রাজার সঙ্গীরাও ছিলেন—রাজার মত পরিণত বয়সের গণ্যমান্য লোক। ছেলে ছোকরা—অর্থাৎ আজকাল যাদের বলে নাকি, তরুণ, রাজার সঙ্গীরা তা ছিলেন না। তাঁরাও এক একটা দিক্‌পাল ছিলেন। রাজার সঙ্গে ব্রহ্ম-সভায় গিয়ে তাঁরা নিরাকার ভজতেন—আবার বাড়ী এসে পূজা-আহ্নিক মূর্ত্তিপূজা সবই কর্ত্তেন। আর জাতিভেদ ষোল আনা রকমে মানতেন। অস্পৃশ্যতাও মানতেন।

এমন নিরাকার ব্রহ্ম-বাদী ব্রহ্ম-সভায় পর্য্যন্ত শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ-পাঠ হ'তো। বিষ্ণুচক্রবর্ত্তী ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাইতেন—গোলাম আব্বাস্ অবশ্য মুসলমান, সে পাখোয়াজ বাজাতেন। এই ত অবস্থা। অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন বা জাতিভেদ উঠিয়ে দেওয়া রাজা বা তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা সম্ভবপর হয় নি। রাজা হয় ত জাতিভেদ উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু সঙ্গীরা তা ছিলেন না। রাজার সঙ্গী ও বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ—রাজার পরে বিলেত গিয়েছিলেন, সমস্ত ইউরোপে ভ্রমণ করেছিলেন, রাজার মতই দ্বারকানাথেরও বিদেশে দেহত্যাগ হয়। এতে করেও রাজার ও প্রিন্স দ্বারকানাথের বংশ হিন্দু-সমাজ ভুক্তই রয়ে গেল,—হিন্দু-সমাজের বাইরে এল না। এতে করে বিলেত যাওয়া হিন্দু-সমাজে চল্ হবার পথ সুগম হ'ল। কিন্তু জাতিভেদ মরল না। রক্ষা পেল। জাতিভেদ রক্ষা করেও বিলেত যাওয়া চলে। গত শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধের এই প্রথা—এ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত একই ভাবে চলছে। হিন্দু-সমাজের ছেলেদের কাজে অ-কাজে বিলেত গিয়ে—বাড়ী ফিরে—এখন আর গোবর খেতে হয় না—যে যার জাতে অবাধে প্রবেশ কর্চ্ছে,—নিষেধ নেই। এবং জাতের বাইরে, ব্রাহ্ম না হলে, বিলেত-ফেরৎ যুবকেরা—কেউ বড় একটা বিয়েও কর্চ্ছে না। বিলেত-গমনও এতদিন পর্য্যন্ত জাতি-ভেদ ভাঙ্গতে পারে নি। তাইত দেখা যাচ্ছে।

রামমোহনের পরে তাঁর ধারা বেয়ে এলেন—দ্বিতীয় ধর্ম্মসংস্কারক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ব্রহ্মজ্ঞানীদের—হিন্দুসমাজ ছেড়ে আর একটা পৃথক সমাজ করতে হবে কি না?—ব্রহ্মজ্ঞানীদের সমাজে জাতি নির্ব্বিশেষে কন্যার আদান-প্রদান চলবে কি, না—? এই নিদারুণ সমস্যা মহর্ষির সামনে খুব স্পষ্ট রকমেই এসেছিল। মহর্ষি পেছু ফিরলেন।

তিনি এগুলেন না। যে পিরালী ব্রাহ্মণ—সেই পিরালী ব্রাহ্মণই থেকে গেলেন। তবে তাঁর ধর্ম্ম-সঙ্গীদের কাছে 'মহর্ষি' হ'লেন। আমাদের কাছেও তিনি মহর্ষিই। হিন্দু-সমাজে ধার্ম্মিকদের প্রতি নিজের জাতি রক্ষা করে, উদারতা দেখান—কৃত্রিম নয়—স্বাভাবিক। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দেবেন্দ্রনাথকে ধর্ম্ম-বিশ্বাসেই—'মহর্ষি' বলে শ্রদ্ধা করতেন এ আমরা দেখেছি। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এতগুলি পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়েছেন। কিন্তু একটাও জাতের বাইরে দেন নি। মহর্ষির পরিবার ধর্ম্মমতে ব্রহ্মজ্ঞানী। কিন্তু সাধারণ বা নব-বিধান এই দুই জাতিভেদ-ভঙ্গকারী ব্রাহ্ম-সমাজের কোন এক সমাজের সঙ্গেও বিবাহাদি ব্যাপারে অঙ্গীভূত হয়ে যায় নি। এখনো পিরালীত্বও সম্পূর্ণ নাই। কারণ? মহর্ষির বংশীয়েরা পিরালী ব্রাহ্মণ থেকেও আজ চার পুরুষ জাতিভেদ মেনে চলছেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের সহিত বিধবার বিবাহ হয়েছে সত্য; কিন্তু সে ব্রাহ্মণের বিধবা। আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহে—জাতিভেদ মানা যে হয়েছে—তা পরে বলছি।

আমরা দোলায়মান অবস্থার লোকেদের কথা বলছিলাম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও জাতিভেদ সম্পর্কে এই রকম দোলায়মান অবস্থায় পতিত লোক ছিলেন। তিনি স্পষ্ট বলে গেছেন—জাতিভেদ যে না থাকুক এ আমাদের (ব্রহ্মজ্ঞানীদের) উদ্দেশ্য নয়। নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই আমাদের উদ্দেশ্য। হিন্দুসমাজের জাতিভেদ রেখে—মূর্ত্তিপূজা ছেড়ে নিরাকার উপাসনা করলেই কি—আধুনিক সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে? আমরা ত তা মনে করি না। শোনা যায় অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু এঁরা দুজনেও স্পষ্ট বলে গেছেন, যে তাঁদের কালেও জাতিভেদ উঠিয়ে দেবার সময় আসে নি। 'এখনে সময় আসে

নাই'—যাঁরা বলেন, তাঁদের কাছে সময় কখনো আসে না। সত্যি কথা বলতে কি—সময় আপনি আসে না—তাকে ডেকে আনতে হয়।

তার পরেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের যুগ। তিনিই প্রথম ব্রহ্মজ্ঞানীদের তরফ থেকে বিবাহ-ব্যাপারে, হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথা উঠিয়ে দিলেন। ব্রাহ্ম-বিবাহ-বিধি ১৮৭২ খৃঃ আইন পাশ হয়ে গেল। মহর্ষি তলে তলে বাধা দিলেন। রাজনারায়ণ বাবু আক্ষেপ করলেন। কিন্তু সেই হ'তেই অসবর্ণ বিবাহ ব্রাহ্ম-সমাজে চলে গেল। আজো চলছে। দেখাদেখি ব্রাহ্ম-সমাজের বাহিরেও দু'চারটা চলছে।

কেশবচন্দ্রকে যখন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ যুবকেরা ছেড়ে এসে—সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ করলেন,—তখন কিন্তু এই সমস্ত বিদ্রোহী কৈশবেরা বিবাহাদি ব্যাপারে জাতিভেদ না মানাই স্থির করলেন। ধর্ম্মমতে বিদ্রোহী কৈশবেরা অনুসরণ করলেন দেবেন্দ্রনাথকে, আর সামাজিক আচারে বিবাহ ব্যাপারে অনুসরণ করলেন কেশবচন্দ্রকে। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে বিবাহে জাতিভেদ নেই। যদি কেউ মানেন—সে ব্যক্তিগত ভাবে।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রেব মাঝখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ খৃঃ হিন্দুদের বিধবা-বিবাহ আইন করে পাশ করে দিলেন। কিন্তু সেই বিধবা-বিবাহ হিন্দু-বিবাহ হওয়া চাই। হিন্দু-বিবাহ হ'তে হ'লেই, হিন্দু-প্রথা মানা দরকার। হিন্দু-প্রথা হচ্ছে—যে যার জাতে বিয়ে করবে। সুতরাং বিধবা-বিবাহেও জাতিভেদ থেকে গেল। ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাহ দিয়েও জাতিভেদ রাখলেন।

কেশবচন্দ্রের পরে এল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ। এই যুগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পূর্ব্বগামীদের সমস্যা জাতিভেদ ছেড়ে, সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—অস্পৃশ্যতা-সমস্যার উপরে।

তাঁরই পরিত্যক্ত ভেরী—নিনাদিত হচ্ছে—মহাত্মা গান্ধীর মুখে। ইহাই ইতিহাস কথা।

ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণ দোলায়মান হচ্ছিলেন—জাতিভেদ সমস্যার ভেতরে; সেই সমস্যা প্রায় ছেড়ে দিয়ে বিবেকানন্দ হাত দিলেন অস্পৃশ্যতার উপরে। আমরা দেখছি—জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা একই সমস্যার দুইটি দিক মাত্র। একটিকে টানলেই আর একটি আসবে। কিন্তু এ দুটির কোনটিকেই না টেনে, নিছক আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আত্মোপলব্ধি করা যায়—যেমন কর্চ্ছেন পণ্ডিচারীনিবাসী শ্রীঅরবিন্দ। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষটা ত আর পণ্ডিচারী গিয়ে চোখ বুজে বসতে পারে না। অনেকের মতে সমাজের সমস্যা ভীরুর মত এড়িয়ে অন্ধকার গহ্বরে গিয়ে চোখ বোজার নাম—আত্মহত্যা। একটা মানুষ 'ধর্ম্মের' নামে, রকমফের আত্মহত্যা করতে পারে—করেও আসছে। কিন্তু একটা আস্ত জাতি তা পারে না। ধর্ম্মের জন্য জাতি নয়। জাতির জন্যই ধর্ম্ম। পরাধীন জাতির ধর্ম্ম—স্বাধীনতা অর্জ্জন করা, তার চেয়ে বড় ধর্ম্ম পরাধীন জাতির থাকতে পারে না। ইতিহাস তা বলে না।

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন সম্পর্কে গত শতাব্দীতে এক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্যতীত আর অল্পাধিক সকলেই দোলায়মান অবস্থায় পতিত ব্যক্তি। এ কথাটা যখন ভাবা যায়—তখনই মনে হয়—জাতিভেদ উঠিয়ে দিতে গেলে একজন ব্যক্তির সাহসের উপর বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উপর নির্ভর করলে চলবে না। তার চাইতেও বেশী কিছুর দরকার। একটা চাপ চাই। বোধ হচ্ছে যেন সেই চাপ এসেছে। অন্নসমস্যার দরুণ অনেক মেয়ের আর অল্প বয়সে বিয়ে হচ্ছে না। সহরে অনেক মেয়ে আগে যেখানে বিয়ে করে ঘরসংসার করত

এখন সেখানে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। অবিবাহিত অবস্থায় থেকে অনেক ভদ্র ঘরের মেয়ে চাকুরী করে জীবিকা নির্ব্বাহ কর্চ্ছে। শুধু নিজের জীবিকা নয়,—পিতৃহীন ভাইদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে, বিধবা মাকে ভরণ পোষণ কর্চ্ছে। এ দরকার হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় ঐ বয়স্কা, উপার্জ্জনক্ষম, শিক্ষিতা মেয়েটি যদি কোন ভদ্র যুবককে বিয়ে করেন—তবে যে তিনি জাত বেছেই করবেন—এমন সুমতি তাঁর কাছ থেকে যদি আমরা আশা করি, তবে সে হবে আমাদের নিতান্তই দুরাশা। তা হবে না। স্বাধীন-বিবাহে এবং যৌবন-বিবাহে জাতি-ভেদ থাকতে পারে না। এবং স্বাধীন ও যৌবন-বিবাহ এসে পড়েছে।

এখন জাতিভেদ ভেঙ্গে যাবে বলে মেয়েদের অল্প বয়সে ধরে জাতে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও আজকার দিনে কেউ সহসা করতে সাহস করবে না। সুতরাং এই অন্ন-সমস্যার দরুণ এমন সব জাতি-ভেদ ভঙ্গকারী আরো কত সমস্যার আবির্ভাব হয়েছে,—যা হঠাৎ তিরোধান করবে বলে ত মনে হয় না।

অনেকে ভাবছেন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ইংরেজী শিক্ষিত হয়ে আর যাই ভাঙ্গুক জাতিভেদ ভাঙ্গেনি। দু'তিন হাজার জাতিভেদভঙ্গকারী ব্রহ্মজ্ঞানীরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নন। তাঁরা একটা আদর্শ দিয়েছেন মাত্র কিন্তু হিন্দুসমাজ তাঁদের অনুসরণ করে নি। কথাটা ঠিক, মিথ্যা একটুও নয়। এখন দেখতে হবে এর কারণ কি? অস্পৃশ্যতা তুলে দিতে, ব্রাহ্মণ-সভার জনকয়েক ছাড়া, দেশশুদ্ধ প্রায় সকলেই হাত তুলবে। অন্ততঃ মহাত্মা তাদের তুলিয়ে ছাড়বেন—। সে ক্ষমতা গান্ধী রাখেন। ইচ্ছামত একটা পরাধীন জাতিকে যে পরিমাণে তিনি হাত তোলাচ্ছেন—আর হাত নাবাচ্ছেন—তাতে জীবিতদের মধ্যে এই দিকে এত বড় ক্ষমতাশালী জন-নায়ক, পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

এ বিষয়ে মহাত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। কেহ বলতে পারেন যে এ সম্ভব হয়েছে কারণ আমরা হচ্ছি একটা ভেড়ার জাত। অগ্রবর্ত্তী মেষকে চলতে দেখে আমরা পথ চলেছি মাত্র। আমাদের নিজেদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা বা কোন কাজ করবার ক্ষমতাই নেই। হুকুম মানাই হচ্ছে আমাদের হাজার বছরের অভ্যাস। কথাটা হয় ত একেবারে মিথ্যা নয়। তবে এই শতাব্দীর—কি স্বদেশী যুগে—কি গান্ধী যুগে—বাঙ্গালী শুধু গড্ডলিকা-প্রবাহে ভেসে যায় নি। ভুলও যদি করে থাকে তবু একথা সত্যি পরাধীন বাঙ্গালী সাহস করেছে বিস্তর, দুঃখও পেয়েছে অনেক এবং নূতনও কিছু করেছে কম নয়। সব দিকেই। মহাত্মা গান্ধীকে সব চেয়ে যদি কোন প্রদেশ কম মেনে থাকে—সারা ভারতবর্ষে তবে সে দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। যে প্রকৃত বাঙ্গালী সেই এই কলঙ্ক অথবা গৌরবের ভার বহন করবে। দ্বিধা করবে না। তথাপি বঙ্গদেশ মহাত্মার নিকট মাথা নত করেছে। এবং তাতেও বলি, বাঙ্গালীর অগৌরব হয় নাই। কেন না গান্ধী—মহাত্মা। এ অতি ধ্রুব সত্য। মহাত্মার কাছে মাথা নত করলে মাথা নত হয় না। মহাত্মাদের তাইত বৈশিষ্ট্য।

মহাত্মা কিন্তু তুলে দিতে বলেছেন অস্পৃশ্যতা। জাতিভেদ তুলে দিতে বলছেন না স্পষ্ট করে। তবে যদি জাতিভেদ নিজেই বলে, আমি আর থাকব না—তবে যাক্‌। মহাত্মা জাতিভেদকে সেধে রাখতে চান না। এই পর্য্যন্ত। অথচ মহাত্মা স্পষ্ট বুঝতে পার্চ্ছেন—জাতিভেদ হিন্দু-সমাজের শিক্ষিত কতক অংশের মধ্যে আর যেন থাকছে না। তাঁদের আটকানো যাবে না—এবং তাঁদের ফেলে দেওয়া গেলেও উচিত হবে না। হয় ত বা ফেলে দেওয়া যাবেও না। তাঁরা দলে খুব কম হবেন না।

ঘটনাটাই বলি—মহাত্মার পুত্র দেবীদাস গান্ধী জাতিভঙ্গ কর্চ্ছেন। তিনি রাজগোপাল আচারিয়ার কন্যাকে বিবাহ করবেন। স্থির হয়ে গেছে। রাজগোপাল আচারিয়ার মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ, গান্ধী গুজরাটী বৈশ্য। এ বিবাহ প্রচলিত নাই। গান্ধী জেলে থেকেই আপত্তি করলেন। আপত্তি সত্বেও যখন বিয়ে হবে বোঝা গেল, তখন মহাত্মা মত দিলেন। বুদ্ধিমানের কার্য্যই করেছেন। আমাদের হেরম্ববাবু (মৈত্র মহাশয়) একবার অমত করে আবার মত দিতেন না। এ নিশ্চয়। মহাত্মা দিলেন।

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী যখন মহাত্মার উপবাসের সময় পুণা গিয়েছিলেন—তখন মহাত্মা গান্ধী বাসন্তী দেবীকে বলেছেন যে তাঁর আপত্তি রাজগোপাল ব্রাহ্মণ বলে নয়—তাঁকে তিনি ছেলের মতন দেখেন—এই আপত্তি। যদি এ সত্যি হয়—আর যদি কেন—এ নিশ্চয়ই সত্যি, তবে ত দেখতে পাচ্ছি, ভিতরে গান্ধী জাতিভেদ মানেন না। অথচ জাতিভেদকেও অস্পৃশ্যতার মত তুলে দাও—স্পষ্ট করে এমন কথাও ত এতগুলি বিবৃতির মধ্যে কোনটাতেও বলছেন না। জাতিভেদ সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা সোজা হয়ে ত মহাত্মার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে না, যেমন করে অস্পৃশ্যতা দূর করার কথা বেরিয়ে আসছে। এর নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে।

আমাদের অনুমান আগেই বলেছি জাতিভেদ-মান্যকারী রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের তিনি বিরাগভাজন হতে চান না। এত বড় সমাজ-সংস্কারের কথা বললে তাঁরা হয় ত রাজনীতি ছেড়েই যাবেন। আশ্চর্য্য নয়।

শুনছি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের জন্য শ্রীযুক্ত বিরলা নাকি এর মধ্যেই একটু বিমনা হয়েছেন। তা হ'লে দাঁড়ায় এই, গান্ধী ইচ্ছে করেই এখন

জাতিভেদের কথা তুলছেন না—যদিও তিনি নিজে জাতিভেদ মানেন না।

আমরা বাঙ্গালী কি করবো? অস্পৃশ্যতার সমস্যা বাঙ্গলাদেশে জাতিগত ভাবে পরস্পর পৃথক জাতির মধ্যে নাই যে তা নয়। বরং বিলক্ষণ আছে। এখন যে ভাবে আছে, এই রকম ভাবে কতদিন থেকে আছে, ঠিক বলা কঠিন। একটা জাতি বড়, আর একটা জাতি তার চেয়ে নীচুতে—ব্রাহ্মণ ছাড়াও অপরাপর জাতির মধ্যেও এই ভাব খুব সুস্পষ্ট। সকল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণও এক জাতি নয়—কেন না তাঁদের মধ্যে কন্যা আদান-প্রদান চলে না। বর্ণ-ব্রাহ্মণ ত শূদ্রবৎ। সকল বৈদ্যের মধ্যেও বিবাহাদি চলে না—সকল কায়স্থের মধ্যেও নয়। তিলি—সুবর্ণবণিক— সাহা— পোদ—মাহিষ্য— রাজবংশী—নমঃশূদ্র—প্রভৃতি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই বহু উপ-জাতি আছে। এবং এই সকল উপ-জাতিরা একে অন্যের সহিত সামাজিক পংক্তি-ভোজনে—এখনো আপত্তি করে—বিবাহাদি ব্যাপারে কন্যার আদান-প্রদান নাই।

যা চলে আসছে তা উল্টে দিতে সহজে মানুষ চায়ও না—পারেও না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—আগে প্রত্যেক জাতির উপ-জাতিগুলির মধ্যে কন্যার আদান-প্রদান হোক,—পরে সকল জাতির মধ্যেই হবে। আগেই এক সঙ্গে সকল জাতির মধ্যে হয়ে কাজ নেই। কেন হয়ে কাজ নেই? তার কোন ভাল উত্তর আমরা পাই নি। বৈদ্যের মেয়ের সহিত কায়স্থের ছেলের বিবাহ দিতে গেলে উভয় সমাজ থেকেই আপত্তি হবে। আপত্তি অগ্রাহ্য করেও যদি বিয়ে হয়—তবে দুই সমাজ থেকেই ঐ দুই বৈদ্য ও কায়স্থ পরিবার একঘরে হবেন, তাদের উপায়? ব্রহ্মজ্ঞানীদের সমাজ? কিন্তু সেখানে ত আবার

অন্য মূর্ত্তি-পূজা দূরের কথা—শ্রদ্ধেয় হেরম্ববাবু সরস্বতী পূজোটাও তাঁদের করতে দেবেন না। ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে ধর্ম্মমতে,—হিন্দুদের মত স্বাধীনতা নাই। সকল ব্রহ্মজ্ঞানীকেই ধর্ম্মমতে এক নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাস করে চলতে হবে। সবদিকেই মুস্কিল। বিবাহে জাতিভেদ-ভঙ্গকারী হিন্দুপরিবার সব যায় কোথায়? নিজেরাই একটা পৃথক সমাজ তাঁরা করতে পারেন। কিন্তু কেবল বিবাহে স্বাধীনতা লাভের জন্যে এ যুগে তাঁরা হিন্দুর স্বাজাত্যাভিমান থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ব্রহ্মজ্ঞানীদের মত,—দূরে সরে যেতে চাইবেন না।

তথাপি শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁরা মেয়েদের কলেজে উচ্চ শিক্ষা দিচ্ছেন—ছেলে ও মেয়ে একত্রে পড়ান হচ্ছে। মেয়েদেরও পড়াশুনা শেষ না হলে বিয়ে হচ্ছে না,—সেই সব দু' পাঁচ বছরের পরের ভবিষ্যৎ উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা, স্বাধীনভাবে নিজেদের পছন্দ মত বিয়ে করবে। আলাপী পুরুষবন্ধুদের মধ্যে থেকেই নিজের স্বামী বেছে নেবে। এর বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। তবু এর বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলা হবে। কিন্তু যারা বিয়ে করবে—তারা তা বিশেষ গ্রাহ্য করবে বলে ত মনে হয় না। সমস্ত ভারতবর্ষ যে-মহাত্মার কথা শোনে,—তাঁরই ছেলে দেবীদাস গান্ধী পিতার বিনা অনুমতিতে বৈশ্য হয়ে বামুনের মেয়েকে বিয়ে করবার জেদ ধরলে—এবং অমন পিতাকেও শেষ পর্য্যন্ত মত দিতে হল।

শিক্ষিতা হিন্দু মেয়েরা কলেজে বা কর্ম্মক্ষেত্রে যে যার নিজের জাত দেখে যুবকদের সঙ্গে মেলা মেশা করবে না। সম্ভব নয়। ভিন্ন জাতের ছেলের সঙ্গে ভিন্ন জাতের মেয়ের আলাপ পরিচয়—বন্ধুত্ব—ও বিবাহ হবেই। জাত বেছে শিক্ষিতা মেয়েরা, আর এ যুগে বিয়ে করবে না। কেন না ছেলে ও মেয়েরা এ যুগে নিজেরাই বিয়ে করবে।

বাপ মা আর তাদের বিয়ে দেবার বড় একটা সুযোগ পাবে না। এইরূপ বিবাহ বর্ত্তমান অবস্থা হ'তে আপনি ঘটে পড়বে। নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লী এদের শাসন করে আটকাতে পারবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ যে বলেছেন—আগে উপজাতিদের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান হয়ে জাতগুলোর সংখ্যা কমে আসুক, তারপর অল্প কয়েকটি জাতের মধ্যে অনায়াসেই বিবাহাদি চলে যাবে—এ কথার যুক্তি শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু তা হবে না। হ'তে পারেও না। এক প্রদেশের, এক বর্ণাশ্রিত, এক জাতির উপজাতিগুলি বিবাহাদি ব্যাপারে এক হওয়ার কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে মহাত্মার পুত্র ও রাজগোপাল আচারিয়ারের কন্যা দেখতে পাচ্ছি রাজি হ'লেন না। প্রদেশ আলাদা—বোম্বাই আর মাদ্রাজ, ভাষা আলাদা—গুজরাটী আর মাদ্রাজী, বর্ণ আলাদা—বৈশ্য আর ব্রাহ্মণ। উপজাতিগুলির এক হওয়া পয্যন্ত এদের যেমন আটকে রাখা গেল না তেমনি অনেককেই যাবে না। প্রথমে শুধু উপজাতিদের এক করা হোক—এরূপ উক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন জাতিভেদ আছে। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর নিজের কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে বেশ একটা গর্ব্ব মনে রাখুন বা না রাখুন—মুখে করে গেছেন।

বিবাহাদি ব্যাপারে কেন জাতিভেদ হিন্দু-সমাজ থেকে উঠিয়ে দেব? এ প্রশ্ন এ শতাব্দীর নয়। এ প্রশ্ন বিগত উনবিংশ শতাব্দীর। এর উত্তরও উনবিংশ শতাব্দী দিয়েছে। খুব ভাল উত্তর দিতে পারে নি। জাতিভেদ-ভঙ্গকারী বিবাহ, বাংলায়, এক ব্রহ্মজ্ঞানী-দের সমাজের কতক অংশে মাত্র হয়েছে। সব অংশে এখনো হয় নি। সামাজিক সাম্যবাদ ছিল ব্রহ্মজ্ঞানীদের সামনে আদর্শ। আদর্শের প্রেরণা, সমস্ত রকম বিঘ্ন অতিক্রম করে গেল শতাব্দীতে

জয়ী হ'তে পারে নি। বাংলায় ব্যাপক ভাবে জাতিভেদ-ভঙ্গকারী বিবাহ গেল শতাব্দীতে হয় নি।

এ শতাব্দীতে হবে। সামাজিক সাম্যবাদের আদর্শ ত আছেই। তা ছাড়া অর্থনৈতিক সমস্যার চাপ—ও রাজনৈতিক আদর্শের অনুপ্রেরণা—এই দুই নূতন শক্তি অতি নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যৎ বঙ্গদেশে—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক বড় অংশে জাতিভেদ-ভঙ্গকারী বিবাহের প্রচলন করবে।

বল্লাল সেন যদি এই জাতিভেদের সূত্রপাত করে গিয়ে থাকেন তবে সে ত খৃঃ দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগের কথা। ৮০০ বছর বাংলায় তা হ'লে এই জাতিভেদ—রূপান্তরিত হতে হতে চলে আসছে। এই ৮০০ বছরে বাঙ্গালার ইতিহাসে এমন সব ঘটনা ঘটেছে—যার জন্যে বাঙ্গালী মাত্রেরই লজ্জিত হওয়া উচিত। বল্লাল জাতিভেদ করে গেলেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে আর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমেই বাংলা জয় করলেন বখতিয়ার খিলিজি। লক্ষণ সেনকে বখ্তিয়ার পরাজয় না করুন। লক্ষণ সেন হয় ত, বখ্তিয়ার আসবার ৩৩ বছর আগেই দেহত্যাগ করেছিলেন। কি আসে যায়? ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গালী জাতটা ত ছিল! এক লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় হওয়া অপেক্ষা একটা সমগ্র জাতির পরাজয় কি বল্লালী জাতিভেদ সমাচ্ছন্ন ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে কম কলঙ্কের কথা? হিন্দুর জাতিভেদের জন্য বাংলা মুসলমানের পদানত হয় নি। না, কেবল এক জাতিভেদের জন্য হিন্দু-বাংলা মুসলমানের অধীন হয় নি তা সত্য। কিন্তু এও মিথ্যা নয় যে বহু জাতিভেদে বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে—দেশাত্মবোধে এক হওয়া সম্ভবপর হয় নি। জাতিভেদ

জাতীয় একতা হ'তে দেয় নি। জাতীয় একতা না হওয়াতেই বাঙ্গলা বখ্‌তিয়ারের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হয়েছিল। . . . .

জাতিভেদ রহিত, অপেক্ষাকৃত সামাজিক সাম্যবাদে শক্তিশালী একাদশ শতাব্দীতে দেখা যাচ্ছে—অত্যাচারী পালরাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। প্রজার বিদ্রোহ। জয়ী বিদ্রোহ। কৈবর্ত্ত জাতি এখন ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করে কি না, জানি না। করলেও ব্রাহ্মণ-সভা স্বীকার করবে না। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ কৈবর্ত্ত জাতি থেকে বেরিয়ে এলেন বিদ্রোহী জাতির নেতা ও রাজা। তাঁরা বাঙ্গলা শাসন করলেন। সে শাসন একটা গৌরবের শাসন বলে ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত। কৈবর্ত্তেরা কিন্তু ক্ষত্রিয় না হয়ে—রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেছিল। তখন কি বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ-সভা ছিল না? শাস্ত্র ও আচার মেনে জাতি চলে এ সত্যি কিন্তু যে জাতি সত্যি চলে—সে পথে যেতে যেতে দরকার হ'লে শাস্ত্র ও আচার ভেঙেও চলে। যে জাতি স্বেচ্ছায় ভাঙ্গবার শক্তি হারিয়েছে তার কোন কিছু বড় গড়বার শক্তি না থাকারই সম্ভব।

অস্পৃশ্যতার উপর বাংলায় মহাত্মা যে চাপ দিয়েছেন—তা বাংলা শুধু ভারতবর্ষের একটা প্রদেশ বলে মেনে নিয়েছে। সমস্যাটা বেশী করে মান্দ্রাজের। বাংলাতেও অস্পৃশ্যতা-সমস্যা আছে। এবং এ যুগে তা থাকা অন্যায় হয়েছে। বাঙ্গালী হিন্দুর গৌরব তাতে করে মুসলমান প্রতিবেশী ও খৃষ্টান রাজার নিকট ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বাঙ্গলার সমস্ত হিন্দু জাতটাই অসংখ্য জাতিভেদ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনই কোন একটা বড় কাজে এক হ'তে পার্চ্ছে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিরাজ উদ্দৌলা না হয় বড় অত্যাচার করেছিল, বাঙ্গালী হিন্দু কৈ সে অত্যাচারে ত এক হ'তে পারে নি। যদি পারতো তবে লর্ড ক্লাইভ

আসে কেন? আসবার ত কথা নয়। বর্গী যখন আলীবর্দ্দীর সময় সারা বাংলাটা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে চষে ফেলতে লাগলো—তখন হিন্দু বাঙ্গালীর জাতগুলি একত্র হয়ে কোন্ বাধা দিল? ইতিহাসে ত এ রকম বাধা দেওয়ার প্রথা আছে। সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী ভরে যখন পর্টুগিজ আরাকানী ও মগ জলদস্যুগণ জাহাজে করে এসে—বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলে নদীগুলির মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যে ঢুকে যুবতী, সুন্দরী মেয়েদের দলে দলে ধরে, জাহাজ ভরে নিয়ে চলে যেত—তখনও কি গ্রামবাসীরা একত্র হয়ে বাধা দেবার সঙ্গত কারণ উপস্থিত মনে করতে পারেন নি। দেখছি ত করেন নি। বামুনের মেয়ে কেড়ে নিয়েছে—তাতে কায়স্থের কি? ভাবটা অনেকটা এই রকম ছিল। জাতিভেদ বর্ত্তমান জাতীয়তা-বিরোধী। বর্ত্তমান জাতীয়তায় না পৌঁছে, বোধ হয়, আমরা বিশ্ব-মানবতার শান্তিনিকেতনে ডবল্ প্রমোশন পাব না। সুতরাং জাতীয়তার মধ্য দিয়েই যেতে হবে। যেতে হ'লে—জাতিভেদ ভাঙ্গতে হবে। একদিন যদি পরাধীনতার মূল্যে জাতিভেদকে বাঙ্গালী হিন্দু নিয়ে থাকে তবে আজ জাতির স্বাধীনতার জন্যে জাতিভেদ তাকে ভাঙ্গতে হবে। মহাত্মা জাতিভেদ ভাঙ্গা তাঁর রাজনৈতিক প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। অস্পৃশ্যতা কেবল করেছেন। কিন্তু এক শ' বছরের উপর হ'তে চললো—বাঙ্গালী রামমোহন জাতিভেদকে এ যুগের একটা বড় রাজনৈতিক সমস্যা বলে গ্রহণ করে গিয়েছেন। মহাত্মার এক শ' বছর আগে রামমোহন। অথচ রামমোহনের দৃষ্টিই অধিকতর সমাজবিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয়।

—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও গিরিশচন্দ্র

মহাত্মা গান্ধী সাতদিনের মহাসঙ্কল্পে ভারতের জাতীয়-জীবন গঠনে যে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "জাতিভেদ প্রথা শত্রুর বাহুবর্দ্ধন করে।" আমরাও আজ বলিতে পারি, আমরা স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বুঝি না, আমরা হিন্দু, এবং সংগঠিত হিন্দুজাতি আজ আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিবে না, আজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে হিন্দু আপনার লক্ষ্যের দিকে ছুটিবে। লক্ষ্যতো স্থির হইল, এখন কি উপায়ে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্তপ্রান্ত পর্য্যন্ত "স্পৃশ্য" ও "অস্পৃশ্যে"র, উন্নত ও অনুন্নতের, উচ্চ ও নীচের বৈষম্য কেবল কথায় নহে, কার্য্যে, আচরণে ও সদ্দৃষ্টান্তে উঠিয়া যায়, তাহা সাধনাসাপেক্ষ। কোন্ নীতি ও আদর্শ অবলম্বন করিলে আমাদের এই সাধনা কার্য্যকরী হইবে, ইহা লইয়া অনেক কল্পনা জল্পনা চলিতেছে। এ বিষয়ে হিন্দু-সম্প্রদায়ের বহুদর্শী মনীষীগণের অভিমত জ্ঞাত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন—কারণ অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন সম্বন্ধে এখন যেরূপ কদর্থ হইতেছে, তাহাতে মূলতঃ সে পার্থক্য ও ভেদবুদ্ধি পূর্ব্ববৎই না বলবৎ থাকে এই ভয় হয়। এ সম্বন্ধে রামমোহন কি দয়ানন্দের যুক্তি অথবা ব্রাহ্ম-সমাজস্থ ও আর্য্যসমাজের মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের আদর্শ উপস্থিত করিয়া হিন্দুসমাজের বিপ্লব ঘটাইতে চাই না। হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস তাঁহাদের মতামত অবগত হওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য।

বহুদিন পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের "ছত্রপতি শিবাজী" নাটকাভিনয় দেখিতে গিয়া শুনিয়াছিলাম, "স্বাধীনতাপ্রিয় মনুষ্যমাত্রেই একজাতীয়,

স্বাধীনতায় তাহারা একসূত্রে আবদ্ধ।” তখন এই কথার অর্থ বুঝি নাই, কিন্তু জেলে ইহা সম্যক বুঝিয়াছিলাম। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে মৌলনা আবুল কালেম আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলভী মুজিবর রহমন, শ্রীযুক্ত চাঁদমিঞা সাহেব, পির বাদশা মিঞা, শ্রীযুক্ত হাজী আবদুর রসিদ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, কিশোরীপতি রায় সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্যে আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, বিদ্যানুশীলনে, মহানুভবতায় কোনও পার্থক্য দেখি নাই। এমতাবস্থায় আজ যদি হিন্দু ও মুসলমান স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া একে অন্যের সঙ্গে আলিঙ্গন করে, চলাফেরা করে, খাওয়া দাওয়া করে, তাহাতে জাতীয়তা সম্বন্ধেতো কোন কথাই নাই, ধর্ম্ম বা মনুষ্যত্ব হিসাবেও কি দোষ হইতে পারে? আমরাতো অন্ততঃ গীতাপাঠনিরত, নিরামিষ-ভোজী, আজাদ সাহেবের সঙ্গে কোনও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের কোনও পার্থক্য দেখি নাই।

হিন্দু-সমাজের কথা বলিতে গিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। যাহা হউক, আমাদের মধ্যেই কেহ কেহ বলেন, বরং মুসলমানদের সহিত একত্রাহার দূষণীয় নয়; কিন্তু মুচি মালা মেথর ও ধাঙ্গরের সহিত—এমন কি জলানাচরণীয় অন্য কোন জাতির সহিতই একত্র ভোজন ঘৃণার কথা! আজ সেই কথাই আলোচ্য বিষয়।

তথাকথিত অনুন্নত সমাজের কোন লোক যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে কোনও ভদ্রনামধারী লোকের সহিত মেলামেশা বা আহার-বিহার করে তবে দোষের কি কারণ থাকিতে পারে? গান্ধীজীও বলেন, “কেহ কাহারও সহিত একত্র ভোজন করিলে অন্যায় কি

অধর্ম্ম করে, এমন অসঙ্গত কথা আমি কিছুতেই বলিতে পারি না।”
গিরিশচন্দ্রও বলিতেন, “আত্মা সবার সমান। কার্য্যে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল প্রভেদ। ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্মেও চণ্ডাল হয়, ব্রাহ্মণ-পুত্র গৌতম চণ্ডাল হয়েছিল। যার কৃতঘ্নতায় শৃগাল কুকুরে তার মাংস ভক্ষণ করে নাই। যে তপস্যায় আত্মদর্শন করে সেই-ই ব্রাহ্মণ, নচেৎ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে, দু’গাছা সূতো গলায় দিয়ে, ‘ব্রাহ্মণ’ ‘ব্রাহ্মণ’ ক’রলে কি ব্রাহ্মণ হয় ?”— তপোবল ১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য।

গিরিশচন্দ্র এই ভোজনব্যাপার সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। উপরোক্ত নাটকেই সদানন্দ ব্রহ্মণ্যদেবকে (বালক-বেশী নারায়ণকে) বলিতেছেন, “ছোঁড়া, তোমার হ্যাঙ্‌লা বৃত্তিতে আমিই চ’মকে যাই! চাঁড়াল মাগীর পান্তাগুলি সেদিন মারলে, আমি দেখে অবাক্‌॥”

ব্রাহ্মণ্যদেব তাহাতে উত্তর করিলেন—

“আহা, সে না খেলে যে মাগী দুঃখ ক’রতো!”

তারপর গান ধরিলেন, “আমায় যে যা দেয়, তাই খাই!”

এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একটী কথা মনে হইতেছে। তিনি যখন যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, একেবারে ধরিয়া বসিলেন যে তিনি ধুনী নাম্নী এক কামারণী ভিন্ন অপর কাহারও কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। কামার পুকুর অঞ্চলে চিংড়িমাছ প্রায় পাওয়া যায় না, একদিন এই ভিক্ষামাতা কামারণী চিংড়িমাছ পাইয়াছিলেন। যদিও তিনি তাঁহার গদাইকে যেখানে যা উত্তম সামগ্রী পাইতেন খাওয়াইতেন, কিন্তু তাঁহার বড়ই ক্ষোভ ছিল ব্রাহ্মণের পুত্রকে রন্ধন করা দ্রব্য দিতে পারিতেন না। চিংড়িমাছ পাইয়াছেন কিন্তু ক্ষুদিরাম প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ ন’ন,

ব্রাহ্মণেরও দান গ্রহণ করিতেন না। কামারণী চিংড়িমাছ দিলে তা গ্রহণ করিবেন না! চিংড়িমাছ রন্ধন করিয়া কলসী কক্ষে বারি আনিবার নিমিত্ত দোরে সিকল দিয়া যাইতেন, হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, গদাই শিকল খুলিয়া চিংড়িমাছ নিয়া পলাইতেছে। দেখিবামাত্র ধুনী চীৎকার করিতে লাগিলেন, ও গদাই, খাসনে—খাস্‌নে!" গদাই তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া খাইতে খাইতে চলিল।

দেবাখ্যান ছাড়িয়া দিলেও এ সম্বন্ধে দুইজন অতিমানব শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর আদর্শ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিব। একদিন স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণ করিতে করিতে তাম্রকূট সেবনে ইচ্ছা হয়, দেখিলেন এক বৃক্ষতলে কয়েকজন ব্যক্তি বসিয়া ধূমপান করিতেছে, তিনি তাহাদের নিকট কলিকাপ্রার্থী হইলেন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল,—"মহারাজ, হাম্‌লোক ভঙ্গী হ্যায়"। ভঙ্গী অর্থে মেথর। 'ভঙ্গী' নাম শুনিয়া স্বামীজী প্রথমে একটু ফিরিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মতিরস্কার করিয়া ভাবিলেন, "আমি কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যের উপযুক্ত নই যে 'ভঙ্গী' নাম শুনিয়া আত্মাভিমানে পশ্চাৎপদ হইতেছি? যে শ্রীরামকৃষ্ণ অভিমান দূরীকরণার্থে স্বহস্তে আবর্জ্জনা-স্থান ধৌত করিয়া আপন লম্বিত কেশদ্বারা উহা মুছিয়া দিতেন, তাঁহার পদাশ্রিত হইয়া আমার এত অভিমান!" তিনি ছিলিম লইয়া ধূমপান করিলেন।

এই প্রসঙ্গ গিরিশচন্দ্র প্রমুখ সতীর্থগণের সহিত কথা হইতেছিল। গিরিশচন্দ্র পরিহাস করিয়া বলিলেন—

"তুই গাঁজাখোর, তামাক খাবার ঝোঁকে মেথরের কল্‌কে টেনেছিলি।"

বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন, "না হে, ইহাতে গুরুদেব আমাকে জীবন-রক্ষাপ্রদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি আর কাহাকেও ঘৃণা করিতাম না।"

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিলেন, "আমি একস্থানে আছি, তথায় আমার নিকট উপদেশ লইবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। ততদিন অনবরত লোক-সমাগম, আলাপ করিয়া সকলে উঠিয়া যায়, কিন্তু আমার আহার হইয়াছে কিনা, তাহা কেহ একবারও জিজ্ঞাসা করে না। তৃতীয় রাত্রে যখন সকলে চলিয়া গিয়াছে, এক দীন ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, 'মহারাজ, আপনি তিন দিন তো অনবরত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু জলপান পর্য্যন্ত করেন নাই, ইহাতে আমার ব্যথা লাগিয়াছে। আমি ভাবিলাম, নারায়ণ স্বয়ং দীনবেশে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কিছু আমাকে আহার করিতে দিবে?" সে ব্যক্তি কাতরভাবে উত্তর করিল, "আমার প্রাণ চাহিতেছে, কিন্তু কিরূপে আমার প্রস্তুত করা রুটি দিব? যদি বলেন, আমি আটা ডাল আনি, রুটি ডাল প্রস্তুত করিয়া লউন।" সে সময় আমি সন্ন্যাসীর নিয়মানুসারে অগ্নি স্পর্শ করি না। তাহাকে বলিলাম, "তোমার স্তপ্রত করা রুটি আমাকে দাও, আমি তাহাই আহার করিব।" শুনিয় সে ব্যক্তি ভয়ে অভিভূত! সে খেতরীর রাজার প্রজা। রাজা যদি শুনেন যে চামার হইয়া সন্ন্যাসীকে তাহার প্রস্তুত করা রুটি দিয়াছে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিবেন এবং দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার ভয় নাই, রাজা তোমাকে শাস্তি দিবেন না।" এ কথায় তাহার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল না। কিন্তু বলবান দয়াপ্রভাবে ভাবী অনিষ্ট

উপেক্ষা করিয়া ভোজ্যবস্তু আনিয়া দিল। বিবেকানন্দ বলিতেন, "সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণপাত্রে সুধা আনিয়া দিলে সেরূপ তৃপ্তিকর হইত কি না সন্দেহ।" তাঁহার নয়নধারা নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ব্যক্তির দয়া দেখিয়া স্বামীজী সেদিন মনে মনে ভাবিয়াছিলেন—

"এরূপ শত সহস্র উচ্চচেতা ব্যক্তি কুটীরে অবস্থান করে, আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করি।"

—গিরিশচন্দ্রের "স্বামী বিবেকানন্দ" প্রবন্ধ—রত্নমঞ্জরী, ফাল্গুন, ১৩১১

বস্তুতঃ যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করি—তাহাদের অনেকের অপেক্ষা আমরা কত নীচমনা! মানুষের পরিচয় হৃদয়ে, অতএব হৃদয়ের সন্ধান না করিয়া আমরা অভিমান ও সংস্কারের বশীভূত! তাই সবারই আত্মা যখন সমান, কাহারও সহিত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পানাহারে কোনও দোষ নাই। এ সম্বন্ধে দেশবন্ধু বরাবর বলিতেন, "চণ্ডালও তো মানুষ, আমারই মত হিন্দু, যদিও সে সভা করে না, বক্তৃতা দেয় না, স্বরাজের কথা কহিতে কেহ তাহাকে শেখায় নাই।" মহা-প্রস্থানের পূর্ব্বে বার বার তাঁহার মুখে শুনিয়াছি—

"আমার দিন তো ঘনিয়ে এসেছে। মনে বড় দুঃখ রৈল, চণ্ডালদের মধ্যে মিশে কাজ করবার অবকাশ পেলাম না। তাদের সঙ্গে থেকে হরিনাম করতে পারলাম না। তাদের সুখদুঃখের অংশী হ'লাম না। এবার যদি বাঁচি, তবে গিয়ে সেই কাজ করবো, আর যদি না বাঁচি প্রার্থনা করবো যেন চণ্ডাল হ'য়ে জন্মগ্রহণ করি।"

কিন্তু পানাহার সম্বন্ধে একটা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনও ব্যাপারেই জোর করিয়া কাহাকেও বাধ্য করা উচিত নহে। জাতিধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে কাহারও বিরুদ্ধে কোন কার্য্যে এবং কোন প্রকারে বলপ্রয়োগ করা উচিৎ নহে। মহাত্মা গান্ধীর এই মত।

ইহার অর্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কাহাকেও অন্য জাতির লোকের সহিত খাইতে জোর করিয়া বাধ্য করিবে না। অনেকের প্রবৃত্তি নয় যে অন্যের হাতে খায়। সে স্ববর্ণেরই হউক কি পৃথক বর্ণেরই হউক। কিন্তু যদি এক শ' জন ব্রাহ্মণের মধ্যে দশ জনও অন্য বর্ণের লোকের সহিত পানাহারে লিপ্ত হয়, তবে বাকী নব্বই জন বাধা দিলে তাহারাও মহাত্মা গান্ধীর আদেশ অমান্য করার দোষে লিপ্ত হইবে এবং ইহারাও সংস্কারের বিরোধী মনে করিতে হইবে। কারণ জোরকরা সকলের পক্ষেই অন্যায় এবং জোর করিলে তাহারাও সমভাবে মহাত্মাজীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করিয়া দিবে। বস্তুতঃ এই নীতি অবলম্বন করিলেই সংস্কার শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে, কারণ পানাহার সম্বন্ধে উদার ভাবসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যাই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাইবে। তবে যদি কেহ এখনও অগ্রসর না হইয়া থাকেন, হিংসা বা বলের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া মহাত্মাজীর কথানুযায়ী প্রেম, ত্যাগ ও ভালবাসার দ্বারা বিরোধী দলকে নিজেদের দলে আনয়ন করিতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

এখন দেখা যাউক জাতিভেদ প্রথা বলবৎ থাকা উচিৎ কি অনুচিত। মহাত্মাজী ডাক্তার সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারযোগে জানাইয়াছেন "জাতিভেদ যাওয়াই উচিত, Caste must go—।" অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন, চারি বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বিদ্যমান থাকিবে, উপবিভাগ সব লুপ্ত হইবে কারণ গান্ধীজী ১৯২১ খৃষ্টাব্দে না কি তাহাই বলিয়াছিলেন এবং আজও নাকি তাঁহার সেই মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। যদিই বা গান্ধীজী এই মত পোষণ করেন, তাহাতেও বাঙ্গলাদেশে জাতিভেদ প্রথা টিঁকিয়া থাকিতে পারে না কারণ আমাদের মধ্যে কেবল চারি

জাতি নয়, এখানে ছত্রিশ জাতি। চারিজাতির কথা উঠিলেই বরং তাহার পূর্ব্ব হইতেই নমঃশূদ্র আপনাকে ব্রাহ্মণ; পোদ রাজবংশ, টিবর, প্রভৃতি আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় এবং ব্যবসায়ী মাত্রই আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিবে। এমতাবস্থায় নমশূদ্র ও ব্রাহ্মণ পরস্পরের সহিত ও সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামধেয় লোক পরস্পরের সহিত পানাহারে লিপ্ত হইলে কার্য্যতঃ জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব কোথায় থাকে? অতএব দেখা যাইতেছে, চারিবর্ণই হউক বা একবর্ণ বিশিষ্টই হউক জাতিভেদ প্রথা যাইতে বসিয়াছে, যাইবে, কাহারও সাধ্য নাই তাহা রোধ করে, কারণ যাহা গুণ ও কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ তাহা বংশানুগত হইয়াছে। একজন সাধুচরিত্র, স্বদেশসেবক পরোপকারী নমঃশূদ্র ও একজন পরদ্রোহী, পরস্বাপহারক এবং স্বেচ্ছাচাররত ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণটী উচ্চবংশে জন্ম বলিয়া যদি নমঃশূদ্রটীর প্রতি যথেচ্ছাচার করেন তবে উহা কোন শাস্ত্র বা ধর্ম্মানুমোদিত নয়। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রও বলিতেছেন :—

হইলে আচার ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ চণ্ডাল
সদাচারী শবর ব্রাহ্মণ। —তপোবল।

নারীদের সম্বন্ধেও বলেন, "যে রমণী শুদ্ধাচার, যদিচ সে চণ্ডালিনী, আচার প্রভাবে তার গর্ভে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ ক'রবে—শাস্ত্রমর্ম্ম এইরূপ"— তপোবল।

অন্যত্র গিরিশচন্দ্র "সৎনাম" নাটকে বলিতেছেন—

কি হেতু যবনগণ অজেয় ভারতে?
বীর্য্যহীন হিন্দুগণ এ নহে কারণ—
মেরুশির, উপত্যকা, বিশাল প্রান্তরে
হিন্দুর বীরত্ব-গাথা রয়েছে অঙ্কিত।

হিন্দুর পতন অনৈক্য কারণ ;—
দ্বেষ হিংসা পরস্পরে,
উচ্চনীচ জাতি-অভিমান—
দূরীভূত কুমন্ত্রীর উপদেশে—
ধর্ম্ম-অভিমানে
স্বজাতি-বান্ধব পরিত্যাগ।
অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বার্থপর ব্রাহ্মণের মুখে,
হীনমতি অশাস্ত্রীয় শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনি,
অশাস্ত্রীয় হীনাদর্শ করিয়া আশ্রয়
ভেদবুদ্ধি জন্মেছে ভারতে।
সেই হেতু স্বরূপ-শাস্ত্রের মর্ম্ম করিয়ে লঙ্ঘন
স্বতন্ত্রতা-ভাব যত হিন্দুর হৃদয়ে,
ভারতের পতনের কারণ এ সব।
অংশে অংশে পরাজিত হয়েছে ভারত।

—সৎনাম ২য় অঙ্ক ১ম গ।

অতএব কি জাতীয়তার দিক্ দিয়া কি সামাজিক মঙ্গলের জন্য, কি হৃদয়ের দিক্ দিয়া জাতিভেদ রহিতই কর্ত্তব্য। কিন্তু সাবধান যেন আবার অর্থ প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশে নূতন জাতিভেদ প্রথা না প্রবর্ত্তিত হয়। এবিষয়ে স্বরাজ-সাধনায় নিরত শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দকেও সাবধান হইতে হইবে, তাঁহারা যেন ধনী ও নির্ধনীর পার্থক্য আনিয়া সাধনা পণ্ড করিয়া দেন না। সকলের স্মরণ রাখা উচিৎ, 'সকল দেশের চাইতে শ্যামল' আমাদের বাঙ্গালা দেশ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ, চিত্তরঞ্জন ও নরেন্দ্রনাথ সেবিত এই বাঙ্গলা কৃষকদের, শ্রমজীবীদের, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ধনী

নির্ধন সকল বাঙ্গালীর। তাই বিবেকানন্দের শঙ্খধ্বনি আবার বাঙ্গলার প্রাসাদে, কুটীরে, পাহাড়ে, গহ্বরে, শ্যামল ক্ষেত্রে ও রাজপথে, প্রান্তরে, নদীতীরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সুপ্ত বাঙ্গালীকে জাগাইয়া এক করিয়া দিক্—আবার "নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপরির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, * * * তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করেছে তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি! এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে। আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম! অতীতের কঙ্কালচয়, হে উচ্চবর্ণ, এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান ভারত।"

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অস্পৃশ্যতা

গুরুবায়ুর মন্দির এক্ষণে হিন্দু জনসাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। উক্ত মন্দির-সংক্রান্ত ব্যাপার সকলেই জানেন, এক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। মহাত্মা গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে প্রায় ব্যর্থকাম হইয়াছেন। তাঁহার জীবন যে স্বরাজ-সাধনায় নিযুক্ত ছিল, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিবার কোনো সম্ভাবনা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে না। গান্ধীজী চরখা ও অসহযোগ দ্বারা, সত্যাগ্রহ দ্বারা, আইন অমান্য

আন্দোলন দ্বারা নিজের অন্তঃকরণের দৃঢ় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াও কোনোরূপেই সফলকাম হইতে পারেন নাই। ভারতবাসী হিংস ও অহিংস দ্বিবিধ সংগ্রামেই পরাজিত ও পরাভূত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য হইলেও স্বাধীনতাযুদ্ধে সাফল্য প্রাপ্ত জাতি সমূহের সমশ্রেণীতে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যর্থকাম ও রাজ-বন্দীত্বপ্রাপ্ত গান্ধীজী এক্ষণে ক্ষেত্রান্তরে স্বকীয় কর্ম্মশক্তি নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে বহু প্রাচীন সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার নামে সংহারব্রত সাধনের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশানুযায়ী সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রথম কার্য্য আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রতিপক্ষ গবর্ণমেণ্টও ঔদার্য্য-বশতঃ তাঁহার সহায়তা করিতে কৃপণতা করেন নাই। পুণা-চুক্তির ফলে উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীবিভাগের পরিবর্ত্তে এক অখণ্ড হিন্দুজাতি বলিয়া সরকারী কাগজপত্রে ও রাজনীতিক বিভাগে হিন্দু জনসাধারণের সম অধিকার স্বীকৃত হয়। গান্ধীজীর দ্বিতীয় অভিযান তাঁহার স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে। গুরুবায়ু ইহার উপলক্ষ্য বা কর্ম্মকেন্দ্র স্বরূপ।

গান্ধীজী বিশ্বের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর স্থলভাগের অন্তর্গত কতিপয় দেশের কতিপয় শিক্ষিত জাতির দিকে তাকাইয়া ভারতবাসীকে তাহাদের সমশ্রেণীতে তুলিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। তাহাদের মধ্যে জন্মগত অধিকার সকলেরই সমান। কর্ম্মগত বিভিন্নতা ও বৈষম্য সে সব দেশেও আছে এবং আর্থিক বৈষম্যের তো কথাই নাই। গান্ধীজী সাম্যবাদী কি না জানি না, তবে আপাততঃ হিন্দুদের মধ্যে জন্মগত বৈষম্য বিভেদ উঠাইয়া দিতেই তিনি বদ্ধপরিকর।

গান্ধীজীর উদ্দেশ্য মহৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য পক্ষেও ভাবিবার বিষয় আছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ন্যায় সম্প্রদায়গত বা সমাজগত স্বাধীনতাও মানুষের কাম্য। গান্ধীজী সনাতনী হিন্দুদের এই স্বাধীনতা নাশ করিতে সমুদ্যত। গুরুবায়ুর মন্দির, এবং ভারতের প্রায় সমুদয় দেবমন্দিরই উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সম্পূর্ণ নিজ ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠিত। ঐ সকল দেবমন্দিরের ইতিহাস বা পূজাপদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ঐ সকল মন্দির ঈশ্বরের কোনো না কোনো শক্তি বিশেষের কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি, অথবা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বর্ণিত মহাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তির উপাসনা-ক্ষেত্র রূপে কতিপয় অল্প সংখ্যক সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য জন সাধারণের মন্দির প্রবেশ বা পূজাদি উক্ত মন্দির-প্রতিষ্ঠাতৃগণের অভিপ্রেত ছিল না। তাহা থাকিলে বর্ত্তমান আন্দোলনের কোনো প্রয়োজনই হইত না। মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন ঐ মন্দির-প্রতিষ্ঠাতৃগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর জুলুম মাত্র। গান্ধীজী বোধ হয় জানেন না, অনেক প্রাচীন পিতামাতা পুত্র-কন্যার হস্তেও আহার করেন না। অনেক স্বামী স্ত্রীর প্রস্তুত দ্রব্যাদিও দেবতার ভোগে অর্পণ করেন না। গান্ধীজীর মতে এই পুত্র কন্যা ও পত্নীর কি অনুরূপ আন্দোলন বা প্রায়োবেশন কর্ত্তব্য নহে? ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি দশ বৎসর মেথরের কাজ করেন এবং মেথর যদি দশ বৎসর যাবৎ শুদ্ধাচারে তপস্যা করেন, তবে ব্রাহ্মণ (সাবিত্রী পতিত না হইলে) গঙ্গাস্নানান্তে বা অন্যবিধ প্রায়শ্চিত্তান্তে শুদ্ধ হইয়া শালগ্রাম পূজা করিতে পারিবেন,—কিন্তু উক্ত মেথর ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা দান বা উপদেশ দান করিতে পারিলেও শালগ্রাম

স্পর্শের অধিকারী হইবেন না, ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের অভিপ্রায়। হিন্দুশাস্ত্রে বেদপাঠ, বিগ্রহ-সেবা, দীক্ষা-দান, যজন-যাজন, প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তি জন্মগত ব্রাহ্মণের জন্যই সুনির্দ্দিষ্ট। কচিৎ অন্য কোনো বিশেষ অনুশাসনের প্রভাবে কোনো বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তির গ্রহণীয় হইলেও বেদাভ্যাস এবং শালগ্রাম-সেবা অথবা বেদমন্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহসেবা ব্রাহ্মণেতর বর্ণ কখনই অবলম্বন করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ ও স্ত্রীজাতির জন্য তন্ত্র পুরাণ সংহিতা শাস্ত্র, গঙ্গাদি সর্ব্বজনগম্য তীর্থ, তুলসী, বিল্ব, বট অশ্বত্থাদি পুণ্যবৃক্ষ, গোমাতা এবং অমন্ত্রে স্থাপিত দেববিগ্রহ আছেন। যদি হিন্দুধর্ম্মে আস্থা থাকে, তবে তাঁহারা উক্ত সকলের সেবা সম্বলিত স্বধর্ম্মাচরণ ও মাতৃপিতৃ-গুরুভক্তি, পতিভক্তি ইত্যাদি দ্বারাই ধর্ম্মলাভ করিতে পারেন। আকাশ, বাতাস, অগ্নি, জল, চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ অরণ্য, পর্ব্বত, শ্যামলা পৃথিবী, ইহাদিগকে তো কেহ কাড়িয়া লয় নাই। বেদমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শালগ্রামাদি লইয়া এই কাড়াকাড়ি কেন?

গান্ধীজী কি বিগ্রহ মানেন? যদি মানেন তবে বিগ্রহের পূজা পদ্ধতি এবং তৎসম্পর্কীয় বিধি-নিয়ম মানিতে হইবে। ঐ সকল বিধি-নিয়ম আধুনিক নহে, উহা চিরন্তন। ঐ সকল অনুশাসনে যদি অস্পৃশ্য জাতির সম্বন্ধে উদারতা না থাকে; তবে সেই উদারতা প্রদর্শন করিতে যাওয়া ঐ অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা নহে কি? যদি অনুশাসন না মানেন, তবে বিগ্রহ মানিবারই বা সার্থকতা কি? যদি বিগ্রহ না মানেন, কেবল রাজনৈতিক বা সমাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য লইয়াই মন্দির প্রবেশ আন্দোলন সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে বিগ্রহবিশ্বাসী শাস্ত্রবিশ্বাসী সনাতনীদের উপর অত্যাচার করা হয় না কি! এক দিকে সনাতনী হিন্দু এবং তাঁহাদের স্বকীয় ধর্ম্ম বিশ্বাস, অন্যদিকে গান্ধীজীর জীবনব্রত, এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে, গান্ধীজীর জীবন রক্ষাও যেমন সম্ভবপর নয়, সনাতনীদের জীবনও তেমনই বিপন্ন। কারণ, ক্রমশঃ সনাতনীদের জনসংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে এবং চিন্তা নাই, দিন কতক পরে রাশিয়ার ন্যায় ভারতীয় ধর্ম্মমন্দির গুলিও ক্রমে ক্রমে ম্যুজিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

শ্রীমতী সত্যবাণী দেবী

সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র-যাত্রা

সাতবার নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম আর কখনও সমুদ্রের তীর মাড়াইব না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলাম না। একদিন বাদ্শা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'সিন্ধবাদ, তুমি অনেক দেশে বাণিজ্য করিয়াছ, তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে পৃথিবীর বর্ত্তমান আইন অনুসারে এই সকল দেশের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার আমার জন্মিয়াছে। এই প্রভুত্বের বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য তোমাকে পাঠাইতে চাই। তুমি গিয়া বলিবে, 'আমি জাপানের মন্ত্রশিষ্য। কাহারও সিংহাসন দখল করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু ইচ্ছা করি, তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যহ পাঁচশত টন করিয়া উৎকৃষ্ট, উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর আরব্য বালি ও কাঁকর ক্রয় করুক।'

আমি বলিলাম, 'ধর্ম্মাবতার, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,'—

বাদ্শা বাধা দিয়া বলিলেন, 'তোমাকে সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে না। আজকাল উড়োপ্লেন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে তুমি আকাশপথে যাত্রা করিতে পার। আকাশপথ তোমার পরিচিত। তাই তোমাকেই এ কার্য্যে নিয়োগ করিলাম।'

আমার আর কিছু বলিবার রহিল না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, চীনযাত্রী এক উড়ো জাহাজে চড়িয়া বসিলাম।

আকাশ হইতে মুগ্ধনেত্রে দূরায়মান দেশসমূহের নব নব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। সহসা চোখ পড়িল ভারতবর্ষের উপর। আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। দেখিলাম, দেশের মধ্যস্থলে এক বিরাট ডিম্বাকৃতি পদার্থ পড়িয়া রহিয়াছে। এবং কয়েকজন ক্ষুদ্রকায় মানুষ এইটিকে দখল করিবার জন্য দেবাসুরের যুদ্ধ বাধাইয়াছে। সন্দেহ হইল, বস্তুটি বোধ হয় রক পাখীর ডিম। কিন্তু রক পাখীর ডিমের জন্যও এতটা কাটাকাটি, লাঠালাঠি শোভন মনে হইল না।

সহসা লোকের ঠেলাঠেলিতে, বা যে কোন কারণেই হৌক, ডিম্বটি ফাটিয়া গেল, এবং তাহার মধ্য হইতে বাহির হইল এক অতিকায় অশ্ব। জন্মগ্রহণ মাত্র যুযুৎসু বীরগণের মুখে এক একটা লাথি মারিয়া তিন লম্ফে কোথায় অদৃশ্য হইল।

এই সময়ে এরোপ্লেনে কি বিকার উপস্থিত হওয়াতে, আমরা তীরবেগে নীচে নামিতে লাগিলাম। তাই, উক্ত বীরগণের পরিণাম কি হইল দেখিবার সুযোগ হইল না।

পতনের বেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। জ্ঞান হইলে দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের শাখায় কাপড় আটকাইয়া পড়িয়া আছি। আশে, পাশে, চতুর্দ্দিকে, যতদূর দৃষ্টি চলে, অবিচ্ছিন্ন বৃক্ষশ্রেণী। নিম্নে নীরন্ধ্র অন্ধকার। তবে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে লক্ষ্য করিলাম, ভগ্ন এরোপ্লেনের একটি অংশ তলায় পড়িয়া আছে; এবং তাহার উপর বসিয়া একটা ভাল্লুক এরোপ্লেন-চালকের ক্ষত অঙ্গ হইতে পরম নিরুদ্বেগে রক্ত পান করিতেছে। ইহারই কিছুদূরে দুইটি জলন্ত গোলক দৃষ্টিগোচর হইল। গোলক দুইটি তড়িদ্‌গতিতে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি

বুঝিলাম, একটা ব্যাঘ্র আমাকে লক্ষ্য করিয়া লাফ দিয়াছে। অমনি এক ধাপ নীচে নামিয়া আত্মরক্ষা করিলাম। কিন্তু ব্যাঘ্রকে আর ফিরিতে দেখিলাম না। তখন উপরে চাহিয়া দেখি, ব্যাঘ্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এক অজগরের বিস্তারিত মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে। অজগর এখন তাহার বাকী অংশ গিলিবার প্রয়াস করিতেছে। ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল।

আমি কোথায় পলাইব ভাবিতেছি, এমন সময়ে এক মত্ত হস্তীর দল সর্প ও ব্যাঘ্র সমেত শাখাটা ভাঙিয়া লইয়া আস্ফালন করিতে করিতে চলিয়া গেল। শাখার ব্যবধান দূর হওয়াতে খানিকটা সূর্য্যালোক বনমধ্যে প্রবেশ করিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম ভল্লুক অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু তাহার স্থানে আসিয়াছে তিনটা গণ্ডার ও সাতটা মহিষ। এরোপ্লেনকে মধ্যে রাখিয়া তাহারা ঘোর যুদ্ধে ব্যাপৃত। শেষে ইহাদের সমবেত শৃঙ্গ-তাড়নায় এরোপ্লেন ভূমি হইতে বত্রিশ ফুট ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্থানান্তরে পতিত হইল; এবং পেট্রলের উগ্রগন্ধ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

আমার মাথায় এক বুদ্ধি গজাইল। একটা দেশলাই জ্বালাইয়া মাটীতে নিক্ষেপ করিলাম। দেখিতে দেখিতে ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, বনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত; এবং অসংখ্য বন্যজন্তুর উৎকট আর্ত্তনাদে আকাশ ভরিয়া গেল।

আমি দেখিলাম কাজটি ভাল করি নাই। বন্যজন্তুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইলাম বটে। কিন্তু আগুনে কাবাব বনিব এরূপ সম্ভাবনা হইল। তাই তাড়াতাড়ি গাছের সর্ব্বোচ্চ শাখায় উঠিলাম, এবং সেখান হইতে প্রাণপণে লাফ দিলাম।

লাফ দিবামাত্র আমার কটিসংলগ্ন প্যারাচুট খুলিয়া গেল। আর,

তাহার ভিতর গরম বাতাস প্রবেশ করাতে অনেকক্ষণ ফানুসের মত উড়িয়া এক স্থানে পতিত হইলাম। কিন্তু ভূমিস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই কোথা হইতে সহস্রাধিক সুসজ্জিত সৈন্য আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল।

দলপতি প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি আগুন জ্বালাইয়াছ?' আমি আগুনের ইতিহাস জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিলেন, 'আমরা চামড়া-পোড়া গন্ধ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি, আমাদের বিশ্বাস, তুমি চীনাবাড়ীর জুতা পুড়াইয়াছ।' আমি বলিলাম, 'অনেকগুলি জীব পুড়িয়া মরিয়াছে। বোধ হয় তাহারই এই গন্ধ।'

'মিথ্যা কথা!' বলিয়া তাহারা আমাকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

সহরে পঁহুছিয়া আমার বিচার হইল। আমার কাহিনী শুনিয়া হয় ত তাঁহাদের বিশ্বাস বা দয়া হইয়া থাকিবে। তাই সহজেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কেবল একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দিতে হইল, 'আমি বা আমার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদি কাহারও চীনাবাড়ীর জুতা পুড়াইবার প্রবৃত্তি বর্ত্তমানে নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবে না।'

যে বন হইতে এই অদ্ভুত উপায়ে উদ্ধার পাইলাম, শুনিয়াছি, তাহার নাম সুন্দরবন। এই হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল দুস্তর অরণ্যকে দেশের লোকে 'সুন্দর' আখ্যা দিল কেন, তাহা বুঝিলাম সহরে আসিয়া। সহরের যে অবস্থা দেখিলাম তাহাতে নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিল যে এ দেশের একমাত্র সুন্দর স্থান ঐ বন।

দেখিলাম, প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ সৌধরাজি। ইহাদের প্রত্যেকটির উপরের কয়েকতলা ভগ্নস্তূপে পরিণত, এবং নীচের কয়েকতলার প্রত্যেক জানালা দরজা হইতে ইষ্টকরাশি অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতেছে, সম্মুখবর্ত্তী সৌধগুলির জানালা দরজা লক্ষ্য করিয়া।

এরূপ হইবার হেতু জানিতে চাহিলে, একজন বলিলেন, 'আহা, দেখিতেছ না, ইহারা যে প্রতিবেশী ? ইহাদের এক দলের সদর দরজা রাস্তার উত্তর দিকে, আর একদলের দক্ষিণ দিকে। কাজেই মনো-মালিন্য। কাজেই একদল আর একদলকে নিঃশেষ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর। বছরের পর বছর ধরিয়া ছুঁড়িবার মত ইট পথে ঘাটে পাওয়া যায় না। তাই ইঁহারা নিজের নিজের দেয়াল ভাঙিয়া ইট সংগ্রহ করিয়াছেন।'

প্রশ্ন করিলাম, 'এইরূপই কি চিরকাল চলিবে ?'

উত্তর হইল, 'বোধ হয় চলিবে না। কারণ সম্প্রতি প্রস্তাব হইয়াছে, রাস্তার মাঝামাঝি একটা প্রাচীর উঠাইবার। তাহাতে ইট ছোঁড়া বন্ধ না হইলেও, মাথাফাটা বন্ধ হইবে।'

আমি অবাক হইয়া রহিলাম।

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কাঁকুড় খাও ?' আমি বলিলাম, 'না, খাই নাই। তবে পাইলে খাইতে পারি।'

'তবে রে !' বলিয়া ধাঁ করিয়া আমার মাথায় এক লাঠি বসাইল।

আঘাতে বিহ্বলপ্রায় হইয়া, আমি দ্রুতপদে এক মুদীর দোকানে আশ্রয় লইলাম।

মুদী বলিল, 'ছি, ছি ! করিয়াছ কি ? ফুটিখেগোদের কাছে কাঁকুড় খাওয়ার কথা স্বীকার করিতে আছে ?'

আমি। 'কেন ? কাঁকুড় খাইলে কি হয় ?'

মুদী। 'রাগ হয় ! আর কি হইবে ? যাহা হউক, এখানে তোমার কোন ভয় নাই। কারণ, আমি কাঁকুড় খাই না। যদি কখনও খাইয়া ফেলি, ত ডান হাতে টৈরী কাটিয়া কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিব।'

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একদল অর্দ্ধনগ্ন লোক পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে দোকানে প্রবেশ করিল। তাহারা জোর করিয়া মুদীকে বাঁধিয়া ফেলিল, দোকানের আসবাবপত্র চূর্ণ করিল, টাকাকড়ি নিঃশেষে লুট করিল, চাল-ডাল-মসলা একাকার করিয়া মিশাইয়া রাস্তায় ছড়াইয়া দিল, তৈলের ভাণ্ডগুলি উপুড় করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইল, এবং আমার পাগড়ীটা আগুনে নিক্ষেপ করিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে চলিয়া গেল।

শুনিলাম, এই হাস্যরসিকগণ ক্ষুধার তাড়নায় নাকি এইরূপ করিয়া থাকে।

'কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি কি করিয়া এমন খাদ্যবস্তুর অপচয় সহ্য করিতে পারে?'

'আহা! ক্ষুধায় উন্মত্ত হইয়াছে যে। এখন কি অত বিচার আছে?'

সর্ব্বস্বান্ত মুদীর গলগ্রহ হইয়া থাকা অসম্ভব। এদিকে, কাহারও গলগ্রহ না হইলেও আমার চলিবে না! কারণ, আমার সঙ্গে যে সব ধনরত্ন ছিল তাহাও অপহৃত হইয়াছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, গৃহস্থদের রক্তলিপ্সা কিঞ্চিৎ উপশমিত হইলে, আমি নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে পথে বাহির হইলাম। মহামূল্য পাগড়ীটা ভস্মীভূত হওয়াতে নগ্নশিরেই পথ চলিতে হইল! এমন লজ্জাকর ঘটনা জীবনে আর কখনও ঘটে নাই।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে পশ্চাতে তুমুল কোলাহল শুনিতে পাইলাম। কতকগুলা লোক ছুটিয়া আসিতে আসিতে চীৎকার করিতেছে, 'ধর্ ব্যাটা বেটেকোকে'।

ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম। অমনি

লোকগুলা ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল। তখন বুঝিলাম 'বেটেকো' নামে ইহারা আমাকেই চাহিয়াছিল। মাথায় টাক না থাকাতে এবার বোধ হয় বিপদে পড়িলাম।

টেকোর দল ধরাধরি করিয়া আমাকে একটা অন্ধকার গৃহে লইয়া গেল। ঘরের এক কোণে একটি সাতরঙা জালা উপুড় করা। এবং ইহার কিছু দূরে একটি মিটমিটে মাটীর প্রদীপ হইতে তৈল চুয়াইতেছে। এই তৈল আমার মাথায় মাখান হইল। তারপর, কয়েকটা মশাল জ্বালাইয়া আমার চুলগুলি পুড়াইয়া দেওয়া হইল। আমি মাথার যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতে লাগিলাম, আর টেকোর দল আমাকে ঘিরিয়া পনের মিনিট নিজের নিজের টাক চাপ্ড়াইল ও নাক মুখ হইতে একটা অমানুষিক শব্দ বাহির করিতে লাগিল। বুঝিলাম জালাদেবতার পূজা হইতেছে।

আধ ঘণ্টায় টেকো হইয়া গেলাম, এবং মুক্তিলাভ করিলাম। বাহিরে আসিবার সময় দুয়ারের দুই পার্শ্বে স্তূপীকৃত ইট, পাথর, ভাঙা কাঁচ ও লৌহ দেখিয়া প্রশ্ন করিলাম, 'এগুলির উদ্দেশ্য কি ?'

উত্তর—'যদি কেহ আমাদের দেবতার অপমান করে, তবে এগুলির সাহায্যে তাহার চৈতন্য লোপ করি।'

'দেবতার কিসে অপমান হয় তোমরা বুঝিবে কিরূপে ?'

'বুঝিব বৈ কি। মন্দিরের কাছাকাছি কেহ নিঃশ্বাস ফেলিলেই দেবতার অপমান হইবে।'

'তবে তোমরা নিঃশ্বাস ফেলিতেছ কোন সাহসে ?'

'আমাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা নিঃশ্বাস ফেলিতে পারি। নাক ঝাড়িতেও পারি। কিন্তু বিধর্ম্মীকে দম বন্ধ করিয়া মন্দির পার হইতে হইবে।'

তিন দিনে এই অসাধারণ দেশের যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতে

আর এক দণ্ড এ স্থানে বাস করিতে সাহস হইল না। আমার মুখে যে কয়টা সোনার দাঁত ছিল, তাহাদের বিনিময়ে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সংকল্প করিলাম। এ দেশে সোনার দর নাই। লোকে এক টুক্‌রা কাগজের জন্য একসের সোনা বিসর্জ্জন দিতে পারে। সুতরাং আমি যাহা পাইলাম তাহা অতি যৎসামান্য। এডেনের টিকিট ক্রয় করিতে ইহার বারো আনা খরচ হইয়া গেল।

যাহা হউক, ভাবিয়াছিলাম, একবার জাহাজে উঠিতে পারিলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিব। তখন জানিতাম না যে ভারতভূমি-স্পর্শের অভিশাপ কালাপানিতেও আমাদের অনুসরণ করিবে। ইহার আভাস পাইলাম জাহাজে উঠিবার সময়। দেখিলাম, জেটীর মাঝামাঝি একটা প্রাচীর তুলিয়া দুইটি পথ করা হইয়াছে। একটি মুসলমানদের, আর একটি অমুসলমানদের জন্য। জাহাজের উপরেও এই ব্যবস্থা ;—মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য পার্টিশন। শুনিলাম, সম্প্রতি মহামানব-জাতিকে এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

—'কিন্তু, অমুসলমান বলিয়া কি কোন একটি জাতি আছে? ক্রিশ্চান, জৈন, হিন্দু—'

'হাঁ, হাঁ,—সব এক জাত। সব এক জাত।'

অমুসলমানদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে হইবে না দেখিয়া আমার সঙ্গীরা প্রথমটা বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যখন দেখাইলাম যে পনের জন অমুসলমান যতটা স্থান পাইয়াছে, ঠিক সেই পরিমিত স্থানে আমাদের একশত পঞ্চাশ জনকে গাদাগাদি করিতে হইতেছে, তখন তাঁহারা পার্টিশন তুলিয়া লওয়ার জন্য আবেদন করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া আমরা মহা গোলযোগ আরম্ভ করিলাম। এবং শেষে, সকলে মিলিয়া জাহাজের

একটা রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িলাম। জাহাজ কাৎ হইবার উপক্রম দেখিয়া কাপ্তেন সাহেব নিজে ছুটিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'মিছা বিবাদ করিয়া লাভ নাই। তোমাদের প্রতিনিধি পাঠাও। আমি এখনই একটা রফা করিয়া ফেলিতেছি।' শেষে আমাকেই যাইতে হইল মুসলমানদের মুখপাত্র হইয়া।

কাপ্তেনের ঘরে গিয়া দেখি সেখানে অমুসলমানদের তিনজন আগে ভাগে আসিয়া সভা জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন।

বলিলাম, 'ইঁহারা কেন? অসন্তোষ প্রকাশ করিলাম আমরা। রফা হইবার কথা আমাদের সহিত। ইঁহারা কোথা হইতে আসিলেন?'

কাপ্তেন। 'রফা যখন করিতে হইবে, তখন আজ সকলের সঙ্গেই রফা করিয়া ফেলিব।'

আমি। 'কিন্তু, তিনজন কেন? আমাদের দল হইতে ত আমি একা আসিয়াছি।'

কাপ্তেন। 'ইঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—বেনে, বেহারী, আর বেঁটে।'

আমি। 'এ কিরূপ শ্রেণীবিভাগ? ইহা ধর্ম্মগত, না কর্ম্মগত, আকারগত, না প্রকারগত?'

কাপ্তেন। 'ইহা ইচ্ছাগত। যিনিই পৃথক্-শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকেই পৃথক্-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে।'

কাপ্তেনের এই কথা প্রকাশ হইবা মাত্র একজন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'হুজুর, আমাদের দল হইতে কোন প্রতিনিধি লওয়া হয় নাই। ইহা অত্যন্ত অবিচার।'

'তোমরা কি?'

'আজ্ঞে, আমরা গাঁটকাটা।'

আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে গাঁটকাটা বলিয়া কোন পৃথক্ শ্রেণী হইতে পারে না। আমাদের সকলের মধ্যেই গাঁটকাটা আছে!

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গাঁটকাটার সহিত এক বিছানায় শয়ন করিতে পার?'

এ প্রস্তাবে বেনেকে কিছুতেই সম্মত করা গেল না। কাজেই গাঁটকাটার জন্যও একটি পৃথক্ আসন নির্দ্দিষ্ট হইল।

গাঁটকাটা আসনে বসিতে যাইতেছে দেখিয়া কাপ্তেন বলিলেন 'থাক্ আর কাজ নাই। অনেক ভীড় হইয়া গিয়াছে। পৃথক্ হইতে চাহিলেই পৃথক্ বলিয়া মানিয়া লইব এই বা কেমন কথা? গাঁট-কাটাদের এত স্পর্দ্ধা ত ভাল নয়।'

ধমক খাইয়া সে বেচারা ফিরিয়া গেল।

এইবার আমাদের সভা বসিল। অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। এবং শেষে, মেজরিটীর ভোটে ঠিক হইল যে যাত্রীদের প্রত্যেক দল পাটাতনের সমান অংশ ভোগ করিতে পারিবে।

ফলে, একজন বেনে, দশজন বেহারী, চার জন বেঁটে ও একশত পঞ্চাশ জন মুসলমান,—প্রত্যেকের ভাগ্যে জুটিল একশত বর্গফুট পরিমিত স্থান।

কেবল তাহাই নহে, পাছে ভবিষ্যতে কোন উপদ্রব করি এই ভয়ে আমাদের স্থান দেওয়া হইল, ডেকের মধ্যস্থলে।

কপালে করাঘাত করিয়া আমরা এই অবিচার সহ্য করিলাম।

আমরা সহ্য করিলাম। কিন্তু ভগবান্ সহ্য করিলেন না। তিন দিন না যাইতেই স্বর্গমর্ত্ত্য একাকার করিয়া প্রচণ্ড ঝড় উঠিল, এবং দু ঘণ্টায় জাহাজ বানচাল হওয়ার উপক্রম হইল। কর্ণধার হাল ছাড়িলেন, এবং কম্পিত কণ্ঠে সকলকে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে বলিলেন।

জাহাজের উপর চল্লিশটা লাইফ-বয় ছিল। সেগুলা লইয়া তখনি কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। আমরা দলে ভারি ছিলাম। গায়ের জোরে অমুসলমানেরা আমাদের সহিত পারিয়া উঠিল না। তখন তাহারা মেজরিটীর দোহাই পাড়িল।

আমি বলিলাম, 'কেবল বাঁচিবার সময়েই মেজরিটীর জিত হইবে কেন? মরণ-ব্যাপারেও তাঁহাদের জিত হওয়া উচিত।'

বেনে বলিল, 'ঠিক কথা! মেজরিটীর উচিত মৃত্যুকে বরণ করা, মাইনরিটীকে বাঁচাইবার জন্য।'

আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বলিলাম, 'ভাই, তুমিই বিচার কর। আমরা তোমাকে মধ্যস্থ মানিলাম।'

বেনে বলিল, 'হাঁ, নিক্তি ধরিয়া সুবিচার চাও ত আমার কাছে আইস। আমি চিরকাল দাঁড়ি পাল্লা লইয়া কারবার করিয়াছি।—আমি বলিতেছিলাম মেজরিটীর উচিত, মরা। অতএব তাহারা এই মুহূর্ত্তে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ুক। যাহারা বাঁচিবার জন্য জাহাজে থাকিবে তাহাদের কাহারও আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি সফল না হইতে পারে এই জন্য বয়াগুলাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হোক্।"

বেনে খুব চালাকী করিয়াছিল। কিন্তু উপরওয়ালা একজন আছেন যিনি মানুষের চালাকীর উপর চালাকী করিতে জানেন।

অমুসলমানদের প্রত্যেকে তিন চারটা লাইফ-বয় লইয়া জলে ঝাঁপ দিল। কিন্তু এই তিন চারটা বয়া সাম্‌লাইতে গিয়া তাহারা একটাও সাম্‌লাইতে পারিল না। জলে পড়িবামাত্র বয়াগুলি হাত হইতে ছুটিয়া গেল। তার পর উত্তাল তরঙ্গের বুকে এক আধবার উঠা নামা করিয়া তাহারাও মিলাইয়া গেল।

নিষ্ঠুর লোভের এই পরিণাম দেখিয়া মনে একটি সুবিমল আনন্দের

উদয় হইল। কিন্তু পরক্ষণেই বড় লজ্জিত হইলাম, এবং অনুতপ্তচিত্তে ঈশ্বরের নিকট অন্তিম প্রার্থনা জানাইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলাম। কতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত ছিল বলিতে পারি না, চোখ খুলিয়া দেখিলাম ঝড় থামিয়া গিয়াছে। সমুদ্রের রুদ্রমূর্ত্তি শান্ত না হইলেও কাপ্তেনের মুখে হাসি দেখা দিয়াছে।

একমাস পরে আমরা বন্দরে পৌঁছিলাম। আমাদের মৃতদেহগুলাকে পৈঁঠা করিয়া যে কাপুরুষের দল জীবনের চড়ায় চড়িতে চাহিয়াছিল, তাহারা কোন্ অতলে স্থান পাইয়াছে বিধাতাই জানেন।

বিদ্যা-সুন্দর

"ফিরে এস, ফিরে এস, ক্ষান্ত দাও রাত্রি আজিকার!
আজিকে জাগ্রত পুরী; পুণ্যভুক্ যাত্রীদল সবে
করিতেছে প্রদক্ষিণ দেউলটি রাজ-দেবতার;
ব্রতমৌন নিশীথের তন্দ্রা ভাঙি মেতেছে উৎসবে
প্রাগ্‌জ্যোতিষের লোক; কিন্নরীলাঞ্ছন কণ্ঠরবে
ভেদ করে মর্ম্মস্থল রঙ্গশালিকার; জালায়ন-
পথে কম্পমান আলো; হর্ম্ম্যতলে নর্ত্তকীরা যবে
'সমে' আসি উন্মাদিনী—ঝলমলে কর্ণের ভূষণ
এক সাথে ক্রন্দি ওঠে নূপুর হইতে সাঁথি কিঙ্কিনী কঙ্কণ॥

"বিদ্যার পাবে না দেখা, ঘিরিয়াছে জাগ্রত প্রহরী
রাজকুমারীর গৃহ ; হয় তো বা সখিদলবলে
চলিবে অক্ষের ক্রীড়া কক্ষে তার সারা রাত্রি ধরি
নিশি-জাগরণ-ব্রতে ; আজি সেথা যাবে কোন্ ছলে
হে বিদেশী !" এত বলি আগুসরি ছায়া-কুঞ্জতলে
থামিল মালিনী মাসি ; ততক্ষণে কিশোর সুন্দর
ছাড়ায়ে সীমানাখানি মালঞ্চের গেছে হায় চলে
কোন্ ঘন অন্ধকারে ; নিষ্কম্প বাতাসে করি ভর
আসিতে লাগিল গন্ধ চম্পকের বসন্তের প্রিয়-সহচর ॥

মালিনী থামিল ধীরে, কিছুক্ষণ রহিল থমকি !
সূচীভেদ্য তমিস্রায় প্রাণপণে ক্ষীণ দৃষ্টি তার
খুঁজিতে লাগিল কারে ! অবশেষে উঠিল চমকি
আপনার দীর্ঘশ্বাসে ! অকস্মাৎ বুঝি একবার
নাচিল দক্ষিণ আঁখি ! ফিরি আসি পুষ্পবাটিকার
বসিল একটি পাশে—করতলে চিন্তানত মুখ !
বিদেশী রাজার পুত্র, রূপে মুগ্ধ কুমারী বিদ্যার
অতিথি তাহার গৃহে ; চলে নিত্য প্রণয়ের সুখ
গোপনে সুড়ঙ্গ-পথে ! কি ঘটিবে রাজা যদি জানে এতটুক ॥

ততক্ষণে রাজপুত্র ছাড়াইয়া কুটীরের সীমা
উত্তরিল গোহালের কাছে ; সুপ্তিমগ্ন ধেনুদল,
কেবল ধবলী জাগি, আহা মরি, স্নেহের প্রতিমা
সে যে ! ধীরে বাড়াইল, আপনার তপ্ত সুকোমল

লোল গ্রীবা-ভঙ্গিখানি ডিঙাইয়া বেড়া ; জ্বল জ্বল
ছুটি নেত্র স্নেহ-কৌতূহল-রসে ; না লভিয়া তার
নির্দ্দিষ্ট পল্লব-মুষ্টি, টানি নিল উষ্ণীষে চঞ্চল
সন্ধ্যা মালতীর গুচ্ছ ; অন্যমনে শুধু একবার
বুলাইল করপদ্ম তপ্ত গলদেশে তার সুন্দর কুমার ॥

ছাড়ায়ে গোহাল-সীমা অবশেষে পঁহুছিল এসে
মধুপ-স্বপন-মুগ্ধ মালঞ্চের নির্জ্জন সভায় ;
সফেণ মালতী পুষ্প সমর্পিল তার শির দেশে
রাশি রাশি শুভ্র দল ; ভৃঙ্গহারা চম্পা আজি হায়
স্তাবকবিহীন ক্ষুব্ধ একাকিনী বিরহিনী প্রায়
নীরব গৌরবে মরি, রহি রহি তীব্র সৌরভের
হানিতেছে কটাক্ষ নিপুণ—ক্ষিপ্র মধুর কষায়
প্রথম যেন সে প্রেম। বিস্তারিয়া শুভ্র লাবণ্যের
স্নিগ্ধ আমন্ত্রণখানি নিশিগন্ধা প্রতীক্ষায় কোন্ পথিকের ॥

আজি না পাইল চম্পা প্রেমিকের সাদর চুম্বন,
আদরে চয়ন-ভাগ্য, সঙ্গোপনে প্রেমিকার নিশি-
মাল্য লাগি ; মুখর দাড়িম্বগুচ্ছ উজলিয়া বন
মদির ছটায় ; বার্ষিক বিদায় লগ্নে কুন্দ দিশি
দিশি কাঁদাইছে কটাক্ষে করুণ ; মাধবিকা মিশি
পল্লবে বিলীন। অন্যমনে অতিক্রমি কাননের
সীমা চলিল সুন্দর ; অকস্মাৎ মনে কিবা বাসি
ফিরিয়া ছিঁড়িল ধীরে নেশারক্ত কবরী পুষ্পের
একটি জলন্ত গুচ্ছ, চমকিল নৈশপাখী স্তব্ধ কুলায়ের ॥

পার হ'য়ে পল্লীসীমা পার হ'য়ে মহুয়ার বন
দাঁড়ালো সুন্দর আসি ইস্পাত-মসৃণ ধানশ্রীর
তীরে ; উদ্বুদ্ধ করিল তারে তীর সিক্ত সমীরণ
ধীরে ; ছুটেছে ধানশ্রী ক্ষিপ্র, স্বচ্ছ ডুরে শাড়িটির
ভঙ্গে ভঙ্গে প্রকাশিয়া আপনার চঞ্চল অধীর
অনিন্দ্য-নর্ত্তন-ছন্দমগ্ন অনবদ্য তনুখানি,
অতিদূর ব্রহ্মপুত্র লাগি ! তাকাইয়া নদী নীর
পানে নিঃশ্বসিল দীর্ঘশ্বাস ! ভাবিল সে কত জানি
রাত ! সেও কি জাগিয়া ! এতক্ষণে নিভিয়াছে ধূপ দীপদানি ॥

বাঁয়ে রাখি গাঁয়ের শ্মশান, উত্তরিয়া হাঁটু-জল
নদী পঁহুছিল রবিশস্য ক্ষেতে ; একধারে নব
ইক্ষুবন ; প্রৌঢ় শরিষার ভুঁই অন্য ধারে ; তল
দিয়া সরুপথ প্রায় সে অদৃশ্য ; অতিদূরে যব
গোধূমের চাষ ; শুনি ঘুমে-জাগা কৃষাণের রব
বুঝিল অনেক রাত ; আকাশের শিশির-মার্জ্জিত
তারাগুলি ; দ্রুত পায়ে আগুসরি থামিল নীরব
বীর এক ঠাঁই ; সরাইতে শিলাখণ্ড, সুনিভৃত
গুহাদ্বার ; মুহূর্ত্তে কোমর আঁটি, হইল সে দৃষ্টির অতীত ॥

মীণার কমল-আঁকা, অতি লঘু চন্দনের দ্বার
উদঘাটি পশিল বিদ্যা কক্ষে আপনার ; ন্যস্ত ডান
করতলে মর্ম্মর থালিকা ভরি কুল-দেবতার
প্রসাদের অবশেষ ভাগ ; নামাইল থালাখান
আধেক আনত হ'য়ে জানু পাতি মাণিক্য বসান

স্ফটিকের ভিত্তিতলে ; রুদ্ধ করি দ্বারখানি ধীরে
দাঁড়াইল সুঠাম ভঙ্গীতে ; দুটি দুলে দুটি কান
দুলালো ঈষৎ শুধু ; কারে হেরি চমকিয়া ফিরে
দেখিল নিজেরি ছায়া পড়িয়াছে কাকচক্ষু দর্পণের নীরে ॥

একটি সরস মাঝে একটি কমল ; ফুটিল যে
পদ্মগুলি ভোরবেলা মানসের কিনারে কিনারে
লুটে পুটে তুলে নিল অপ্সরীরা স্নানরসে মজে
সাজি ভরি ; সপ্তর্ষি নামিয়া ধীরে মানসের ধারে
সযত্নে তুলিল আর ; সকলের নাগালের পারে
একটি অস্ফুট পুষ্প যেন হায় বাকি ! তাকাইয়া
দর্পণের পানে কাঁপিল অধর—মধুকর ভারে
ফুল্ল গোলাপের দল ; মৃদু হাসি গেল চমকিয়া
ওষ্ঠপুটে, "সে যদি আসিত আজি কি ভাবিত আমারে
হেরিয়া ॥"

স্বচ্ছ মুকুতার মাঝে লাবণ্যের মত ঢল ঢল
ছায়া-দর্পণেতে ; ক্ষীণচন্দ্রোপম ভালে খয়েরের
টিপ ; ভুরু কালো, তারা কালো, মরি কালো সে কাজল—
চোখের চাহনিখানি, যেন আহা, কোন্ বনান্তের
তমালের আভাময়ী ! দ্যুতিখানি দুটি কপোলের
মুহূর্ত্তে প্রকাশ করে হৃদয়ের গোপন বাসনা
প্রেমিকের পরিতৃপ্তি ; কণ্ঠ স্নিগ্ধ সদ্য মৃণালের
মত ; ধনী কাঁচুলির তলে আভাসে যায়রে গণা
বন্ধুর বক্ষের তাল ; ইন্দ্র গোপ রক্তরুচি বসন, বিমনা।

ভাঁজে ভাঁজে নামিয়াছে স্তরে স্তরে লুকাইয়া, মরি,
দুর্লক্ষ্য রহস্যরাজি, পদপ্রান্তে যেথা লাক্ষা-রাগ
পথপ্রান্তে আরক্ত মিনতি ; স্কন্ধ হ'তে ঝুলি পড়ি
মুছি দেয় পিছনের প্রেমিকের চিরবাঞ্ছা দাগ
চরণের ; কটিতে কনককাঞ্চী কণ্ঠ কলবাক্
স্বর্ণউষা ; লাবণ্যমসৃণ দুটি ব্যগ্র বাহুলতা
অঙ্গুলির সঞ্চালনে যেন আহা খেলিতেছে ফাগ
অদৃশ্য দয়িত সনে ; মুক্ত কুন্তলের অজস্রতা
নির্ঝরিছে নীড়গামী বলাকার পক্ষচ্যুত অন্ধকার যথা ॥

নগরীর সিংহদ্বারে বাজে মধ্যরাত ; শান্ত্রিগণ
হেঁকে যায় ; অমনি পড়িল মনে কার লাগি হায়
আজি মিছা জাগরণ ! সহসা লাগিল শিহরণ
সারা অঙ্গে ! যদি আসে নিত্যমত অবোধের প্রায়
আজো ! সশস্ত্র সমস্ত পুরী ! কর জুড়ি দেবতায়
করিল প্রণাম। খুলিল কাঁচুলি খানি, প্রকাশিল
তপ্ত তনু ! দর্পণে ঘুরায়ে পিঠ, চক্ষু রাখি তায়
উতারিল স্তনচ্ছদ বস্ত্র মণিপুরী ; দেখা দিল
স্বর্ণ পয়োধর দুটি, স্তনাগ্র পাটল তীক্ষ্ণ কমল-উন্মীল ॥

শিথিলিয়া নীবীবন্ধ নামিল বসন ; সুগভীর
নাভি ; তলে তার ত্রিবলী সোপান বেয়ে পথ চলি
গেছে অজ্ঞাত-রহস্য এই, তাপদগ্ধ পৃথিবীর
কামনার শ্রেষ্ঠ স্বর্গপানে ; সুরভি তৈলেতে জলি

স্ফটিকের দীপ বিচ্ছুরিতেছিল আলো, প্রতিফলি
লক্ষ বর্ত্তি তেজে, নিভাইল তারে ; বিরাজে অদূরে
রজতের শয্যাধার ; সুশোভিত দুটি শঙ্খ কলি
শিথানের স্বর্ণ ফলকে ; পদপ্রান্তে আছে জুড়ে
মৃগয়ার মর্ম্মর কল্পনা ; চার হস্তী বহে পালঙ্কটি শুঁড়ে

পালঙ্কে বসিল বিদ্যা, অতীতের মর্ম্মতল ভেদি'
এক রাত্রে এলো মনে সহস্র রাত্রির স্মৃতি-কথা !
এই যে শয়ন শুভ্র, এ যে আহা প্রণয়ের বেদী
গুপ্ত যুগলের ; ব্যগ্র ওষ্ঠ ছোঁয়াইল যথা তথা
সুন্দরের স্পর্শ খুঁজি ; বিস্তারিয়া আতপ্ত মত্ততা
বসন্ত-রভস-ময় রতি-মুগ্ধ নর্ম্ম শয্যাখানি
বারম্বার কঠিন নিষ্পেষে ; উলটিল বাণাহতা
মৃগী সম ; রাঙিল কপোল গণ্ড, তপ্ত রক্ত হানি
কাঁপিল কপালে শিরা ; করতল বদ্ধ মুষ্টি, মুখে নাহি বাণী ॥

ভাবিতেছিল সে মনে, সেই এক অতি প্রিয় মুখ,
আঁকিতেছিল সে মনে তারি আহা প্রত্যেকটি রেখা,
স্মরিতেছিল সে মনে কথা গুলি দিয়াছে যা সুখ
স্বর্গাধিক ; সে দিবস প্রথম যেদিন হ'ল দেখা
মালিনীর কৌশলেতে ; তারপরে প্রতি রাতে একা
এই গৃহে সম্মিলন ; মুহূর্ত্তে হয়রে পুরাতন
সদ্যজাত প্রেম খানি, ভালে তার অমরতা লেখা ।
অবশেষে এল নিদ্রা, বিরহীর একান্ত শরণ !
প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে নেশারক্ত নিশীথিনী বিহ্বল তখন ॥

খুলিয়া সুড়ঙ্গ পথ প্রবেশিল একাগ্র সুন্দর !
সহসা মেলিয়া চক্ষু না পাইল হেরিতে বিস্তারে
কোনো খানে ; বুঝিল ঝাড়ের আলো অতি খরতর
নেত্র তার ধাঁধিয়াছে ; মিস্মিরিয়া আঁখি বারে বারে
দেখিল যা দেখিবার ; ধীরে পালঙ্কের একধারে
দাঁড়াইল ; দেখিল তুলিছে বক্ষ গণি মৃদু তাল,
নভে দীপ্ত শশী যবে, আর স্বপ্নালস পারাবারে
অনাবৃত উদ্বেলতা ; দেখিল দেখিল ক্ষণকাল
অনন্ত চাহনি ভরে ; সুরভি নিঃশ্বাসে কক্ষ সুগন্ধি রসাল ॥

ত্যজি' পালঙ্কের সীমা—তাকাইল গৃহের চৌদিকে,
অতি পরিচিত সব ; পুরুষেরা আপনা সংহত ;
রমণী অস্তিত্ব নিজ চতুর্দ্দিকে যায় লিখে লিখে
বসন্তের ব্যস্ততায় ; দীপাধারে, ধূপাধারে, কত
তুচ্ছ সামগ্রীর বুকে ; জীবনেরে জড়ায়ে নিয়ত
অবিরত গড়িতেছে মধুচক্রী নর-মনোরমা
চিরদিন ধরি তারা ; তিল তিল খুঁটি ইতস্তত
গড়িছে পুরুষ তাহে বাসনার নারী তিলোত্তমা
হৃদয়ের পাদপীঠে, স্বপ্নসার বিনির্ম্মিত লাঞ্ছিত উপমা ॥

সমুদ্র-মন্থন-দৃশ্য-আঁকা ছাদ হ'তে ঝুলিতেছে
স্বর্ণদণ্ডে স্ফটিকের ঝাড় ; শিখা দীপে জল জল
ঝলমল কাচের দোলক গুলি মৃদু দুলিতেছে
ছড়াইয়া চিত্রবর্ণ চূর্ণ ইন্দ্রচাপ ; দীপ্তোজ্জল

গৃহভিত্তি ; সুবর্ণের ধূপদানি হ'তে, অনর্গল
ওঠে বাষ্প তন্বী লঘু লীলাময়ী অপ্সরীর মত
ঘুরে ঘুরে—দর্পণেতে কাঁপে ছায়া ; প্রভাতী কমল
বন অঙ্কিত দক্ষিণে, এই মাত্র সেথা হংস শত
ডাকিয়াছে পাখা নাড়ি ; উচ্চ-নাল ফুলগুলি ঈষৎ আনত ॥

বামে কথা শকুন্তলা-দুষ্মন্তের ; তরুতলে মুগ্ধ
রাজা ; আগে চলে সখিদ্বয় ; পশ্চাতে কিশোরী ফিরি
কণ্টক-আহতা, দুই চক্ষু ব্যস্ত দুই দিকে ; দুগ্ধ
শুভ্র কর্ণোৎপল ম্লান ; ছাদ নিম্নে চারি ভিত্তি ঘিরি
মেঘদূত লীলাচ্ছবি ; তরুশ্যাম দূরে রামগিরি
জনক তনয়া স্নানে পবিত্র উদক ; কুণ্ডলিয়া
ওঠে মেঘ উপত্যকা হ'তে ; ওই শিপ্রা ঝিরি-ঝিরি,
জল-কেলি-ক্লান্ত যত কর্ণের ভূষণ ভাসাইয়া
হেসে ধায় ; মহাকাল মন্দিরের চূড়া জ্বলে তমিস্রা ভেদিয়া ॥

চলিছে মন্থর মেঘ জল-বিন্দু-ভারে, ইন্দ্রকান্ত
মণি নীল আভা ; পাশে পাশে চলে দল চাতকের ;
নন্দন-স্যন্দনচারী কিন্নরেরা দেখে নিম্নে শান্ত
রেখামাত্র চর্ম্মবতী স্বচ্ছ ক্ষীণ মাণিক্য-হারের
মত—দোলে মেঘ-মধ্য-মণি ! দিগন্তরে দশার্ণের
শ্যাম জম্বুবনপ্রান্ত ; শরমুখ ব্যূহ রচি ধায়
দলে দলে গগনে বলাকামালা স্তব্ধ মানসের
দিকে বিসকিশলয়বান্ ; সুদূর কৈলাস ভায়
অস্পষ্ট সত্যের মত,—'ফেণরঙ্গে গঙ্গা যেথা গৌরীরে শাসায়'।

কোণে কোণে ঘুরিল সুন্দর ; হস্তিদন্ত বিরচিত
শুভ্র বস্ত্রাধারে হেরিল কাঁচুলিখানি, তুলি নিল
অতি যত্নে, তখনো লাগিয়া তাহে অতি পরিচিত
গন্ধ, ছানিল অঙ্গুলে তারে, কিছুক্ষণ রেখে দিল
মস্তকে মুখেতে ; স্তনবন্ধ বস্ত্রখণ্ড পড়ি ছিল
একধারে ; যুগ্ম স্বর্গচ্যুত সেই বসনের পরে
সদ্যস্ফুট বন্ধুরতা স্তনযুগলের ; বিকশিল
সম্পূর্ণ চুম্বন এক মর্ম্ম ভেদি ক্ষিপ্ত ওষ্ঠাধরে
মানসের গর্ভ হ'তে সণাল কমল যথা ফোটে স্তরে স্তরে ॥

অর্দ্ধমুক্ত মঞ্জুষায় ছিল শাড়ি কান্তি মরকত ;
নিল তাহা সন্তর্পণে ; পাড় আঁকা পাকা ফসলের
বর্ণে ; খুলিতে একটি ভাঁজ গন্ধ কুঙ্কুমের ; যত
ভাঁজ খোলে তত বিচিত্র সৌরভ শ্বেত-চন্দনের,
কস্তুরীর, অগুরুর, দারুচিনি, রক্ত গোলাপের
নির্য্যাস প্রখর, উশীর, কর্পূর মৃদু, দ্রাবক সে
মৃগনাভিকার ; অলক্ষ্য গন্ধের মেঘ সে কক্ষের
জমিল বাতাসে—শরতে পশ্চিমে যথা রশ্মি রসে
স্তরে স্তরে জ্বলে মেঘ লক্ষ লাক্ষা-দ্রাবী দীপ্ত গলন্ত প্রদোষে ॥

মেঝেতে মর্ম্মর থালে দেবতাপ্রসাদ ; নানা জাতি
ফলমূল ; ব্রহ্মপুত্র বালুচরে জাত দ্বিখণ্ডিত
তরমুজ, মধ্যভাগ রক্ত কালো, উঠিয়াছে মাতি
গূঢ় বাষ্প সুস্নিগ্ধ নির্গত রসে ; দক্ষিণে সজ্জিত

দ্বিধাভক্ত কমলাটি—আসামের হৃদয় নিঃসৃত
সুরমার উপত্যকাচারী ; ডালিমটি রসভারে
বিদীর্ণ আপনি ; না সহে পরশ কোনো, ভূলুণ্ঠিত
দ্রাক্ষাগুচ্ছ অধর ব্যতীত ; পানপাত্রে একধারে
বেদানার সুধাদ্রব, মাতালের মত টলে বুদ্বুদের ভারে ॥

বসিল সুন্দর শেষে শ্বাস রুধি পালঙ্কের ধারে ;
কাছে বিদ্যা একখানি মূর্ত্তিমতী রাগিণীর মত !
চন্দনের পত্রলেখা ক্ষীণচন্দ্র ললাটের পারে
লুপ্ত যেন ; বিস্রস্ত অলক হ'তে মুক্তাগুলি শ্লথ,
তারি সাথে ঝিকিমিকি স্বেদলব জাল ; অসংযত
দুটি দুলে দুটি রক্ত ছায়া ; কভু ওঠে ঝলসিয়া
দন্তের আভাসটুকু ওষ্ঠাধর মাঝে ; সুধাব্রত
ডান হস্ত লগ্ন শয্যাতলে ; নীবীবন্ধ সামালিয়া
বামকর ; মৌন দেহ-বীণা তারে সুর যেন গিয়াছে জমিয়া ॥

উদ্বেলিত পয়োধর অনাবৃত ইন্দ্রজাল হানি'
নেত্রে দেয় সুধারস অঞ্জন মাখায়ে ; মুক্তা ডোর
বেষ্টি দোঁহে ঝুলিছে ডাহিনে ; এবে স্তব্ধ কানাকানি
মণিহার হৃদয়ের উপত্যকা মাঝে ; কৃষ্ণ ঘোর
তিল এক বাম স্তন পার্শ্বদেশে, অযোগ্য যে চোর
সে যেন পশিল স্বর্গে ! ধীরে ধীরে নোয়াইল শির
সুন্দর বিদ্যার মুখে—যেমন নোয়ায়ে চন্দ্র, ভোর
বেলা, আপনার ক্লান্ত মুখখানি, গণে জলধির
বুকের স্পন্দন মৃদু, হেরে বক্ষে ছায়াখানি নিজ বিম্বটির ॥

কাঁপিল বিদ্যার ওষ্ঠ—তাকায়ে সুন্দর ; অতি ক্ষীণ
ধ্বনিটুকু ! 'সুন্দর, সুন্দর' ; স্বপ্নে বুঝি হেরে তারে !
ভাবিতে বীরের লাল হ'ল কর্ণমূল, রিণঝিণ
রক্তধারা—হৃৎপিণ্ড দ্রুততর ; ধ্বনি এইবারে
স্পষ্টতর—'ফিরে এস, ফিরে এস, সুন্দর আমারে
যেয়ো না ফেলিয়া একা।' 'কোথা যাব, কোথা যাব, কোথা
শান্তি তোমারে ত্যজিয়া—চেয়ে দেখ, এসেছি বিদ্যারে,
তোরি তরে উপেক্ষিয়া স্নেহময়ী মালিনীর কথা,
অমাবস্যা রাত্রি ভেদি, অবজ্ঞিয়া তীক্ষ্ণ-অসি জাগ্রত জনতা ॥

'একি স্বপ্ন একি সত্য—এত সুখ জাগরণে কভু
হবে কি সম্ভব !' চমকিলা বালা ! 'স্বপ্ন যদি হয়
হোক্ তাই—থাক্ তাহা কিছুক্ষণ আরো—ওগো প্রভু,
ইষ্টদেব।' হাসিয়া সুন্দর কহে—'নাহি পাবো লয়
কিছুক্ষণ শেষে সখি—হের আমি তোমারি অক্ষয়
সুন্দর বরেন্দ্রপুত্র।' চকিতে উঠিতে তার, বক্ষ
অনাবৃত লাগিল বৈদেশি বুকে ; সলজ্জ বিস্ময়
ভরে দিল তুলি বস্ত্রাঞ্চল ; সামালিল চ্যুত-কক্ষ
নাবীবন্ধ গ্রন্থখানি। বাহিরে তখন সবে নেশায় অশক্য ॥

দুঃসহ রভসবেগে সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন
কণ্টকিয়া উঠিতেই টুটি লুটি পড়ে—অকস্মাৎ
দর্শনের অকুণ্ঠিত সুখ তেমনি বিদ্যার মন
দিল ভয়ে ভরি। 'এলে তুমি প্রিয়তম, আজি রাত

ভয়ঙ্কর! আসন্ন ঝড়ের মেঘে না করি দৃকপাত,
দুরন্ত নাবিক তুমি! নামিত এ ঝড় যদি!' 'সেই
জানে কি আনন্দ তীরবদ্ধ করিয়া পশ্চাত
একে একে পালগুলি ব্যগ্রভাবে খুলি মুহূর্তেই
মাস্তুলের চূড়াগ্র অবধি, ভাসাতে তরণী! ডুবি যদি এই

অলঙ্ঘ্য সাগরতলে মণিমুক্তা দুর্লভ প্রবাল
রচি দিবে অন্তিম-বাসর। আর যদি উত্তীরিয়া
পঁহুছাই কাম্য দ্বীপে মোর, তবে সুপ্রসন্ন ভাল,
ভাগ্যে আছে এই'—এত বলি দুই বাহু প্রসারিয়া
ধরিল বিদ্যারে। 'থামো, থামো আজ নয়, মন দিয়া
শোনো'—'বৃথা উত্তরিনু সিন্ধু, বৃথাই কি সন্ন্যাসীর
বেশে গোঁয়ালেম বর্ষমাস হায়! উঠিল শ্বসিয়া
সুন্দরের মর্ম্মান্ত অবধি! নহে কভু চিত্ত-স্থির
প্রেমিক, পাগল, শিশু—কাঁটা যেন অতি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডটির॥

দেখা দিল দুটি অশ্রু দুটি চক্ষু কোণে—তবু তাহা
রাখিল চাপিয়া বিদ্যা রুদ্ধ অভিমানে—যথা
সতর্ক কমলদল সন্তর্পণে ধরি রাখে, আহা
একটি শিশিরবিন্দু প্রাতঃসূর্য্য পানে। আছে কথা
ওরি মাঝে দীর্ঘ রজনীর। ঘুচাইয়া নিস্তব্ধতা
কহিতে লাগিল বিদ্যা—'পুরুষের ভালবাসাখানি
উদ্দাম উদ্বেল মত্ত অকস্মাৎ-বর্ষণে আগতা
তটপ্লাবী বন্যাসম—ভাসাইয়া পশুপক্ষী প্রাণী
নিয়ত লেলিহমান, যেন এই চিরন্তন, শেষ নাহি জানি॥

সকালের বন্যা হায় বৈকালে কোথায় চিহ্ন তার!
ধ্বস্তগ্রাম, ভগ্নতরু, মগ্নজীব, ভেসে-আসা খড়-
কুটা নির্দ্দেশিছে পথখানি সর্ব্বগ্রাসী নগ্নতার
সেই! রমণীর প্রেম, সখা, শান্ত স্তব্ধ সরোবর
চারিকূলে আবেষ্টিত! একমাত্র তাহার নির্ভর
গোপন মনের সুধা। না জানে জোয়ার-ভাটা, নাহি
শোনে বন্যার আহ্বান। একবার হলে ভর-ভর,
চিরপূর্ণ! বক্ষ তার উজ্জ্বলিয়া ফোটে এক কমল সুন্দর॥'

যেনরে কমল দল আপনার শিশিরাশ্রু ভারে
নত হ'ল! স্তব্ধ-কথা নেত্র হ'তে নীরব বিদ্যার
ঝরিল রে অশ্রুধারা, সিক্ত করি, অঙ্গদ খানারে
বাম মণিবন্ধশায়ী। তুলি ধরি মুখখানা তার
মুছালো সুন্দর ধীরে; রাখিল সে অতি লঘুভার
গ্রীবাখানি স্কন্ধে নিজ—বুকে তার বক্ষ সমর্পিয়া
লাগিল কহিতে—'সেই পুরাতন ছন্দে, রক্তধার
বহিতেছে করি অনুভব—তবে কেন, তবে কেন প্রিয়া
সরাইলে ওষ্ঠপুট, এ নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান বিঁধিলে হানিয়া॥'

কহিতে লাগিল বিদ্যা উর্ব্বশীর বীণাখানি সম।
'শিবরাত্র ব্রত করি পতি-ভিক্ষা মাগে যে রমণী
পায় সে অভীষ্ট বর! আজি আমি মোর প্রিয়তম
লাগি পালিয়াছি ব্রত, সঁপিয়াছি মস্তকের মণি
পুরোহিতে, রহিয়াছি উপবাসী অতি পুণ্য গণি!

তাই তো এ অবাধ্যতা ! সখা, তাই আজি আসিবারে
করিনু বারণ ।' 'দেবতা প্রসন্ন তাই বুঝি, ধনি,
দেখা হ'ল ।' সবল দুবাহু পাশে চাপিয়া তাহারে
বাজাইল দেহ তন্ত্রী—অজস্র মূর্চ্ছনা-ময় উন্মাদ ঝঙ্কারে ॥

"স্বপনে দেখিতেছিনু, যেন তুমি শিবিকা সহিত
আসিয়াছ নিতে মোরে না হইতে ব্রত উদ্‌যাপন !
আমি না চাহিনু যেতে—তুমি রাগে অমনি ত্বরিত
ফিরাইলে মুখ । ভয়ে লাজে আমি ডাকিলাম ঘন
ঘন—সুন্দর, সুন্দর ; স্বপ্নে তুমি নাহি দিলে কোনো
সাড়া' 'স্বপ্নের সে অপরাধে, সত্যতর রূপে, দ্বারে
তব উপস্থিত, দিয়েছি উত্তর মর্ম্ম জানে ।' 'শোনো
কথা, স্বপন কি সত্য হয় !' 'অদৃষ্ট প্রসন্ন যারে
স্বপ্ন, সত্য শুধু নামান্তর তার ! ওঠ সখি, রাত্রি শুধু বাড়ে ।'

'বিদেশী রাজার সৈন্য ঘিরিয়াছে আমার নগর
দূতমুখে পেয়েছি সংবাদ কাল । এ বিপদে আর
কে কোথা নিশ্চিন্ত থাকে । হের অসি মোর পার্শ্বচর
গর্জ্জিতেছে পলে পলে ! চল শীঘ্র থাকিতে আঁধার ।'
'আজ থাক্ আজ থাক্ ব্রত মোর হইবে উদ্ধার
কাল প্রাতে, সে তোমারি মঙ্গল লাগিয়া—তারপরে'
'তবে তাই হোক্' নিমেষে উঠিলা বীর শয্যাধার
পরিত্যাজি ! তন্বী তুমি সম্পদের সৌভাগ্য-শিখরে
অস্তহীন শুক্রতারা ! মোর আশা নিম্নশায়ী উপত্যকা ভ'রে

বিচ্ছিন্ন কুয়াশা সম যাক্ মিলাইয়া অন্ধকার
অবসানে ! প্রত্যাশার মরুস্থানে বসিয়া বসিয়া
শুনিয়াছি দণ্ড পল কালসূচী বালুঘটিকার
ক্রমস্ফীত ধূলিস্তূপে ! ছিল আশা উদিবে হাসিয়া
আমার সৌভাগ্য তারা সূর্য্যাস্তের সীমান্তে আসিয়া
গোধূলির সীমন্তিনী ! কিন্তু হায় এ কি বেশে এলে !
মরুর পথিক সম বক্ষপুটে আনিলে বহিয়া
দুঃখের বারতা শুধু ! তাই হোক্ দাও দূরে ঠেলে !
এ পৃথ্বী এতই বড় ছাড়াছাড়ি হ'য়ে দোঁহে দূরে চলি গেলে

কদাচিৎ দেখা আর ! নিভে যায় আঁখির সে জ্যোতি
যাতে দোঁহে চিনেছিল দু'জনারে ! তবু তবু প্রিয়া
চলি যদি যাই আমি পৃথিবীর সীমান্ত অবধি—
চুম্বক-শলাকা যথা একদৃষ্টে থাকেরে চাহিয়া
সুদূর উত্তরে কোন্—সেই মত অবল্লভ হিয়া
নিয়ত স্মরিবে তোমা !' ধীরপদে গেল বীর মুখে
সুড়ঙ্গের। সে আবেগে কক্ষখানি রণিয়া কাঁপিয়া
পীড়িয়া উঠিতেছিল মুহুর্মুহু মর্ম্মাহত দুখে
ঝঙ্কৃত তন্ত্রীর মত ! হঠাৎ দর্পণপটে হেরিয়া সম্মুখে

করবীর বিম্বগুচ্ছ দাঁড়ালো থমকি ; স্মিত হেসে
খুলি পুষ্প গেল ফিরি যেথা বিষ্ণা ম্রিয়মান হায়
নিমেষে গুনিতেছিল একলক্ষ যুগ ; পরাইল কেশে
প্রতি রজনীর মত শেষবার ফুল ! অমনি রে তায়

কে ধরিল সর্ব্বাঙ্গে জড়ায়ে! কে কহিল বেদনায়
মর্ম্মান্ত উদ্বেলি—'যাব যাব হে বিদেশি যাব তব
সহ সুমেরুর সীমান্ত-অবধি! যাব যেথা চায়
যবে চায় চিত্ত তব। জীবনের বাঁকে বাঁকে নব
নব অদৃষ্টের সাথে নির্ভয়ে চলিব ধেয়ে—তুমি মোর সব ॥'

'যাব যেথা হিমাদ্রির কুণ্ডলিত কুহেলি নিঃশ্বাসে
দিগন্তের নীল নেত্রে মুহুর্মুহু ছায়াছাণি পড়ে!
যাব যেথা উচ্চকিত পাগলিয়া পুঞ্জিত হুতাশে
স্রস্তকেশ তিস্তা হ'তে রাশি রাশি ফেণপুষ্প ঝরে!
আপন ছায়ায় ভীত মৃগদল ধায় যেথা ডরে,
দিবসে জোনাক-জ্বালা, শ্বাপদের আঁখি-দীপ্ত পথে
নিঃশঙ্কে চলিব দোঁহে শব্দবেদী তটরেখা ধরে'
ব্রহ্মপুত্র স্রোতস্বীর! অতিক্রমি এ মর্ত্ত্য জগতে
যাব অলকার পানে উত্তীরিয়া ক্রৌঞ্চদ্বারে দৃপ্ত মনোরথে ॥

'লহ রাজ্য লহ ধন, লহ লহ এ রূপ যৌবন,
লহ কান্তি, লহ শোভা, লহ লহ পরম দুঃসহা
চিত্তের চরম তৃষা; দুরুদ্দেশ্য এ তুচ্ছ জীবন,
মৃত্যুর দিগন্তব্যাপী জগদ্দল একান্ত দুর্ব্বহা
লহ লহ অস্তিত্ব আমার! অনন্তকাল প্রবহা
এ ক্ষুদ্র রহস্য-কণা বাছি লয়ে অন্য সব হ'তে
করো তব সামগ্রী খেলার! সখা নাহি যায় কহা
জনমের সমগ্র সাধনা! যবে অনির্বার স্রোতে
বাহিরায় পুঞ্জ পুঞ্জ, তবু ভাবি কতটুকু আসিল আলোতে ॥"

চঞ্চলা চাঁপার ছায়া পরিত্যজি বৃক্ষের আশ্রয়
ঝড়ের উত্তরী ধরি চাহে যথা উধাও হইতে—
তেমনি উঠিল বিদ্যা, অঙ্গে দিল রক্তচ্ছটাময়
কাঁচুলিটি উলটিয়া ; ব্যস্ত করে কেশ জড়াইতে
খুলিল ডাহিন দুল ; মুখর নূপুর উতারিতে
বাঁধিল বিষম গ্রন্থি। নত হ'য়ে মারি এক টান
সুন্দর ছিঁড়িল তারে—ছড়াইয়া লাগিল ঝল্লিতে
অশ্রুর মতন মুক্তা ; আড় চোখে নিজমূর্ত্তি খান
দর্পণে দেখিল বিদ্যা—সিন্দুর কুঙ্কুম বিন্দু ললাটে অম্লান ॥

প্রণয়-গুঞ্জন সম উস্‌খুস্‌ মৃদুমন্দ রবে
খুলিল দুয়ার খানি স্পর্শখুসী বিদ্যার মায়ায় !
পলকে ঝলক মারি রশ্মিরাশি পশিল গৌরবে
দাগিল ভিত্তির গাত্র দু'জনার একটি ছায়ায়।
দু'জনে বেষ্টিয়া দোঁহে ছায়ালগ্ন পাদপের প্রায়
ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পায়ে পায়ে নামিল সোপানে ;
প্রদীপের যাতায়াতে বিচলিত দুটি ছায়া, হায়,
পড়িল ডাহিনে বামে, আগে পিছে এখানে ওখানে
শরীর রক্ষীর মত আবর্ত্তিল ; দুইজনে চলে সাবধানে ॥

মদিরাপিচ্ছিলমত্ত প্রাসাদের বলভি সভায়
নয়নে লেগেছে নেশা, সঙ্গীতের ভাঁজে ভাঁজে ঘোর ;
নূপুর-স্খলিতা সবে নিদে মদে উন্মাদিনী প্রায় !
কাহারো শিথিল হ'ল কটিলগ্ন নীবীবন্ধ ডোর,

নির্দ্দয় কটাক্ষ হানে চতুর্দ্দিকে কোনো চিত্ত চোর।
স্বেদোজ্জ্বল স্তনে কারো পীতরশ্মি পিছলিয়া পড়ে,
ছিন্ন মণিহার কারো উল্কা সম ছুটিয়াছে জোর,
চাপা-হাসি কোনো নটী বন্দী হ'য়ে রাজপুত্র করে
ভাণকরা লজ্জাবেশে সম্বরিতে বস্ত্র হায় শ্লথতর করে ॥

প্রাসাদ রাখিয়া বামে তুই জনা চলিল সত্বর—
সঙ্কীর্ণ গলির পথে ; তুই পাশে স্তম্ভ সারি সারি
ভূতলে ফেলিয়া ছায়া মিশিয়াছে ক্রমে শীর্ণ-তর
সুদীর্ঘ বীথির প্রান্তে ; তীর্থোদকে ভরি স্বর্ণঝারি
মন্দার মালিকাময়ী পূজারিণী যত যক্ষ নারী
মস্তকে বহিছে ছাদ ; চাতালের আঁকা ধারে ধারে
বধু-বিয়াকুল দ্রুত কিম্পুরুষ নভাঙ্গনচারী।
স্তম্ভ শ্রেণী অবকাশে বিজড়িত আলো অন্ধকারে
সচল তুইটি ছায়া, আলোকের মাঝে কভু, কখনো আঁধারে ॥

প্রাসাদ কাননে বামে নীলকান্ত দীপের মায়ায়
ঊর্দ্ধ অধঃ চতুর্দ্দিকে রচিয়াছে ইন্দ্রজালখানি।
গোলাপ করবী কুন্দ দাড়িম্বের আরক্ত নেশায়
নীলাভ আভাস দিল দিগন্তের নীলাঞ্জন ছানি।
উচ্ছ্বসিত জলযন্ত্র ঝিরি ঝিরি আত্মগত বাণী
বকিছে আপন মনে ; পরাগের শয্যাতলে বসি
কোকিল কুহরে মৃত্থ ; একপায়ে দীর্ঘছায়া হানি
সারস স্বপনে মগ্ন ; রহি রহি বায়ু ওঠে শ্বাসি
অলিন্দ-আলিসা হ'তে কেলিস্রস্ত পারাবত পক্ষ পড়ে খসি ॥

নেশাসুপ্ত সিংহদ্বার প্রেমীযুগ্ম অতিক্রম করি
দাঁড়ালো দীঘির তটে ; অন্ধকারে শুনিল নিয়ড়ে
অশ্বের নিঃশ্বাস শব্দ ; সুন্দরের শিষ অনুসরি,
সচকিয়া নির্জ্জনতা শুষ্করাশি পত্রের মর্ম্মরে,
আনন্দিত হ্রেষা তুলি, চারি খুরে অধীরতা ভরে
বেগের ব্যঞ্জনা বহি দাঁড়াইল আনমিয়া শির
সুশিক্ষিত অশ্ববর ; স্পর্শ লভি পরিচিত করে
কালো চোখে আলো জ্বালি ভেদ করি অখণ্ড তিমির
বিদ্যার দর্শন লোভী প্রভুরে সার্থক দেখি পুলকে অস্থির ॥

সোনার রেখাব পরে পা রাখিয়া অশ্বে আরোহিয়া
বিদ্যারে বসায়ে যত্নে সন্তর্পণে সম্মুখে তাহার
মৃণাল-কোমল তনু বামহস্তে ধরিল বেষ্টিয়া
দক্ষিনে বল্‌গা ধরি মৃদু চাপ দিল অশ্বে তার।
মুহূর্ত্তে কেশর নাড়ি, ধনুঃ সম বাঁকাইয়া ঘাড়,
জাগায়ে যুগল কর্ণ—একবার করি হ্রেষারব
ছুটিল সুন্দর অশ্ব। অকস্মাৎ পড়িল বিদ্যার
অসতর্ক দীর্ঘশ্বাস—আঁখিপ্রান্তে দুটি মুক্তা দ্রব।
রহিল রহিল পড়ি পিতামাতা, আজন্মের গৃহ দ্বার সব ॥

রহিল রহিল পড়ি পুরাতন প্রাগ্‌জ্যোতিষ ধাম,
রহিল রহিল পড়ি পরিচিত সুখের বন্ধনী,
রহিল সখির দল, রহিলরে আরাম বিরাম!
এখন সম্মুখে শুধু প্রসারিয়া বিপুল তর্জ্জনী
অজ্ঞাত অগাধ রাত্রি ; সঙ্গে চলে অশ্বক্ষুর ধ্বনি।

তারা-জলা দীঘিজল একবার ঝকিল দক্ষিণে,
বামেতে হাঁকিল শান্ত্রী রজনীর প্রহরান্ত গণি !
জটিল পুরীর পথে ধায় দোঁহে দীপদীপ্তি বিনে,
বাতায়ন-বিচ্ছুরিত রশ্মিভয়ে নতশির পাছে ফেলে চিনে ॥

অতীতঅঙ্কিত জীর্ণ নগরের সিংহদ্বার ছাড়ি
সম্মুখে অনন্ত মাঠ, দিগ্বলয়ে অন্ধকারে লীন
গারো পাহাড়ের লেখা ; উল্কাবেগে দেয় অশ্ব পাড়ি
ফলন্ত ভুট্টার ক্ষেত আবক্ষ-উন্নত ; জ্বলে জিন্
সপ্তর্ষির আলোপাতে ; তালে তালে বাজে রিণ্‌ঝিন্
সাজের কনক ঘণ্টা ; দুই পাশে আফিঙের বনে
দিবসের মউ-মাছি মধুমদে পক্ষগতিহীন
চমকে দুলন্ত ফুলে ; সে সুগন্ধি সুতীক্ষ্ণ পবনে
বিঁধিল বিদ্যার অঙ্গে, সুন্দরের শিরে শিরে—কাঁপিলা দু'জনে ॥

ফাল্গুন বাতাসে ভাসে খেজুরের মদির নিঃশ্বাস
কান্তারের কোণে কোণে ; কখনো বা গন্ধ-অনুমান
বন-চামেলির স্তূপ ; সৌরভের তীব্র নাগপাশ
কোথাও হানিছে চম্পা ; কোনোখানে মাধবিকা ম্লান
বসন্তের একান্ত দুলাল ; কভু ধানশ্রীর গান,
অবিরল কলধ্বনি সঁপিয়াছে একখানি পাড়
মৌনতার উত্তরীয় প্রান্ত ঘিরি করি দীপ্তি দান।
শুষ্ক-ঘাস বাঁশবনে দগ্ধ করি দূর গিরিসার
কিংশুক-কোমল শিখা স্তরে স্তরে বহ্নিলীলা করিছে বিস্তার ॥

অকস্মাৎ নিশীথের মর্ম্মাহ'তে দিগন্ত অবধি
নীলাভ উল্কার রেখা আকাশেরে ফেলিল ছিঁড়িয়া,
ইস্পাত-মলিন নীল উদ্ভাসিল ধানশ্রীর নদী,
উদ্ভাসিল একবার স্বেদলবমুক্তাজাল দিয়া
পীতাভ-পাণ্ডুর মুখ বিত্থার—সে তমিস্রা ভেদিয়া।
ক্ষণিক-আলোক লুপ্ত গাঢ়তর সুপ্ত-অন্ধকারে
নভশ্চ্যুত স্বপ্ন সম দুই জনা চলিলা ছুটিয়া।
ভেদ করি গিরিদরী জনগ্রাম নগর কান্তারে
ভেদ করি তারকিত-নির্জ্জনতা নবতন দিগন্তর পারে॥

ঘৃতকুম্ভ

দ্বিতীয় পর্ব্ব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

সেদিন শ্রাবণ মাসের পয়লা তারিখ। গত রাত্রি হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, এখন বেলা চারি প্রহর, বৃষ্টি থামে নাই। সেই প্রচণ্ড বর্ষণের ফলে আমাদের উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি কলিকাতা সহরের ফুটপাথ জলে ডুবিয়াছে। ট্রাম চলাচল বন্ধ হইয়াছে। ট্যাক্সিওয়ালারা গলির মোড়ে মোড়ে আরোহী লইয়া অচল অবস্থায় দণ্ডায়মান। রিক্সর

হুড্ তুলিয়া রিক্সওয়ালা গদীতে বসিয়া ঝিমাইতেছে—একমাত্র বলীবর্দ্দ-বাহিত অর্ণবপোতের মত পথে চলিতেছে গোযান। বহুদিন পরে অদ্য তাহারা মহাত্মার অনশনের পরে অনুন্নতদের মত অস্পৃশ্যতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এতদিন যাহারা কয়লা ও সুরকি টানিয়া মরিয়াছে, আজ তাহারা আপিস-ফেরৎ বাবুদিগকে বহন করিয়া সগর্ব্বে চলিতেছে। পথে কেবল ছাতি, শাদা কালো বড় ছোট বিচিত্র বর্ণ ও আকারের ছত্রের অরণ্য ম্যাকবেথের বর্ণিত অরণ্যের মত সঞ্চরণশীল। এহেন বর্ষণপ্লাবিত শ্রাবণ দিবসে আমাদের উপন্যাসের পাত্রপাত্রীগণ কবি না হইলেও গণ্ডদেশে কর ন্যস্ত করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন এবং সকলের হাতেই একখানি করিয়া চিঠি। সকলেই বর্ষণস্নিগ্ধ দ্বিপ্রহরটি লিপিলিখন কার্য্যে ব্যয়িত করিয়া চিঠি ডাকে দিবার উপায় কল্পনা করিতেছিলেন।

ভবানীচরণের লিপির পাত্র শ্রীমৎদারুব্রহ্মানন্দ স্বামী। সম্প্রতি তিনি বরাহনগরের নিকট শিষ্যালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। ভবানী তাঁহার দর্শন কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছে। পত্রখানি এইরূপ—

প্রভো!

বহুদিন হইতে শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। আপনার সহিত নিজে গিয়া সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে নিষেধ আছে বলিয়া ইচ্ছা সত্ত্বেও এতদিন যাইতে পারি নাই। আপনার প্রাথমিক উপদেশাবলী বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছি—এবং তাহাতে সফল হইয়াছি। টাকা পয়সা আদৌ স্পর্শ করি না, নারীজন প্রসঙ্গেও যোগ দিই না। সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি জপ করি এবং নরকঙ্কালের দিকে চাহিয়া জগতের নশ্বরতা সম্বন্ধে চিন্তা করি। রাজসিক ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছি—ছানা, রাবড়ি, লুচী ও মালপো ইত্যাদি সাত্ত্বিক বস্তু

আহারার্থে ব্যবহার করিতেছি। আজকাল একাকী রাত্রি যাপন করিতে ভয় কিংবা অস্বস্তি হয় না। যে সব জিনিষ পূর্ব্বে ভাল লাগিত আজকাল ক্রমেই সে সব পদার্থে বিরাগ উপস্থিত হইতেছে। বুঝিতেছি এখন যোগমার্গ অবলম্বন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি একবার আসিলে ভাল হইত। ইতি

সপ্রণাম সেবকাধম
ভবানীচরণ

নারায়ণীদেবী রান্নাঘরে তাহার খুড়শাশুড়ীকে লিখিত একখানি পত্র হাতে করিয়া বসিয়াছিলেন। চিঠিখানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আপনার পত্র পাইলাম। সবই প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। যদি আপনার লিখিত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হয় তবে তাহাতে তাঁহার বা আমার আপত্তি নাই। তবে আমাদের যে ইচ্ছা ছিল তাহা হইল না। যে ছেলেটির সহিত বিবাহ দিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল তাহার সহিত বিবাহ হইবার আশা নাই। তাহার এক অভিভাবিকা ধর্ম্ম-দিদি আছে, তাহার আপত্তি, আর সে ছেলেও এখন সন্ন্যাসী হইবার মত হইয়াছে। কাজেই সে আশা ছাড়িয়াছি। গণেশবাবুর দেনা-পাওনা সম্বন্ধে সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া ফেলিলে আমরা মেয়ে দেখিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে পারি। আপনি মুরুব্বি হইয়া যাহা ভাল বুঝিবেন করিবেন। দেশকালের অবস্থা বুঝিয়া যতদূর সংক্ষেপ হয়—" ইত্যাদি।

মৃণ্ময়ী চিঠি লিখিয়াছিল তাহার এক বান্ধবীর নিকট। চিঠিখানির প্রথমাংশে সেদিনের ঘনবর্ষায় তাহার মন-ময়ূর পেখম ধরিয়া কেমন করিয়া নৃত্য করিতেছে তাহার একটি সংস্কৃত ও ইংরাজী কোটেশনে কণ্টকিত বর্ণনা ছিল, শেষের দিকে লেখা ছিল, "—হ্যাঁ, যখন হবে

সংবাদ দেব বৈ কি! তুমি না আস্‌লে তো চল্‌বেই না। তবে বিয়ে আমি কর্ব্ব না। কাউকে ভালোবেসেছি লিখেছ, তা মিথ্যে। একটি মাত্র পুরুষের সঙ্গে আমার কতক পরিচয় ছিল, তাকে ভালোবাসি বল্‌তে পার্ব্ব না তবে খুব ভাল লোক—ভ্যাবা গঙ্গারাম। তার সঙ্গে বিয়ে হবে না। মা নাকি চেষ্টা করেছিলেন তা সে নাকি সন্ন্যাসী হচ্ছে। তার মত লোকের সন্ন্যাসী হওয়াই উচিত। পারুক্ না পারুক্ তাতে আমার কাজ নেই। এখন এ বিপদ থেকে রক্ষা পেলে বাঁচি। মা আর বাবা চারদিকে চিঠি লিখে গণ্ডা গণ্ডা পাত্র যোগাড় কর্চ্ছেন, কোন্‌টা যে কখন ঘাড়ে এসে চাপে সেই ভয়েই আমি অস্থির হয়ে আছি।"

দারুব্রহ্মানন্দ স্বামী তাঁহার এক সহধর্ম্মী সন্ন্যাসীর নিকট লিখিতেছিলেন—"করুণাময়ের অশেষ কৃপাবলে নিরাপদ নির্ব্বিঘ্নে একরূপ দিন কাটিতেছে। কিন্তু দেশে গোয়েন্দার উৎপাত ক্রমে যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে স্থির করিয়াছি শীঘ্রই নগর পরিত্যাগ করিয়া ত্বদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইব। প্রকৃতপক্ষে মহারণ্যই আমাদিগের উপযুক্ত আশ্রয়। সংসারী মানবের সাহচর্য্যে বাস করিলে গার্হস্থ্য জীবনের বিবিধ স্মৃতি মনে উদয় হইয়া মনকে পীড়িত করিয়া ব্রহ্মবিচারকে কলুষিত করে। কিমধিকমিতি।"

বিমলার লিপির পাত্রী নারায়ণীদেবী। চিঠিখানি সুদীর্ঘ। দুইদিন পূর্ব্ব হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া এইমাত্র সে পত্রখানি শেষ করিয়া হাঁপাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্কভাবে বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া চালভাজা চিবাইতেছিল।

বিমলার পত্র তেওয়ারী কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে যখন নারায়ণী দেবীর নিকট পৌঁছিল তখন তিনি কেবল স্নান সারিয়া

লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়াছেন। ডালের হাঁড়ি উনুনে চাপাইয়া নারায়ণী দেবী পত্রখানি পড়িতে বসিলেন। পড়িতে পড়িতে অকস্মাৎ উঠিয়া তিনি বৈঠকখানার রুদ্ধ দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া তিনবার কড়া নাড়িলেন। সদাশিব বাবু বুঝিলেন প্রয়োজন জরুরী। একবার কড়া নড়িলে 'বাজার' দুইবার নড়িলে 'খাবার প্রস্তুত' এবং তিনবার নড়িলে 'বিশেষ প্রয়োজন' এইরূপ পারিবারিক সঙ্কেত ছিল। সদাশিব বাবু সমাগত রোগী তিনজনকে বসিতে বলিয়া ভিতরে আসিয়া কহিলেন, "কি ব্যাপার?"

নারায়ণী দেবী বিমলার চিঠি খানি সদাশিব বাবুর হাতে দিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, "প'ড়ে দেখ!"

সদাশিব বাবু পড়িলেন। বিমলা প্রথম দুই পৃষ্ঠায় বগলামুখী দেবী কর্তৃক শ্বশুরগৃহ হইতে তাহার উদ্ধার কাহিনী সংক্ষেপে লিখিয়া তাহার পর লিখিয়াছে—

"মুখেই সমস্ত বলিতাম কিন্তু মুখে বলিতে লজ্জা করিবে বলিয়া চিঠিতে লিখিলাম। ভবানীর মায়ের প্রথম সন্তানটির নাম ছিল খোকা। সে ছেলেটি সাত বৎসর বয়সে মারা যায়। তারপর অনেক দিন আর কোনও সন্তান না হওয়ায় ভবানীর মা কালীঘাটে ধর্ণা দেন। তাহার পর ভবানীর জন্ম হয়। কাশীধামের এক জ্যোতিষী আসিয়া ভবানীর কোষ্ঠী করিয়া বলিয়া যান যে একুশ বছর বয়সের পূর্ব্বে যদি কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার প্রণয় হয় কিংবা তেইশ বছর বয়সের আগে তাহার বিবাহ হয় তাহা হইলে তাহার প্রাণের হানি হইবে। এ সকল কথা ভবানীর মা মৃত্যুকালে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য মিনুর সঙ্গে যাহাতে সে ঘনিষ্ঠতা না করিতে পারে তাহার জন্য বরাবর আমি খুব চেষ্টা করিয়াছি, তাহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে

রাখিয়াছি। একুশ বছর বয়স তাহার দুই বছর আগে হইয়া গিয়াছে পয়লা শ্রাবণে সে তেইশ বছরে পড়িল। এখন মিনুর সঙ্গে যদি তাহার বিবাহ হয় তবে খুব সুখী হইব। সে গুরুদীক্ষা লইয়া ভজন পূজন করিতেছে কিন্তু কোষ্ঠীতে সন্ন্যাসী হওয়া লেখা নাই কাজেই তাহাকে সংসারী হইতে হইবে। এখন তাহাকে সংসারী করা দরকার। পরের সংসারে আর কতকাল আমি থাকিব? আমার শ্বশুর ঘর, স্বামীর ভিটা আছে সেখানে গিয়া মরিলে আপনাদের দশজনের আশীর্ব্বাদে বৈকুণ্ঠে যাইতে পারিব। কাজেই আপনি শ্রীমানের বিবাহ সম্বন্ধে একটা বিহিত ব্যবস্থা করিয়া গেলে বিশেষ সুখী হইব। মিনুকে এ পত্রের কথা জানাইবেন না কিন্তু তাহাকে একবার সঙ্গে করিয়া আনিবেন তাহাকে অনেক দিন দেখি নাই। মামাকে আমার প্রণাম দিবেন ও আপনি জানিবেন। মিনুকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি—সেবিকা বিমলাবালা দেবী।"

পত্রখানি পড়িয়া সদাশিব বাবু কহিলেন, "মেয়েটি লক্ষ্মী। তুমি আজই যাও। দেখ, পার যদি ভালই হয়।" বলিয়াই সদাশিব বাবু পুনরায় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। নারায়ণী দেবী অত্যন্ত খুসী হইয়া সজিনার ডাঁটার পরিবর্ত্তে সেদিন কপির ডালনা রাঁধিতে বসিলেন।

(২)

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। মেঝেতে আস্তৃত মৃগচর্ম্মে বসিয়া ভবানীচরণ পাঠ করিতেছিল—

কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? সর্ব্বাত্মনা রাগাদি নিবৃত্তেসতি কর্ম্মনিবৃত্তির্ভবতি। রাগাদি নিবৃত্তিঃ কদা ভবতি?

এমন সময় মিনু ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "রাগাদি নিবৃত্তিঃ কদা ভবতি ভবুদা ?" ভবানী ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া মিনুর দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। এ কোন্ মিনু ? মুহূর্ত্তকালের মধ্যে ভবানীর মন সত্য যুগে গিয়া উপস্থিত হইল ; মনে হইল যেন স্বর্গ হইতে উর্ব্বশী অথবা মেনকা ভবানীচরণ নামক ঋষি-কুমারের তপোবনে উপস্থিত হইয়াছে। মিনু বাম চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কহিল "কৈ বল্‌লে না ?"

ভবানী কহিল, "অনেক দিন পর তোমাকে দেখছি মিনু। বস।"

মিনু কহিল, "বস্‌ব কোথায় ? সম্বলের মধ্যে তো হরিণের ছাল, তা তো গৃহকর্ত্তাই জুড়ে বসে আছেন।"

ভবানী উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে একটা ছোট চৌকী আনিয়া কহিল, "বস। তারপর কি পড়ছ ?"

মিনু কহিল, "আবার কি ? যে পর্য্যন্ত বিদ্যে হয়েছে তাই সামলাতে অস্থির, এর পর আর সৈবে না।"

ইহার পর আর কি বলিবে ভবানী ভাবিয়া না পাইয়া বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। এই সময় দরজার কাছেই বিমলার গলা শোনা গেল। ভবানী তাড়াতাড়ি কহিল, "ঐ দিদি আস্‌ছে।" মিনু বিন্দু-মাত্র বিচলিত না হইয়া কহিল, "আসুন না! তিনজনে মিলে গল্প করা যাবে।"

এই সময় বিমলা ঘরে প্রবেশ করিল, ভবানী উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দিদি ?"

বিমলা কহিল, "কিছু না। মামীমা এসেছেন।" বলিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ভবানী আশ্চর্য্য হইল। যে মিনুর সহিত কথা বলা পর্য্যন্ত এক

কালে বিমলার নিষেধ আজ সেই মিনুকে জল জীয়ন্ত তাহার ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াও বিমলা রাগ করিল না! এ হইল কি? ভবানী ভাল করিয়া কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মিনু কহিল, "বস না ভবুদা! অনেক দিন দেখা নেই একটু গল্প করি। তুমি সাধু মানুষ তোমার কাছে দু' দণ্ড বস্‌লেও স্বর্গবাস।

ভবানী বসিয়া কহিল, "সাধু হ'তে অনেক তপস্যার দরকার। কলকাতা সহরে সে রকম তপস্যা হ'তে পারে না। তাই ভাব্‌ছি—"

"কি লিলুয়ায় যাবে?" মিনু কহিল।

ভবানী আবার থামিয়া গেল। তারপর কহিল, "না আরও দূর।"

"তবে বর্দ্ধমান?"

ভবানী বুঝিল মিনুর সহিত এ সকল প্রসঙ্গ চলিবে না। অথচ তাহাকে উঠিয়া চলিয়া যাইতে বলিতেও পারে না কাজেই অন্য কোনও প্রসঙ্গ পাড়িবে ভাবিতেছিল, এমন সময় গৃহভিত্তিলম্বিত নর-কঙ্কালটার দিকে চাহিয়া মিনু প্রশ্ন করিল, ভবুদা, আজকাল ডাক্তারী পড়ছ নাকি? মড়ার হাড় দেখছি যে!

ভবানী কহিল, "না। ওটা দরকার হয়।"

"দাঁত ভিরকুটি দেখবার জন্যে বুঝি ভবুদা?" মিনু কহিল।

ভবানী গম্ভীর হইয়া কহিল, "না জপ করি।"

"কি রকম জপ? এত কালী দুর্গা কার্ত্তিক গণেশ ভাল ভাল দেবতা থাকতে শেষকালে মড়ার হাড় জপ! তাও কোন জাতের মড়া—"

এবার ভবানী মিনুকে বাধা দিয়া কহিল, "সে সব তুমি বুঝবে না মিনু। এ জগৎ অতি নশ্বর। মানবজীবন দুদিনের সেই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখবার জন্যে—"

"নিমতলা ঘাটে গিয়ে ব'সে থাক্‌লে তো আরও ভাল হয় ভবুদা।

এ হয় তো কোনও বুড়ো মানুষের হাড়। আর সেখানে দেখা যাবে কত তাজা ছেলে ছোঁড়া রোজ নশ্বর মানব দেহ—" এই সময় বিমলার সঙ্গে নারায়ণী দেবী প্রবেশ করিলেন। ভবানী উঠিয়া নারায়ণী দেবীকে প্রণাম করিল, নারায়ণী দেবী কহিলেন, "হয়েছে বাছা, বেঁচে থাক!" তারপর ভবানীর স্বাস্থ্য বিষয়ক গুটিকয়েক কথাবার্ত্তা কহিয়া নারায়ণী দেবী বিদায় লইলেন।

নারায়ণী দেবী চলিয়া গেলে বিমলা কহিল,—"এখন তোমার সংসারী হবার দরকার হ'য়েছে ভবু।"

এ কথা বিমলার মুখে ভবানী কোন দিন শুনিবে ভাবে নাই। দিদি খাবার যোগাইবে এবং সে স্বচ্ছন্দে নির্লিপ্ত চিত্তে আহার করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিবে—জীবনের এই রকম একটা প্রোগ্রাম সে মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, বিমলার কথা শুনিয়া তাহার মুখ শুখাইল, সে কথা না কহিয়া চুপ করিয়া রহিল। বিমলা কহিল, "মিনুকে তোমার পছন্দ হয়?"

ভবানী মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করিল। বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা কইছিস্ না যে! পছন্দ হয়?"

ভবানী বিপদে পড়িল। কি বলিলে দিদি খুসী হইবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কহিল, "কেন দিদি?"

বিমলা কহিল, "শুধু শাস্ত্র পড়লে তো হবে না ভাই সংসার কর্ত্তে হবে। আমি আর কত কাল টানব?"

ভবানী ধীরে ধীরে কহিল, "বিয়ে কর্ব্বার তো সময় নেই দিদি। মানুষের এই নশ্বর জীবন—গুরুদেব বলেছেন—"

"গুরুদেব যা ইচ্ছে বলুন। বিয়ে তোমাকে না কর্ল্লে চল্‌বে না! এখন বড় হ'য়েছ, বয়সের মত বুদ্ধি হওয়া দরকার!"

ভবানী আর প্রতিবাদ না করিয়া কহিল, "আচ্ছা ভেবে দেখি, আর একদিন বল্‌ব।"

বিমলা 'আচ্ছা' বলিয়া চলিয়া গেল।

ভবানী কাণ পাতিয়া রহিল। তেতলায় গ্রামোফোন বাজিয়া উঠিবা মাত্র সে দরজায় খিল আঁটিয়া দারুব্রহ্মানন্দ স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লিখিল,—

"গুরুদেব! মহা বিপদ উপস্থিত। আমার দিদি বলিতেছেন আমাকে বিবাহ করিতে হইবে। হঠাৎ এরূপ বিপদ ঘটিবে তাহা আমি ভাবিতেও পারি নাই। অগত্যা আপনি আসিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। মায়াময় সংসার, কখন মায়ায় বাঁধা পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িব, এখন সর্ব্বদা আপনার আমার সঙ্গে থাকা আবশ্যক।"

ডাকে চিঠি পাঠাইয়া ভবানী ঘরে গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিল। প্রাণ-পণে দ্বিপ্রহরের যাবতীয় ঘটনা ভুলিয়া পরমে ব্রহ্মাণি যোজিত চিত্ত হইয়া তন্ময় হইতে চেষ্টা করিল কিন্তু কানে বিমলার কথাগুলি বার বার বাজিতে লাগিল। জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য বার বার নরকঙ্কালটির দিকে চাহিতে চেষ্টা করিল কিন্তু চোখ দুটি, যে চৌকীখানাতে মৃণ্ময়ী বসিয়াছিল, সেই চৌকীখানার উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। অগত্যা উঠিয়া চৌকীখানা খাটের তলায় লুকাইয়া সে আবার পদ্মাসনে বসিল কিন্তু মনে হইল মৃণ্ময়ী যেন পিছনে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছে, "কোথায় যাবে, লিলুয়া?" তাহার শাড়ীর লাল পাড়টি চোখের সম্মুখ দিয়া একটা রক্তবর্ণ সরীসৃপের মত কিল্‌বিল্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভবানী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর অস্থির হইয়া ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে

লাগিল। এমন সময় তেতলায় বিমলার গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়া উঠিল—

রূপের সায়রে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনেরি বনে মন হারাইয়া গেল॥

শুনিয়া তর্জ্জনী সহায়ে কর্ণরন্ধ্র দুটি বন্ধ করিয়া সে নীচে নামিয়া চলিয়া গেল।

নারায়ণী দেবী যথাকালে বিমলার মুখে ভবানীর সঙ্কল্পের কথা শুনিলেন। সদাশিব বাবু আহারান্তে গড়গড়ার নল মুখে দিয়া ঢুলিতেছিলেন। নারায়ণী দেবী কহিলেন, "ওগো শুন্‌ছ?"

চোখ না মেলিয়াই সদাশিব বাবু কহিলেন, "শুন্‌ছি।"

"ভবানী বিয়ে কর্ত্তে চায় না। সে সন্ন্যাসী হবে।"

সদাশিব বাবু কহিলেন, "বেশ! ন ধর্ম্মো সন্ন্যাসাৎ পরঃ।"

"মিনুর সঙ্গে বিয়ের কথা বিমলা বলেছিল। তাতে—"

সদাশিব বাবু কহিলেন, "সন্ন্যাসীর বিয়ে কর্ত্তে নেই।"

নারায়ণী দেবী রাগিয়া গেলেন, "সংসারের কথা বল্‌ছি ভাল ক'রে শোন। ভবানীর সঙ্গে মিনুর বিয়ের কথা বিমলা বলেছিল।"

সদাশিব বাবু উত্তর দিলেন, "হুঁ।"

"তাতে তার আপত্তি।"

"হুঁ।"

"এখন অন্য পাত্র দেখ তা হ'লে।"

"আচ্ছা।" বলিয়া সদাশিব বাবু পাশ ফিরিলেন।

"মিনুকে যার পছন্দ হ'ল না তাকে আর কি বল্‌ব?"

"কিছু না। আমি বল্‌ব।" বলিয়াই সদাশিব বাবু নাসিকা

গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। অগত্যা নারায়ণী দেবী আর কোনও কথা না কহিয়া একাকীই কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

'মিনুকে যার পছন্দ হ'ল না' কথাটি নারায়ণী দেবী কিঞ্চিৎ উচ্চৈস্বরেই কহিয়াছিলেন। পাশের ঘরে মিনু কথাটি শুনিতে পাইয়া— এডুইন আর্ণল্ডের খোলা কাব্যগ্রন্থখানি মুড়িয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। দ্বিপ্রহরে বিমলা আসিয়াছিল ব্যাপারটি সে পরিষ্কার জলের মত বুঝিয়া গেল। বুঝিল, ভবানীর সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে এবং তাহাকে ভবানীর পছন্দ হয় নাই। ভাবিতে ভাবিতে সে উঠিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং অভিনিবেশ সহকারে নিজের মুখচ্ছায়া দেখিয়া চক্ষু অর্দ্ধেক মুদ্রিত করিয়া একটু হাসিল, সে হাসি বিদ্রূপের। তারপর অনুচ্চ স্বরে কহিল, "আচ্ছা"! কথাটি বলিয়া অল্প সময়ের জন্য সে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি বোধ করিল বটে কিন্তু বিছানায় শুইয়া চোখ বন্ধ করিতেই আবার মনে হইল, 'মিনুকে যার পছন্দ হ'ল না'। মিনু আবার শয্যায় উঠিয়া বসিল। কি দারুণ অপমান! তাহাকে পছন্দ হইল না ভবানীর! আস্পর্দ্ধা তো কম নয়? ভাবিতে ভাবিতে মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিল সে রাত্রে আর মিনুর ঘুম হইল না!

—ক্রমশঃ

মিল-মেধ-কাব্য

বলেছে ভারতচন্দ্র, "মিল ছাড়া কাব্য নাহি হবে।"
"আমিও ছাব্য না তাহা" ভীমকণ্ঠে কহে সম্পাদক,
মিল যার একমাত্র ট্যাকভারী সুবোধ পাঠক!
মিল ছাড়া দিন যার চলা সুকঠিন এই ভবে।
মিল-গরমিল-বিধি মু-অক্ষম করিতে খণ্ডন,
শিরসি মণ্ডন করি চালাইনু শ্রীপদপল্লব
বড় সড়কের পানে। 'বাস্' আসে 'হৃদয়-বল্লভ',
তাহাতে চাপিনু বসি—এগারোটা বাজে:ঢন্ ঢন্।
বিরল-জনতা পথ-নগরীর—রাত এগারোটা—
ঝুলিয়াছে যবনিকা দীপদীপ্ত কক্ষ-বাতায়নে,
সেথা চাহি নিঃশ্বসিয়া ষ্টেশনের ইয়ার্ড-শয়নে
অভাগারা চলিয়াছে—পুঁটুলিতে বাঁধিয়া পরোটা।
'হৃদয়-বল্লভ' বাস্ গতি তার তস্করের প্রায়,
একটি ভোঁ-দৌড় দিয়া উত্তরিল ধর্ম্মতলা মোড়ে—
বাহুবন্ধে বাঁধি কটি যুগলেরা ঘোরাফেরা ক'রে
কেহবা দাঁড়ায়ে একা লুব্ধ নেত্রে ইতি উতি চায়।
মন খুঁজে ফিরে মিল কোথা মিল হা হত বিধাতা?
শূন্যে খিঁচাইছে দাঁত ভিক্টোরিয়া চেম্বারের চূড়া,
পদনিম্নে ফুটপাথে ঘুমাইছে অষ্টাবক্র বুড়া
জরাজীর্ণ দেহতলে পুরাতন 'ষ্টেস্‌ম্যান' পাতা।

চাহি আর খুঁজি মিল! আসে বড় সাহেবের গাড়ী,
মালিক হাঁকায় নিজে এঁকে বেঁকে বোতল-বেতাল;
ব্যাক সিটে ঢলি ঢলি হাসিতেছে নারী এক পাল—
ভুলিয়া আইন পঞ্চ সেলামিছে সার্জ্জেন্ট গ্রেগারী।
তবু মিল চাই! চাই! চলিলাম বিহ্বলের প্রায়
গঙ্গাপ্রাপ্ত অকটার্লোনী তস্ত সেই মনুমেণ্ট নীচে
জীবিত রমণী এক জীর্ণবাসে বসিয়া কাঁদিছে,
চারি পাশে এক গণ্ডা নগ্নদেহ বালক ঘুমায়।
ভাবিলাম মন্দ নয়, ছন্দভরা জগৎ নিখিল,
অজস্র উৎকট মিলে পরিপূর্ণ ধরণীর বুক—
আমি হতভাগ্য শুধু হাতে নিয়ে শূন্য নোটবুক
মাঠ হ'তে মাঠান্তরে নিদ্রাহীন খুঁজিতেছি মিল!
এত মিল, এত মিল! 'রেণেশাঁস' আর তালশাঁস
ফুল-ডোরে মূলো চোরে উদীচি ও মেদীচির সাথে
গাঁথা হ'ল কাব্যসূত্রে মিলধ্বজ কবিদের হাতে।
মোর মিল-ভাগ্যে শুধু বীণাপাণি মারিলেন বাঁশ।
ধিক্কারে হুক্কার এল চলিলাম জাহ্নবীর তীরে
মিলহীন এ জীবন রাখিব না—নামিলাম জলে।
অকস্মাৎ কটি মম পিছু হ'তে আঁকড়ি সবলে
কে কহিল—"মরিও না প্রাণেশ্বর, এসো এসো ফিরে!"
'প্রাণেশ্বর!' ফিরিলাম—হেন ডাক ডাকে নাই কেহ!
কিন্তু একি! কে রূপসী মূর্ত্তিমতী অমাবস্যা রাতি
নিগ্রোনিগৃহীতবর্ণা বিকশিয়া দীর্ঘ দন্তপাঁতি
হাসিয়া ডাকিছে মোরে 'প্রাণেশ্বর' নাহিক' সন্দেহ!

প্রাণেশ্বর ! চমকিনু, কহিলাম—"অয়ি বরাঙ্গনে !
কোথা দেখা তব সাথে সে কথা তো পড়ে নাক' মনে,
চিড়িয়াখানায় কিংবা গোঁদিয়ার ঘন শাল বনে ?"
"আমি কাব্যলক্ষ্মী তব বাস তব মগজ-অঙ্গনে।"
কহিলাম, "ধন্য আমি ! কিন্তু প্রিয়া অন্য কথা থাক্,
প্রভাতে হেরিলে তোমা পথিকের লাগিবে তরাস !
চট্‌পট্‌ চলি যাও মিলতত্ত্ব মোরে করি ফাঁস।
পণ মম এ জগতে যোগাইব কাব্যের খোরাক্—
মিলে মোলায়েম করি বেদানার পোলাওয়ের মত।"
নারী কহে—"যাও ফিরে ! আজি হ'তে নয়নে তোমার
কেবলি পড়িবে মিল—তুমি হবে মিল-মহামার—
শতমার কবিরাজ চিৎপুরের অমুকের মত।"
ত্রস্ত শজারুর সম কচুবনে মিলালো রমণী,
নাচিল ধমনী—
নোটবুক হাতে নিয়ে মালিনীর তালে নৃত্য করি
চলিলাম এসপ্লানেড্ ধরি।
দেখিলাম—সত্য বটে—এ নিখিল জগতের ঘটে
উপচিয়া পড়িতেছে মিল !
পথে ঘাটে বাসে ট্রামে মিল চলে করি কিলবিল
সরীসৃপ শিশুর সমান।
কে বলেছে মিল নাই ? মিল ছাড়া মিথ্যা এ জগৎ—
টিকি ও তিলক ছাড়া অসম্ভব গণেশ ভকত
তেজারতি চলিবে না তার।
নয়ন সম্মুখে মোর লক্ষ মিল করে হাহাকার,

মিল আছে ! আছে মিল !
মেলে ভালো 'হেম' আর 'প্রেম'—
'দান' সাথে নাচে 'প্রাণ' ;
নাচে যথা সোলজার ও মেম ।
'তাজে' ও 'ইংরাজে' মিল, মিলে গেল 'পুলিশে' 'ফুলিশে'—
জিদে আর মসজিদে—ক্রমে হ'ল অনেক গুলি সে
ভরি নিয়া নোটবুক চলিলাম সম্পাদক-স্থানে
আপ্যায়ন করিয়া চা-পানে—
সম্পাদক কহে—বন্ধু যশ তব ছুটিবে সুদানে ।—
আজি হতে গণ্য তুমি হবে বলি মিল-মিশ ওনার—
কাব্যে মিলে গরমিল, হে বন্ধু লহ হে নমস্কার ।

জাতিভেদ

রতিতে ওজন হবে লৌহের এ প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
বিধি চাহে জলাশয়ে জাতিভেদে জল ভাগাভাগি ;
বিরুদ্ধে তুলিছে মাথা দিকে দিকে যীশুর মিশন
দেবতার লীলা সবই, মোরা করি মিথ্যা রাগারাগি ।

উর্দোস্কৃত প্রচারিণী সভা

আজ প্রায় তিন মাস হইল মামা বাত সারাইবার জন্ম আমার বাসায় আসিয়াছেন। মামার বাত সারিয়া গিয়াছে, এখন প্রত্যহ দুপুর বেলায় ষ্টীমারে চাঁদপাল ঘাট হইতে রাজগঞ্জ অবধি ভ্রমণ করেন। লোকের সহিত আলাপ করিবার মামার অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি কাহারও সহিত আলাপের সূত্রপাত করেন না, একেবারে বজ্রপাত করিয়া বসেন। প্রত্যহ যাত্রিবৃন্দ ও ষ্টীমারের খালাসীরা অবাক্ হইয়া চীন, বর্ম্মা, মেসোপটেমিয়া ও ইজিপ্টে তাঁহার ডাক্তারীর গল্প শোনে।

সেদিন মামার সহিত ষ্টীমারে বেড়াইতেছি। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের জেটী হইতে একটী প্রৌঢ়বয়স্ক মুসলমান ষ্টীমারে উঠিলেন। মাথায় তৈলসিক্ত ফেজ, এক হাতে একটী কাপড়ে জড়ান বাঁশের লাঠি ও অন্য হস্তে একটী শাদা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। রং অমাবস্যা distill করা, ইলেকট্রিক লাইটের কাছে যাইলে হয় bulb ফাটিয়া যায়, নয়, তার fuse হইয়া যায়! শ্রোতার অভাবে এতক্ষণ মামার গল্প বন্ধ ছিল, মুসলমানটীকে সাদরে নিজের পাশে বসাইয়া একটী বিড়ি দিলেন। মিঞা সাহেব ব্যাগ হইতে একখানি হাতপাখা বাহির করিয়া দাড়ীতে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, "বিসমিল্লা, কি গরম!"

মামা—হাঁ, সামান্য গরম পড়েছে বটে, তবে বোগদাদের তুলনায় এ কিছুই নয়।

মিঞা—আপনি বোগ্‌দাদ গ্যাছলেন না কি?

মা—আমি ধনপতি বসু, পৃথিবীর কোন্ জায়গায় যাই নাই তাই

জিজ্ঞাসা করুন। চীন থেকে মিশর অবধি কোন দেশ আমার বাকী নাই।

মি—বোগ্‌দাদে কি খুব গরম?

মা—গরম তা আর বলতে? সেবার তিনটে উট আমার চোখের সামনে হার্টফেল হয়ে মরে গেল। আবার মরে পড়ে রইল আমার তাঁবুর সামনে। তখন ভয়ানক যুদ্ধ চলেছে, ঘণ্টায় ২৫।৩০টা হাত পা মাথা amputate কর্চ্ছি, উটগুলোকে যে টাইগ্রিসে ফেলে দেব সে সময় নাই। দু দিন বাদে হাঁসপাতাল থেকে বেরুবার সময় পেলুম। বেরিয়ে দেখি উটগুলো পচে নি। তিন দিন দিনযামিন্যোসায়ংপ্রাতঃ রৌদ্র লেগে একেবারে আমসত্ত্বের মতন হয়ে গেছে।

মি—বলেন কি? হাড্ডি ভি শুকিয়ে গেল?

মা—একদম বিলকুল শুকিয়ে খেংরাকাটী বানিয়ে গেল।

মি—কি তাজ্জব বাত!

মা—এ আর তাজ্জব কি? নানকিনে এর সাড়ে তিন গুণ গরম। তখন চীনদেশে ডাক্তারী করি। বুদ্ধদেবের Wisdom tooth উদ্গম উপলক্ষে আমাদের ২১ দিন ছুটী। সঙ্গে একটী চীনে হাবসী চাকর নিয়ে চীনের পাঁচীল দেখতে বেরুলুম। গিয়ে দেখি চীনারা কাঁচা পাঁপরে জলের ছিটে দিয়ে পাঁচীলের ওপর রাখছে আর খানিক বাদেই পাঁপর মুচ্‌মুচে ভাজা হয়ে উঠছে।

মি—বিসমিল্লা, এমন কাণ্ড ত কখনও শুনি নি।

মা—শুনবেন কোত্থেকে? আগে ত আর ধনপতি বোসের দেখা পান্‌ নি। 'আমি চীন্‌ময় ভারত' বলে একখানা বই লিখছি, তাতে এই সব কথা থাকবে। গরমে পাঁচীলের পাথরগুলো

ফটাফট্ ফাটছিল তার এক টুকরো ছিটকে লেগে হাবসীটা মরে গেল।

মি—একদম মরে গেল ?

মা—একদম আপাদমস্তক মরে গেল। একেবারে চীনের পাঁচীলে মরে বুদ্ধলোক-প্রাপ্তি। চীনদেশে প্রতি বৎসর পাঁচীলের কাছে ৩৭ হাজার লোক গরমে গলে মারা যায়, এই জন্যেই ত ওরা রেগে দেশটাকে Republic করে ফেল্লে।

মি—কি বিশ্রী মুল্লুক! আপনি বহু জায়গায় ঢুঁড়েছেন দেখছি। লোক-গুলো কি পাঁচীলের ধারেই পচে, না, তাদের কলসীতে পুরে গোর দেওয়া হয় ?

মা—পচেও না, গোরও দেওয়া হয় না। গরমে গলে শিলাজতু হয়ে হিমালয়ের গা বেয়ে তিব্বতে এসে পড়ে আর কবিরাজরা তাই কুড়িয়ে নিয়ে ওষুধ করেন। এ শিলাজতু কলকাতায়—কুমারটুলীর বনেদী কবিরাজদের ও হরিণবাড়ী লেনের সেরা সেরা হাকিমদের কাছে পাওয়া যায়। বোগদাদের গিদ্ধড়খানাচকের এক কাণা হাকিমের কাছেও কিছু দেখেছিলুম। যাক্ অনেক কথা হল, শালিমারে এসে পড়েছি দেখছি, আসুন আর একটি বিড়ি নিন্, আমিও একটু তামাক খেয়ে নিই।

Attache caseএর ভিতর হইতে মামা একটি ছোট হুঁকা বাহির করিয়া তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "তাইত মিঞা সাহেব, এতক্ষণ আলাপ হল, আপনার নাম ত জানা হল না। আপনি কোত্থেকে আসছেন ?"

মি—আমার নাম গাজী বিটকেল-উদ্দীন, ঢাকা জিলার মক্তব হতে বাংলা বাত improve করবার জন্ম কলকাতায় এসেছি।

মা—আহাহা, আপনিও বাতে ভোগেন না কি? ও অতি সাংঘাতিক ব্যায়রাম; আমি ওতে তিন মাস শয্যাগত ছিলুম, কিছুতেই সারে না। শেষে কলকাতায় আমার এই ভাগনের বাসায় থেকে ডাক্তার প্রাণহরণ ফিস্‌নবীশের চিকিৎসায় একটু ভাল আছি। তিনি আমাকে সকালে বিকালে ট্র্যামে, দুপুরে ষ্টীমারে, সন্ধ্যার সময় রিক্‌সায় ও রাত্রে বাসে বেড়াতে বলেছেন। আপনার বাত কোথায়? হাতে, পায়ে, না শিরদাঁড়ায়?

মি—আমি বাংলা বাতের কথা বলছি, হাত পায়ের বাত নয়?

মা—হাঁ, আমিও ত তাই বলছি। রাস্তায় অনেক ভিখারী দেখা যায়, বেশ স্বাস্থ্যো করা চেহারা অথচ হাতে লাঠি নিয়ে একপা খোঁড়াচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, "রামজীর কৃপায় পায়ে বাত হয়েছে, একটি পয়সা দিন।" এ বাত হিন্দুস্থানী বাত, মেড়ো ছাড়া আর কোনও জাতের এ বাত হয় না। আমি ও বাতের কথা বলছি না। আমার একেবারে বাংলাদেশের শ্রীপাট শান্তিপুরের গেঁটে বাত, একদিন কেরাসিন তেল মালিস কর্ত্তে ভুলে গ্যাছেন কি জয়েন্ট মচ্‌কে ধরে গ্যাছে। আপনার যদি সামান্য বাত হয় ত * * * কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হতে বাঘের চর্ব্বি কিনে মালিস কর্ব্বেন, বেশ উপকার হবে।

মি—আপনি মোটেই সম্‌জাচ্ছেন না, এ সে বাত নয়।

মা—গেঁটেবাত নয়, তবে কি কট্‌কটে বাত? তার ভাবনা কি! কালো ভাল্লুকের নখ কোমরে লাল সূতো দিয়ে বেঁধে রাখলেই সেরে যাবে, তবে দেখবেন ভাল্লুকটির যেন একটিও সাদা লোম না থাকে।

মি—আরে মশাই, আপনার যে কিছুই মালুম হয় না, আমি ও-সব বাতের কথা বলছি না।

মা—তবে কি আপনার আমবাত ? ওর কথা তুলবেন না। আম-
বাতের মোটেই respectability নাই, ওটা বাতকুলকলঙ্ক।

মি—আরে মশাই, আমি বাত ব্যায়রামের কথা বলছি না, আমার বাত
বাংলা বাত, যাকে আপনারা বলেন, ব্যাঙ্গলী লিংগুয়েজ। হিঁদুদের
হাতে পড়ে বাংলা বাত একদম পয়মাল হয়ে গ্যাছে। আমি এই
বাংলা লিংগুয়েজে উর্দ্দু ও আরবী বাত ঢুকিয়ে এমন একটি চীজ্
বানাব যে দুনিয়া শুদ্ধ লোক অবাক হয়ে যাবে।

মা—সাবাস মিঞা, সাবাস ! এ অতি উত্তম কথা বলেছেন। বাংলা
ভাষায় বাত ধরিয়ে দিতে পাল্লে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়। আমার যখন
বাত প্রায় সেরে এসেছিল তখন দিন কয়েক দেশবন্ধু পার্কে বেড়াতে
যেতুম, কিন্তু কংগ্রেসওলাদের অত্যাচারে আমাকে বেড়ান বন্ধ
কর্ত্তে হয়েছিল ; রোজ রোজ মিটিং আর বক্তৃতা, কান ঝালাপালা,
tympanum ফাটাফাটি, শেষে পুলিশের লাঠালাঠি। একবার
ভাষাতে বাত ধরলে lecture আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। বাছাধনেরা
বুকে flag এঁটে বক্তৃতা দিতে এসে হাঁ করে থাকবেন, ভাষার
বাত হয়েছে, কিছুতেই কথা বেরোয় না। Political agitation
একেবারে stopped. British Government এতদিন কামান,
বন্দুক, বেয়নেটে, যা করতে পারেনি আপনি একলা তা করে
ফেলবেন। এ যেন ঠিক হনুমানের এক লাফে সমুদ্র-লঙ্ঘন।
আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা আবার নিশ্চিন্তমনে পার্কে বেড়াতে
পাব।

মি—আঃ কি আবোল-তাবোল বলছেন মশাই ? আপনার মাথায়
নিশ্চয় ছিট আছে।

মা—না মিঞা সাহেব, ধনপতি বোসের মাথা একেবারে খাঁটি অভয়-

আশ্রমের চরকার সূতোয় বানান, ছিট প্রবেশ করলেই tresspass. যাহ'ক আপনার plantটা খুব ভাল, এতে পার্কে ডেঁপো ছেলে-গুলোর বক্তৃতা বন্ধ হবে, বাড়ীতে মেয়েদের ঝগড়া বন্ধ হবে, এমন কি কাউকে সামনাসামনি গালাগালি দেওয়া চলবে না, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও শ্রীমান স্বভাষচন্দ্রের মত খবরের কাগজের মারফৎ ভগবানের কাছে বিপক্ষের সুমতি প্রার্থনা করতে হবে।

মি—না, না আপনি কিছু সমজাচ্ছেন না। আমরা চাই আপনাদের বাংলা ভাষায় শতকরা ৫৫টী উর্দ্দু ও পারশী কথা ঢোকাতে, তা হ'লে সকলেই বাংলা বুঝতে পারবে। আপনাদের হাতে পড়ে সংস্কৃতের ঠেলায় বাংলা language একেবারে জাহান্নমে গেছে, আমরা ওর উদ্ধার কর্ত্তে চাই। এবার বুঝলেন ত?

মা—ঠিক বুঝলুম না, জাহান্নমের latitude, longitude ত আমার জানা নাই। আর নেহাৎই যদি ভাষাটা জাহান্নমে গিয়ে থাকে তাহ'লে ওকে উদ্ধার করতে হ'লে আপনাদেরও ততদূর যেতে হবে।

মি—আলবৎ যাব। এই দেখুন না, আপনারা মিছামিছি নিরীহ মুছলমানদের হয়রান করবার জন্যে তালব্য ছ, মূর্দ্ধণ্য ছ, দন্ত্য ছ—তিনটা ছ রেখেছেন, এর বদলে একটা ছ রাখলে কি ক্ষতি?

মা—ঠিক বলেছেন মিঞা সাহেব, ওটা একটা মস্ত বেয়াকুবী, চীনারা যাকে বলে 'ইংসান্'। আমার একবার বস্‌রায় থাকতে বড় ইলিশ মাছ খাবার ইচ্ছা হয়েছিল। ভাবলুম শ্বশুর মহাশয়কে লিখে দি; তিনি গোটা কুড়ী ইলিশ মাছ Air-mailএ করে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু ইলিশ মাছ কোন শ দিয়ে বানান করতে হবে ঠিক না হওয়ায় আমার আর চিঠি লেখা ঘটে উঠল না।

মি—হাঁ, এইবারে বুঝুন, এসব হুজ্জত আমরা তুলে দেব। তবে আপনাদের গোড়ায় কয় বৎসর মৌলবী রাখতে হবে, তা না হ'লে সব বাত বুঝতে পার্ব্বেন না। আমরা শতকরা ৫৫টী উর্দ্দু কথা ও অক্ষর ঢোকাব, বাকী ৪৫টী সংস্কৃত থাকলেও থাকতে পারে। তখন দেখবেন বাতের কি চেহারা হয়।

মা—ও বাবা, আপনি ত সোজা লোক নন, একেবারে পাণিনি-ছালাদিন লিমিটেড! তা শতকরা ৪৫টী সংস্কৃত কথা রাখলে কি করে চলবে? গালাগালির কথাগুলো ত cent per cent depressed class-দের কাছ থেকে নিতে হবে। আর এ ভাষাকে বাংলা বলবেন কেন? একে বলুন **উর্দ্দোস্কৃত**।

মি—ঠিক বলেছেন, আপনার মত বিচক্ষণ লোক আমি খুব কম দেখিছি। আজই দামাদুদ্দৌলা সাহেবকে আপনার কথা বলব।

মা—দামাদুদ্দৌলা সাহেব আবার কে?

মি—আরে দামাদুদ্দৌলার নাম শোনেন নি? তিনিই আমাকে খরচ দিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় আনিয়েছেন। তিনি একবার বল্লেই সব কেতাব এই ভাষায় লেখা হবে। চলুন, চাঁদপাল ঘাটে নেমে দুজনে তাঁর কাছে যাই।

বিটকেলউদ্দীনের কথায় মামার ভাষাচর্চ্চার উৎসাহ দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে একাকী বাড়ী যাইতে বলিয়া বিটকেলের সহিত দামাদুদ্দৌলার বাড়ী চলিলেন।

(২)

মামা আজকাল 'উর্দ্দোস্কৃত' লইয়া বড় ব্যস্ত। বিটকেলউদ্দীন ভাষাচর্চ্চার switch টিপিয়া দেওয়া অবধি মামার মাথায় অনবরত উর্দ্দু হইতে সংস্কৃতে alternating current পাস করিতেছে। এরই মধ্যে

উর্দ্দোস্কৃতে দু' তিনখানি বই লিখিয়া ফেলিয়াছেন, দামাদুদ্দৌলা আশা দিয়াছেন ওগুলি শীঘ্রই স্কুলপাঠ্য হইবে। মামার কথাবার্ত্তাও আজকাল উর্দ্দু মিশ্রিত। খাইবার সময় প্রায়ই ঠাকুরকে বাবুর্চ্চি বলিয়া ফেলেন। আমি প্রতিবাদ করিলে বলেন, "দেখ, যাহার রন্ধনে বাবুদের রুচি সেই হল বাবুর্চ্চি, এটি অতি প্রাচীন উর্দ্দোস্কৃত শব্দ, আন্তপদলোপী কর্ম্মধারয়।"

একদিন সন্ধ্যার সময় দেখি মামা অতি প্রফুল্ল মনে একটি Chinese কানেড়া ভাঁজিতে ভাঁজিতে রিকসায় চাপিয়া আসিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "আজ আমার নূতন নামে পাঁচ শ' কার্ড ছাপিয়েছি।"

আমি—নূতন নাম কি মামা ? নামও বদলালেন না কি ?

মা—সব বদলাই নি, কেবল ধনপতি বসুর বদলে দৌলতখসম বসু করেছি।

আ—কি সর্ব্বনাশ, করেছেন কি মামা, কেবল 'বসু'টুকু রেখেছেন ? ওটুকুও বাদ দিলেন না কেন ?

মা—বসুর বদলে বৈঠ্ঠ করব স্থির করেছিলাম, কিন্তু সেদিন রহিমুদ্দীন একখানা বই থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে বিড়ি মুড়ে দিলে। বিড়ি বার করতে গিয়ে দেখি কাগজে লেখা রয়েছে "বুদ্ধদেব বসু প্রণীত।" আমি জীবনের অর্দ্ধেক বর্ম্মা চীন প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে কাটিয়েছি, বুদ্ধদেবের উপাধি ত্যাগ করলে আমার নেমকহারামী হবে, 'ভেস্তে' যেতে পারব না।

(৩)

আজ University Instituteএ উর্দ্দোস্কৃত প্রচারিণী সভার প্রথম অধিবেশন হইবে। মামা সকাল হইতে বড়ই ব্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের

Comparative Philologyর অধ্যাপক নীতিশোভন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যক্কতমৃঙ্গী পিলে নামে এক মান্দ্রাজী ও অবোধভাস্কর বাগচী নামে এক চীন-ভাষাবিদকে লইয়া উর্দ্দোস্কৃতের বিরুদ্ধে দল পাকাইয়াছেন। ইহারা মিটিংয়ে আসিবেন শুনিয়া মামা চেনা অচেনা সকলকেই সভায় আসিয়া উর্দ্দোস্কৃতের পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ করিতেছেন।

বেলা চারিটার সময় মিটিং আরম্ভ হইল। মামা ৫০।৬০ জন যুবক-যুবতী লইয়া আসিয়াছেন, আমাকেও সঙ্গে আসিতে হইয়াছে। সর্ব্ববাদিসম্মতক্রমে দামাদুদ্দৌলা সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ও কয়েকখানি পত্র দেখাইয়া বলিলেন, "অনেক বড় বড় ছাহেব ছরীর বেতরিবৎ নিবন্ধন আসিতে পারিবেন না বলিয়া পত্র দিয়াছেন। আপনারা জানিয়া খুষ্ট হইবেন যে উর্দ্দোস্কৃতে সহানুভূতি জাহের করিবার জন্য বিশ্বমক্তবের একজন বাংলাঝুলেমা নিজের নাম বদলাইয়া দানেশমন্দ ছেন রাখিয়াছেন। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন, "উর্দ্দোস্কৃত নূতন ভাষা নয়। বাংলাভাষায় পীরোত্তর, আইনজ্ঞ প্রভৃতি উর্দ্দোস্কৃত শব্দ বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভ্রমানন্দবাবু একজন মুসলমান লেখক 'জলপথে'র পরিবর্ত্তে 'পানিপথে' লিখিয়াছেন বলিয়া বিদ্রুপ করিয়াছেন, তিনি জানেন না যে বৈষ্ণবসাহিত্যে বহুদিন ধরিয়া পানি শব্দের ব্যবহার হইতেছে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে "আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।" উর্দ্দোস্কৃতে বলিতে হয় ভ্রমানন্দবাবু রামাজ্ঞ। ইহার পত্রে আরও অনেক ছারগর্ভ বাত আছে। এখন সভার কাম সুরু করা যাক। যক্কতমজী ও বাগচী ছাহেব compromiseএ রাজী আছেন, আপনারা উঁহাদের বাত গ্রাহ্য করেন কি না মালুম হইলে অন্য কাম্ করা যাবে।

যকৃতমজী বাংলা কিম্বা উর্দ্দোস্কৃত কিছুই জানেন না। তিনি ইংরাজীতে যাহা বলিলেন তাহা হইতে বুঝা গেল যে বাংলার উচ্চারণ মান্দ্রাজীদের ন্যায় না হইলে অচিরেই বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরে ডুবিয়া South Poleএর সহিত আঁটিয়া যাইবে। তাঁহার পর একটি অল্পবয়স্ক বালক বক্তৃতা দিতে উঠিল। শুনিলাম ইনিই অবোধভাস্কর বাগচী, ইনি চীনভাষাবিশারদ, বহুদিন জ্যোৎস্নারাত্রে চীনের প্রাচীরের উপর Sun-Yat-Senএর সহিত Mah-jong খেলিয়াছেন। ইঁহার এরূপ চীনপ্রীতি যে প্রাতঃকালে চীনাবাড়ীর জুতা দর্শন না করিয়া সিগারেট স্পর্শ করেন না।

ইনি মেয়েলী গলায় বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের উর্দ্দোস্কৃত ভাষার সহিত আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে, কিন্তু আমি চীনভাষাকে তাহার অপেক্ষা শ্রদ্ধা করি। আমার নিবেদন, বাংলা পুস্তকে যেমন উর্দ্দোস্কৃতে লেখা হইবে, ইংরাজী পুস্তকও সেইরূপ চীনাবাজারের ইংরাজীতে লেখা হউক। দেখুন চীনারা হুয়েন সাংএর সময় হইতে বাংলা দেশে আমাদের জুতা supply করিয়া আসিতেছে। ইহা উহাদের Yellowman's Burden. অতি প্রাচীনকালে চীনারা আমাদের নিকট দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন, এই জন্য বেদান্তে ভগবানকে 'চিণ্ময়' অর্থাৎ a full-blooded Chinaman বলা হইয়াছে। আপনারা যদি আমার প্রস্তাবে রাজী হন তাহা হইলে আমি বাগচীর পরিবর্ত্তে 'সেরচী' উপাধি লইতে প্রস্তুত আছি।"

বাগচী 'সেরচী' উপাধি লইবেন শুনিয়া সভায় ঘন ঘন করতালি ও Sandal-তালি হইতে লাগিল। কিন্তু উহা মুসলমানদের মনঃপূত হইল না। এক হারুণ অল রসীদ প্রতিম বৃদ্ধ অঙ্গুলী সঞ্চালনে দাড়ী দশদিকে বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "হদিসে চীনাদের কোনও

বাত নাই ; উহারা শূয়ার খায়, উহাদের ভাষায় ইংরাজী লেখা হইলে তাহা হারামতুল্য হইবে।" এই কথায় সভায় মহাগণ্ডগোল হইতে লাগিল। দামাদুদ্দৌলার Casting Voteএ যক্তমজী ও বাগচী উভয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গেল। এখন প্রকৃত উর্দ্দোস্কৃত-প্রচারিণী সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে গাজী বিটকেলউদ্দীন উঠিয়া বলিলেন—

"ভাইছাব ও বহিনছাবীগণ, আজ মোদের কি সুরোজ। আমরা এতগুলি আদমী আদমিনী জাড়পীড়িত বকরা বকরীর ন্যায় একত্র হইয়াছি। টিকিওয়ালা মৌলবীদের হাতে পড়িয়া বাংলা ভাষার নাজেহালত্ব লাভ হইয়াছে, তবে সোবে হয় দৌলতখসম বসু ও সেরচী ছাহেবের মেহেররাণীতে উহার পূনর্জান্ প্রাপ্তি হইবে। নজর করুন হিন্দু বাঙ্গালীরা কি পাজী! আমরা শতকরা ৫৫ জন হইলেও ওরা আমাদের বাত মোটেই পুছে না। একমাত্র বিনয়কুমার ছরকার ছাব, দুনিয়া, দৌলত, পয়জার প্রভৃতি বাত ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু হিঁদুয়ানীর চক্রে পড়িয়া তিনিও একখানি কেতাবের নাম "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" রাখিয়াছেন; কেন? উস্কোর বদলে "জরু, গরু ও মুল্লুক" নাম দিলে কি ক্ষতি হইত? আশা করি অভিনয়া সংস্করণে তিনি কেতাবখানির নাম বদলাইবেন। যদি না বদলান, দপ্তরীদের বলিয়া দিব, কেহই উহার কেতাব বাঁধিবে না, সকলে finger-strike করিয়া বসিয়া থাকিবে। এখন হইতে আমাদের যথামূরৎ উর্দ্দু ও আরবী শব্দ চালাইতে হইবে। আমাদের জান থাকিতে বঙ্গ-বাতের অঙ্গ হইতে বিনয় ছাহেবের পয়জারের চিহ্ন লোপ পাইতে দিব না।"

বিটকেলউদ্দীন এই বক্তৃতা দিয়া ঘন ঘন দাড়ী সঞ্চালন করিতে

লাগিলেন ও চতুর্দ্দিক সাবাস, সাবাস কেয়াবাৎ শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। তখন সভাপতির আদেশে হাজী ভীমরুল বেসামাল নামক একটা বাবরীকাটা চুলওয়ালা যুবক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। ইনি বলিলেন "বেরাদরগণ ও বেরাদারিণীগণা, বিটকেলউদ্দীন এতক্ষণ যা চিল্লালেন তা আপনাদের আলবৎ কানে ঢুকিয়াছে। একবার হিন্দুদের বদমায়েসীত্ব নজর করুন, আজ হইতে আমরা জান্‌পনে উর্দ্দোস্কৃতের চর্চ্চা করিব। বড়ই আফশোষের বাত যে আজ বেহেস্তীয় দিলবাহার দাস মহাশয় এখানে হাজির নাই। তিনি জান্‌বস্ত থাকিলে কংগ্রেসকে দিয়া বাংলা বাতের মধ্যে শতকরা ৮০টা উর্দ্দু বাত দিবার pact করিতেন। মরদসিংহ সার জল্‌দি-খোশ ছাড়া আর কারুর তাঁকে বাধা দিবার মত ছাতির জোর ছিল না। কিন্তু হায় দাস ছাব আজ ভেস্তে গিয়াছেন। তাঁহার কাম আমাদেরই করিতে হইবে। ইহাতে টেংরীপশ্চাৎ হইলে চলিবে না। আপনারা না করিলে আমি কখনও কসুরাপবাদগ্রস্ত হইব না। আমিও লেখার মধ্যে উর্দ্দোস্কৃত ঢুকাইয়াছি। বিনয় ছরকারের কেরামতিতে বাংলার অঙ্গে পয়জার পড়িয়াছে আমিও উহাকে জিঞ্জির পরাইয়াছি। আমিই বা কম কিসে?"

হাজী ভীমরুল বেসামালের বক্তৃতা শেষ হইলে মামা দামাদুদ্দৌলাকে কানে কানে কি পরামর্শ দিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া দামাদুদ্দৌলা উঠিয়া বলিলেন, "দৌলতখছম ছাহেবের এক দোস্ত এই সভায় হাজির আছেন। ইনি একজন ভয়ানক এলেম্বান্ আদমী, এর মধ্যেই উর্দ্দোস্কৃতের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহার কেতাবের কিছু নমুনা আপনাদের শুনান হইবে।"

দামাদুদ্দৌলার কথায় খদ্দরপরিহিত, শীর্ণকায়, মাথায় এরারুট

মাখাইয়া "টেরীকাটা একটী যুবক দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, সভাধসম মহাশয় ও সমবেত সভ্যগণ! আমার পূর্ব্বের নাম শিশিরকুমার দাস, তখন আমি বেকার সঙ্ঘের একজন মেম্বার ছিলাম। দৌলতধসম বাবুর নাম শুনিয়া একরোজ তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে কিছু সাহায্য দান করিয়া উর্দ্দোস্কৃতের চর্চ্চা করিতে বলিলেন। তাঁহার বাতানুসারে আমি বেকারসঙ্ঘের অফিসে যাইয়া উহার নাম 'সাদীকার সঙ্ঘ' রাখিবার প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু উহার মেম্বারগণ কেহই আমার বাত গ্রাহ্য করিল না, বরং বিশেষ পীড়াপীড়ি করাতে জন কয়েক বেয়াদব আমাকে বাউরা বলিয়া ভাগাইয়া দিল। তখন আমি দৌলতধসম বাবুর আস্তানায় আসিলাম ও শিশিরকুমার দাসের বদলে 'ওস্‌পোলা গোলাম' নাম লইলাম। তাঁহার সলামর্শে জল্‌দাজল্‌দি উর্দ্দোস্কৃতে কেতাব বানাইতেও সুরু করিয়া দিলাম। বহুদ্রোজ আগে বিদ্যাসাগর নামে এক আদমী বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া দুখানি কেতাব বানাইয়াছিল, কিন্তু উহাতে উর্দ্দারবী বাত একদম নাই। তদোয়াস্তে, আমি কেতাব দুখানা উর্দ্দোস্কৃতের কায়দানুযায়ী বানাইয়াছি ও উলেমাগণের পড়াইবার সুবিস্তার জন্য বহুৎ সলা বাত্‌লিয়াছি। আমার কেতাব এইরূপ হইবে:—

রং মোলাকাৎ।

পহেলা বখরা।

ভেগু-যাত এলেমবহর কর্ত্তৃক বানিত

ও

গোলাম্ ওস্পোলা চেক্‌নাই দ্বারা পরিবর্ত্তিত।

বাংলা হরফ দুরকম, 'রং তরকারী' ও 'রং আওয়াজ'। 'রং তরকারী'

পহেলা। উহার হরফগুলি গোড়া হইতে এই রকমে লিখা হয় ",:,ঃ ...। ইহাদিগকে 'নোক্তাচাঁদ', 'বিবেহেস্ত', 'গোবরাণু' ইত্যাদি বলিয়া পড়িতে হয়। পহেলা বখরা আগাগোড়া এই রকমে বানাইয়াছি। দোসরা বখরাও সুরু হইয়াছে। উহার গোড়াতে 'ঐক্য, বাত্য, বিসাদীক্য, জহরত্য' প্রভৃতি আচ্ছা আচ্ছা বাত লাগাইয়াছি। এই বখরা এখনও সারা হয় নাই তবে আপনাদের মেহেরবানী থাকিলে জল্‌দি ইহা লিখিয়া ফতেষ্ট হইব।"

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের এই নমুনা দেখিয়া সকলে খুব প্রশংসা করিলেন। চতুর্দ্দিকে "বহুৎ আচ্ছা, সাবাস্‌, কেরামৎ কেরামৎ" শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। মামা কেবল "দৌলত্য, দৌলত্য" বলিয়া ভীষণ ভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

আর কেহ কিছু বলে না দেখিয়া মামা একটুকরা কাগজে কি লিখিয়া সভাপতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দামাদুদ্দৌলা তাহা পড়িয়া বলিলেন, "বড়ই স্ফূর্ত্তির বাত যে সংস্কৃত জানা একজন পণ্ডিত দৌলতখসম ছাহেবের সাথ এখানে আসিয়াছেন, তিনি এখন উর্দ্দোস্কৃতের পক্ষে বলিবেন।"

তখন মামা ইসারা করিলে নামাবলী গায়ে এক ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহাকে প্রত্যহ মামার নিকট আফিং দিয়া চা খাইতে দেখিয়াছি। দামাদুদ্দৌলার পাশে আসিয়া ইনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সভাপতি মহাশয় ও ভদ্রমহোদয়গণ! মদীয় নাম শ্রীনকুড়চন্দ্র পূতিতুণ্ড ভট্টাচার্য্য শিরোমণি, আমি একজন গণ্ডহিন্দু, ইতর লোকে যাহাকে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া থাকে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে সায়ংসন্ধ্যা সমাপ্ত না করিয়া আমি জলোস্পর্শ করি না। পূর্ব্বে আমি কার্ত্তিকচন্দ্র পরামাণিক্যের কাষ্টগোলকে কার্য্য করিতাম, সম্প্রতি

ধনপতি বাবুর সাহার্য্যে একটী বিত্যালয় উৎখোলন করিয়াছি। ধনপতি বাবু আমার পরম হিতাস্কাঙ্ক্ষী। একজন সংস্কৃতাজ্ঞ গণ্ডপণ্ডিত সাম্যর্থন করিলে আপনাদের কর্ম্মের সৌকার্য্য হইবে শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুরোধে আমি অত্য এই সভায় আপনাদিগের সহিত সমবেত্র হইয়াছি। আমি বাংলা ও সংস্কৃত সম্যক্ অবগত আছি এবং মদীয় পাঠ্যশালয়ে ছাত্রগণকে ইংরেজী ফাষ্টোবুকের চিলের পাতা অবধি অধ্যাপনা করিয়া থাকি। প্রয়োজন হইলে বালকগণকে ড্রিল, মুদ্গরভঙ্গিকা ও কুস্তীও শিক্ষাদান করিতে পারি। অনেক দিন গঙ্গাস্তীরে সন্ধ্যা করিতে করিতে চট্টগ্রামের নাবিকগণের বাক্যালাপ পরিশ্রুতিগোচর হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হৃদয়োদগম্য না হওয়ায় কিছুতেই উহার মর্ম্মানুষ্কাবন করিতে পারি নাই। ইহা হইতে আমার মর্ম্মাস্তিক ধারণা হইয়াছে যে উর্দ্দোস্কৃত ব্যতীত আমাদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, মাদৃর্শজনের বাক্যে আপনাদের কিছু গমনাগমন হইবে না। কিন্তু রামায়ণে লিখিত আছে যে, যখন রামচন্দ্র সেতুবন্ধন করিতেছিলেন তখন হনুমান, জাম্বুবান প্রভৃতি মহদ্বীরগণ উপস্থিত থাকিলেও জনৈক কাঠবেরালী তাঁহাকে একমুষ্টি বালুকা দিয়া সাহার্য্য করিয়াছিল। আমিও সেই প্রাচীনা কাষ্টমার্জ্জারীর ন্যায় ধনপতি বাবুকে সাহার্য্য করিবার জন্য এস্থলে আগন্তক হইয়াছি। আপনাদের যখন উর্দ্দোস্কৃতে পুস্তক ছাপা হইবে তখন উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলে আমি প্রাণোৎপাত করিয়া উহার proof প্রদর্শন করিব। আশা করি এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাক্য আপনাদের মানস্পুটে অঙ্কিত থাকিবে এবং যথাসময়ে আমাকে উক্ত কার্য্যের ভারাম্পণ করিবেন।" এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয় বসিয়া পড়িলেন; তাহার কথায় কেহ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল না।

শিরোমণি মহাশয় বসিয়া পড়িলে পর দামাদুদ্দৌলা বলিলেন, "কলিকাতা ভুনিয়ামক্তবের বাতচ্ছাত্র-হুনহুর নীতিছোভন ছাহেব কিছু প্রতিবাদ করিতে চান্। এইবার তাঁহার বলিবার পালা, আপনারা তাঁহার কথা শুনিবেন না।" নীতি-শোভন বাবু প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া কোমরে তাঁহার ষব-বালি-পরিচিত ময়লা লালপেড়ে সিল্কের চাদর বাঁধিয়া সকাল ৭টা হইতে Hunger-strike করিয়া Auto suggestionএ বরাহ অবতারের উপাসনা স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায় বেলা ৩টার পর হইতে তিনি সমাধিস্থ ছিলেন, এখন সভাপতির কথায় চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া লাফাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,

"সভাপতি মহাশয় ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দ, আমি উর্দোস্কৃতের একান্ত বিরোধী। হিন্দুর সনাতন ভাবধারা কখনও উর্দ্দুতে প্রকাশ পাইতে পারে না। সংস্কৃতোৎপন্ন ভাষা ব্যতীত আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতা অসম্ভব। হিন্দুদের একটি নিজস্ব কাল্চার আছে। এই কাল্চার যুগযুগান্ত হইতে সংস্কৃতের সহিত বিজড়িত। আপনাদের ইহা নাই বলিয়া আপনারা ইহার মূল্য সম্যক্ অবধারণ করিতে পারেন না।"

যেই নীতিশোভন বাবু এই কথা বলিয়াছেন অমনি "তোবা, তোবা" বলিয়া ঢাকা হইতে আগত একটি ওয়াল্‌রাসোরস্ক হিপোপটেমাস-স্কন্ধ মুসলমান যুবক লাঠিহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল

"আরে কত্তা, বস্ যান, থামা ছ্যান, কাল্চার, কাল্চার করি চিল্লাইবেন না। কাল্চার বুঝি ক্যাবল হেঁদুগো আছে, মোছোলমানদের নাই? কেন, মোছোলমানরা কি ম্যাঘনার জলে ভাইস্যা আইছে না কি? কাফের হেঁদুদের যদি কাল্-চার থাকে ত মোছলমানদের

নিশ্চয়ই 'পরস্তু-পাঁচ' আছে। যদি না থাকে ত হাতী মিঞাকে বৈল্যা গভর্ণমেণ্টের কান মল্যা আদায় কইর্যা লইমু।"

ইহার কথায় চতুর্দ্দিকে তুমুল হাস্যধ্বনি উঠিল। সভাপতি বহুকষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া রহিলেন। বিট্‌কেলউদ্দীন রাগিয়া লোকটিকে তাড়াইয়া দিতে যাইতেছিলেন কিন্তু পাছে আরো গোল বাধে এই আশঙ্কায় মামা তাহাকে নিরস্ত করিলেন। শেষে দামাতুদ্দৌলা তাহাকে বহু চেষ্টায় বসাইয়া দিলেন, লোকটা বসিয়া আপন মনে গজরাইতে লাগিল। নীতিশোভন বাবুও বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "অনেক রাত্রি হইয়াছে, এখন দৌলত-খসম বহু ছাব কিছু বলিবেন, ইনি উর্দ্দোস্কৃতে বহুৎ কেতাব বানাইয়াছেন তাহা হইতে কিছু কিছু পড়িবেন।" তখন মামা তাঁহার সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ ভুঁড়ি দোলাইতে দোলাইতে বলিতে লাগিলেন, "মজলিশ-খসম জবরাশয় ও ভদ্রাভদ্র মাজলিশগণ, আমি ভদ্রাভদ্র বলিতেছি কারণ এ সভায় নীতিছোভন বাবুর মত অভদ্রাদ্‌মীও হাজির আছেন; হে জেনানাবৃন্দ, আপনারা নীতিছোভন বাবুর বাচ্ছ্রবণ করিবেন না। উনি হিঁদুর সনাতন ভাবধারার কথা বলিয়াছেন কিন্তু সনাতনের যে দবিরখাস বলিয়া উর্দ্দোস্কৃত নাম ছিল তাহা বলেন নাই। এই থেকেই আপনারা সমজাচ্ছেন উনি কি রকম সাংঘাতিক ধাপ্পাবাজ। উঁহার জানা উচিত যে উর্দ্দুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বাত। উরস্ দুলাইয়া যাহা পড়া যায় তাহাকে উর্দ্দু বলে। আপনাদের নিশ্চয়ই নজরুক্ত হইয়াছে যে আদ্‌মী শিশুগণ যখন নয়া পড়িতে সুরু করে তখন তাহারা ছাতি দুলাইয়া পড়িতে থাকে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে পহেলা সকলেই উর্দ্দুতে পাঠ করে। আমরা মেহেরবানী করিয়া শতকরা ৪৫টি সংস্কৃতবাত

রাখিতেছি। অনেকে শতকরা ৫০টি বাত সংস্কৃতে রাখিতে চান। কিন্তু তাহা হইতে পারে না—কারণ আমরা সংস্কৃতের সহিত compromise (কম্—প্রমিজ)· করিতে চাই। সমান promise কিম্বা বেশী promise করিতে পারি না। বড়ই আফশোষের বাত যে দুনিয়া-ওজনৃতী মুসলমানগণের নিকট হইতে বহুৎ আশরফী বাগাইয়াছে তথাপি আফতাবেন্দ্রের উর্দ্দোস্কৃতের প্রতি নেক্‌নজর নাই। কিন্তু উহাতে আমাদের ডরান্বিত হইলে চলিবে না। এই বাতে যে আচ্ছা কেতাব বানান যাইতে পারে তাহা দেখাইবার ওয়াস্তে আমি রামায়ণখানি উর্দ্দোস্কৃতে বানাইয়াছি। আমার বানিত কেচ্ছা হইতে কিছু পড়িয়া শুনাইব। আপনারা স্থির মেজাজিস্থ ও খাড়কর্ণ হইয়া শ্রবণ করুন। দ্যাখেন আমার হাতে বাংলা বাতের চেরাগ, কি রকম উর্দ্দোস্কৃতের তৈলযোগে কাশ্মিরী ছুঁবার স্থায় পত্‌পত্‌ নিনাদে গগনসড়কে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।” এই বলিয়া মামা একতাড়া কাগজ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

“সীতার সাথ রিষ্মাদশ-ছাওয়াল রামের সাদী হইয়া গিয়াছে; কয়দিন খুব জবর খানাপিনা চলিয়াছে। হর রোজ বাইগুনের কোপ্তা ও ঠাণ্ডী পোলাও ভক্ষণে সকলের প্যাটে খিল ধরিতেছে। কেহই হাত হইতে বদ্‌না নামাইবার ফুরসৎমন্ত হইতে পারিতেছে না। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও দুস্‌মনঘ্ন সকলেই হাজির। সীতামায়ির ললাটে সিন্দূর পানি-পানি করিতেছে। নবাবর্ষি জনক চারপায়োপবেশনে উজু করিতেছেন তাঁহার সামনে বশিষ্ঠ মৌলবী, দুনিয়াদোস্ত মোল্লা গৌ চুরী করিয়াছে বলিয়া নালিশের আরজী পেশ করিতেছেন। এমন সময় “হরিনাম হক্, হরিনাম হক্” বলিতে বলিতে নারদ মোল্লা আসিয়া হাজির, ইয়া আজানুলম্বিত নূর, হাতে অলাবুর বদ্‌না, মুখে

ষ্ট্রাণ্ডরোডের বিড়ি। জনক তখনই তাঁহাকে লুঙ্গিগর্দ্দান হইয়া আ-জমীন সেলাম করিলেন। নারদ বলিলেন, "ভোঃ ভোঃ ওজুস্মান বাবা পাতশাহ, তব শরীর সরীফ ত?" বাবা পাতশাহ, বলিলেন "হে মেহেরবানীময় মোল্লাসত্তম, পঞ্চ-মামুদো নির্ম্মিত শরীরের বাত পুছিয়া বান্দাধমকে কেন লাজ দিতেছেন? আপনি দামাদপ্রবর রামকে আশীর্ব্বাত করুন। উহাকে যেন নেকাহিত জীবনে কোনও বালাই ভোগ করিতে না হয়। আজ আমার বহুৎ সুরোজ, তব-মাফিক পরম বখরাবতের দর্শন প্যালাম্। আমি বুড্ডা বনিয়া গিয়াছি, বোখারা রাক্ষসী আমাকে গ্রাস করিয়া বৈঠিয়াছে। আশীর্ব্বাত করুন, যেন আমার জান্ চেরাগ নিবিয়া গিয়া ভগবানের গোঁড়ে আস্তানা কায়েম করিতে পারে।" এই বাত শুনিয়া নারদ মোল্লা ফুকারিলেন "সওদাগর সওদাগর! আপনিই যথার্থ খোদাবিদ্। আপনার মধুর্ব্বাতে আমার নূরে বাতাস লাগিল।" এই বলিয়া তিনি রামকে একটি হরিতকী নজর দিয়া বলিলেন, "হে রঘু-খসম কমল-চশম, মুস্কিল-ভঞ্জন, বিপদাসান্ সর্ব্বমুরোদাবাদ ব্রহ্মতালা তোমায় ভাল রাখুন।" রামজী পাকিটে হরিতকী রাখিতে গিয়া দেখেন যে পাকিটের গর্ত্ত আছে, পাকিট নাই। এই দেখিয়া তিনি দিলোদুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেখুন, দরজীর কাণ্ড, মেরজাইটার জন্য বেটাকে নগদ ১৮ আনা কার্ষাপণ দিয়াছি তবু বেটা পকেট বানায় নাই।" বাবা পাতশাহ বলিলেন, "রাম তোমার মস্তকে মোটেই এলেম গজায়িত হয় নাই। দরজীকে কি কেহ বিশ্বাস করে? বৌধায়নের হদিসে আস্নাই গোঁসা প্রভৃতি ছয়টী রিপুর কথা লেখা আছে। এই রিপুদের কামকে 'রিপুকর্ম্ম' বলে। দরজীরা হরদম রিপুকর্ম্ম করে, উহাদের বিশ্বাস করিতে নাই।" তখন নারদ

মোল্লা বলিলেন, "ভোঃ বাবা পাতশাহ, আসিবার সময় নয়া সড়কের ধারে টাঙ্গিরাম দরবেশের সাথ মোলাকাত হইল, টাঙ্গিরাম আপনার জ্যেষ্ঠদামাদের সাথ একহস্ত লড়িবেন বলিয়া আসিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ গোঁসান্বিত হইয়া বলিলেন "কি বোলতা, মোল্লাবর? কে টাঙ্গিরাম দরবেশ? হামি অমন একশোটা টাঙ্গিরামকে এক কলিকায় সেজে খানা পিনা করিতে পারি। সে আগে হামার সাথ লড়ুক, তার পর রামভেইয়ার সাথ লড়বে।" নারদ বলিলেন, "হে লছমন, তুমি অপরিণত-উমেরস্ক বালক মাত্র, তোমার মগজ বুদ্ধিষ্ঠ হইতে বহুৎ দেরী। তুমি টাঙ্গিরামকে চিন না। ও মোটা মোটা ছত্রীদের পোলা দেখলেই গাঁজা খাইবার পয়সা চায়, পয়সা না পাইলে জলদি গর্দ্দান লয়। ও একটী ধাড়ী সয়তান, নিজের মাকে কোতাল করিয়াছে।" এই অপরূপ রামায়ণ শুনিতে শুনিতে হিন্দুদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। একজন শ্রোতা বলিল, "মশাই কি কি এখানে মস্করা কর্ত্তে এসেছেন?" আর একজন বলিল "না, উনি দামাদুদ্দৌলার আস্কারাতে রসকরা বিলুচ্ছেন।" মামা এই কথায় একেবারে রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "কি বেটা জিন্-ছাওয়াল, খোবীসদামোদ! আমায় বাধা দেওয়া! তোমার নাপ্পিতে পোকা পড়ুক। যদি আমার কথা না শুনবে তবে এখানে মরতে এসেছ কেন? যাও রাসমণির বাজারে কুমড়ো বেচো গে, দুপয়সা রোজগার হবে।"

মামার আস্ফালনে হাতাহাতির উপক্রম দেখিয়া দামাদুদ্দৌলা বলিলেন, "দৌলতখসম ছাব, আর আপনার রামায়ণের কাম নাই; আপনি যে poetry বানাইয়াছেন তা থেকে কিছু বাতলিয়ে ছান।"

তখন মামা বলিলেন, "এ অতি খুব-বাত, এবার একটু গজলপদী কবিতা শুনুন।" এই বলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন—

দামাদুদ্দৌলা চিল্লায় সাজ্ সাজ ।
হেঁদুর হাড্ডিতে ফেলবো বাজ্ ॥
বিটকেলউদ্দীন বোকা দুম্বা ।
নাড়ছে হামেশা নূর লম্বা ॥
বাংলা ভাষা হয়ে দেওয়ানা ।
বুলছে দেখ দীন নয়না ॥
দেখরে মোদের বাতমাতা ।
পিঁধেছেন আজ ছেঁড়া কাঁথা ॥
ওঁকে উর্দ্দুর উর্দ্দী পরাতে হবে ।
তবে ত মায়ি বিবি বানাবে ॥
আমি বস্থ দৌলতখসম ।
বলছি নিয়ে কালীর কসম ॥
বাঙ্গালীর বাত সহিদ হবে ।
কিম্বা আমার জান্ যাবে ॥
আমি জননীর হক ছাওয়াল ।
পরাবো মাকে উটের ছাল ॥
উর্দ্দোস্কৃতে বাত কই ।
আদমী মুই, দুম্বা নই ॥

মামার poetry শুনিয়া শ্রোতারা "কেরামৎ কেরামৎ" বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। মামা সোৎসাহে বলিলেন, "এ কাম্ সব মেরা নিজস্ব, কেবল শেষের লাইনটি ডি, এল, রায়ের 'মানুষ আমরা নহি ত মেষ'-এর উর্দ্দোস্ক ত তর্জ্জমা।"

মামার বক্তৃতা শেষ হইলে সকলে "হাতী মিঞাকি জয়, দৌলতখসম বস্থকা জয়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সভাপতিকে কেহ কিছু বলে না দেখিয়া মামা স্বয়ং তাঁহাকে Vote of thanks দিলেন ও চেঁচাইয়া বলিলেন, "সকলে বলুন জয় বাবা দামাতুদ্দৌলা মাঘিকী ফতে!" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটি টুপী বাহির করিয়া পরিলেন। টুপিটি আর্দ্ধেক গান্ধী ক্যাপ্ ও আর্দ্ধেক ফেজ্; তাহার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা

"উর্দ্দোস্কৃতে বাত কই !
আদমী মুই, তুম্বা নই ॥"

সভা ভঙ্গ হইল। শ্রোতারা উৎসাহে মামাকে চ্যাংদোলা করিয়া রিক্সায় চাপাইয়া দিল, আমিও রিক্সার একধারে বসিলাম। রাত্রি তখন ৯টা। আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। রিক্সা যখন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মমন্দিরের কাছ দিয়া যাইতেছে তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শুনিলাম কয়েকটি যুবক ব্রাহ্মসমাজের সিঁড়ির উপর বসিয়া গান গাহিতেছে—

"চিদাশ্মানে হল পূর্ণ আস্নাই-চন্দ্রোদয় হে।"

আমি বলিলাম, "মামা এ কি কাণ্ড করলেন?"

মামা গম্ভীরভাবে বলিলেন—

"কালোস্মি ভাষাক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো
বাংলা সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতোর্দ্দুস্কৃতে ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যে স্ফুরিতা প্রত্যনীকেষু বাতাঃ"

—শ্রীহলধর ভড়

মানসাঙ্ক

হেদোর উত্তরধারে গাছের ছায়ার তলে বসি'
একলা দুপুরবেলা মনে মনে মানসাঙ্ক কষি।
এগারোটা গেছে বুঝি বেজে
সরু সরু ছেলেগুলো মোটা মোটা বই হাতে ঢুকিতেছে
পাশের কলেজে।
আকাশে একটা রবি, আরেকটা হেদোর পুকুরে,
আকাশের তপ্ত আলো নাচে পুকুরের বুক জুড়ে,
পড়ে রোদ গাছের মাথায় ;
মাঝে মাঝে হাওয়া বয়—গরম দুপুরে হাওয়া—
নাড়া দেয় পাতায় পাতায়।
'আমার মনের সাথে কি যেন কি যোগ আছে দুপুরের
বাতাসের সনে'—
মনে মনে ভাবি, আর গাছের ছায়ায় বসে মনেসাঙ্ক কষি
মনে মনে।
'একসের দুধ যদি দেয় রোজ পাঁচ পোয়া বলে,
গোয়ালাটা এক মাসে কত সের ঠকায় তা হলে ?'
চুল্‌কাই মাথা, আর 'ফর্‌মুলা' লাগাই কেবল,
কিছুতে বুঝিনে তবু এ আঁকের কত হবে ফল ;
ভেবে ভেবে ঘামে মাথা, দেহ ঘামে রোদের গরমে,
ব্যর্থতার ব্যথা মোর বেজে ওঠে মরমে মরমে।
যাগ্ সে গোয়ালা বেটা যত পারে থাকুক্ ঠকাতে ;
আখেরে জবাব এর ওই দেবে, আমার কি তাতে ?

ওকে ছেড়ে অন্য আঁক কষি
হেদোর উত্তরধারে গাছের ছায়ার তলে বসি'।
ওধারের রাজপথে চলে ট্যাক্সী ট্রাম্ চলে কত ;
চলে বাস্, রিক্সা আর পায়ে হাঁটা পান্থ অবিরত।
দেখে আমি হেসে মরি, আর ভাবি, "হায় মূর্খ; হায় !
তোমরা মরিছ ঘুরে এ ভবের গোলক-ধাঁধায়।
আমি দেখ কি আরামে গাছের ছায়ার তলে বসে
তুনিয়ার তুখ ভুলি মনে মনে মানসাঙ্ক কষে।"
এসো গো পথিক এসো, এসো কলেজের ছেলেমেয়ে !
হেদোর উভয় ধারে তোমরা সবাই এসো ধেয়ে।
পথিক ! তোমার হাঁটা এখন ক্ষণিক বন্ধ থাক্।
কলেজের ছেলেমেয়ে ! তোমাদের পার্সেণ্টেজ্ যায় যদি যাক্।
এইখানে এসে মোর সনে
গাছের ছায়ায় বসে মানসাঙ্ক কষ মনে মনে।

প্রসঙ্গ-কথা

এই সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে আমরা জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম।

পরাধীনতা-সমস্যাই বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা, কিন্তু সে সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আলোচনা অর্ডিনান্সে বাধে। দ্বিতীয় সমস্যা—হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ অথবা মিলন বিষয়ক। এই সম্বন্ধে সমাধান চেষ্টাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। সুতরাং বৃহত্তর ও বিপজ্জনক

সমস্যাগুলির কথা ছাড়িয়া দিয়া নিরীহ হিন্দুসমাজের পক্ষে যে সমস্যার সমাধান এখন নিতান্ত আবশ্যক মনে হইতেছে সে বিষয়েই তিনটি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিলাম।

কিন্তু এই আলোচনার আরও বহুদিক আছে, বহু মনস্বী ব্যক্তি বহুরকমে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে ভাবিয়া থাকেন, বাঙালীরাও ভাবেন। জাতির কল্যাণের জন্য এই সমস্যায় যোগদান করিতে আমরা তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা যদি অশুভ বিবেচিত হয় তাহা হইলে তাহা দূর করার চেষ্টা সমবেত ভাবেই করিতে হইবে; বহু শতাব্দীর পাপ একদিনে যাইবার নয়। সুতরাং এসম্বন্ধে আন্দোলন ও আলোচনা যত ব্যাপকভাবে হয় ততই ভাল। জাতি ও দেশকে যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহাদের এই সম্পর্কে কিছু বলিবার থাকিলে নিশ্চই তাঁহারা নীরব থাকিবেন না। শনিবারের চিঠি তাঁহাদিগের মতামত যথাযথ প্রকাশ করিবার দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন আলোচনার ফলে এই সমস্যার একটা মীমাংসা হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং ইহাই হইবে জাতির প্রথম সোপান।

এই সমস্যাটিকে নিতান্ত গতানুগতিক ভাবে যাঁহারা দেখিয়া থাকেন আমাদের এই আবেদনের লক্ষ্য তাঁহারা নহেন। যাঁহাদের সত্যকার কিছু বলিবার আছে তাঁহারা কথা বলিলেই কাজ হইবে; আশা করি তাঁহারা কথা কহিবেন।

আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাও আমরা যথাসময়ে বলিব। ভবিষ্যতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কেও এই ধরণের আলোচনা আহ্বান করিবার ইচ্ছা আছে।

* * *

মেসার্স বিরলা ব্রাদার্সের 'বেঙ্গল ষ্টোর্স' খোলা হইল, এই সংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য বিশ্ব-বরেণ্য বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন বেঙ্গল ষ্টোর্সে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেদিনকার আনন্দ-উৎসবের মধ্যে আমরা অনুভব করিলাম, বাঙালার কবি আনন্দোজ্জ্বল মুখে ললিতমধুর কণ্ঠে বাঙালীর পরাজয়ের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। কবির কণ্ঠ কাঁপে নাই, চোখে অশ্রু উদ্গত হয় নাই। বাঙালীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

বাংলাদেশের রাজধানীর বুকে বেঙ্গল ষ্টোর্স খুলিল মাড়োয়ারী, শিরস্ত্রাণ-বিরহিত বাঙালীরা তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, দেখিয়া আনন্দ করিল জয়ধ্বনি করিল। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য মাড়োয়ারী-বাঙালীর এই মাখামাখি আনন্দ-সূচক সন্দেহ নাই কিন্তু শুধু বাংলার কথা ভাবিতে গেলে বলিতে হইবে রবীন্দ্রনাথ সেদিন বাঙলার অমঙ্গল ডাকিয়া আনিলেন। বৃহৎ করিয়া ভাবিতে গেলে স্বদেশ বিদেশ, স্বদেশী বিদেশী এই বিভাগ করিবারই বা প্রয়োজন কি? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বেঙ্গল ষ্টোর্সে স্বদেশী দ্রব্য মিলিবে বলিয়াই বা আনন্দ করেন কেন? স্বদেশ বিদেশের তফাৎই যদি করিতে হয়, বাঙালী অবাঙালীর তফাৎ আমরা বাঙালী হইয়া করিব না কেন?

অথবা, আবরা সঙ্কীর্ণমনা বলিয়াই এইরূপ ভাবিতেছি, আসলে সেদিন দেশের মঙ্গলই সাধিত হইল।

এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খৃষ্টান।

বেঙ্গল ষ্টোর্সের জয় হউক।

* * *

শনিবারের চিঠির পাঠকেরা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছেন; পুরাতন সংবাদ-পত্র ঘাঁটিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি শনিবারের চিঠিতে প্রকাশ করিয়াছেন; 'পুরাতনী' বিভাগে সেকালকার অনেক সংবাদ শনিবারের চিঠির পাঠকদের গোচরে আনিয়াছেন।

এই সকল বিষয় জানিবার জন্য যাঁহাদের আগ্রহ আছে তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে সম্প্রতি 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামে ব্রজেন্দ্র বাবুর একটি সুবৃহৎ পুস্তকের প্রথম খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় ও ব্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার সমাজ রাষ্ট্র ও সাহিত্য কিরূপ ছিল তাহার সত্যকার পরিচয় এই গ্রন্থে আছে। যাঁহারা গত শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিবেন, এই পুস্তকটিকে বাদ দিলে তাঁহাদের চলিবে না। এই গ্রন্থখানি ব্রজেন্দ্রবাবুর বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। পুরাতন গলিত কীটদষ্ট বিস্মৃত সংবাদপত্র ঘাঁটিয়া বাংলার ইতিহাসের যে উপকরণ ব্রজেন্দ্রবাবু আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিতেছেন তজ্জন্য সমগ্র বঙ্গভাষাভাষীর তরফ হইতে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

চলচ্চিত্র
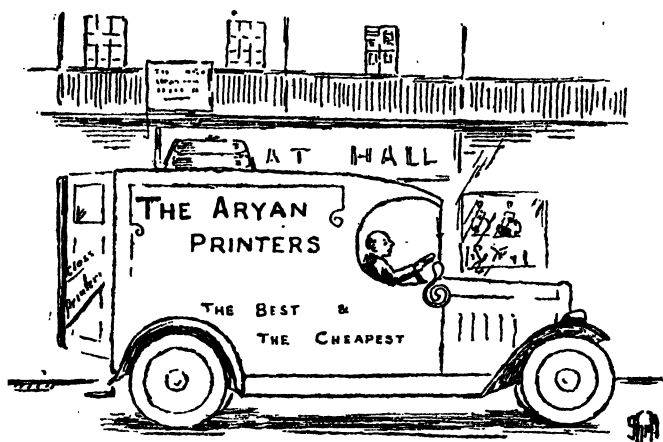
আমাদের প্রাচীন—
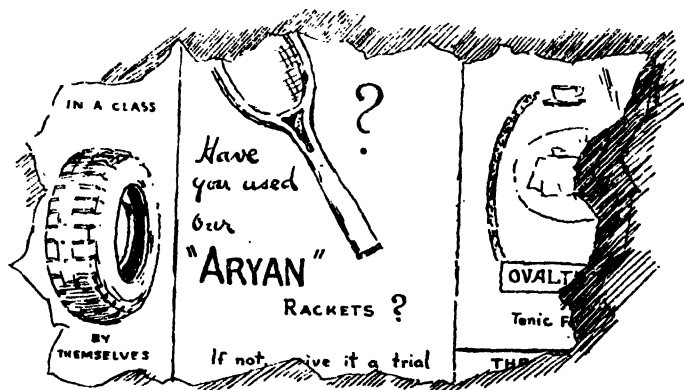
টেনিস র‍্যাকেট ছিল না ? আলবৎ ছিল।
প্রমাণ—বেদ।

আমাদের ভিত্তি—
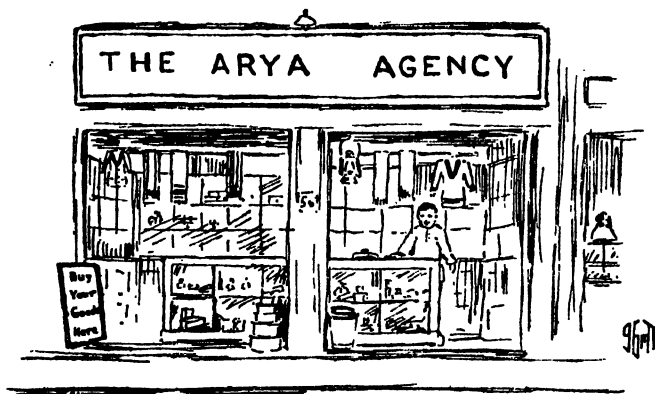
ক্রমশঃ প্রমাণ হইতেছে—
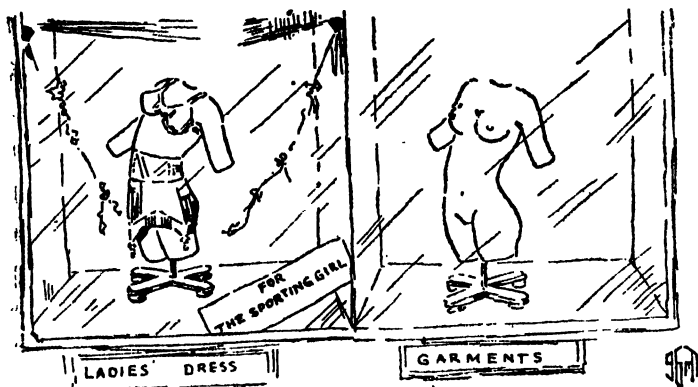
দোকানে যদি চলে, সাহিত্যে চলিবে না কেন ?
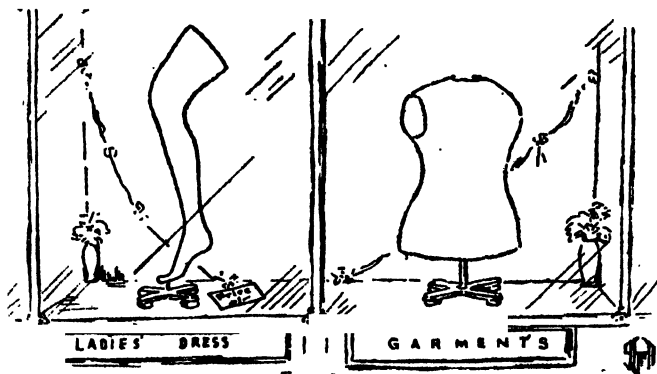
ভুলও তো হইতে পারে !
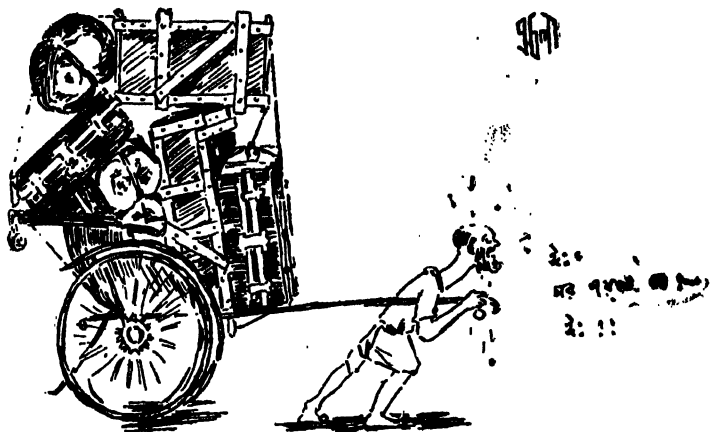
সি এস পি সি এ !
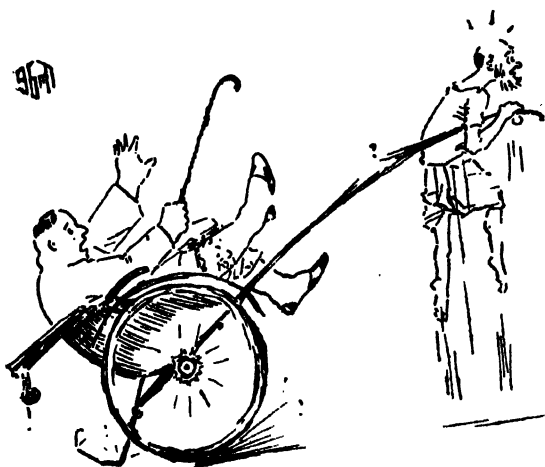
ঠিকসে বস্থন হুজুর

কে জাগে ?

সহরে সবাই ঘুমে অচেতন, জেগে আছে পেট্রোল,
বি-ও-সি এবং সোকোনি এবং শেল—
কারো আঁখি লাল, কারো চোখ দুধ-সাদা।
আর জেগে রয় রাস্তার মোড়ে বীটের পুলিস যত,
পৌষের শীত রাত্রি দুপুর বাজে।

জেগে আছে যারা পানের দোকানে মদের বেসাতি করে,
বিড়ির দোকানে কোকেন যাহারা বেচে—
চাটের দোকানে প্লেটে সজ্জিত কাঁকড়া ডিমের ঝাল,
গলদা চিংড়ি, বেসনে পলতা-ভাজা—
শীতের হাওয়ায় শুকায়ে হয়েছে কাঠ।

জেগে আছে তারা এখনও যাদের জোটে নাই খদ্দের,
জুটেছে যাদের—পাখা খুলে দিয়ে ভূতের নৃত্য করে—
মদে আর গানে, চাটে, বাঁয়া-তবলায়।
স্খলিত বচনে ঘন ঘন তারা পানওয়ালারে ডাকে,
অকারণে চুমু খায়, হাসে, কাঁদে, গান গায় অকারণ।
বুদ্বুদ-সম কারেন্সী নোট হাওয়ায় মিলায়ে যায়।

জাগিয়া রয়েছে তাহাদের বধূ যাহারা ফেরেনি ঘরে,
মা হতভাগিনী স্নেহময়ী কারো জাগে ;

রাত বাড়ে যত শুকাইছে বাড়া ভাত,
সদর দরজা খুলে দিতে হবে, ঘুমে ঢুলে আসে আঁখি।
সরিষার তেল প্রলেপ করিয়া চোখে—
জাগে বধূ, তার জ্বালাধরা চোখ জলে ছলছল করে,
বুকের জ্বালার প্রলেপ পাশের ঘুমানো খোকার ঠোঁটে।
ললাটে তোলে না হাত,
অদৃষ্টেরে ধিক্কার দিলে, পাছে লাগে অভিশাপ।
ভাবে ব'সে আর যত্নে লাগায় তালি,
দুইটি মাত্র পরণের সাড়ী, ছিঁড়েছে ধোপার ঘরে।

যক্ষ্মার রোগী জাগিয়া কাশিছে বসে,
নয়নের জ্যোতি ঝাপসা হতেছে ক্রমে,
চারিদিকে যত মানুষ এবং ঘরবাড়ী গাছপালা—
লাগে সুন্দরতর।
আঁকড়ি ধরিতে চাহিছে যখন, মুঠি খুলে খুলে যায়,
নিবে আসে ধীরে মলিন জীবন-বাতি।

তাহারই শিয়রে বসি,
ক্লান্ত প্রেয়সী তন্দ্রায় জেগে আছে,
জাগিবে যে কত দিন!
যত জাগে তত সীঁথির সিঁদুর চওড়া ও গাঢ় করে—
হাতের নোয়ায় মনে হয় তার ঠিকরে হীরক-দ্যুতি!

জাগে কারাগারে ফাঁসীর মঞ্চে কাল যার আয়ু শেষ—
যে জন শোনেনি বহুকাল কানে, প্রিয়া ডাকে,
"ওগো শোনো"—

সাধের কন্যা ডাকে, "শোনো শোনো, বাবা।"
সহসা শিহরি মর্ম্মের মাঝে ডাক শুনে জেগে আছে ;
কোথায় যেন রে বিনিদ্র ঘরে প্রিয়া ফেলে নিশ্বাস,
ঘুমায় তবুও খুকী ছট্‌ফট্‌ করে।
কম্বলে তার শুয়ে আধখানা, আধখানা গায়ে দিয়ে,
লাপ্‌সি ভুলিয়া আঁধার কক্ষে চেয়ে কড়ি-কাঠ পানে,
জাগ্রত আঁখি ঝাপ্‌সা যাদের হয়—
তারাও জাগিয়া আছে ;
তারা প্রতীক্ষা করে—
প্রিয়া-বাহুপাশ একদা জড়াবে গলে,
সাধের কন্যা কণ্ঠ-লগ্না হবে,
আছে আশা, আশা মনে তবু কত আছে।

কাল যায় আয়ু শেষ—
সে জন জাগিয়া খোঁজে আকাশের তারা,
কঠিন পাষাণে বাধা পেয়ে চোখ, দেয়ালে কি যেন খোঁজে,
চটা উঠে গিয়ে এখানে সেখানে ফুটে ওঠে কত ছবি,
কত চেনা মুখ, অচেনা ভঙ্গী কত ;
রবি ঠাকুরের মাথা—
ভুলে যাওয়া কোন্‌ বাল্য সখীর ঠিক যেন এলো খোপা।
কবন্ধ আর ছিন্নমস্তা-ছায়া
দেয়ালে দেয়ালে জাগে—
চমকি জাগিলে মিলায় পলক পাতে।
মনে পড়ে যায়, পাশের বাড়ীর মেয়ে

একদা আসিয়া বলেছিল কবে, ভেঙে গেছে পেন্সিল—
বেড়ে দিতে হবে—সকাতর অনুরোধ !
ধমকিয়া তারে বলেছিল, নাহি হবে ।
যে-বেদনা-ছায়া নেমেছিল কালো চোখে,
সেই স্মৃতিখানি কেন তার মনে আসে
কাল যার আয়ু শেষ !
মার আঁখিজল নহে,
কবে কোথা দ্রুত সাইকেলে যেতে, নেহাৎ অসাবধানে—
চাপা পড়েছিল একটি কুকুরছানা—
তাহারই আর্ত্তনাদ ।

জাগে পাগলিনী, পাগলাগারদে গরাদে রাখিয়া হাত,
ঘুম নাই তার চোখে,
মুখে হাসি ঘন কান্নার মত ঠেকে,
পরণে জীর্ণবাস ।
একে একে তার সন্তান যত মরিল কালের ঘায়ে,
জাগ্রত মহাকাল !
তাহাদেরই পথ চেয়ে জেগে আছে, জননী উন্মাদিনী—
অন্ধকারের চরণ-শব্দ শোনে নিবিষ্ট মনে,
হঠাৎ হাসিয়া উঠে ;
হঠাৎ আর্ত্তনাদে—
স্তব্ধ নিশার নিবিড় শান্তি ক্ষণ বিম্বিত করি,
ডাকে, আয় বাছা, হাঁটি হাঁটি পায় পায় !
প্রসারিত বাহু ব্যর্থ শীতল হয়,

স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়ে—
ফোঁটা ফোঁটা দুধ কান্নার ধূলায় পড়ে টপ টপ্ করি,
যুগান্তরের সঞ্চিত কালো ধূলা—
সৃষ্টি শিহরি উঠে—
কাঁদে গতি-বন্যায়!

জাগিয়া রয়েছে কবি,
গগনে গগনে অনাহত ধ্বনি, ধ্বনি মঙ্গলময়,
মলিন যা কিছু, যা কিছু অকল্যাণ—
সবারে ঢাকিয়া সেই স্বর যেন নিখিল ছাপিয়া উঠে,
নয়ন ছাপিয়া যায়।

আর জাগে ভগবান,
জাগে নির্গুণ, পরম ব্রহ্ম, জাগেন নির্ব্বিকার,
ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর—
অঙ্কুর মেলে পাতা, সেই পাতা শুকায়ে ঝরিয়া পড়ে,
তারে তিনি দেন কোল!
জাগে অশক্ত সর্ব্বশক্তিমান—
জাগ্রত ভগবান।

শুধু হাসে মহাকাল—
হাহা সেই হাসি শুনিলাম যেন, রজনী দ্বিপ্রহরে
শীতের রাত্রি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াসা গলিয়া পড়ে—
জনহীন রসারোড!—

চলে চারি জন ক্লান্ত চরণে, ক্ষণে বদলিয়া কাঁধ—
মুখে অতি ক্ষীণ—বল-হরি-হরিবোল।
মহাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে।
সে ক্রূর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত দোতলায়—
নবজাত শিশু ককিয়ে কাঁদিয়া উঠে—
সেই জাগে চিরকাল।

বড় হওয়া

খোকা বলে, 'বাবা, কবে আমি বড় হব ?
তোমার মতন গোঁফ দাড়ি হবে মুখে ?'
মনে মনে হাসি' কহিলাম মনে মনে—
'গোঁফ-দাড়ি হলে বড় হওয়া যদি যেত—
পৃথিবীতে তবে বড়র অভাব কোথা ?
গোঁফে ও দাড়িতে জঙ্গল হল দেশ—
কাঁচা গোঁফ দাড়ি পেকে হয়ে গেল শাদা—
কিন্তু তবুও হায়রে পৃথিবী খুঁজে
'বড়'র দেখা ত পেলাম না কোনোখানে।

—শ

সংবাদ-সাহিত্য

আমাদের বারীনদাকে দিয়াই সুরু করা যাক। বোমারু বারীনদার নিতান্ত ব্যক্তিগত কথাও যে বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ স্বয়ং বারীনদাই "আমার জীবন-স্মৃতি"তে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার আজন্মসঞ্চিত আপাদমস্তক ব্রহ্মচর্য্য-স্খলনের মর্ম্মঘাতী ও রোমাঞ্চকর ইতিহাস তাঁহার বোমাকাহিনীর মতই জাতীয় সম্পত্তি; তাঁহার মাসী ও মাসতুতো ভাই, নাম ভুলিয়া গিয়াছি, যিনি সর্ব্বপ্রথমে হাতের কাজে তাঁহার হাতে খড়ি দেন, উভয়েই আজ সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন জুড়িয়া বসিয়াছেন। বারীনদার বাল্যজীবনের 'ওমা', কৈশোরের cóma, যৌবনের বৌমা ও বোমা এবং প্রৌঢ় বয়সের বীমা যদি সাহিত্য হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী জীবনের নিমা-ই বা সাহিত্যে স্থান পাইবে না কেন?

—

পুরীতে আশ্রমস্থাপনের সংবাদ ইতিপূর্ব্বে দিয়াছিলাম কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেখানে জুৎ হইল না! একেবারে হালফিল খবর এই যে দাদা সেই তাঁহাদের লইয়া কাশীবাসী হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে লইয়া দরজির দোকান খোলায় সম্পূর্ণ সাহিত্য হয় নাই মনে করিয়া সম্প্রতি একটি প্রদর্শনীতে চায়ের ষ্টল খুলিয়া বোমা ও সাহিত্যের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছেন। নিজে র‍্যাপারমুড়ি দিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া বাবরি দুলাইয়া তদারক করেন, খদ্দের আসিলেই তাঁদের

নিতান্ত পরিচিত সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া হাঁক দেন—নিমু, চা। চা আসে, সাহিত্য হয়।

শুনিতেছি, দাদা এই সাহিত্য চিরস্থায়ী করিবার জন্ত একটি সাপ্তাহিক বাহির করিতেছেন। মাণিকতলার বাগানবাড়ীতে সেই সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটিলেই যেন ভাল হইত।

তাঁহার অতি-আধুনিক কীর্ত্তি 'প্রাচীর ও প্রান্তর' উপন্যাসটি লইয়া সম্প্রতি বাংলার ক্লুট হামসুন অচিন্ত্যকুমার অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন; এই মহামূল্য সম্পত্তিটি প্রকাশকদের হেফাজতে রাখিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইতেছিল না—অনেক ভাবিয়া তিনি নাকি শেষে উহা আইন ও সম্পত্তির রক্ষক পুলিশের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। যে দিনকাল পড়িয়াছে, অচিন্ত্যবাবু ভাল করিয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে।

—

রবীন্দ্রনাথের আহ্লাদী পুতুলের মুখের হাসিতে একবার মোনা লিসার হাসির ঝলক 'প্রবাসী' দেখিয়াছিলেন; পৌষ সংখ্যার প্রবাসীতে দেখিলাম—সুরেশচন্দ্র ঘোষের 'পথভ্রান্তা' মোনা লিসার বিশ্ববিজয়ী দুর্ব্বোধ্যতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তিন রঙে। কিন্তু এ রঙ কাহার wrong বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, মাসিক বসুমতীর ছবি প্রবাসীতে বাহির হইল কাহার ভুলে? অথবা প্রবাসী গতিমুখ ফিরাইতেছেন—ইহা তাহারই আভাস! শ্রীহীন সুরেশচন্দ্র ঘোষের জোর কপাল বলিতে হইবে; আর্টজ্ঞ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কঠোর দৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি তাঁহার 'পথভ্রান্তা'কে প্রবাসীর

পশ্চাতে লেলাইয়া দিয়া তাহাকেও পথভ্রান্ত করিতে পারিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীও ত ছিলেন।

প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে দেখিতে পাই বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যগীত ও অভিনয়কুশলতা সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য থাকে এবং ইঁহারা নিজেরা অভিনয়ের দ্বারা উপার্জ্জন না করিলেও, অন্য লোকে ইঁহাদের সাহায্যে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এমতও শ্রুত হওয়া যায়। এই কারণেই, সুদক্ষ অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুসংবাদ প্রবাসীতে না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ইঁহারই পিতা ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন—শুনিয়াছি তিনি ভাল নাটক লিখিতেন। দানীবাবু সম্বন্ধেও কি প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় 'শুনিয়াছি ভাল অভিনয় করিতেন' লিখিতে পারিতেন না?

—

নিজেদের উপাধির বানানে তালব্য 'শ' ঢুকাইয়া যে সকল দাস ও দাসগুপ্তেরা দাসত্বের চিহ্ন লোপ করিতে চান, তাঁহাদের জন্য দুঃখ হইতেছে। পত্রিকায় ও প্রাচীরগাত্রে একটি বায়স্কোপের ছবির বিজ্ঞাপন দেখিলাম—Slave,—দাশত্ব। এইবার 'ষ'এর পালা।

'ধূর্জ্জটি'—ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সম্পাদক—ঠাকুরবাড়ীর ইন্দ্রদের একজন। যে ধূর্জ্জটিকে আমরা বোম-ভোলানাথ বাবা শিব বলিয়া জানি, কভারের উপরে ত্রিশূল ও ডম্বরু দেখিয়া তাঁহারই কথা মনে হইয়াছিল, একটু সমীহ করিয়া পাতা উল্টাইতে গেলাম; কিন্তু প্রথম

পৃষ্ঠার কবিতাটি পড়িতে না পড়িতেই আশ্বস্ত হইতে হইল—বাবা শিবেরও দাদা আছেন তাহা হইলে; আমাদের জ্যেঠা মহাশয় অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রহিয়াছেন! জ্যেঠা মহাশয়ের কোল ঘেঁষিয়া বসিলে বাবার অতটা রাগ না হইতেও পারে! ভাই শিবকে সম্বোধন করিয়া জ্যাঠা মহাশয় লিখিয়াছেন—

> তুমি বুঝি শিব তেমন দেবতা নহ,—
> আভিজাত্যের গৌরব বুঝি নাই?
> এ মাটির দেশে তাই বুঝি অহরহ
> মানুষেরি মত বিচরণ কর ভাই?
> * * * *
> কণ্ঠ তোমার নীল করিয়াছ ভাই,……

কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় ভাসুর হইয়া ভাইয়ের কাছে ভাদ্রবৌ-এর প্রেমের কথা বলিলেন কি করিয়া?

ধূর্জ্জটির কর্ত্তৃপক্ষ দুইটি গল্পের সাহায্যে বাঙালী পাঠককে যে শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন তাহা অভিজ্ঞতাপ্রসূত হইলে দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সহিত পত্নীর পরিচয় করাইয়া দিলে যে বিষময় ফল ফলিতে পারে উপর্য্যুপরি দুইটি গল্পে তাহা দেখানো হইয়াছে। যে ভাবে চারিদিকে তরুণদের চোখ ফুটিতে সুরু হইয়াছে তাহাতে আশঙ্কা হয়, তাঁহারা অচিরাৎ পরদা-প্রথার জয়গান সুরু করিবেন। তরুণীরা অগ্রসর হইতেছেন, তরুণেরা পিছু হটিতেছেন, মাঝপথে একটা ঠোকাঠুকি না হইয়া যায়! গল্প দুইটির প্রথমটি 'তাহারা'—

ক্ষিতীশের বাড়ী, মায়া ক্ষিতীশের পত্নী, অনিল ক্ষিতীশের ঘনিষ্ঠ

বন্ধু। ক্ষিতীশের অবর্ত্তমানে অনিল তাহার ঘরে পায়চারি করিতেছিল, মায়া ঘরে ঢুকিল।

মায়া—জানালাটা খুলে দেন নি? (জানালার দিকে অগ্রসর হইল) [অনিল মুগ্ধনেত্রে চাহিয়াছিল, কাছে আসিতেই আচম্‌কা মায়াকে বুকের কাছটিতে টানিয়া লইয়া তাহার মুখে চোখে পর পর কয়েকটা চুমু খাইয়া ফেলিল......]

মায়া। আপনার লজ্জা করে না।

অনিল। লজ্জা? খুব করে! চুমু খাওয়ার মধ্যে লজ্জাটুকুই তো সুন্দর।

... ...

মায়া। আপনি কি মনে করেন আমাকে? আমি সমস্ত প্রকাশ করে দেবো।

অনিল। (ঘাড় নাড়িয়া) সে তুমি পার না মায়া! তোমাদের সতীত্ব বড় ঠুনকো,—স্পর্শ করলে তার জাত যায়। আর স্বামীরা এই জাত সম্বন্ধে সচেতন।

মায়া। সে আমি জানি।

অনিল। দেহ আমি চাই নি মায়া! . . . . কিন্তু যদি চাইই—আমি জানি তুমি একটি কথাও বলতে পারবে না।

অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর—নীচে কড়া নাড়ার শব্দ হইল—

(অকস্মাৎ ঝড়ের মত আসিয়া মায়া অনিলের গালে একটা চুমু খাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।)

—

দ্বিতীয় গল্প 'মেঘমুক্তি'।—মনীশ ও মনোরমা স্বামী স্ত্রী—দেখিতে উভয়েই খুব সুন্দর কিন্তু মনীশের বন্ধু জয়ন্ত আরও সুন্দর।

স্বাম-স্ত্রীতে রূপ লইয়া তর্ক হইতেছিল এমন সময় জয়ন্তর প্রবেশ।

"মনোরমা স্বামীর এই বন্ধুটিকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিত। . . . . জয়ন্তের নিখুঁৎ দৈহিক লাবণ্যের বুঝি তুলনা নাই। একবার দেখিলে দেখার সাধ মিটে না—দেখিয়া দেখিয়া প্রাণের নিভৃত কোণে যে ভাবের উদয় হয়, বিবাহিতা নারীর পক্ষে

তাহা কল্যাণের নহে। জয়ন্তের প্রত্যেকটি বচনভঙ্গীতে মুখশ্রীর যে বিভিন্ন সৌষ্ঠব প্রকাশ পায় তাহা দেখিয়া কত দিন কত দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে যে মনোরমাকে গোপনে প্রকাণ্ড লোভ পরিপাক করিতে হইয়াছে তাহা জানে সে আর তাহার অন্তর্যামী।"

—

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মনোরমার গরহজম হইল, গল্পটি তাহারই ইতিহাস। জয়ন্তের "সুশ্রীকতা" একদা মনোরমাকে দিশা ভুলাইল।

দুই হাতে সজোরে বুক চাপিয়া ধরিয়া মনোরমা বলিল, "এস ঠাকুরপো!"

—"আপনি একা, মনীশ কৈ?"

—"তিনি বাড়ী নেই, আসতে হয় ত দেরী হবে, তুমি ঘরে এস, এত দিন কোথায় ছিলে বল ত?"

জয়ন্ত তথাপি নড়িল না বা কোনও কথা বলিল না, নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

—"আমার গিয়ে হাত ধরে নিয়ে আসতে হবে না কি?"

"সম্মুখে বাধা পাইয়া জলস্রোত যেমন"·········ইত্যাদি। "ইহাই মনোরমার পণ। মনোরমা একবার একবার দেখিবে জয়ন্তের গর্ব্বোদ্ধত মস্তক তাহার পায়ে লুটায় কি না।"

কিন্তু মনোরমা সতীই থাকিয়া গেল, ইহাই গল্পের ট্র্যাজেডি।

—

লঙ্কাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র যখন একে একে রাবণের বংশ নির্ব্বংশ করিবার কাজে ব্যস্ত, বিভীষণ তাঁহার মন্ত্রণা-দাতা, তখন একদা ক্ষত্রকুলপতি রাবণ আক্ষেপ করিতেছিলেন, সূর্য্যের প্রখর রশ্মি আমি সহ্য করিতে পারি কিন্তু সূর্য্য যদি মেঘাবৃত হইয়া রশ্মি বিকীরণ করে তাহা হইলে অসহ্য বোধ হয়; তরুণ ধূর্জ্জটিপত্রের পৃষ্ঠায় অচিন্ত্যকুমারের 'প্রথম প্রেম' সম্বন্ধে কটূক্তি এই কারণে তাঁহাকে

অধিক বাড়িবে। অচিন্ত্যকুমারের প্রতি ক্রমশঃ আমাদের সহানুভূতি হইতেছে। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধূর্জ্জটির লেখক বলিতেছেন—

"আপনার প্রতিভার কি এমন দৈন্যদশা আজ উপস্থিত হ'ল যে, সেই ছোট্ট গল্পটির হুবহু ভাষা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে এই উপন্যাস খানিতে ধার না নিলে পূজার আগে আর বইখানার বাজারে বেরোবার সম্ভাবনা থাকত না?.........কিন্তু অচিন্ত্য, বুদ্ধ, প্রবোধ.........বাবু যদি ঠকান, তবে একটা উদ্ধত বিদ্রোহ মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মনে হয় অতি আধুনিক যুগের গর্ব্বোদ্ধত সাহিত্য পতাকা যাঁরা ধারণ করবার অধিকার পেয়েছেন, তাঁদের নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভা আজ নিঃশেষ বিত্ত।"

কিন্তু ইহা আমাদের কথা নয়। আমরা বলি, কবন্ধের মাথা-ব্যথা সম্ভব নয়।

—

ভিতরে যখন বস্তু কিছুই না থাকে, তখন খোসাতেই নজর দিতে হয়, পৌষের ভারতবর্ষে নরেনদার 'হলিউড' দেখিতে না পাইয়া বিজ্ঞাপন ঘাঁটিতে সুরু করিলাম। একটি উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়াছে—

=ব্রহ্মচারী ব্রতাবলম্বী স্বামীস্ত্রীর অপূর্ব্ব কাহিনী=

শেষ পর্য্যন্ত কি হইল জানিবার জন্য উপন্যাসটি পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে।

—

'যে মাটিতে পড়ে, লোক তাই ধরি উঠে' ইহাও যেমন সত্য, তেমনই লোকে যাহার আশ্রয়ে উঠে তাহাকেই লাথি মারিয়া থাকে এমনও দেখা যায়। ২৪শে অগ্রহায়ণের 'সঙ্কল্পে' দেখিলাম, শরৎচন্দ্র

তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার লেখাকে লোকে চায় বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখার কল্যাণেই শরৎচন্দ্র আজ শরৎচন্দ্র, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি নয়; সুতরাং লেখা চাহিয়া লোকে যে বিশেষ অপরাধ করে তাহা বোধ হয় না। জায়গাটা এইরূপ—

"কিরিং কিরিং কোরে টেলিফোনের ঘণ্টাটা বেজে উঠল······ লেখার তাগিদ এসেছে "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। কথা শেষ করে হাতলটা নাবিয়ে বলবেন, এরা আমাকে চায় না; চায় আমার লেখা। স্বাস্থ্যটা আমার একেবারেই ভালো নয়, অথচ এটা তাঁরা খেয়ালের যোগ্য বলেই মনে করেন না! লেখা তাঁদের চাই-ই।"

পয়সাটা যাঁহারা চান না, তাঁহারা এ কথা নিশ্চয়ই বলিতে পারেন। বিচিত্রা-সম্পাদক মহাশয়ের অন্যায়।

—

ছাদে উঠিয়াছি, ছাদে বসিয়াছি, পাঁচীল ডিঙাইয়া এ-ছাদ ও-ছাদও করিতে হইয়াছে কিন্তু ছাদ যে "আমাদের বাঙালীদের একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান" এটা তো বুঝিতে পারি নাই। ছাদে 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' থাকেন অনেক 'মন-দেয়া-নেয়া' হয় কিন্তু ছাদ লইয়া সাহিত্যে যে ব্যবসা চলে তাহা এই প্রথম দেখিলাম; হয় তো ভুল করিতেছি, 'উত্তরা' কি পয়সা দেয়?

—

শ্রীমতী চাঁদকে আজ পর্য্যন্ত এদেশে এবং বিদেশে বহু সাহিত্য-ধুরন্ধরই ভালবাসিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাকে অনেক শ্রুতিসুখকর

বিশেষণে সম্বোধন করিয়া কুলের বাহির করিবার প্রয়াস করিয়াছেন; কিন্তু প্রকাশ্যে সদর রাস্তার উপর সেই ভদ্র মহিলার শ্লীলতা-হানির চেষ্টা বোধ করি ইতিপূর্ব্বে আর কোনও ভদ্রলোক করেন নাই—যেমন বুদ্ধদেব বাবু করিয়াছেন। অগ্রহায়ণের উত্তরায় 'ছাদ' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"বার বার আমি তাকাচ্ছি; খানিক পর-পরই চাঁদকে একটু দেখে নিচ্ছি—লোভী এবং সলজ্জ দৃষ্টি সকাম অথচ অনিচ্ছুক—যে দৃষ্টিতে নবীন প্রেমিক তাকায়, যদি কখনো প্রিয়ার অনাবিষ্কৃত বক্ষস্থল দৈবাৎ তার চোখের সাম্‌নে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। প্রায় ইন্দ্রিয়গত, মাংসগত উপভোগ নিয়ে আমি চাঁদকে দেখ্‌ছি······চাঁদ হচ্ছে স্ত্রী-সত্তার প্রতীক—না, প্রতীকমাত্র নয়, চাঁদ সেই সত্তা, জীবন্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অনস্বাকার্য্য—'

মহাভারতের অর্জ্জুন একবার জীবন্ত অবস্থায় স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রের সভায় নৃত্যরতা বিবসনা উর্ব্বশীর প্রতি এমন ভাবে নজর দিয়াছিলেন যে, পিতা ইন্দ্র স্বর্গীয় পিতার মতই পুত্রকে রজনীযোগে উর্ব্বশীর ঘরে পাঠাইয়াছিলেন। উর্ব্বশী মহাখুসী কিন্তু অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া ভাগিয়া পড়িলেন যে, তাহার দৃষ্টিতে লালসা ছিল না—বিস্ময় ছিল। যে মহিয়সী মহিলার তাঁহার পিতৃপিতামহগণকে দেহদান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহাকে তিনি বিস্মিত হইয়া শ্রদ্ধার চোখে না দেখিয়া পারেন নাই। আহতা উর্ব্বশীর শাপে অর্জ্জুনকে এক বৎসরের জন্য বৃহন্নলা হইতে হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব বাবু অর্জ্জুন নহেন, তাঁহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ চাঁদকে প্রেমের চোখে দেখিলেনই বা, সম্পর্কে হইলেনই বা তিনি গুরুজন

তাই বলিয়া চাঁদের মাংসের প্রতি লোলুপ হইব না, লালসা ভরে চাঁদের স্তন দুটি দেখিয়া লইবার সাধ হইবে না ?—এ কেমন কথা! অজ্ঞাতবাস যদি করিতেই হয়, খামকা বৃহন্নলা বনিয়া যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং—

চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।

—

অস্পৃশ্যতা এবং পাগ্‌লা জগাইয়ের কবিতা এ দুইটিই দূর করিতে হইবে ; দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে প্রায়োপবেশন করিয়াও ইহা করিতে হইবে, নতুবা দুইটাই সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। একদিকে জামোরিণ, অন্য দিকে শ্রী অরবিন্দ।

পাগলা জগাইয়ের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি কবিতার নাম—বাণী। নীচে ব্রাকেটের মধ্যে লেখা আছে, মদিরা ছন্দ—লঘু গুরু। মদিরা ছন্দ না হইলে মানুষ লঘু-গুরু জ্ঞান এত সহজে হারায় না।

"তব শিল্পবনে রমি ; চিত্ত তুরঙ্গমি' ধাইল ভারতী : বর্ণব্রতী।
এসো কাব্যরথে তব লুণ্ঠি অগৌরব—নিম্ন হৃদে ফলি' ঊর্দ্ধরতি।
রচ' কোকিল কণ্ঠ, মরাল, শিখণ্ড ময়ূর-শিখে সৃজ সৃষ্টিরমে!
বাহি' গাঙ্গ-বিভঙ্গ-কলধ্বনি-রঙ্গ, কলঙ্ক বিমোচনি' শুভ্রতমে!
আজি স্থাবর জঙ্গমি' উর তমঃ ক্ষমি' মা, রসনে স্ফুর' চঞ্চলিয়া।
এসো শঙ্খি' সিতাম্বর, ডঙ্কি' চরাচর ধূলি ধরাধর সঙ্গমিয়া।"

টীকা নিষ্প্রয়োজন, কারণ এই কবিতা পড়িয়া অর্থের কথা মনে হয় না, অনুপ্রেরণা আসে। তাহার ফলে—

ওহে পগ্না জগা শুন, ছন্দ-তুলা ধুন' ভাঙ্গি খ্যালে (খেয়ালে) সব
মাত্রা-যতি,
ওগো কাব্যরথী তব কণ্ঠ কলোরব—থাম্ব, কাব্যে ভব উর্দ্ধরতি।
নাচে ভোকিল-টুর্ণিক হিন্দু উড়ে শিখ নূর নেড়ে যত ইস্লামিয়া,
সবে ভাঙ্গ-বিভঙ্গ শোনে ধ্বনিরঙ্গ পত্র প্রশংসিত লম্বা ইয়া।
কেহ স্থাবর 'স্থাবর ফেলি দিয়া রঢ় ধায় ত্বরান্বিত পণ্ডিচারী,
ওহে থাম্বহ থাম্বহ অন্য বাত কহ থাম্বহ আজন্ম ব্রহ্মচারী।

—

ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে ; তরুণ প্রেম-চিকিৎসকদের অনুবীক্ষণে আপ্-টু-ডেট মহিলা মাইক্রোবদের স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে—they are gone! বালীগঞ্জের পথে পথে কল্পিত মহিলাদের পিছনে পিছনে আর তরুণদের ছুটিতে দেখিব না। কলিকাতার এবং কুমিল্লার মেয়ে কলেজের ও স্কুলের বাসগুলি নিরুপদ্রবে যাওয়া আসা করিবে ; ছেলেদের কলেজে পড়া মেয়েদের বেঞ্চিতে ও ডেস্কে আর খড়িমাটির ছোঁয়াচ লাগিবে না।

বুদ্ধদেব বাবুর 'মন দেয়া নেয়া'র সমালোচনা প্রসঙ্গে কুমিল্লার পূর্ব্বাশা লিখিয়াছেন—

"আলোক-প্রাপ্তা up to date মহিলার অন্তঃসারশূন্যতার যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তা এত দূর বাস্তব যে এর পর কোন modern মহিলাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা সম্ভব নয়।"

শ্রদ্ধা করা আর বিরক্ত করা নিশ্চয়ই এক নয়।

—

পৌষের প্রবাসীতে শ্রীশৈলবালা দেবী লিখিত 'ভারতভারতী' নামে

কবিতার আকারে একটি লেখা বাহির হইয়াছে, তাহার প্রথমটা এইরূপ—

"সংকীর্ণতা আমি ভাল নাহি বাসি,
উদার আমার স্নেহ।
সকলেরে আমি টেনে নিতে চাই
কোলে আসে যেই কেহ।"

তারপর, শাক্যসিংহ, চীন, জাপান, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, জাঠ, শক, আর্য্য, অনার্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গ, শিখ, নানক, ব্রহ্মজ্ঞানী, রামমোহন, শ্রদ্ধানন্দ, পর্য্যন্ত সকলের কথাই আছে, সকলকে কোলে লওয়ার কথাই লেখিকা বলিয়াছেন কিন্তু মুসলমান ও খ্রীষ্টানের কথা নাই। শেষের পংক্তি দুটিতেও উদারতার কথা আছে, যথা—

উদার হৃদয়ে সকলেরে আমি
অঙ্কে টানিয়া লই।

কিন্তু এ কেমন উদারতা? লেখিকার কল্পিত 'ভারতভারতী' কি মুসলমান ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়কে বাদ দিয়া চলিবেন? প্রবাসীর মতও কি তাহাই? এ-মত আর যাহাই হউক, উদার নয়—অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

—

এই সংখ্যা প্রবাসীতেই শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী প্রণীত শৃঙ্খল উপন্যাসের নায়িকা বীণা বলিতেছে—

"মুসমান মেম্বর কেউ হতে চান, স্বচ্ছন্দে হতে পারেন। কিন্তু নিজের আওরাতটিকে সাবধানে ঘেরাটোপ দিয়ে নিজের বাড়ীতে

জমা করে রেখে এসে অন্যদের আওরাতদের সঙ্গে মজলিসি আলাপ জমাবেন, এ হতে পারবে না।”

কথাটা ভাল, কিন্তু বীণার মুখে নয়।

আমাদের সুধীরবাবু এবার মন আর চৈতন্য লইয়া ভারী বিপদে পড়িয়াছেন। মন বস্তুটার যে এত বড় সম্ভাবনা ছিল তাহা ইতিপূর্ব্বে আমরা মনেও করিতে পারি নাই।

১। “প্রাণপণে নিজেকে যতটা প্রকাশ করে তাহা ছাড়াও বীণার মনের মধ্যে গভীরতার স্থান কি একটা আছে ?”

২। “তাহার মগ্ন চৈতন্য ভরিয়া একটি তন্বী নারীদেহের গভীরতম রহস্যের আভাস। প্রাত্যহিক নারীজীবনের কত শত তুচ্ছ খুঁটিনাটির অপরূপ অপরিচিত সুষমা।”

৩। “এবারে তাহার নিজের চেতনার উপর হইতে ঘুমের জড়তা কাটিয়াছে।”

৪। “দর্পিতা মেয়েটির মনের অন্ততঃ বাহির অঙ্গনের চৌকাঠ অতিক্রম করিতে হইবে।”

৫। “বীণার কলহাসির ছোঁয়াচ-লাগা অজয়ের সচেতন মন।”

৬। ‘তাহার নিজেরও মনের এমনই একটা ঘরের সব কয়টা দরজা-জানালা সে আজ সতর্ক হইয়া বন্ধ করিয়া বসিয়াছে। সেখানে সে অত্যন্ত কাতর মুখ কাঁচুমাচু করিয়া থাকে। সেখানে বলা নাই, অকস্মাৎ একদল অপরিচিত লোক হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়ে।’

৭। “নন্দের ঘরের দরজাটা মনের মধ্যে বন্ধ হইয়াই রহিল।”

রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছেন—“ওরে আমার মনরে আমার মন !”

সুধীর বাবুর উপন্যাসের অজয় দিদিদের জব্দে রাখিবার বেশ একটি ফন্দী আবিষ্কার করিয়াছে—একেবারে original। অজয় বলিতেছে—

"শেষে……মামাদের ব'লে তাঁর বিয়ে দিয়ে দিলাম। দিদিদের জব্দে রাখবার ঐ এক রাস্তা আছে।"

কিন্তু অজয় জানে না, অনেক দিদিই জব্দ হইতে গররাজি নন।

—

সুধীর বাবু 'পরিচয়ে' লিখিয়া থাকেন, পরিচয়-গোষ্ঠীর তিনি একজন। তাই একস্থলে তাঁহার বিভীষণবৃত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। পরিচয়ের দলকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি বলিতেছেন—

"আমরা লিখিতে যখন বসি তার আগে দিন কতক auto-suggestion দিয়ে নিজেকে ঠিক করে নিতে হয়, ভাবতে হয় আমি প্রুস্ত, আমি লরেন্স, আমি মান্, নিদেন পক্ষে আমি আলডুস্ হাক্স্লি, তারপর আমাদের কলমের ডগায় কথা ফোটে। আর্টিষ্ট ছোক্‌রারা শিব আঁকে বলে বিমান দুঃখ করে, আমাদের কলমের অর্টিষ্টরা শিবও কেউ একটা আঁকে না, সেখানে সমস্তটাই বাঁদরের রাজত্ব।"

এই রাজত্বের রাজা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কি বলেন?

—

"শ্রীমৎ আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" (প্রবাসী, পৌষ, বিবিধ-প্রসঙ্গ—পৃষ্ঠা ৪৫৩) মহাশয়ের নামের 'শ্রী' লইয়া কৈফিয়তের আর শেষ নাই। 'শ্রী' কেন লেখা হয়, প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় তাহা জানেন না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নামের পূর্ব্বে শুধু 'শ্রী' নয়, 'শ্রীমৎ আচার্য্য' ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা বলি—'শ্রীর'

যেমন অর্থ হয় না; ঠাকুর, চট্টোপাধ্যায় এগুলিরই বা কি অর্থ আছে? একজন মানুষের পরিচয়ের পক্ষে তাঁহার পদবী সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। যে যুগে ঠাকুরের পুত্রকে কুকুর পুষিতে হয় এবং চট্টোপাধ্যায়-নন্দন জুতা বেচিয়া অন্নসংস্থান করেন সে যুগে এগুলি ত্যাগ করাই তো উচিত। 'শ্রী' লইয়াই যদি মাথা ঘামাইতে হয়, পদবী কি দোষ করিল? তবে ইহা যদি শুধু খেয়ালের কথা হয়, ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল লইয়া সাধারণের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার অধিকার কাহারও নাই। ঠাকুর, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি আমরা যেমন ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, শ্রীও তেমনই ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া। যদি বলা হয়, তাঁহারা সত্য সত্যই শ্রীমন্ত ছিলেন, তোমরা নও—আমরাও বলিব, তাঁহারা ঠাকুর, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি ছিলেন—তোমরা তাহা নও; সমস্যার সমাধান হয় না। শ্রীমৎ আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নমস্কার—তাঁহারা যদি ঠাকুর, চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করেন, আমরাও শ্রী ব্যবহার করিব!

—

'পরিচয়'—কার্ত্তিক ১৩৩৯। দেখিতেছি, পরিচয়ের মত আভিজাত্যবিলাসী পত্রিকাতেও অস্পৃশ্য শনিবারের চিঠির ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, মহাত্মা গান্ধীর জয় হোক্! শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের 'একটি বসন্ত' নামক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় লেখক দিলদার হুসেন (মৎকুণ?) লিখিয়াছেন—

"১৮নং কবিতায়..........পড়িয়া মনে হইল খোকা দাঁড়াইয়া Sunday School-এ হলপ পাঠ করিতেছে। খোকার মনে কি আছে

খোকাই জানে।” শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘খোকা’ বিশেষণ শনিবারের চিঠির দেওয়া।

কার্ত্তিকের পূর্ব্বাশায় পাগলা জগাইয়ের কাণ্ড দেখিয়াছেন? “ছন্দ-দ্বৈরথে” তিনি প্রবোধ সেনের সহিত একাত্ম হইয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাল ঠুকিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে এই বলিয়া শাসাইয়াছেন যে, আমরা তো বাপু ছন্দ-বিস্তারে তোমাকে ঘায়েল করিয়াছি, তুমি দুই চারিটি ছড়া কাটিয়া আমাদের কেচ্ছা লিখিলে তো বহিয়াই গেল! গোড়াতেই—

“ভূদেবচন্দ্র স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস শুনেছিলেন। আমি শুন্‌লাম ছন্দ-দ্বৈরথ, বলি।—দেখলাম (“আধজাগা ঘুমঘোরে”) যে দিলীপ প্রবোধ দুয়ের যোগফলে metempsychosis হয়ে গেছে প্রলীপ। এ হেন প্রলীপ সূক্ষ্ম শরীরে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে করল তর্ক সুরু।”

তর্কে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু দিলীপ প্রবোধ যদি ‘প্রলীপ’ হইতে পারে, metempsychosis-এ ‘প্রলাপ’ এবং তাহা হইতে ‘উন্মাদ’ হইতেই বা দোষ কি? সূক্ষ্ম শরীর কেন? দিলীপের সঙ্গে প্রবোধ যদি যুক্তও হন (Old Testament এর জয় হউক;) তাহাতেই বা রবীন্দ্রনাথের ভয় পাইবার কি কারণ ঘটিতে পারে! মূল কথাটা রবীন্দ্রনাথ ও প্রলীপের কথোপকথনের মাঝখানেই আছে—

“প্রলীপ। লক্ষী কবি, ছন্দ তর্কে অমনধারা চোখা চোখা উপমা ছুড়লে লোকের মনে সন্দেহ হবে না কি যে আপনার সঙ্গে ছন্দ নিয়ে তর্ক করে যে প্রলীপ তার যোগ্য স্থান পাগ্‌লা গারদই?

রবীন্দ্রনাথ। (প্রীত হাসিয়া) আচ্ছা আচ্ছা।”

পাগলা জগাই ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া একটি ছড়াও ছাড়িয়াছেন

প্রবন্ধের শেষে এই বলিয়া যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ পাঠে ক্ষিপ্ত হইয়া "পরের সংখ্যা পরিচয়ে লিখে বসেন বা—

আমারে না মেনে শ্রীপ্রবোধ সেনে বাখানিরে 'লাঠিয়াল।'
'গুটিসুটি' ঘোরে কেন মোরে ধরে করিতে চাহিলি ঘাল?
কেন মূঢ়, বাদ সাধি' মোর সাথ করিলি ফ্যাসাদ ব্রত?
উপমায় তোরে ব্যঙ্গ অঝোরে করি ক্ষত বিক্ষত
যদি দেই? তবে কে রাখিবে ভবে? দেখেছিস্ কিরে ভেবে?"

পড়িয়া পুনরায় 'আনন্দ-বিদায়ের' কথা মনে হইতেছে। রবীন্দ্র-নাথেরও কপাল!

—

বাংলা সাহিত্যের বখ্‌তিয়ার খিলিজি গোলাম মোস্তফা সাহেব কার্ত্তিকের 'মোহাম্মদী'তে 'প্রেমের অভিশাপ' বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—তাঁহার মত পবিত্রচেতা ইসলামাবাদীর ইহা উপযুক্ত হইয়াছে!

কবি সাহেব বলিতেছেন—

ভালো যদি মোরে বাসিবে—ছিল এ মনের আশা,
নরনন্দিনী হয়ে কেন হেথা বাঁধিলে বাসা?
কেন এ নিঠুর সমাজ-শাসন লইলে মানি,
বন্দিনী হয়ে কেন এলে তুমি, হে ফুলরাণি!
হেথা কেহ হায় বুঝে না কাহারো বুকের ভাষা।
... ...
লাভ লোকসান খতিয়ে ইহারা ভালো যে বাসে,
প্রেমিকের চোখে অশ্রু দেখিলে ইহারা হাসে!
মিলন চায় না—চায় শুধু এরা হইতে জুদা।

কবি কাহাদের কথা বলিতেছেন ঠিক বুঝিলাম না, লাভ লোকসান খতাইয়া ভাল যাঁহারা বাসেন তাঁহাদের সহিত মোস্তাফা সাহেবের পরিচয় থাকার কথা নয়। যে সমাজে তিনি বাস করেন সেই সমাজের কাহারও কথা হইলে খুব আফ্‌শোষের ব্যাপার। এত আঁটাআঁটিতেও তাহা হইলে কিছু সুবিধা হইতেছে না।

—

কিন্তু আসলে সমাজের পক্ষের কথা নয়, কবি-প্রেয়সী ভুঁইফোঁড় হইয়া জন্মান নাই বলিয়াই কবির দুঃখ—তিনি সমাজ-শাসন মানিয়া লওয়াতেই কবির অসুবিধা।

তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন—

কন্যা ভগিনী না হ'য়ে কাহারো এ পাপ-পুরী
ফেরদৌস হ'তে নামিতে যদি গো হিরণহুরী !

... ...

গুরুজন করি' মানবের হাতে সঁপিয়া দিয়া
সৃজন করিলে কেন আমাদের পরাণ-পিয়া !

... ...

এরা কী বুঝিবে ? এরা-ত মালী এ ফুলের বনে,
ফুলের মূল্য জানে শুধু যত প্রেমিকজনে।

... ...

তোরা কেন ঘিরে রাখিস তোদের ফুল-বাগিচা ?
নিশিদিন দিস্ সজাগ আঁখির পাহারা মিছা !

'বাগিচার বুলবুলি' কবি নজরুল ইসলাম সাহেবেরও তো কথা এই; এপিঠ আর ওপিঠ! ইহার মধ্যে মোস্তাফা সাহেব ধর্ম্মের প্যাচটুকু কোথায় লাগাইলেন যাহাতে মোহাম্মদীর মত আচারনিষ্ঠ পত্রিকাতে তাঁহার স্থান হইল? 'হিরণছুরী' কথাটাই সম্ভবতঃ একমাত্র কারণ নয়।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৫-সি, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ষষ্ঠ সংখ্যা] ফাল্গুন, ১৩৩৯ [৫ম বর্ষ

রবীন্দ্র মৈত্র

[শ্রীমোহিতলাল মজুমদার]

হঠাৎ সংবাদ পাইলাম রবীন্দ্র মৈত্র আর নাই। স্তম্ভিত হই নাই; কারণ, মৃত্যুর রীতি-নীতি আরও ভালো করিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি; অভ্যাস হইয়া আসিতেছে।

ইহাও বুঝি, আজিকার দিনে, যে যায় তার জন্য শোক করা শুধুই বৃথা নয়—তাহা অশোভন, একরূপ অসামাজিক অসভ্যতাও বলা যাইতে পারে। যাহারা আছে তাহারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ লয় না, স্মরণ করিতেও অনিচ্ছুক। শোক করিব কাহার কাছে?

কারণ, আমরা এ যুগের মানুষ, আমরা কেবল বাঁচিতে চাই, মরার খবর আমরা লই না; যে যতক্ষণ বাঁচে, ততক্ষণই তাহাকে জানি, চিনি; মরিয়া গেলে জাত যায়, সম্বন্ধ স্বীকার করি না; স্মরণ

করিয়া লাভ কি? রবীন্দ্র মৈত্র মরিয়াছে তাহাকে আর কাহার কি প্রয়োজন আছে?—সে কি আর কোনও কাজে লাগিবে। জীবনে সে যতটুকু কাজে লাগিয়াছিল, যতটুকু আরও কাজে লাগিবার ভরসা দিয়াছিল, তাহারই হিসাবে তাহাকে একটা মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলাম। যে বর্ত্তমানকে সে ক্রমাগত টানিয়া চলিতেছিল, সে বর্ত্তমান এখন চির অতীতের কুক্ষিগত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমানের যজমান, সমসাময়িকতার পূজারী, ক্ষণ-দেবতার উপাসক; আমাদের অতীত নাই, ভবিষ্যৎও নাই; তাই মানুষ মরিয়া গেলে, আমরা আর ফিরিয়া চাই না; যে আর জীবিত নাই সেও সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল হইয়া গেছে। রবীন্দ্র মৈত্র যে-ই হোক, তার জীবন-পরিচয় যেমনই হোক, সে কথায় আর কাজ কি? জীবন নামক হট্টচতুষ্পথের কোথাও সে যখন আর যোগ দিতে পারিবে না, তখন তাহার সহিত আর কোন্ সম্বন্ধ সম্ভব? এই চতুষ্পথের হট্টযাত্রার বাহিরে কোনও বিরল নিভৃত স্থান আজিকার জীবনে ত নাই—ভাবিবার, চিন্তা করিবার, স্মরণ বা ধ্যান করিবার অবকাশ কোথায়? আমরা কেবলমাত্র বাঁচিয়া আছি ও বাঁচিতে চাই; জীবনের কয়েকটা উন্মাদ-মুহূর্ত্ত কোনওরূপে ভর্‌তি করিয়া লইতে চাই; তারপর আর কিছুই নাই, কেহ নাই। এই না?। রবীন্দ্র মৈত্র সেই মুহূর্ত্তের পুঁজি শেষ করিয়াছে, তার পর তাহার আর কেহ নাই, কিছু নাই; নিঃশেষের নিঃস্বতায় সে তলাইয়া গিয়াছে।

* * *

অতএব প্রকাশ্য ভাবে শোক করিব না; কিন্তু স্মরণ করিতে দোষ আছে? দোষ নাই মনে করিতেছি এই জন্য যে, এখনও তাহার চিতাভস্ম শীতল হয় নাই; এখনও স্মরণশক্তি প্রয়োগের সময় আছে

নাই। এখনও দুই-চারি দিন বা দুই-চারি মাস তাহার জীবিত-সত্তার অনুরণন একেবারে স্তব্ধ হইবে না, ইচ্ছা করিয়াও ভুলিতে পারা যাইবে না। তাই এই বেলা তাহার নামটা একবার লইব; "শনিবারের চিঠি"র জন্যও বটে, কারণ চিঠিকে সে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছে—চিরদিনের জন্য হৃতবল করিয়া গিয়াছে।

* * *

রবীন্দ্র মৈত্রকে আমি দেখিয়াছিলাম; যাহারা দেখে নাই তাহারা তাহাকে চিনিবে না। বাংলাদেশের আধুনিক 'কুলচুরী' সম্প্রদায়ের পরিচয় ছাপার হরফেই ভালো, কারণ তাহারা মানুষ নয়, কেতাব। কিন্তু যে মানুষের জীবন-তথ্য তাহার আকৃতিতে, চলনে বলনে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে চাক্ষুষ হইয়া উঠে, যাহার ব্যক্তিত্ব যেন সর্ব্ব-অঙ্গে মূর্ত্ত হইয়া ওঠে, তাহার পরিচয় কেবল কথায় দেওয়া যায় না। রবীন্দ্র মৈত্র নামক মানুষটি বাহিরে ধরা দিয়াছিল আর দুইটি রূপে—তাহার কর্ম্মে ও তাহার সাহিত্য-সাধনায়। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির মিল ঘটে নাই; এই উভয়ের মধ্যে যেখানে সামঞ্জস্য ছিল সেখানটিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই, অর্থাৎ নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করিবার পূর্ব্বেই, সে চলিয়া গিয়াছে। এই সামঞ্জস্য-সাধনে সে প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল—দ্বিদল চণকের সন্ধিস্থলে অঙ্কুর উদ্গম হইতেছিল; আশা-বিস্ময়ে উন্মুখ হইয়াছিলাম, বাংলাসাহিত্যে এক প্রাণবান শক্তিমান রসিক লেখকের অভ্যুদয় সুনিশ্চিত মনে করিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম।

* * *

সে তাহার জীবনের প্রধান ভাগ নিয়োজিত করিয়াছিল কর্ম্মে, সে কর্ম্মের প্রেরণা ছিল তাহার হৃদয়ে। বর্ত্তমান যুগের বাংলাদেশ

তাহাকে 'নিশির ডাকে'র মত ডাক দিয়াছিল—তাহার প্রাণ স্বপ্ন-বিভোর, দেহ ছিল জাগ্রত, কর্ম্মের পশ্চাতে ছিল দুরন্ত হৃদয়াবেগ বাস্তবের ভাবনা ছিল প্রেমের আশায় ও প্রেমের বিশ্বাসে প্রদীপ্ত। এই হৃদয়াবেগের সঙ্গে ছিল বলিষ্ঠ মনন-শক্তি, সে একজন উৎকৃষ্ট বক্তা ছিল। তার চোখ দুইটি ছিল আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময়, আবেগে বিস্ফারিত ও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। এই সব লইয়া সে ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্র সেবায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল; এত বড় অস্থির মানুষ আমি আর দেখি নাই, তাহার দেহে-মনে সর্ব্বদা একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া বেড়াইত। একই মানুষের মধ্যে, একই কালে, এমন ভাব-গভীর আন্তরিকতা ও ব্যঙ্গ-কুশল রঙ্গরসিকতা আমি আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সময় নাই অসময় নাই, ঝড়ের মত সে আসিয়া পড়িত; হয় ত অনাহারেই আছে, ভ্রূক্ষেপ নাই; দুই তিন ঘণ্টা তর্ক করিয়া, যুক্তি ও আবেগের অদ্ভুত ঝড় বহাইয়া, নিজের রচনা শুনাইয়া সে আবার ঝড়ের মত নিরুদ্দেশ হইয়া গেল; কারণ আর দাঁড়াইবার সময় নাই, রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত তাহার কাজ আছে, সংবাদপত্র আছে, সভা আছে, ভূতের বেগার আছে, মুচি-মেথরের বস্তিতে পাঠশালার কাজ আছে, আরও কত কি আছে! তথাপি তাহার চোখ সর্ব্বদা হাসিতেছে, ক্লান্তি বা অবসাদের লেশমাত্র তাহার দেহে মনে কোথায়ও নাই।

* * *

এই ব্যক্তি ছিল লেখক, বাংলার বাণী-মন্দিরে ভক্তসাধক! লেখাও কম নয়; একদিকে সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতি; অপরদিকে ব্যঙ্গ-কৌতুক, কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও সর্ব্বশেষে নাটক। এই অজস্রতা ও অবাধ প্রবাহের শক্তি দেখিয়া মনে মনে বিস্মিত হইতাম; তথাপি

মানুষটার মধ্যে যে শক্তির আভাস পাইতাম, সাহিত্যরচনায় তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইত। অনুকৃতিমূলক ব্যঙ্গ-রচনায় তাহার সৃজনীশক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম, কয়েক ছোট গল্পে তাহার কৃতিত্ব লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু এ সকলের মধ্যে, কল্পনার মৌলিকতা, দৃষ্টিশক্তি ও ভাবুকের অনুকম্পা থাকিলেও, ভাষায় ও রচনাভঙ্গিতে উৎকৃষ্ট শিল্পী-মনের বিশিষ্ট ছাপ তখনও ফুটিয়া উঠে নাই। বুঝিতাম এই শক্তিমান পুরুষ এখনও আত্মস্থ হয় নাই; নিজ শক্তিকে ঠিক মত প্রয়োগ করিয়া আপনাকে আপনি চিনিয়া লইবার অবকাশ এখনও হয় নাই; সাহিত্যিক প্রতিভা তাহার জন্মগত সম্পদ হইলেও অনন্যমনা হইয়া তার সাধনায় ব্রতী হইতে সে এখনও পারে নাই—তাহার সাধন-মন্ত্র এখনও দ্বিধাযুক্ত হইয়া আছে। তাহার যে সকল রচনা তখন পর্য্যন্ত আমি দেখিয়াছি তাহার বৈচিত্র্যে ও বলিষ্ঠতায় একটি সদাজাগ্রত হৃদয়, সাহসী মন ও তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টির পরিচয় ছিল। যে ঝড়ের মত জীবন সে যাপন করিত, সেই ঝড়ের একটা লীলার দিক এই সকল রচনায় প্রকাশ পাইত—শক্তি আছে, বেগ আছে, যথেচ্ছ বিচরণের যোগ্যতা আছে, কিন্তু সে কোথায়ও দাঁড়ায় না, বসে না; ফলটি ফুলটি যাহা পথে পড়ে তাহাই কুড়াইয়া লইয়া আসে, ছড়াইয়া যায়; যাহা পায় তাহাকে ধ্যানের বস্তু করিয়া, অখণ্ড মানস-সূত্রে গাঁথিয়া, শিল্পী-মনের গভীরতর পিপাসা উদ্রেক ও নিবৃত্তি করিবার অবসর যেন তার নাই। তাই তার রচনা-শক্তির প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাহাতে সেই সুর লাগে নাই, যাহা শিল্পীর আত্ম-প্রত্যয় বা আত্মদর্শনের সুর—যে সুর রচনায় একবার বাজিয়া উঠিলে কাহারো প্রতিভা সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না।

* * *

তথাপি, রবির কর্ম্মজীবন ও সাহিত্য-চর্চ্চা, এই দুই দিকেই দৃষ্টি রাখায় আমি আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে একটা নূতন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

সকল যুগ সাহিত্য-সৃষ্টির যুগ নয়; কবি-প্রতিভার অধিকারী হইয়াও যুগপ্রভাবের বশে কত লেখক পথভ্রষ্ট হইয়াছেন—কাব্য লিখিতে গিয়া বক্তৃতা লিখিয়াছেন; অথবা ভাবপ্রধান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কোনও যুগে হয়ত মানুষের মনের পিপাসা রসপিপাসাকে অতিক্রম না করিয়া পারে নাই—সে যুগের কাব্যে ছন্দ-সঙ্গীত আছে, লিপি-চাতুর্য্য আছে, আশ্চর্য্য উপমা-সমুচ্চয় আছে, ভাবের মৌলিকতাও হয়ত আছে, কিন্তু কল্পনা বা সৃষ্টিশক্তি পাণ্ডিত্য-প্রয়াসের দ্বারা আচ্ছন্ন। আমাদের সাহিত্যে গত যুগের কবিদিগের মধ্যে এমনই একজনকে দেখিতে পাই যাঁহার উপর সে যুগের একটি প্রধান প্রবৃত্তি বিশেষ করিয়া ভর করিয়াছিল—ইনি মহিলাকাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। মাঝে রবীন্দ্রনাথের যুগ গিয়াছে, সে যুগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক। তারপর আজ আমরা যে যুগে বাস করিতেছি তাহাতে ভাব বা চিন্তার সমস্যা নয়—জীবনের সমস্যাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; এখন পাণ্ডিত্যও নয়; নিরুদ্বেগ সৌন্দর্য্যচর্চ্চাও নয়—এ যুগের প্রধান প্রবৃত্তি কর্ম্মপথে জীবন-জিজ্ঞাসা। আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাহাতে এই কর্ম্মও স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না; কর্ম্ম অর্থে অতি সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-সন্ধান, এবং জীবন-জিজ্ঞাসার নাম কাম-প্রবৃত্তির উদ্দাম অধ্যবসায়। অতএব এ যুগও সাহিত্য-সৃষ্টির যুগ নয় বলিয়াই মনে হইতে পারে। একদিকে যেমন চিন্তা ও ভাবুকতার অবকাশ নাই, আর এক দিকে তেমনই জীবনের সম্মুখীন হইবার সাহস নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে এই অধঃপতিত সমাজে একাধিক মহাপুরুষের জীবন ও

বাণী জাতির হৃদয়-গোচরে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীমূর্ত্তি, তাঁর সেই দুর্নিরীক্ষ্য জ্যোতিশ্চর্য্যা, আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সে বাণী ব্যর্থ হয় নাই, হইবার নয়; মনুষ্য-দেহে দিব্য-আত্মার প্রকাশ ক্বচিৎ হয়; যখন হয়, তখন জগতে মন্বন্তর আসন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিবেকানন্দকে আজও আমরা চিনি নাই, তার কারণ, আমরা যুক্তিবাদী ও কুলচুর-বাদীর আখড়ায় পরধর্ম্মের উচ্ছিষ্টভোজে এখনও লালায়িত; প্রাণধর্ম্মের দিব্যমন্ত্রে এখনও সাড়া দিতে পারি নাই; দেশ ও জাতির শত জন্মের চেতনা-গহনে যে বিরাট আত্মা পথ হারাইয়া পথ খুঁজিতেছিল, তাহার সেই আকস্মিক পথ-প্রাপ্তির দৈব-ঘটনা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি নাই—এখনও সূর্য্যকে অস্বীকার করিয়া আলেয়ার অনুসরণ করিতেছি। কিন্তু বিবেকানন্দ আমাদিগকে চিনিয়াছিলেন, তাই বিংশশতকের আরম্ভ হইতেই অচল চক্র চলিতে সুরু করিয়াছে, সে চালনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছে। দ্বিতীয় মহাপুরুষের বাণী এখনও শেষ হয় নাই, সে বাণীমূর্ত্তি আমরা এখনই প্রত্যক্ষ করিতেছি। বর্ত্তমান যুগে এই দুই বীর-মানব মন্বন্তরের মহাপ্লাবনা রোধ করিয়া মৃত্যুস্রোতের উপরে যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে অনেকে আরোহণ করিতেছে, সেই জাঙ্গাল ধরিয়াই জয়-যাত্রা সুরু হইয়াছে। বর্ত্তমানে এ জাতির মধ্যে যেখানে যেটুকু জীবন-স্ফূর্ত্তি ঘটিয়াছে, তাহার মূলে আছে এই দুই মহাপুরুষের প্রেরণা—এ বিষয়ে এ যুগে ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আর কেহই নাই; এ কথা অস্বীকার করিয়া, সাম্প্রদায়িকতার মোহে, কোনও মিথ্যাকে এখনও খাড়া করিয়া রাখিবার চেষ্টা শুধুই নিরর্থক নহে, তাহা নীচতা ও শঠতার পরিচায়ক।

* * *

অতএব আজিকার সমাজে জীবন যে কোথায়ও নাই এমন কথা আর বলে চলে না। কিন্তু এই জীবন-চর্য্যা কি সাহিত্য-চর্চ্চার অনুকূল? প্রশ্নটা কিছুকাল যাবৎ আমার মনে নূতন করিয়া জাগিয়াছে। জাতির মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে—একদিকে যে অতিরিক্ত ভাবাবেগ, আত্মভ্রষ্টতা ও অসংযম, এবং অপরদিকে যে ধরণের কর্ম্মোন্মাদ আত্ম-উৎসর্জ্জনের অধীরতা—তাহাতে সাহিত্যিক প্রেরণা বা কবিকার্য্যের অবকাশ কোথায়? বিংশশতাব্দীর এই মন্বন্তর মুখে আমরা আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে বিশেষ বড় কিছু গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছি? যাহা কিছু উৎপন্ন ও স্তূপীকৃত হইয়াছে, তাহা গত যুগের আদর্শ বা প্যাটার্ণের উপর সূক্ষ্মতর সূচীকর্ম্ম মাত্র—স্রোতোহীন বদ্ধ জলরাশি যতই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, ততই তাহা অগভীর হইয়াছে। ইহার কারণ, জীবনে যে বান ডাকিয়াছে তাহার গতি ভিন্নমুখী—সাহিত্যের যে আদর্শে আমরা দীক্ষিত হইয়াছিলাম তাহা ভাবাকুল আত্মপ্রসাদের আদর্শ; জীবনকে ফাঁকি দিয়া, মনুষ্যত্ব ও পৌরুষকে উপেক্ষা করিয়া, জীবিতের জীবনধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া, আমরা এক অতি সুন্দর মিথ্যার উপাসনা করিয়াছিলাম—দেহাধিষ্ঠিত আত্মার সন্ধান না লইয়া, মানস-পুরীর বিলাস-কক্ষে সুখ-শায়িতা কাম-বধূর প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়াছিলাম এই মানস-আদর্শের দম্ভও কম ছিল না: ইহার পশ্চাতে ছিল উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আস্ফালন, সুরুচি, শুচিতা ও বিবেকের নামে আত্মসুখস্বাধীনতার জয়ঘোষণা; কুৎসিত কুরূপ ও কর্দ্দমাক্ত বলিয়া জাতি সাধারণের স্পর্শ বাঁচাইয়া একটা নূতন ধরণের কাঞ্চন-কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা। সমগ্র শিক্ষিত সমাজে,

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মনোবৃত্তির প্রসার-কল্পে সাহিত্য কম সাহায্য করে নাই। এ আদর্শের প্রভাব এখনও সাহিত্যে প্রবল; অথচ জীবনে যেটুকু সত্যের সাড়া জাগিয়াছে, তাহা এ আদর্শের প্রতিকূল। এযুগে জীবনের গভীরতর প্রবৃত্তির সঙ্গে এই স্বসুষ্ঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-ধর্ম্মের বিরোধ সাহিত্যকে আরও প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছে; এককালে সাহিত্য যেমন জীবনের সত্যকে পরাভূত করিয়াছিল, এখন তেমনই, জীবনের সত্য সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু জীবনে এখনও সে দৃষ্টি আসে নাই—জীবনের অন্তস্তল হইতে যে সত্য-সুন্দরের অভ্যুদয় হইবে, তাহারই দিব্য-প্রতিভায় অতঃপর সাহিত্যের নবকলেবর নির্ম্মাণের সময় আসিতেছে।

* * *

সময় এখনও আসে নাই—আসিতেছে। অতি আধুনিক সাহিত্যের যে রূপ দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি, উহাতে কোনও নূতন প্রবৃত্তির প্রেরণা নাই; জীবনাবেগ-বর্জ্জিত, পৌরুষ ও মনুষ্যত্বদ্রোহী যে কুৎসিত মানস ব্যভিচারকে আমরা উচ্চাঙ্গের সত্য বা স্বাতন্ত্র্যসাধনা বলিয়া আশ্বস্ত হইতে চাই—তাহা পূর্ব্বতন সাহিত্য-ধর্ম্মেরই যুগোপযোগী স্বাভাবিক পরিণাম। আধুনিক কালে জাতির যে জীবন-সমস্যা কাপুরুষ মানস-বিলাসীর আত্মপ্রসাদ বিঘ্নিত করিয়াছে, ইহা তাহাকেই অস্বীকার করিবার চেষ্টা। ইহা যে নূতন নয়, পুরাতনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহার প্রমাণ, এই আধুনিক সাহিত্য-ব্যভিচারের প্রতি সে যুগের সাহিত্য-নায়ক মহাকবির মনোভাব। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত, অস্বীকার করিতে অসমর্থ—কোথায় যেন একটা মমতা-বন্ধন

আছে। ইহারা যে, বাস্তব জীবন-নীতি, দেশ ও জাতিধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত নয়, ইহারা যে কোনও সংস্কারের দাসত্ব করে না!— সূক্ষ্ম মানসিকতা বা ভাব বিলাসের পক্ষপাতী; ইহাদের রুচি ও রসিকতা যে অতি-আধুনিক য়ুরোপ বা 'বিশ্বে'র আদর্শে সুসংস্কৃত, ইহাই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের আশ্বাসের কারণ; কিন্তু সেই সঙ্গে ক্ষোভ ও লজ্জার কারণ এই যে, ইহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান বা আর্টের আদর্শ খুব বিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন নহে, ইহাদের মানসবিলাসে একটা রুচির শৈথিল্য আছে, মনের সাজসজ্জায় দুই রঙের তালি-দেওয়ায় মত ইতরামি আছে; এইখানে বাধে, মানস-বিলাসের সত্যশিবসুন্দর এইখানে ক্ষুণ্ণ হয়। তাই দেখিতে পাই গতযুগের সাহিত্যাবতার এযুগে বড়ই অস্বস্তি ভোগ করিতেছেন, দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন, কাব্যছাড়িয়া চিত্রকলার আশ্রয় লইতেছেন, জাতি ও সমাজের পরিবর্ত্তে বিশ্ব, এবং সুন্দরের পরিবর্ত্তে মহামানব-বিগ্রহের সেবায় রত হইয়াছেন।

* * *

যতই দিন যাইতেছে ততই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এযুগে সাহিত্যের সে আদর্শ অচল; কারণ সত্য ও সুন্দরকে এখন আর মানস-বিলাসের সামগ্রীরূপে বরণ করা চলে না। জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের ডাক পড়িয়াছে; সেবায় ও ত্যাগে, মনুষ্যত্ব ও পৌরুষের মহিমায় সত্য-সুন্দরের অভিনব প্রকাশ মানুষের চোখ ধাঁধিয়া দিতেছে। অন্তরের গভীরতম আবেগ আজ ভিন্নমুখী; সেই মুখে সাহিত্য যদি আজ আপনাকে স্থাপিত করিতে পারে, তবেই এযুগে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব, নতুবা সাহিত্যক্ষেত্রে বানরের ব্যভিচারই প্রশ্রয় পাইবে।

* * *

কিন্তু জীবন-বন্যার এই অতি বেগবান স্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাহারই গতি নিয়মিত করিয়া, যাহারা সিন্ধুসন্ধানে চলিয়াছে যাহারা বৃহৎ ও মহৎকে সত্য ও সুন্দরকে কর্ম্মের মধ্যে উপলব্ধি করিবার বাসনায় অধীর হইয়াছে তাহারা কি সাহিত্য-ধর্ম্মী? রস-চর্চ্চা, আর্টের মর্য্যাদা রক্ষা খাঁটি কবিকল্পনার আবেগ কি তাহাদের পথে সম্ভব? সাক্ষাৎভাবে হয়ত নয়? কিন্তু যাহারা সাহিত্যিক প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছে, এযুগের এই প্রবলতম প্রবৃত্তি তাহাদের সেই প্রতিভাকে প্রভাবিত করিবে না? য়ুরোপীয় বহু কবি-সাহিত্যিকের জীবনেতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত দ্বারা এমন সিদ্ধান্তের সমর্থন করা যাইতে পারে যে, জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়, প্রত্যক্ষ বাস্তবের ক্ষেত্রে প্রাণশক্তির সাধনা, সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরায় নহে; বরং জীবনকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া কবিকল্পনা শক্তি ও সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে এই ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝাঁপ না দিলেও, যাহাদের ভাবনা ও কল্পনাশক্তি সুস্থ ও সতেজ, জাতির জীবন-ধর্ম্ম-সাধনা, যুগ-বিশেষের সমষ্টিগত প্রেরণা, তাহাদের ব্যক্তি-চেতনায় সাড়া পাইয়াছে, রস-সঞ্চারের অনুকূল হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কাব্যসংস্কার ও কবি-প্রবৃত্তি যে রসের আদর্শকে চিরদিন বরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার মতে, কাব্যজগৎ বাস্তবজীবনের ক্ষেত্র হইতে এতই দূরে যে এ দুইএর মধ্যে কোনওরূপ সম্বন্ধ ঘটিলে কাব্যের রসহানি অনিবার্য্য। তার কারণ, আমরা কবিত্বকে মনুষ্যত্ব হইতে পৃথক করিয়া ধারণা করি, আমাদের কাব্যসাধনা একরূপ বানপ্রস্থ। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ আমরা কখনও স্বীকার করি নাই, আমাদের সাহিত্যিক আদর্শ চিরদিনই অসম্পূর্ণ। তাই আজ জীবন যখন এমন করিয়া আমাদের

সর্ব্ব-চেতনাকে গ্রাস করিয়াছে, তখন আমরা সাহিত্য-ধর্ম্ম বজায় রাখিবার কোনও উপায় আর দেখিতেছি না। পুরাতন আদর্শবাদীরা আজ চমকিত বিভ্রান্ত; নূতন আদর্শের নূতন প্রেরণা এখনও নূতন রস-রূপের সন্ধান পায় নাই।

* * *

একই কালে জীবনের প্রবল তরঙ্গাভিঘাত নিজ বক্ষপঞ্জরে ধারণ করা, এবং তাহারই মধ্যে ধ্যাননিবিষ্ট দৃষ্টিতে রস-রূপের সাক্ষাৎকার—আজিকার সাহিত্যসাধনায় কবিপ্রতিভার এই দুরূহ পরীক্ষা উপস্থিত। ভবিষ্যৎ কবি-শিল্পী হয় ত কল্পনার সাহায্যেই তাহাকে আয়ত্ত করিবে, কারণ তখন জীবনে ও সাহিত্যে বিরোধ ঘুচিয়া, উভয়ের মধ্যে রসের সংক্রমণ-সেতু নির্ম্মিত হইয়া যাইবে; কিন্তু আজিকার সাহিত্যসেবী এই দ্বন্দ্বের দ্বারা নিরতিশয় বিক্ষিপ্ত—আজ তাহাকে ভাব ও কর্ম্মের বিরোধ নিজের জীবনেই মিটাইয়া, সাহিত্যে নব রসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

* * *

রবীন্দ্র মৈত্রকে দেখিয়া ইহাই মনে হইয়াছিল। তাহার মত আরও অনেকে এই দ্বন্দ্বে বিক্ষিপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভার সম্যক অবকাশ পাইতেছে না, কেহ বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এমন একজনকে অন্ততঃ জানি, যাহার শিল্পীমনের পরিচয় বহুপূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম; তাহার রচনায় কবি-শক্তির নিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে; চিত্রকলার সাধনাও সে করিয়াছে; কিন্তু যুগ-দেবতার আহ্বান সে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই,—ধ্যানের আসন ত্যাগ করিয়া সে অবশেষে প্রাণের তাড়নায় গৃহত্যাগী হইয়াছে। রবি জীবনের ডাক শুনিয়াছিল আগে, কর্ম্মোৎসাহই তাহার জীবনের আদি প্রবৃত্তি। তাই, প্রায় ৬।৭ বৎসর

পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন তাহাকে চিনিতে পারি নাই, তাহার সাহিত্যিক প্রতিভার বিশেষ কোনও উন্মেষ তখন লক্ষ্য করি নাই। পরে যখন তাহার রচনা-শক্তির নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তখনও তাহার শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ হইলেও, প্রতিভায় বিশ্বাস করি নাই। গত বৎসর সে যখন আমাকে তাহার কয়েকখানি পুস্তক উপহার দিয়া অভিমত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিল, তখন তাহার জীবন ও সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে আমি অধিকতর সচেতন হইয়াছি—লেখাগুলি আবার পড়িলাম, কিন্তু কোনও মন্তব্য করিলাম না। এবার যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, সে নিজ শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, আত্মপ্রত্যয়ের বিপুল সাহস তাহার চোখেমুখে প্রতিভাত হইতেছে। সে তখন 'ঘৃতকুম্ভ' নামক উপন্যাস-রচনায় মশ্‌গুল; পরে সহসা বিষম কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেই 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' লিখিয়া 'শনিবারের চিঠি' ভরিয়া দিল। এই সময়ে আমি তাহাকে শেষ দেখি, এবং সেই দেখাতেই বুঝিয়াছিলাম সাহিত্যে তাহার পথ সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। লেখাও পড়ি, মানুষটিকেও দেখি—একই বস্তু চোখে ঠেকে—সত্যকার শক্তিচেতনার একটি সপ্রতিভ দৃঢ়তা, ও পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব উভয়ত্রই বিদ্যমান।

* * *

'ঘৃতকুম্ভ' অসমাপ্ত রহিয়া গেল। এই উপন্যাসে সর্ব্বপ্রথম তাহার রসদৃষ্টির নিঃসংশয় প্রমাণ পাইলাম। কেবল আবেগ বা অনুকম্পা-মূলক কাহিনী রচনা নয়—এ রচনায় লেখক আত্মস্থ; জীবন ও চরিত্রের গভীরতর প্রদেশে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া অনাসক্ত ভাবে সেই রহস্য ধ্যান করিবার যে ভঙ্গি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই ইহার গৌরব। ভাববাদ বা বাস্তববাদ,—সর্ব্ব বাদবিসম্বাদের সংস্কার উত্তীর্ণ হইয়া,

কেবল জীবনের আবরণ উন্মোচন করিবার যে স্পৃহা তাহাই এই উপন্যাসে লেখকের কল্পনায় শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। কথাবস্তু বা ঘটনাসংস্থানে যেমন কোনও convention নাই—নায়ক ও নায়িকার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ প্রথাবিরুদ্ধ—তেমনই চরিত্র-চিত্রণে, মানবীয় প্রকৃতি অথবা সামাজিক সংস্কার কোনটাই লঙ্ঘন করিবার সজ্ঞান অধ্যবসায় নাই; মোটের উপর, কোনও অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি নাই; আছে কেবল আধুনিক জীবন-যাত্রার রঙ্গমঞ্চে চিরন্তন মনুষ্য-হৃদয় লইয়া এক অভিনব রস-রহস্যের অভিনয়। এই উপন্যাসে নায়িকার যে চরিত্র কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেই লেখকের মৌলিকতার পরিচয় আছে; এই চরিত্রের রহস্যই কাহিনীকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। রবির প্রতিভার প্রথম প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই এই উপন্যাসে।

* * *

'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এর অভিনয় অনেকেই দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন—লেখক দেখেন নাই; দেখিলে এই নাটকখানির সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত ভাবে মত প্রকাশ করিতে পারিতাম। অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে—এই রচনার উৎকৃষ্ট হাস্যরস। উপন্যাসে ও গল্পে যেমন হউক, বাংলা নাটকে আমরা সাধারণত যে হাস্যরসে অভ্যস্ত তাহা রঙ্গরস মাত্র। যে হাসির অন্তরালে অতি গভীর Criticism of Life আছে, অর্থাৎ যে হাস্যরস উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কোনও মর্ম্মস্থল উদ্ঘাটিত হয়, তাহাই কাব্য, তাহাই উৎকৃষ্ট রস। 'ঘৃতকুম্ভ' ও 'মানময়ী' এই দুইটি রচনায় লেখকের অকৃত্রিম জীবন-প্রীতি বা জীবন-রস-রসিকতার পরিচয় রহিয়াছে। মনের এই attitude অতিশয় দুর্লভ; যে দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিতে জানিলে একই কালে অধর হাস্যরঞ্জিত ও নয়ন অশ্রুসজল

হইয়া উঠে, তাহাই রসিকের দিব্যদৃষ্টি। রবি এ দৃষ্টি পাইল কোথায় ? সে ত' আজীবন দুরন্ত আবেগে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে ; কখন কেমন করিয়া সে এই স্থির রসদৃষ্টি লাভ করিল ?

* * *

আজ যে তাহাকে স্মরণ করিয়া এত কথা বলিতেছি, তাহার মূলে আছে এই জিজ্ঞাসা। রবি তাহার সাহিত্য-সাধনায় যে সিদ্ধির পথে পা দিয়াছিল, আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে যে সিদ্ধি লাভ সে নিশ্চয়ই করিত তাহা হইতে একটা বিষয়ে আশ্বস্ত হইয়াছি। আমি সাহিত্যের যে যুগোচিত আদর্শ ও সাধনার কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, রবির সাহিত্য-সাধনায় তাহার একটা সুস্পষ্ট সঙ্কেত পাইতেছি। রবির জীবনে ছিল একটা প্রচণ্ড আবেগের তাড়না, তাহারই বশে সে তটভূমি ত্যাগ করিয়া তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল—এক মুহূর্ত্ত কর্ম্মের উত্তেজনা হইতে নিষ্কৃতি ছিল না ; যুগধর্ম্ম তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। জাতির জীবন-সঙ্কট, ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার দুরূহ সমস্যা, বর্ত্তমানের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে প্রাচীনের ভিত্তিমূল একেবারে ভাসিয়া যাওয়ার উপক্রম, ব্যক্তির আত্ম-সাধনায় সত্য-মিথ্যার অনিশ্চয়তা,—এ সকল তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল ; নূতন ও পুরাতন, ব্যক্তি ও সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মনীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও মানবসেবা—সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি এই আসক্তি সত্ত্বেও তাহার সহজাত রস-পিপাসা সর্ব্বদা জাগ্রৎ ছিল, ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যেও স্থির বিন্দুটিকে ধরিবার সাধ ও সাধনা সে কখনও ত্যাগ করে নাই। মনে হইয়াছিল, বুঝি এই দ্বন্দ্ব সে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না তাহার সাহিত্যিক প্রতিভা হার মানিবে—তাহার শক্তি, জীবনকে দেখা অপেক্ষা জীবনকে জয় করার দিকেই

ব্যথিত হইবে। কিন্তু শেষ দুইটি রচনা পড়িয়া সন্দেহ দূর হইল; বিশ্বাস হইল, সে জীবন ও সাহিত্যের সুগভীর রস-সঙ্গতি প্রাণের মধ্যে লাভ করিয়াছে; সহসা সে এমন একটি স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে, যেখানে জীবনের খরস্রোত নিঃশব্দ-গভীর, অতিচঞ্চল জ্যোতিঃপ্রবাহ স্থির শিখায় দীপ্যমান। জীবনকে এমন করিয়া জয় করিবার সাধনা যে না করিবে, এযুগে তাহার দ্বারা উচ্চাঙ্গের কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব হইবে না। বাস্তব-বাধাহীন নিরঙ্কুশ কল্পনার দিন গিয়াছে; সোনার স্বপন দেখিবার কাল আর নাই—লোহাকেই বক্ষ-শোনিতের রসায়নে সোনা করিয়া তুলিতে হইবে, জীবনের বাস্তব সুখদুঃখের তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়া এই দেহের শুক্তি-গর্ভে মুক্তা ফলাইতে হইবে; ইহাই এযুগের কাব্যসাধনা। রবির অসমাপ্ত সাহিত্য-সাধনা ইহারই ইঙ্গিত করিতেছে।

* * *

পূর্ব্বে বলিয়াছি সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে যুগপ্রভাব প্রতিকূল হইতে পারে, যুগপ্রভাবের প্রবল শাসনে কবিপ্রকৃতিও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পারে যুগকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া কবি মানসের যে স্বতন্ত্রনিষ্ঠা, তাহাও সত্য নহে—কল্পনার সে স্বাতন্ত্র্য যতই ব্যক্তিত্ব-মহিমায় মণ্ডিত হোক, তাহাতে কাব্যের উৎকর্ষহানি হয়। কাব্য যতই সার্ব্বজনীন বা সার্ব্বভৌমিক হোক—যুগ, জাতি, ও দেশের ভাব-চৈতন্যের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এইজন্য যদি সে সকলের প্রবৃত্তি কাব্যসৃষ্টির অনুকূল না হয় তাহা হইলে রসিকচিত্ত ও নিগৃহীত হয়, সম্যক স্ফূর্ত্তিলাভ করেনা। আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে যে যুগ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে তাহা কাব্যসাধনার অনুকূল না হইলেও, তাহার মূলে ভাবাতিরেক আছে—অতিদৃঢ় কর্ম্মব্রত

রবীন্দ্রনাথ (কৈশোরে)

উদ্‌যাপনের মধ্যেও প্রবল হৃদয়াবেগ আছে। জীবনের গুরুতর সমস্যা অনুধাবন করিয়াই যাহারা কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহারাও কর্ম্মবুদ্ধি অপেক্ষা ভাবের আদর্শকেই আশ্রয় করিয়াছে। এই ভাবপ্রবণতা বাঙ্গালীর চরিত্রে বদ্ধমূল; কর্ম্মের কামারশালে অতিতপ্ত লৌহপিণ্ড হাতুড়ির আঘাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে, তাহাতে শক্তিক্ষয় হয়। কিন্তু এই স্ফুলিঙ্গরাশিই সাহিত্যের দীপপাত্রে আলোকশিখায় পরিণত হইতে পারে, রবির জীবনে তাহারই আভাস আছে। অর্থাৎ,—'through literature to life' একদিক দিয়া যেমন সম্ভব, তেমনই—'through life to literature' আমাদের পক্ষে এযুগে শুধুই সম্ভব নয়, ইহা ভিন্ন সাহিত্যের গত্যন্তর নাই। যুগধর্ম্মের যে প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে বর্ত্তমানে সাহিত্যের সম্বন্ধে নিরাশ্বাস হইয়াছিলাম, কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তে আবার আশার সঞ্চার হইতেছে; মনে হইতেছে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এযুগে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু ভাবপ্রবণ রসপিপাসু বাঙ্গালী, জীবনের বন্যাবেগ বক্ষে ধারণ করিয়াই সাহিত্যের নূতন রস-রূপের প্রতিষ্ঠা করিবে—ভাব-চৈতন্যের গহন অতলে, জীবন ও মৃত্যুর প্রচণ্ড সংঘর্ষে যে ভীষণ আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়, তাহারই মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সে আত্মার রসরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া অভয়প্রাপ্ত হইবে, বাঙ্গালীর জীবনে শাক্ত ও বৈষ্ণবের চিরন্তন দ্বন্দ্ব এতদিনে এক অপূর্ব্ব জীবন-সঙ্গীতে লয় পাইবে। রবির অসমাপ্ত সাহিত্য-সাধনায় যে সিদ্ধির আভাস পাইয়াছি, তাহাতেই এত কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

* * *

রবির জীবনে এ যুগের মূল প্রবৃত্তি—সর্ব্বদ্বন্দ্ব সমন্বয়ের উৎকণ্ঠা—

সর্ব্বাঙ্গীণ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল ; তাহারই অন্তর্গত রূপে সাহিত্যের সমস্যাও সমাধানের পথ খুঁজিতেছিল। আধুনিক জীবনযাত্রার যত কিছু বৈসাদৃশ্য, তাহার মধ্যেই 'ঘৃতকুম্ভ' ও 'মানময়ী'র লেখক একটা গভীরতর রস-সত্যের সন্ধানে উদ্‌গ্রীব ও আশান্বিত হইয়াছিল। 'ঘৃতকুম্ভ' নামে যে উপন্যাস সে ফাঁদিয়াছিল, তাহাতে একটা উদ্ভট ঘটনা-সংস্থানে ট্র্যাজেডির ছায়াপাত হইয়াছে ; নীতি ও দুর্নীতি উভয়কে সবলে পাশ কাটাইয়া তাহার কল্পনা যে পথে অগ্রসর হইতেছিল তাহার গন্তব্য ছিল মানুষের হৃদয়-রহস্যের শাশ্বত তীর্থ-মন্দির। উপন্যাস অসমাপ্ত রহিয়া গেল, তথাপি তাহার কল্পনার যে ভঙ্গি ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহার পূর্ণ পরিণতি এই প্রথম রচনাতেই দৃষ্টিগোচর না হইলেও, সে ভঙ্গি যে কালে অপরূপ সাফল্যে মণ্ডিত হইত, সে অনুমান মিথ্যা নহে। 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' রচনা হিসাবে সার্থক হইলেও খুব বড় কিছু নয় সত্য ; কিন্তু ইহার মধ্যেও জীবন-রস-রসিকতার যে ভঙ্গি চোখে পড়ে, তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অল্প ছিল না। ঘটনাবস্তু সামান্য হইলেও এবং তাহাতে কল্পনার গভীরতা ও অবকাশ যথেষ্ট না থাকিলেও, লেখকের সৃষ্টিশক্তি ও রসদৃষ্টির প্রচুর প্রমাণ ইহাতে আছে। নবযুগের নূতন ভাবপ্রেরণাও ইহাতে লক্ষিত হইবে, অতিশয় বিরুদ্ধ সংস্কারসম্পন্ন নরনারীর একটি সহজ আত্মীয়তা—উদার প্রীতির সম্ভাব্যতা—যে রসের সৃষ্টি করিয়াছে ; অতিশয় প্রাচীন ভাবাপন্ন পাত্র-পাত্রীর মনে অতি আধুনিক আদর্শও অজ্ঞাতসারে যে সহানুভূতির উদ্রেক করিয়াছে, তাহাই নাটকখানিকে এমন হাস্য-মধুর করিয়া তুলিয়াছে ; কল্পনার এই প্রবৃত্তিই ঘটনা ও চরিত্রগুলির উদ্ভাবন করিয়াছে। সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের উপরে মানুষের হৃদয় যে চিরজয়ী হইয়া আছে—সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতির সমস্যা

যেমনই হোক, ধরণীর মহারাসে রসিকশেখরের রাসলীলা কিছুতেই বাধা মানিবে না—এই দিব্য-উপলব্ধি রবীন্দ্র মৈত্রকে কর্ম্মী হইতে কবি-পদবীতে তুলিয়া ধরিতেছিল। জীবনের আবর্ত্তসঙ্কুল স্রোতে যে নির্ভাবনায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পক্ষেই এই রস-দৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল; কারণ বাস্তবকে যে সত্য করিয়া দেখিতে পারে, সুন্দর তাহার কাছেই ধরা দেয়। রবির সাহিত্য-প্রতিভা যে শেষে নাটকের দিকেই ঝুঁকিয়াছিল এবং তাহাতেই স্ফূর্ত্তি পাইত বলিয়া মনে হয়—ইহাও আশ্চর্য্য নহে। যে কল্পনা জীবনের গতিবেগ ও কর্ম্মোন্মাদনা হইতে আপন পুষ্টি সংগ্রহ করে, তাহার প্রকাশ-ভঙ্গি নাটক হওয়াই স্বাভাবিক। এই নাটকের অভাব আমাদের সাহিত্যে এখনও ঘুচে নাই। খাঁটি নাটকীয় প্রতিভা এদেশে এত দুর্ল্লভ কেন, এবং আগামী বাংলাসাহিত্যে নাটক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে কি না—সে প্রশ্নের উত্তর রবির জীবন ও সাহিত্য-সাধনার কাহিনী হইতে মিলিতে পারে।

* * *

রবির সম্বন্ধে আজ আমার যাহা মনে হইতেছে তাহার প্রায় সবটাই বলিয়া রাখিলাম। তার সম্বন্ধে কিছুই বলিবার সময় আসে নাই, তাই এতদিন কিছুই বলি নাই। কিন্তু তার বলা সে শেষ করিয়া গিয়াছে, সকল আশা, সকল কামনার অন্ত হইয়াছে; তাই একদিন যাহা সম্পূর্ণ প্রমাণসহকারে, অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলিবার আশা করিয়াছিলাম, আজ তাহাই দ্বিধাকম্পিত কণ্ঠে সসঙ্কোচে বলিলাম। একদিন সে বড় আব্দার করিয়া নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার অভিমত চাহিয়াছিল, সেদিন তাহার সে আব্দার রক্ষা করিতে পারি নাই। আজ সে নাই, আমার অভিমতের

মূল্যও আর নাই; বাঁচিয়া থাকিলে কামনা করিতাম কাহারও অভিমতের প্রয়োজন যেন তাহার না থাকে। বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবযুগের কর্ষণ চলিতেছে; যে দুই চারিটি বীজ ইতিমধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে তাহাদের একটি; প্রার্থনা করি অপরগুলি শাখা-পল্লবে ফলে-ফুলে নিজ নিজ আকার ও আয়তন লাভ করুক, কিন্তু রবির সাধনার প্রায় সবটুকুই ভূমিতলে প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেল। অকাল-মৃত্যু আরও অনেকের হইয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া ফুটিবার মুহূর্ত্তেই কেহ ঝরিয়া পড়ে না। মৃত্যুকে অনেকরূপেই দেখিলাম—মোহ আর নাই; শোক করিতে লজ্জা হয়। মহাকাল আপনার প্রয়োজন বোঝে—লাভের অঙ্ক তাহারই, ক্ষতির হিসাবও সেই পূরণ করিবে; আমরা দিন-মজুরীর মজুর মাত্র, নালিশ করিবার কে?

রবি মৈত্র

[শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়]

রবি আমার ছাত্র ছিল, কিছু কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে এম্‌-এ পড়িয়াছিল, সেই সময়ে সে আমার ক্লাসেও আসিত। মনে হয় সে আমার ছাত্র হইবার বহু পূর্ব্বেই আমার সহিত পরিচিত হইয়াছিল। ইহা কেমন করিয়া হইয়াছিল জানি না। প্রথম হইতেই উদ্যমে পূর্ণ, সদালাপী ও অধ্যয়নশীল ছোকরা বলিয়া তাহার প্রতি আমি আকৃষ্ট হই। সে মাঝে মাঝে আমার কাছে পড়িবার জন্য বই লইত,—

তাহার সাহিত্যানুরক্তি দেখিয়া মনে মনে বিশেষ প্রীতি অনুভব করিয়াছিলাম। তারপর বহুদিন ধরিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এইবার যখন সে আমার সঙ্গে দেখা করিল, তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এবং তাহার মত উৎসাহশীল যুবক যে-ভাবে সমাজ-সেবার কার্য্যে নামিয়াছে, তাহা দেখিয়া দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে হতাশ-ভাব মনকে অবসন্ন করিয়া তুলিতেছিল তাহার প্রতিষেধক রসায়ন যেন পাইলাম। আগে ছিল সে একজন মেধাবী ও সব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ছাত্র—আর পাঁচ জন ছাত্রের মধ্যে একজন মাত্র—তবে একটু বেশী শ্রদ্ধা ও সারল্যযুক্ত, এইটুকু তাহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। এখন তাহাতে দেখিলাম সত্যদ্রষ্টা ও সত্যবাক্ কর্ম্মীকে, এবং কবি ও সাহিত্যস্রষ্টাকে। এম্-এ ও ল' পাস করিয়া গতানুগতিক ভাবে অধ্যাপনা বা ওকালতী করিবার ছেলে সে ছিল না। সে তো চোখে ঠুলী-দেওয়া ঘানির বলদ ছিল না, সে ছিল গগন-বিহারী গরুত্মান্। সামান্য অর্থোপার্জ্জনের প্রতি অথবা বিদ্যাচর্চ্চার একান্ত আত্মনিষ্ঠ চিত্তপ্রসাদের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। তাহার মধ্যে আমি ঈশ্বর-প্রেরিত জন-ত্রাতার আভাস পাইয়াছি। জগতের গতি আমাদের জ্ঞান-গোচরের বহির্ভূত; বিধাতা বা অ-দৃষ্ট শক্তির কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রবি আমাদের এই অভিশপ্ত বাঙ্গালী হিন্দুজাতির মধ্যে ক্ষণিকের জন্য আসিয়াছিল তাহা আমরা জানি না; কিন্তু সে আসিয়াছিল যেন মূর্ত্তিমান কর্ম্মযোগ—নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া যাইবার মহান্ আদর্শ যেন আবার নূতন করিয়া আমাদের সমক্ষে ধরিবার জন্যই আসিয়াছিল।

যখনই আমাদের বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজের ও জীবনযাত্রার গতি লইয়া আমি চিন্তা করি, নানা দিক হইতে একটা গভীর নৈরাশ্য

আসিয়া আমাকে পীড়িত করে। আশা না থাকিলে মানুষ বাঁচতে পারে না ; তাই নৈরাশ্যের পঙ্কের উপরেও আমাদের আশার আসন পাতিয়া বসিতে হয়। লড়াইয়ে হারিয়া যাইব জানিয়াও আমাদের লড়িতেই তো হইবে ; আর এই লড়াই হইতেছে মুখ্যতঃ আমাদের নিজেদের সঙ্গে, আমাদের জাতিগত, সমাজগত ও ব্যক্তিগত সমষ্টি-প্রাণ ও ব্যষ্টি-প্রাণের সঙ্গে ; আমাদের মধ্যে যে সর্ব্বনাশকর মানসিক অবসাদ চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে, জীবনের কঠিনতম সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যে ক্লীবোচিত উপেক্ষা দেখা যাইতেছে, কোনও চিন্তা না করিয়া পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া নিজ জাতির সম্বন্ধে আস্থা হারাইয়া কেবল স্রোতে গা ঢালিয়া দিবার যে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে, চারিত্র্য-বল আমাদের কাছে যে উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে—এই সবের বিরুদ্ধে লড়াই করা, বা ইহাদের বিপক্ষে খাড়া হইয়া দাঁড়ানো যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা আমরা একটু হৃদয় দিয়া একটু অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের দৃষ্টি দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি। বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ এখন শ্মশান-প্রায় ; এই শ্মশানের বুকে এখন আমাদের ভাষাতত্ত্ব বা ইতিহাস বা বিজ্ঞান বা রসচর্চ্চা বা সাহিত্যসাধনা করিতে যাওয়া অত্যন্ত কাণ্ড-জ্ঞানহীন ভাববিলাস বা কলাবিলাস বলিয়া মাঝে মাঝে আমাদের মনে সংশয় জাগে। এই শ্মশানে একটা সমগ্র জাতির জন্য চিতা প্রস্তুত হইতেছে—দেশ জোড়া মৃত ও মুমূর্ষুর মেলা। যাহারা এ বিষয়ে সচেতন, তাহারা চেষ্টা করিতেছে, কিসে এই সব মৃতের বা মৃত-কল্পের মধ্যে চেতনার সাড়া আনিতে পারা যায়। এই বোধনের সাধনায় সদাজাগ্রত মন্ত্র-জাপকরূপেই প্রধানতঃ রবিকে মনে হয়। রবি 'কঙ্কাল-মঙ্গল'-এর মন্ত্র-পাঠ করিয়া মৃতের মধ্যে চেতনা-সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছে ; সে মৃত্যুঞ্জয় মহাকালকে আহ্বান করিয়া আকুল ভাবে

প্রাণ-সঞ্জীবক বর চাহিয়াছে। তাহার প্রার্থনা ও তাহার মন্ত্রপাঠ কেবল কবিতায় ও গদ্যকাব্যে ঝঙ্কৃত হয় নাই—তাহার জীবনের সার্থক উদ্যমশীলতায়, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ও মানবের সেবাময় কার্য্যকারিতায়ও তাহার সাধনা প্রতিফলিত। তাহার বক্ষোমধ্যে যে তীব্র জ্বালা যে গভীর অনুভূতি অহরহঃ প্রদীপ্ত হইয়া থাকিত, তাহার চোখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ও তাহার কণ্ঠের সিংহগর্জ্জনে তাহা প্রতিফলিত হইত।

কবি ও সুলেখক রবিকে আমরা এই আত্মভোলা, পাগ্‌লা রবি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারি না। দরিদ্র ও নিপীড়িতের ব্যথা তাহার ন্যায় গভীর ভাবে কয়জন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে? সে যে শহরে ও গ্রামে হাটে বাটে মাঠে ঘুরিয়া সব দেখিত, তাহার কাছে দরিদ্রের ক্রন্দন, আরাম-কেদারায় শুইয়া ভাববিলাস ছিল না। "থার্ড ক্লাস" বইয়ের গল্পগুলিতে তাহার এই প্রাণের পরিচয় আমরা পাই। তাহার চোখ ছিল, প্রাণ ও দরদ ছিল, সত্য জিনিস তাহাকে এড়াইয়া যাইতে পারে নাই, আর যাহা সে দেখিয়াছে ও স্বয়ং প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছে তাহা অপরকেও দেখাইবার ও অনুভব করাইবার শক্তিও তাহার ছিল অসাধারণ।

রবির চরিত্রের একটা বড় দিক ছিল, তাহার অপূর্ব্ব চিত্ত-প্রসন্নতা ও তদানুষঙ্গিক রস-বোধ। সে প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারিত, এবং অপরকেও হাসাইতে পারিত। মানুষের দৌর্ব্বল্যকে সে হাসির আলোকেও যেন উদ্ভাসিত করিয়া দিত, সেই আলোক-পাতে মানব-দৌর্ব্বল্যের বৈসদৃশ্য আমাদের চোখের সাম্‌নে পড়িত, কিন্তু দুর্ব্বল চরিত্রের জন্য ঘৃণার উদ্রেক করিত না, অনুকম্পার ভাব আনিত। 'হরিকুমার'-চরিত্রের সহিত পরিচয়ে আমরা ইহা দেখিতে পাই। তাহার আঁকা মানুষের নীচতা, অজ্ঞতা, মূঢ়তা, বর্ব্বরতা দেখিয়া

আমাদের লজ্জা হয়, ঘৃণাও হয়; কিন্তু ঊর্দ্ধ হইতে অবলোকন করিবার শক্তি তাহার ছিল, তাই তাহার লেখায় উপস্থিত-আলোচ্য কোনও অবস্থা সম্বন্ধে হতাশার ভাব আসিলেও, মানব-সম্বন্ধে নৈরাশ্য-বোধ হয় না। তাহার মনের উদ্দাম স্ফূর্ত্তিশক্তি, নৈরাশ্য-বাদের নিকট কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে চাহে নাই। এই যে নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার আলোক দেখিতে সমর্থ হওয়া এবং অপরকেও দেখাইবার চেষ্টা করা, জাতীয় জীবনে ইহা রবির চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের একটি শ্রেষ্ঠ দান।

আঁধারেতে ভয় করি না, আঁধার আমি বাসি ভালো।
আঁধার দেখ্‌লে মনে পড়ে শ্যামা মা মোর এম্‌নি কালো॥
ভয়ের আকার দেখ্‌লে পরে ডাকি আমার শ্যামা মারে,
আঁধার মাঝে দেখ্‌তে যে পাই মায়ের রাঙা পায়ের আলো॥

বহুদিন রবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, অন্তরঙ্গ ভাবে আলাপ ঘটিয়াছে। যখনই সে আসিয়াছে, তাহার সহিত আলাপে আমি নূতন শক্তি লাভ করিয়াছি, নূতন আশা-বন্ধে আমার মনকে বাঁধিয়াছি। সে ছিল যেন শক্তির, উৎসাহের এবং কর্ম্ম-প্রচেষ্টার উৎস। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সে আসিত—এবং সে আসিত তাহার সম্পূর্ণ বিশিষ্টতা লইয়া—তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া কেহ থাকিতেই পারিত না।

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ কেশ, চার পাঁচ দিন দাড়ীগোঁফ কামায় নাই, খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিহিত, পায়ে সামান্য চাপ্‌লি-জুতা, বগলে এক গাদা কাগজ—কিন্তু তাহার বড় বড় চোখ দুটিতে অপার্থিব ঔজ্জ্বল্য; খুব ভদ্র ও কেতা-দুরস্ত সমাজে অনেক সময়ে সে দেখা দিত যেন একটা মূর্ত্তিমান বিরোধ; নিজেরা সুখে ও আরামে

আছে বলিয়া, দেশের মধ্যে হিন্দুজাতি ও সমাজের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভদ্র শ্রেণীতে যে অপরিসীম ব্যর্থতা ও পঙ্গুতা, মৃত্যুবিভীষিকা এবং হৃদয়হীনতা বিদ্যমান, তাহা যাহারা জানে না এবং জানিতে চাহে না, রবি তাহাদের মধ্যে যেন দুর্ব্বাসার মত উপস্থিত হইত।

আমার প্রতি রবি একটু শ্রদ্ধা পোষণ করিত, রবির মত সোদর-কল্প ছাত্রের শ্রদ্ধা আমার নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাকে বিশেষ পীড়িত করিত। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তাহার নানা চেষ্টার খবর সে আমায় দিত, আমার পরামর্শও চাহিত। রঙ্গপুর অঞ্চলের ওরাওঁদের জন্য মন্দির করিতে হইবে, তাহার টাকার যোগাড় চাই। কোনও সহৃদয় মহোদয়ের নিকট গতমাত্রেই তিনি দুইশত টাকা দিলেন, আরও টাকা পঞ্চাশেক যোগাড় হইল। প্রথম দফায় আটশত টাকা দরকার। রবি উৎসাহে কাজে নামিয়া পড়িল। শেষে টাকার টানাটানি। একদিন রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা—উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিল, "স্যার, আমার একখানা গল্পের বইয়ের কপিরাইট সমেত পাণ্ডুলিপি বিক্রী ক'রে এক শ' টাকা পেলাম, সেটা আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এই ভাবে সে কাজ করিত। বাঙ্গালার চিরন্তন কলঙ্ক, পল্লী-অঞ্চলে নারীধর্ষণ, এবং সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অবিচার ও নির্য্যাতন, তাহার চোখ দিয়া যেন রক্তের অশ্রু বাহির করিত। রঙ্গপুরে বিস্তর ওরাওঁ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু তাহাকে পিতার মত শ্রদ্ধাভক্তি করিত; সে সকলের স্পৃষ্ট জল ও খাদ্য খাইত, কিন্তু নিজে ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠায় থাকিত। কতকগুলি দুঃস্থ ছাত্র ও যুবককে স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রার পথে সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে সারা শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। বেলেঘাটায় পশ্চিমা মুচিদের বাড়ীতে গিয়া সে কাজ করিত—তাহাদের আর্থিক উন্নতির জন্য পরামর্শ দিত,

তাহাদের মধ্যে সে কেবল প্রেম ও কর্ম্মশীলতা দ্বারা একটু স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছিল ;—এইসব শ্রেণীর লোকদের কাছে পড়িবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমার নিকট হইতে বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত বাঙ্গালা অক্ষরে তুলসীদাসের মূল রামায়ণ পাইয়া তাহার কি আনন্দ! আমার সে বই সংগ্রহ করা সার্থক হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে রবির দান অল্প হইলেও তুচ্ছ নহে। তাহার "থার্ড্ ক্লাস" বইয়ের দুইটি গল্প ও তাহার দুইটি কবিতা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করি—গল্প দুইটি 'মডার্ণ-রিভিউ'তে প্রকাশিত হয়। পরে তাহার গল্পের হিন্দি অনুবাদও বাহির হয়। তাহার কবিতা ভাববিলাসীর সুখালস জীবনে যেন কশাঘাত করিয়া কার্য্যে আহ্বান করে। "দিবাকরী"র গল্প ও কবিতাগুলি কৌতুক-রচনা হিসাবে অপূর্ব্ব। "মোছলমানী বাঙ্গালা" সে এমনিই আয়ত্ত করিয়াছিল যে এই উপভাষায় লেখা তাহার ব্যঙ্গাত্মক রচনাও মৌলিক লেখা বলিয়া অনেকের ভ্রম হয়। আর নির্ম্মল হাস্যরসের সৃষ্টি "মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল" বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যে একটি চির-আনন্দদায়ক বস্তু হইয়া থাকিবে।

আমাদের রবি আর নাই—একথা যেন ভাবিতেও পারা যাইতেছে না। সে যে অফুরন্ত জীবনীশক্তিতে ভরপূর ছিল। অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহার সেই চিরপ্রিয় হাস্যময় মুখ এখন স্মরণে আসিতেছে—তাহার বৈশিষ্ট্যময় নিজস্ব কণ্ঠস্বর, কখনও সঙ্গত ক্রোধে তীব্র, কখনও ক্ষোভ-ময় আবেগে কম্পিত, কখনও বা অনুযোগ বা অনুকম্পায় কোমল। এখন স্মরণে আসিতেছে তাহার সরল শিশুপম হাসি ; এবং স্বল্প সাফল্যে বা সাফল্যের আভাসে তাহার বিপুল আনন্দ। সব চেয়ে বেশী করিয়া এখন মনে কষ্ট দিতেছে—সে তাহার আরব্ধ কর্ম্মের কিছুই

সাজ করিতে পারিল না। অনেক বড় বড় কল্পনা তাহার মাথায় খেলিত, অনেক কাজে সে হাত দিয়াছিল এবং দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সমস্তই রহিয়া গেল might have been-এর পর্য্যায়ে; এবং তাহার তিরোধানে কর্ম্মিবিরল বাঙ্গালার একটি বড় কর্ম্মীর অনপনেয় অভাব ঘটিল।

তাহার অনাবিল স্নেহ পাইয়া তাহার বন্ধুরা ধন্য হইয়াছিল—তাহার বন্ধুদের জীবনের অনেকখানি সে শূন্য করিয়া দিয়া গেল। কিন্তু আমাদের শোক আরও দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে, যখন আমরা বধূমাতার কথা মনে করি, এবং রবির পিতৃহীন পুত্রকন্যাদের কথা চিন্তা করি। অবস্থা আমরা সকলেই বুঝি। অসহায় আমরা, আমাদের একমাত্র আকুল নিবেদন ভগবানের শ্রীচরণে গিয়া পড়ে—প্রভু, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

চিঠি

[শ্রীগোপাললাল হালদার]

Buxa Fort
P. O. Baksa Duar
7. 3. 33.

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

দিন সাত পূর্ব্বে আপনার চিঠি পাইয়াছি তারও দিন দুই পূর্ব্বে সাপ্তাহিক "সঞ্জীবনী"র মারফৎ একটি ছোট্ট শোকসংবাদ পাঠ করিয়াছিলাম—'সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ মৈত্র পরলোক গমন করিয়াছেন।' সংশয়ের কোথাও অবকাশ ছিল না, কিন্তু আপনার চিঠিতে যে অহেতুক দুরাশাটুকু পোষণ করিতেছিলাম তাহাও নিবাইয়া দিল।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রথম তাহার নামের আড়ালে ও লেখার দৌত্যেই আরম্ভ হইয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা—অনেক দিনই বা কি? রবি ত অনেক দিনের মুখই দেখিতে পাইল না। তবু আজ ভাল করিয়া মনেই করিতে পারিতেছি না কবে সে আমার পরিচিত হইয়া গেল। খুব সম্ভব সে ১৯২৩—২৪ এরূপ কোনো একটা বছর হইবে। তখনো 'শনিবারের চিঠি'র মাসিক আকৃতি দেখা দেয় নাই। সাপ্তাহিক 'চিঠি' তখনই একটি Enfant terrible; এবং সেই সময়ে তাহার পত্রে মুসলমানী বাঙলা সাহিত্যের এমন সব ব্যঙ্গানুকরণ বাহির হয় যাহাতে 'চিঠি'র সহিত নিঃসম্পর্কিত, ব্যঙ্গবিমুখ আমার মত অসাহিত্যিকরাও একটু চমৎকৃত হয়। আমি আবাল্য পূর্ব্ব-বাঙলার সঙ্গে সুপরিচিত। মুসলমানী সাহিত্যের অনুকরণে লিখিত সেই সব কবিতা, 'কেচ্ছা' ও প্রবন্ধ পাঠে আমার মনে হইয়াছিল যে লেখক নিশ্চয়ই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। এমন কি প্রথম দিকটায় এরূপও সন্দেহ হইয়াছিল যে 'চিঠি'র কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত অকস্মাৎ বাঙলা ভাষার ঘনায়মান বিপদটির সন্ধান পাইয়া কোনো কোনো প্রচলিত 'মুসলমানী' শিক্ষাবিষয়ক পাঠ্য পুস্তকাদি হইতে ওই সব কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প চয়ন করিয়া দিয়াছেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত এ বিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার কোনো কারণ দেখি নাই—লেখা এমনি খাঁটি 'মুসলমানো' ঠেকিয়াছিল 'ফজরে উঠিয়া শিশু পড়হ নেমাজ' ইত্যাদি এমনি মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের চলতি পাঠ্য পুস্তকের মত, গল্প ও প্রবন্ধ এমনি নির্জ্জলা 'মুসলমানী'। কিছু দিন পরে অবশ্যই এ ভুল ভাঙিয়া যায়—লেখকের ব্যঙ্গের খোঁচা মনে আসিয়া বিঁধে। কিন্তু তখনই এই কথাটিও সুস্পষ্ট হয় যে, উহার লেখক শুধু লেখক নহেন, তাঁহার কলমেই যে শুধু তীক্ষ্ণতা আছে তাহা নয়, তাঁহার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা

আরও মারাত্মক। তাঁহার মন কঠিনরূপে বস্তুনিষ্ঠ—true to the real. মনে রাখিতে হইবে, তখনো কলিকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সুরু হয় নাই এবং বাঙলার শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে তাহার রক্তের ছোপ গিয়া লাগে নাই। পশ্চিম-বাঙলার সাহিত্য-সেবী ও শিক্ষা-বিলাসীরা তখনো 'মুসলমানী বাঙলা সাহিত্য' বলিয়া কোনো বস্তুর অস্তিত্বই জানেন না, জানিবার ইচ্ছাও রাখেন না; পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙলা জুড়িয়া যে উগ্র মনোবৃত্তি নিজের শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে, উহার উচ্ছেদ বা নিরোধ সম্বন্ধে তাঁহারা কোনো কালেই কোনো দায়িত্ব বোধ করেন নাই, তখন পর্য্যন্তও তাঁহারা ও-সম্পর্কে সচেতনও হন নাই। এমনি সময়ে 'চিঠি'র ক্ষুদ্র পত্রের মারফতে মুসলমানী বাঙলা সাহিত্যের নিদর্শন উপস্থিত করিলেন তাঁহাদের দরবারে এক নাম-না-জানা লেখক। যাঁহারা বাঙলা দেশকে হিন্দু বা মুসলমানের কাহারো একার সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন না, 'বাঙলা সাহিত্যের'ও তেমনি 'বাঙলাত্ব' বা 'সাহিত্যত্ব' ঘুচানো সহ্য করিতে চাহেন না, তাঁহারা নিশ্চয়ই চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। হয়ত বাঙাল বলিয়া আমার পক্ষে চমকানো ছিল আরও স্বাভাবিক—কারণ তখনই উপলব্ধি করিতেছিলাম যে বাঙাল-দেশের মুসলমান প্রাধান্য যে ভ্রাতৃবিরোধী ও মাতৃ-বিরোধী [স্বভাষার স্বভাব ভাঙা ও স্বদেশের স্বকীয়তা অস্বীকারকে কি মাতৃবিরোধ বলা চলে না?] অদ্ভুত ও অত্যুগ্র মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিতেছে সমস্ত বাঙলার—[অথবা তাহার যাহারা নেতৃত্ব করিয়াছেন, ভাবে ও ভাষায়—সেই গঙ্গামাতৃক বাঙালীদের] পক্ষে কি তাহাকে শোধন করা, উচ্ছেদ করা বা প্রতিহত করা সম্ভব হইবে? এই আশঙ্কা যে 'ফোবিয়া' নয় তাহা আজ ত সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু সেই দিন এই আশঙ্কা ছিল হাস্যকর ও

alarmist. তবু সেই হাস্যকর ও alarmist মনোভাব হইতে যাঁহারা বিমুক্ত ছিলেন তাঁহারাও সে দিন 'শনিবারের চিঠি'র ওই ব্যঙ্গ সাহিত্যের নিদর্শনগুলি পড়িয়া লেখকের সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তখনো লেখকের ছদ্মনামের মেঘাবরণ খসিয়া পড়ে নাই। কিন্তু অনতিবিলম্বে আমার কাছে তাহা স্বচ্ছ হইয়া গেল—'রবীন্দ্র মৈত্র' নামীয় একজন অপরিচিত শক্তিধর তাঁহার অতি কঠিন সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টি লইয়া আমার পরিচিত জগতে সেদিন আবির্ভূত হইলেন। বন্ধুগোষ্ঠী হইতে দূরে রবি কি করিতেছেন,—কোন সাঁওতাল পল্লিতে ঘুরিতেছেন, কোনখানকার বাউল সমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাইতেছেন, কোন পরিত্যক্ত বা নিপীড়িত নরনারীকে আশ্রয় দিয়া সমাজের সঙ্গে লড়াই বাধাইয়াছেন, সম্প্রদায়-বিশেষের বৈরিতা উৎপাদন করিতেছেন বা বিশেষ রাষ্ট্রীয় দলের অবজ্ঞা ও বিরোধিতার পাত্র হইতেছেন—এই সমস্তই মাঝে মাঝে কানে আসিতে লাগিল—আর চোখে পড়িতে লাগিল সাময়িক পত্রের পাতায় তাঁহার গল্প ও তাঁহার কবিতা। যে-রবির কথা শুনিতেছিলাম পড়িয়াও সেই রবিকেই দেখিতাম—কর্ম্মী রবি ও সাহিত্যিক রবি যে এক ও অভিন্ন তাহা বুঝিতে দেরী হইত না। বোধ হয় 'থার্ড ক্লাশ' গল্পটি ও 'গিরিবালার আত্মকথা' প্রভৃতি গল্পগুলি মনে তাঁহার সেই মূর্ত্তিটি সুস্পষ্টতর করিয়া তুলিতেছিল। এমনি সময়ে বাঙলা সাহিত্যে মাসিকপত্ররূপে 'শনিবারের চিঠি' দ্বিতীয়বার উদিত হইল—এবং সেই 'সাহিত্য ধর্ম্মের' প্রাকযুগে, সমযুগে ও পরযুগে ওই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্যনিষ্ঠ রবির ব্যঙ্গ আমাদের আবার প্রধান অস্ত্র হইয়া উঠিল। 'ঝড়ের রাতে' ও 'বাস্তবিকা' পর্য্যায় যখন মাসে মাসে বাহির হইল তখনকার কথা ভুলিব না—সেই সব লেখা যখন ডাকে পৌঁছাইত

তখনকার আশা উৎসাহও বলিয়া শেষ করা যায় না। মোড়কের উপর রবির হস্তাক্ষর দেখিয়াই নীরদবাবু ও সজনী নাচিয়া উঠিতেন। মোড়ক হাতে লইতে নীরদবাবুর শীর্ণ দেহে নানা রেখার নানা ভঙ্গী দেখা দিত—অফিসের বড় ঘর হইতে তিনি ছুটিয়া সজনীর নিকট উপস্থিত হইতেন। চেয়ারের ওপর সজনীর বিশাল বপু চঞ্চল হইয়া উঠিত ও প্রকাণ্ড বদনে নূতন ঔজ্জ্বল্য দেখা দিত। সবাই ঝাঁকিয়া বসিত—পরশুর উপরে অচিরে চা জোগাইবার হুকুমটুকু দেওয়ামাত্র অবসর—তারপর স্থরু হইত পড়া। কোন্ গাঁ হইতে রবি পাঠাইয়াছে—হস্তাক্ষর তাহার ছিল স্থন্দর ও বড় বড়—কিন্তু সে গাঁয়ের লেখাপড়ার প্রতি যে লোভ নাই তাহা রবির কাগজে ও কালিতে বেশ প্রমাণিত হইত। তবু উৎসাহের অভাব ঘটিত না—মোহিতবাবু উপস্থিত থাকিলে ত কথাই নাই। তাঁহার স্থূলদেহ কৌতূহলে স্থির হইয়া থাকিত,—কুণ্ডলীকৃত সিগারেটের ধোঁয়া উপরে উঠিতে থাকিত আর চোখের দৃষ্টি ও ঠোঁটের হাসি একটি স্বচ্ছ ও সরস আনন্দে স্থন্দর হইয়া উঠিত। কিন্তু লেখা পড়িতেন নীরদবাবু—উহা তাঁহার হাত হইতে আর কাহারো হাতে যাইবার উপায় ছিল না। নীরদবাবুর চশমা তখন ভাঙিয়া গিয়াছে, নূতন গড়াইবার ফুরস্থৎ নাই, চোখে দেখেন খুব কম, আবার দেখিতেও কষ্ট হয়। তবু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। 'দিবাকরের' লেখা অন্যে পড়িতে পাইবে না। পড়া তাঁহার স্থন্দর, পরিষ্কার উচ্চারণ, নির্ভুল যতিদান, অনিন্দনীয় তাঁর স্থর intonation. রবির লেখা যেন ছন্দে ছন্দে, তালে তালে, লাফাইয়া উঠিত, হেলিয়া দুলিয়া বঙ্কিম-স্থতীক্ষ্ণ হাস্তে ফাটিয়া পড়িত। কাহারো চা যাইত জুড়াইয়া আর কাহারো সিগারেট হাতে পুড়িয়া শেষ হইত—হাসিতে উৎসাহে নীচেকার ও উপরকার কম্পোজিটারদের চমক

ছাত্র রবীন্দ্রনাথ

লাগিত, আপিসের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের [এই সব হাসি বাং-সওয়া হইলেও] দুই একবার আপত্তি না জানাইয়া উপায় থাকিত না। আজও মনে পড়ে 'ঝড়ের রাতে' যখন প্রথম পৌছাইল তখনকার কথা। তরুণ সাহিত্যের কথাবস্তুর ঢং-বাঁধা প্লট ও ঢং-বাঁধা লিপি-ভঙ্গি বোধ হয় এই গল্পটির ব্যঙ্গে originalদের সকল নিদর্শনকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। ব্যঙ্গের দিক হইতেও ওটি উৎকৃষ্ট, একেবারে নিখুঁত। 'ঝড়ের রাতে'র সেই 'নাচুনি-ঢং'এর লেখা নীরদবাবু কতবার পড়িলেন। এক একজন বন্ধু আসিতেছেন, আবার পড়া আরম্ভ হইতেছে—আবার সেই হাসি, সেই সরস বিস্ফুরিত উৎসাহ, সবে পড়া শেষ হইয়াছে, আবার কে আসিল—অশোকবাবু, পড়ো, আবার পড়ো—সেই হাসির স্বতঃ উচ্ছ্বসিত উৎস ঠমকে ঠমকে ছাপাইয়া উঠিল। নূতন কে আসিল—হয়ত আপনি? আবার স্বরু হইল পড়া। উৎসাহ নিবে না, হাসি দমে না। মোহিতবাবু হয়ত আসিয়া উপস্থিত প্রায় বিকালে—'শুনুন্', 'শুনুন্'।—পড়িয়া আর শেষ হয় না, বিষয় পুরানো হয় না, হাসি পরাস্ত হয় না—প্রত্যেকবারেই যেন প্রথম বারের পড়া। চশমা-শূন্য চোখ বার বার মুছিতে হয়—তবু নীরদবাবুর শ্রান্তি নাই, উৎসাহ নিবে না। সেই 'দুঃখী পলক'! নির্ব্বোধের sentimentalism যেন এক একটি প্যারার শেষেকার ওই এক একটি 'দরদ'ভরা টানে একেবারে হাসির রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছিল। তারপর শেষদিকে—যেখানে denoument—সেখানে ব্যঙ্গ তুবড়ির মত ফাটিয়া পড়ে। "ঝড়ের রাতে কেই বা কার বোন, বন্ধু ইত্যাদি" (শেষের কথাগুলি আমার ঠিক মনে পড়ে না)—পড়িয়া যেন তখনকার তরুণ-ism হাস্যকর idiocyকে যেন প্রত্যক্ষ করিতে পারা যাইত। এইরূপেই পরেকার গল্প ও 'বাস্তবিক' পর্য্যায় পড়া হইয়াছিল—তখনো রবি

'শনিমণ্ডলের' অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া থাকিতে পারিতেছে না, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কোথা হইতে কোথা যাইবার পথে রবি দিন দুইএর জন্য দেখা দিল একেবারে মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে—যেখানে তাঁহার লেখা লইয়া এত হাসি ফুটে, এত আমোদ জুটে—সেই 'চিঠি'র পীঠস্থলে।—আমার সঙ্গে রবির তখন সাক্ষাৎ পরিচয় হইল—এই প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়।

পরিচয়ে দেখিলাম—কর্ম্মী রবি মৈত্রও নাই, সাহিত্যিক রবি মৈত্রও নাই—আছে মাত্র মানুষ রবি। সেই মানুষটিকে চিনিতে দেরী হয় না—ছোট নাতিস্থূল রবিকে আপনি ত খুবই দেখিয়াছেন। দেখিতে সে সুশ্রীও ছিল না—সুকুমারও ছিল না; অতিরিক্ত শোভনতার প্রয়াসও তাহার বেশভূষায় পরিলক্ষিত হইত না। তাঁহার আচরণেও কোথাও নবযুগের 'মিহি গলার ও চিবিয়ে কথা বলার' ভদ্রতা দেখা যাইত না—তাহা বড় বেশি রকমের স্পষ্ট ছিল। সুললিত বেশভূষা ও বাক-বিন্যাস ছিল রবির ধাতের বিরোধী। মাথার বড় বড় চুল তখনো প্রশস্ত ললাটের উপরের দিকে অবিন্যস্তই পড়িয়া থাকিত, পানেরঙা দাঁত ঠোঁট কথা বলার সময় বেশ দেখা যাইত—style করিয়া অস্পষ্ট উচ্চারণ রবি কখনো করে নাই। বরং তাঁহার কথা অনেক সময় কঠিন, স্থূল হইয়া দেখা দিত—কখনো কখনো বলিতে বলিতে মুক্তকণ্ঠ উচ্চ হইতে উচ্চতর কণ্ঠে পৌছাইত, তাঁহার মুখের মাংস-পেশী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইত, চোখ একটু বেশি করিয়াই জ্বলিয়া উঠিত, এবং মোটা [ঈষৎ মলিন—'meeting-কাপড়া' নয়] খদ্দরের চাদরের বাধা ঠেলিয়া হাত ভঙ্গিতে আন্দোলিত হইত—রবি ভুলিয়া যাইত, সে সাহিত্যিক, সাহিত্যিক সমাজে আসিয়াছে—ভুলিয়া যাইত, 'মাজা কথা ও মাপা হাসি' সেই জগতের

সামাজিকতার মাপকাঠি। অবশ্য রবির মূর্ত্তি দেখা দিত তখনই যখনই মানুষের কথা উঠিত, দেশের অবস্থার কথা উঠিত, গাঁয়ে গাঁয়ে যে সব কঠিন সামাজিক ও অমানুষিক নিপীড়ন সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই সবের কথা সে বলিত। সে বাস্তবকে প্রতিনিয়ত দেখিয়াছে—ওটা তাহাকে গর্কি হ্যামসুন প্রভৃতির পাতা হইতে সংগ্রহ করিতে হয় নাই। 'ভুখা ভগবানরা' কে ও কিরূপ তাহা তাহার জানা আছে, তাহাকে উহাদের পরিচয় পরদেশী সাহিত্য পড়িয়া লইতে হয় নাই। ইহাদের দুঃখ তাহার সর্ব্বাংশে নিজস্ব হইয়াছিল, সে উহাদের সহিত প্রাণ মিলাইয়া দিয়াছে, উহাদের লাঞ্ছনাকে শুধু আর্টের উপকরণ, প্রাণহীন বিলাসিতার বস্তু বলিয়া মনে করে নাই—তাই উহাদের অযথা libel, উহাদের বিকৃত ও অসম্ভব চিত্র, যা-নাই তাহাকে বাস্তব বলা ও যা-আছে তাহাকে নাই বলিয়া জ্ঞান করা [যেহেতু পরদেশী আর্টে উহাদের দেখি নাই—কাজেই, উহাদের কি করিয়া বাঙলাদেশে পুনর্নির্ম্মাণ করি ?—এই মনোবৃত্তির ফলে]—realities of life:ক অস্বীকার করা ও 'দরিদ্রের ভগবানের' নামে 'সাহিত্য' করা, 'কাব্যি' করা,—রবি সহ্য করিতে পারিত না—সে একটু অসহিষ্ণু হইত।—যে রবি সমাজ পরিত্যক্তা ধর্ষিতাদের রক্ষা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, যে রবি অস্পৃশ্য ভাইদের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছে ও সাঁওতাল-দের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া কলিকাতায় পর্য্যন্ত তাহাদের বন্ধুরূপে আপনার সহিত পরিচিত করিয়া লইয়া আসিত, সে আমাদের 'arty' আর্ট-গন্ধী সাহিত্যিক আবহাওয়া ও সত্যহীন বাস্তবতা—realism that is un-true and unreal—দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবে বই কি!—এই ক্ষোভটুকুই তাঁহার নিজস্বতার ও ঐকান্তিকতার প্রমাণ। ওইটুকু দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, রবি মৈত্র কর্ম্মীও নয়, সাহিত্যিকও নয়,—কর্ম্মীর

ও সাহিত্যিকের অপেক্ষাও বৃহত্তর ও মহত্তর একটি জিনিস—মানুষ রবি। রবি ক্ষ্যাপা, রবি প্রাণখোলা, রবি ভবঘুরের মত পরের বোঝা বহিয়া বেড়াইত—সকলকে টানিয়া আপনার করিয়া লইত,—এ সেই রবি মৈত্র। এ অত্যন্ত বড় কথা যে, রবির কথায়, লেখায়, কাজে কোথাও এই মানুষটি ঢাকা পড়ে নাই, বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। রবি মৈত্র আগাগোড়াই রবি মৈত্র রহিয়াছে—তাহার সমাজ সেবায়, তাহার 'থার্ডক্লাশে' ও 'উদাসীর মাঠে' ও তাহার দিবাকরী 'বাস্তবিকায়'—এমন কি আমাদের মত বন্ধুগোষ্ঠীর সহিত তাহার অল্প কয়টি বছরের সৌহার্দ্দ্য। সর্ব্বত্র সেই একই জিনিস দেখিলাম—শুধু সাহিত্যিকের যে বালাই না থাকাই কাম্য—একটি সহজ, তেজস্বী প্রাণ, এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ ও সর্ব্বব্যাপী সত্যকে [realকে, শুধু realismএর ফ্যাশানকে নহে] অকুণ্ঠিত করে চিত্রণ। 'প্রবাসীতে' তাঁহার 'থার্ডক্লাশ' সমালোচনা করিতে এই কথা আমি বলিয়াছিলাম—'ইহাতে হয়ত realism নাই, কিন্তু reality আছে।' রবি পড়িয়া খুশী হইয়াছিল—লিখিয়াছিল—'আমি লিখিয়াছি, কিন্তু আপনি প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছেন।'—ভুল কথা ;—লেখকের প্রাণ কি উহার ছত্রে ছত্রে দেখা যায় নাই ? [মনে থাকিলে সেই রিভিয়ু আমি তুলিয়া দিতাম ও এই চিঠি শেষ করিতাম এই বলিয়া যে,] আমাদের থার্ডক্লাশের এই যাত্রীদের মধ্যে যে রবি সজীব প্রাণ লইয়া আসিল, সে মাঝপথে নৈশ অন্ধকারে নামিয়া গিয়া এই যাত্রীদের ক্ষীণ আনন্দটুকুও কাড়িয়া লইয়া আজ ইহার রুদ্ধ বায়ুকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

এবারকার চিঠি এখানেই শেষ করি—পরের চিঠিতে ঠিক উত্তর দিব। ইতি *

ভবদীয় স্নেহমুগ্ধ

গোপাল

---

* ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা।

"থার্ডক্লাশের" রবি মৈত্র

[শ্রীবিষ্ণু শর্ম্মা]

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পড়িলাম—'সুবিখ্যাত গল্প লেখক রবীন্দ্র মৈত্রের থার্ডক্লাশ অপূর্ব্ব কয়েকটি গল্পের সমষ্টি, একত্র প্রকাশিত হইল।' বঙ্গদেশের কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকা বইটির প্রশংসা করিয়াছেন তাহাও দেখিলাম, কিন্তু তথাপি বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনমাত্র। তাহা পড়িয়া লেখককে বিচার করা চলে না, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাও হয় না। বহু লোকের প্রশংসাপত্রও বাহির হয়। দোষ-ত্রুটীগুলি তারকা চিহ্নিত করিয়া অর্থাৎ বেমালুম চাপিয়া গিয়া প্রশংসাপত্র জোড়া-লাগানো অনেকের রচনা পড়িতে গিয়া হতাশও হইয়াছি, এও সেইরূপই একটা কিছু হইবে বা। অতএব রবীন্দ্র মৈত্রের থার্ডক্লাশ ঠিক থার্ডক্লাশের মতই অনাদৃত ভাবে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

সহসা মডার্ণ রিভিয়ু পড়িতে পড়িতে শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনূদিত একটি অপূর্ব্ব গল্প পড়িলাম—His Excellency's Special—মূল লেখক রবীন্দ্র মৈত্র। গল্প পড়িয়া শুধু মুগ্ধ হইলাম না, বিস্মিত হইলাম এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পর অনবদ্য ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে যে অতি অল্প দুই চারিজন প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী নাম করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এই লেখকটি যে অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু রহিল না।

তৎক্ষণাৎ লাইব্রেরী হইতে একখানি 'থার্ডক্লাশ' আনিয়া সমস্ত গল্পগুলি এক রাত্রির মধ্যে পড়িয়া ফেলিলাম। অতি তুচ্ছ লোকেদের

সুখ-দুঃখের কাহিনী, ব্যথা-বেদনার ইতিহাস! যাহাদের কথা কেহ ভাবে না, যাহাদের আর্ত্তনাদ কোলাহলের মধ্যে চাপা পড়িয়া যায়, যাহাদের অরুন্তুদ যাতনা নিঃশব্দে অন্তরের মধ্যে শেষ হইয়া যায় তাহারাই সকলে আসিয়া থার্ডক্লাশের মধ্যেই ভীড় করিয়া বসিয়াছে। ব্যর্থজীবনের অশ্রুবন্যায় লেখক নিজে ভাসিয়াছেন পাঠককেও সেই বন্যার স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। শ্রদ্ধা হইল শুধু লেখার প্রতি নহে—লেখকেরও প্রতি।

শনিবারের চিঠি পড়ি। "দিবাকর শর্ম্মার" নামটাও অজানা নহে। শ্লেষের অসাধারণ শক্তি দিবাকরের রচনার ছত্রে ছত্রে। যেখানে ন্যাকামী, ভণ্ডামী, চালাকী ও মিথ্যাচারিতার রাজত্ব তাহারই উপর দিবাকরের তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত নির্ম্মমভাবে মাসের পর মাস সপাসপ্ পড়িতেছে। এই নির্ভীক সত্যাশ্রয়ী পুরুষই যে রবীন্দ্র মৈত্র তাহা তখনও কল্পনা করিতে পারি নাই।

মানুষের লেখা পড়িয়া অনেক সময় লেখকের স্বরূপ পাঠক যেভাবে কল্পনা করেন প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর হয়তো সে ধারণা সম্পূর্ণ ওলট্ পালট্ হইয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্র মৈত্র সম্বন্ধে মনে মনে যে ধারণা করিয়াছিলাম পরিচয়ের পরেও সে ধারণা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

শনিবারের চিঠির অফিসে সুপ্রসিদ্ধ লেখক ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি নাটক পড়া হইতেছে, বঙ্গদেশের কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক সেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। পড়া চলিতেছে এমন সময় রবীন্দ্র মৈত্র ঘরে প্রবেশ করিলেন। নাটকটি আমিই পড়িতেছিলাম হঠাৎ একজন বাহিরের লোককে সেখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিলাম। তিনি যে রবীন্দ্রবাবু তাহা তখনও জানি না, সজনীবাবু আমার সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন।

রবীন্দ্রবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি অনেক দিন সজনীকে ব'লেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে, কিন্তু কোন সময়েই সুযোগ হয় না। "ত্রিলোচন কবিরাজ" আপনি বেতারে প'ড়েছিলেন কিন্তু ধন্যবাদ দেওয়ার সুযোগ পাই নি। আর একবার আমাকে প'ড়ে শোনাতে হবে কিন্তু * * * নিন্ যা প'ড়ছেন, পড়ুন।" রবীন্দ্র বাবুর মিষ্ট কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। এই নিরহঙ্কার মানুষটি একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রথম সম্ভাষণেই যে এরূপ আপন করিয়া লইতে পারেন, এমন কি তাহার প্রতি দাবী জানাইতেও দ্বিধাবোধ করেন না দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তাহার পর হইতে ঘনিষ্ঠ ভাবে এই মানুষটির সহিত মিশিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। বার বার তাঁহার বিরাট প্রাণের পরিচয় পাইয়াছিলাম বলিয়াই আজ তাঁহার বিয়োগে সত্যকারের ব্যথা বুকে বাজিতেছে। তাঁহার লেখার চেয়ে তাঁহার অন্তর যে কত বড় ছিল তাহা জানিবার সুযোগ কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের হইয়াছে মাত্র, বাহিরের সকল লোকে জানিতে পারিল না বলিয়া আজ আমাদের দুঃখের অন্ত নাই।

সাহিত্যিকদের সান্ধ্য মজলিসে তাঁহার হাস্যবিমণ্ডিত মুখ, তাঁহার সেই আড়ম্বরশূন্য খদ্দরের পোষাক ও চাদর, শিশুর মত সারল্য; দীপ্ত চক্ষু কখনও ভুলিতে পারিব না। মাথায় পাতলা চুলগুলি অবিন্যস্ত ভাবে হাওয়ায় উড়িতেছে, চিরুণি দিবার সময় বা ইচ্ছা বোধ হয় জীবনে কখনও হয় নাই। প্রত্যেক কথা বলিবার ভঙ্গীতে দৃঢ়তা ও সতেজতা অনুলিপ্ত। ব্যক্তিত্বের সহিত মাধুর্যের এমন সমন্বয় খুব অল্প লোকের চরিত্রেই দেখিয়াছি।

ষ্টারে, "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" অভিনীত হইল। রবীন্দ্রনাথের

উৎসাহের প্রাবল্যে আমরা অস্থির হইয়া উঠিলাম। বালকের মত তাঁহার চাঞ্চল্য। তাঁহার নাটকের পাত্রপাত্রীগণের প্রতি তাঁহার যেমন দরদ অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রতিও ঠিক তেমনি সহানুভূতি। অভিনেত্রীরা কেন ভালভাবে জীবন যাপন করে না, তাহাদের জীবন কেন ব্যর্থ হইয়া যায় এই লইয়া তিনি আলোচনা করিতে বসিলেন।

একদিন দুইজনে একত্রে থিয়েটার দেখিতে গেলাম। দর্শকরা তাঁহার নাটককে সুচক্ষে দেখিতেছেন কি না তাহা জানিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। আমাকে সারাক্ষণ এক টাকা হইতে পাঁচ টাকার সিটে আসন বদলাইতে হইল। অবশেষে আমি বলিলাম, "মশাই, আপনার নাটকের একটি নিন্দুকও খুঁজে পেলাম না, নিন্দে করলে কি আর আপনি এখানে দাঁড়াতে পারতেন? এখুনি পালাতে হ'ত!" তবু কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছে কি না * * * ঠিক শিশুর মত ভয়!

রবীন্দ্র মৈত্রের এ ভয় কাপুরুষতার লক্ষণ নহে, যাঁহাদের জন্য তাঁহার নাটক রচনা তাঁহারা খুসী হইয়াছেন কি না ইহা জানিবার তীব্র ইচ্ছাই তাঁহাকে সকল সময়ে চঞ্চল করিয়া তুলিত।

'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' তাঁহার প্রথম ও শেষ নাট্য অবদান। সর্ব্বসাধারণের নিকট এই কৌতুক নাট্য অত্যন্ত সমাদৃত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের মনে আরও কয়েকটা ভাল নাটক লিখিবার বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠিল। ইদানিং প্রায়ই তিনি বলিতেন, "ওঃ এবার একটি চমৎকার নাটকের প্লট মাথায় এসেছে, এক মাসের মধ্যে আমি সবটা শেষ ক'রে ফেলবো।"—নিজের শেষ দিন যে অদূরে সমাগত তাহা পূর্ব্বে বুঝিবার শক্তি থাকিলে হয়তো আর একখানি চমৎকার নাটক তিনি আমাদের দান করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর

বিধানে সকল কল্পনা, সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা অপরিপূর্ণ রাখিয়াই তাঁহাকে অকালে মহাপ্রস্থান করিতে হইল। কে জানিত যে অমন সবল সুস্থকায় শক্তিমান যুবক মাত্র আমাদের একটি দিনের অদর্শনে চির-বিলুপ্ত হইয়া যাইবেন। তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে অতি অল্পদিন মিশিয়াছিলাম কিন্তু সর্ব্বদাই মনে হইত যেন কত দিনের পরিচয়। দুই চারি দিন দেখা না হইলেই তাঁহার অনুযোগের অন্ত থাকিত না। আজ এই প্রিয়তম বন্ধুকে হারাইয়া সত্যই মর্ম্মাহত হইয়াছি।

আমাদের সাহিত্যবৈঠক এখনও বসে বরং পূর্ব্বেকার চেয়ে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকে হাসে, গল্প করে, উচ্চ কোলাহলে আসর সরগরম করিতে চেষ্টা করে কিন্তু কোথায় এমন একটা শূন্যতা থাকিয়া যায় যাহা সহস্র আলোচনাতে গল্প-গুজবে, অশ্রান্ত হাসির ধারায় ভরাট করিয়া তোলা যায় না। বন্ধুদের দিক দিয়া দেখিতে হইলে ক্ষতির পরিমাণ গণিতশাস্ত্রের বাহিরে গিয়া পড়ে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের যে কি পরিমাণ এবং কত বড় ক্ষতি হইল তাহা সাহিত্য রসিকগণ বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

চারিত্রিক গৌরবে, হিন্দুত্বের নিষ্ঠাবান্ সাধক হিসাবে, ব্যথিতের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে, সর্ব্বোপরি খাঁটি মানুষ হিসাবে রবীন্দ্র মৈত্রের কাছে দাঁড়াইবার যোগ্যতা খুব অল্প লোকেরই আছে, ইহা ছাড়া তাঁহার যাহা অতিরিক্ত ছিল সেগুলি সমন্বিত হইয়া যে বন্ধু আসিবেন তিনি এখনও আমাদের কল্পনার বাহিরে।

মরণ-চুম্বন

[রবীন্দ্রনাথ মৈত্র]

[৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের বহু অপ্রকাশিত রচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে—এখন হইতে প্রতি মাসে শনিবারের চিঠিতে সেই সব রচনা আমরা ক্রমশ প্রকাশ করিব। প্রথম যে সময়ে রবীন্দ্রবাবু বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া স্বদেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এই গল্পটি তাঁহার সেই ছাত্রজীবনের প্রাথমিক রচনা। রচনা-ভঙ্গী, গল্পের আখ্যানভাগ এবং ভাষার স্বচ্ছতা. এই তিনটি বস্তুর সফল সম্মিলন এই রোমান্টিক গল্পটির বিশেষত্ব।—স. শ. চি.]

গ্রামের লোকে তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। নবাবের ফৌজে সে কাজ করিত বলিয়া সকলে তাহাকে নবাবের নফর আখ্যা দিয়াছিল। বৃদ্ধেরা তাহাকে ছুঁইলে স্নান করিত—বিধবারা প্রাতঃকালে তাহার মুখ দেখিলে হাঁড়ি ফেলিয়া দিতেন। এত লাঞ্ছনা, এত বিদ্রূপ সকলই সে হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে। সে কাহারও বাড়ীতে যাইত না, প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু আজ সে বড় প্রয়োজনেই লক্ষ্মী দাসের বাড়ীতে আসিয়াছে। লক্ষ্মী দাসকে প্রণাম করিবামাত্রই তিনি পা সরাইয়া লইলেন, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দরকার তোমার?" দুলাল নম্র কণ্ঠে উত্তর করিল "কিছু টাকা চাই—"

"টাকা! ও সব আমার এখানে হ'বে না"

দুলালের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল, আজ বড় প্রয়োজন তার। সংসারে তার একমাত্র আত্মীয় মা। বাল্যাবধি সে মা ছাড়া আর কাউকে চিনেনা, কাহারো সহিত তার পরিচয় নাই। পিতা

বহুকাল মৃত। মায়ের স্নেহে, মায়ের আদরেই সে বাড়িয়া উঠিয়াছে, মায়ের ভিক্ষালব্ধ অন্নে তাহার জীবন বাঁচিয়াছে। সেই মা আজ অনাহারে মৃতপ্রায়। অর্থ নাই—বৈদ্যের দর্শনী দিবার সামর্থ্য কোথায়!

দুলাল বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কিছু ভিক্ষা দিন, মায়ের অসুখ, আজ তিন দিন খায়নি।"

লক্ষ্মীদাস ধনী, মানুষের কথায় তাহার বিশ্বাস ছিল না—তিনি পরুষকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"তোমার মা তিন দিন খায়নি তা আমার কি, যাও দূর হ'য়ে যাও আমার বাড়ী থেকে, নবাবের গোলাম!"

নবাবের গোলাম, তা ঠিক! কিন্তু কেন সে নবাবের দাসত্ব করিয়াছে! উদরের জন্য নয় কি? যখন সে গ্রামের প্রতিগৃহদ্বারে অন্ন মুষ্টির জন্য ক্ষুধিত কুকুরের মত লালায়িত হইয়া ঘুরিয়াছে তখন কেহতো তাহাকে একমুষ্টি অন্ন দেয়নি, তাহার স্নেহময়ী জননীর চরিত্রে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া গ্রামবাসী তাহাকে উপহাস করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। যেন সে কত হীন! এক মুহূর্ত্তে সকল কথা হতভাগ্য দুলালের মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে, সে উত্তর দিল না। লক্ষ্মীদাসের পার্শ্বোপবিষ্ট বৃদ্ধ গণেশ দাস যখন বলিলেন 'মাকে ফৌজদারের কাছে বাঁধা রাখলেই টাকার যোগাড় হ'তে পারে, দুলাল তখন গ্রামপথে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

(২)

তৈলাভাবে গৃহদীপ নির্ব্বাপিত প্রায়। ঈষদুন্মুক্ত বাতায়নপথে চন্দ্ররশ্মি আসিয়া শয্যায় পড়িয়াছে। সেই ম্লান আলোকে শীর্ণা বৃদ্ধার মূর্ত্তি অতি ভীষণ দেখা যাইতেছিল। শুভ্র কেশরাশি ছিন্ন উপাধানের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; নিঃশ্বাসে বক্ষ কাঁপিতেছে যেন পঞ্জর লোল চর্ম্মের ভিতর দিয়া আপনার মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে প্রয়াস

পাইতেছে। বৃদ্ধা নিদ্রায় অচেতন। দুলাল নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিয়া মায়ের দিকে চাহিল, এই তার মায়ের অবস্থা! অশ্রুতে তাহার চক্ষু ভরিয়া গেল! পুত্র বাঁচিয়া থাকিতে জননী অনাহারে মৃত্যুর কবলে যাইতে বসিয়াছেন। দুলাল আর উঠিতে পারিল না, পালঙ্কে মায়ের পদতলে বসিয়া পড়িল। বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাবা দুলাল? টাকা পেলি?" দুলাল কি উত্তর দিবে! কেমন করিয়া সে জানাইবে সে প্রত্যাখ্যাত হইয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়াছে! তবু বলিতে হইবে! দুলাল কম্পিত-স্বরে কহিল, "না মা পাই নি।" জননীর অপাঙ্গ বহিয়া অশ্রু ঝরিল। মায়ের অশ্রু! দুলালের আর সহ্য হইল না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মা আমি নবাবের গোলামী করি ব'লে কেউ আমাকে টাকা দিলে না, দেখি চুরি করলে টাকা মিলে কি না।" দুলাল উঠিয়া দাঁড়াইল। সহসা ও কি! সোপানে কার পদশব্দ! তাহার বাড়ীতে আজ কে আসে! দ্বার খুলিয়া গেল—কে ও, সাবিত্রী দেবী? লক্ষ্মীদাসের পুত্রবধূ তাহার গৃহে কেন? দুলাল জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাহার পানে চাহিল। সাবিত্রী দেবী কহিলেন, "দুলাল চুরি কর্ব্বে কেন? আমি তোমাকে টাকা ধার দেব!" দুলাল নির্ব্বাক! লক্ষ্মীদাসের পুত্রবধূ তাহাকে টাকা ধার দিবে এ যে স্বপ্নের অগোচর! সাবিত্রী দেবী অঞ্চলপ্রান্ত হইতে টাকা বাহির করিলেন—দুলাল হাত পাতিল। সাবিত্রী দেবী টাকা দিয়া বৃদ্ধার পার্শ্বে বসিলেন, বৃদ্ধা তখন নিদ্রিতা। দুলাল টাকা লইয়া বৈদ্যের গৃহে ছুটিল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিল, আমার গৃহে এত রাত্রে সাবিত্রী দেবী কেন আসিলেন? চারিদিকে লোলুপ ফৌজদারের অসংখ্য অনুচর ঘুরিতেছে; একবার যদি তাহারা সন্ধান পায় তাহা হইলে সাবিত্রী দেবীর আর নিস্তার নাই।

(৩)

কোন ফল হইল না, বৃদ্ধা বাঁচিলেন না। জীবনে তিনি যে অপমান ও উপেক্ষায় জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছেন, মরণেও সে উপেক্ষা তাঁহার সঙ্গে চলিল। চিতা ধূ ধূ জ্বলিতেছে, দুলাল একা সে চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, কেহ তার সঙ্গে আসে নাই। হতভাগ্য একা বোঝা বোঝা কাঠ আনিয়াছে। একা সে তাহার জননীর শব স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে আনিয়াছে, একা সে চিতা সাজাইয়াছে। চিতার পার্শ্বে একা দাঁড়াইয়া মাতৃহীন দুলাল—বক্ষে বাহু সংবদ্ধ, চক্ষে অশ্রু।—চিতার অগ্নিতে সেই অশ্রুসজল চক্ষু বহ্নিময় বোধ হইতেছিল। চঞ্চল নদীজলে সে-চিতার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। আজ দুলালের সব শেষ। মায়ের জীবন-সূত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংসারের সকল বন্ধন টুটিয়াছে। জীবনে সে অনেক দুঃখ, অনেক উপেক্ষা, অনেক অনাদর পাইয়াছে—কিন্তু সবই সে তার স্নেহময়ী মায়ের মুখ চাহিয়া ভুলিয়া ছিল, তার জীবন-পথের ধ্রুবতারা আজ শ্মশানে। আজ এই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, কেহ ত তাহার জন্য আর অন্ন লইয়া বসিয়া থাকিবে না। হোক সে শাকান্ন কিন্তু সে কত উপাদেয়, কত মধুর। পাখীরা নীড়ে ফিরিয়া চলিয়াছে, সে কোথায় যাইবে, তাহার গৃহ কোথায়! মাতৃহীন শূন্য কুটীরে সে কেমন করিয়া ফিরিবে। চিতা নিভিল, বৃদ্ধার অবশেষ ভস্ম হইয়া গেল। দুলাল একবার মা বলিয়া ডাকিল। তারপর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া শেষ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করিতে গেল। আজ সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে মায়ের দেহভস্মটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষে ধুইয়া দিতে হইবে। দুলাল জল আনিতেছে, শরীর অবসন্ন, তবু বিশ্রাম নাই—জল আনিতেছে—জল আনিতে হইবে যতক্ষণ শেষ

বহ্নিকণা না নিভে, ও কে! কে তাহাকে ডাকে! কি চাও তুমি? রুক্ষকণ্ঠে দুলাল প্রশ্ন করিল। তরুণী উত্তর করিল, "তুমি বিশ্রাম কর, আমি জল আন্‌ছি।" "আন, আমি দেখি" বলিয়া অবসন্ন দুলাল তৃণশয্যায় বসিয়া পড়িল। গ্রামপ্রান্ত-বাসিনী কমলা বৈষ্ণবী, মাতৃহীনা, সংসারে তাহার আপনার বলিতে একমাত্র বৃদ্ধ পিতা। পিতাপুত্রীতে এক কুটীরে বাস করে। কন্যা সারা দিন ভিক্ষা করিয়া আনিয়া অন্ধ পিতাকে আহার করায়। আজ সে সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল। শ্মশানের ঘাটে আসিয়া দেখিল দুলাল একা দাঁড়াইয়া মায়ের সৎকার করিতেছে। গ্রামে সে সমস্ত শুনিয়াছে কেহ বৃদ্ধার শব বহিতে প্রস্তুত হয় নাই, করুণায় তরুণীর হৃদয় কোমল হইয়া উঠিয়াছিল—দুলালকে দেখিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই তো মানুষ। চিতা নিভাইয়া কমলা দুলালের কাছে আসিল, দুলাল নিদ্রিত। তাহার বেদনা-কাতর মুখে চন্দ্রকিরণ লুটিতেছে। কমলা দুলালকে জাগাইতে গিয়া সহসা থামিয়া আবার তাহার মুখপানে চাহিল। তারপর হতভাগ্যকে জাগাইল। দুলাল জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কেমন করে যাব মা নেই যে—" কমলার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল সস্নেহে দুলালের হাত ধরিয়া সে কহিল—"আমাদের বাড়ী চল"। . . .

(৪)

দিন বসিয়া থাকে না। দিন যায়। আজ কুড়ি দিন দুলাল মাতৃহারা। যতক্ষণ পিপাসার শান্তি না হয় পিপাসু ততক্ষণ পানীয়ের আশায় ঘুরিয়া মরে। দুলালেরও তাহাই হইল। মাতৃস্নেহ-বিচ্যুত স্নেহপিপাসু দুলাল কমলার স্নেহভাণ্ড নিঃশেষে পান করিল। সত্যই কমলা তাহাকে স্নেহ করে। এই মাতৃহীন যুবককে হৃদয়ের যত্নে

কমলা আপনার করিয়া লইয়াছে। দুলাল শূন্য গৃহ ছাড়িয়া কমলার কুটীরে আশ্রয় লইয়াছে। প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী, যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, চিত্তকে জয় করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। কমলার অগাধ প্রেম দুলালের চিত্তকে জয় করিয়াছে। কমলা দুলালকে ভালবাসিল। দুলাল সন্ধ্যাকালে কমলার পিতার নিকট বসিয়া দেশের কথা শুনিত—কত কথা কত যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী—বেদনাতুর কৃষকজীবনের ইতিহাস—দেশের কথা শুনিতে শুনিতে গৌরবে উৎসাহে দুলালের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত আর কর্ম্মনিরতা কমলা প্রশংস নেত্রে সেই পুরুষমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিত। দুলাল কখন মুখ ফিরাইত, চারি চক্ষু মিলিত, কমলার মুখ লজ্জারক্ত হইয়া উঠিত। এমন তো তাহার কোন দিন হয় নাই। তাহার এই দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর বয়সে সে এত সঙ্কোচ ত কোন দিন বোধ করে নাই! এ কি প্রেম! সেই প্রেম, যাহার কথা সে পিতার নিকট কত দিন শুনিয়াছে। যে প্রেমে রাধা উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। গোপীজন গৃহপরিজন ভুলিয়াছিলেন—সমস্ত ব্রজধাম কৃষ্ণময় হইয়াছিল! কমলা ভাবিত। দুলাল ভাবিত তাহার জননীর কথা, কমলার কথা, দেশের কথা, উপার্জ্জনের কথা। পুরুষ সে, তাহার অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই—আর কত দিন সে ভিখারিণীর অন্নে উদর পূর্ত্তি করিবে? কর্ম্মের প্রত্যাশায় সে গ্রামবাসী সকলের গৃহেই পদার্পণ করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই কেবল রুষ্ট কথা শুনিয়া ফিরিয়াছে। আজ সে কর্ম্মের সন্ধান পাইয়া কমলাকে সেই কথা জানাইতে আসিয়াছে। বহুবার সে বলিতে গিয়া সঙ্কোচে বলিতে পারে নাই। কমলার বিশ্রামের অবকাশ প্রত্যাশা করিয়া আছে। কমলার গৃহকর্ম্ম শেষ হইল। দুলাল নিকটে বসিয়া কহিল, "কমলা একটা কথা বলব।" কমলা কহিল, "বল কি কথা" "কমলা আমি

সস্ত্রীক রবীন্দ্রনাথ

এখান হইতে চলিয়া যাইব” কমলা সহসা চম্‌কিয়া উঠিল, কহিল, “কেন ?”

“পুরুষ মানুষ উপার্জ্জন না করিলে কেমন করিয়া চলিবে ?”

“ভগবান চালাইবেন।”

“ভগবান !” তিনি তো এতদিন চালাইলেন, আর তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিব না।”

কমলা প্রশ্ন করিল, “কি করিবে ?” “রাজা সীতারাম রায়ের ফৌজে গোলন্দাজ হইব।” কমলা শিহরিয়া উঠিল, ফৌজ! যাহারা লড়াই করে, মানুষ মারে। দুলাল দেখিল কমলার মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে। দুলাল ডাকিল, “কমলা”—কমলা কাঁদিয়া ফেলিল, শুধু জিজ্ঞাসা করিল “কেন যাইবে ?”

দুলাল কি উত্তর দিবে। কমলার অশ্রু তাহার অশ্রুকে অবজ্ঞা করিবে। কমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল “আমি একলা কেমন করিয়া থাকিব ?” “কমলা এ কি প্রশ্ন ? দুলাল তোমার কে ?” দুলাল সমস্তই বুঝিল।

আজ দুলালের বিদায়ের দিন। কাল প্রাতঃকালে রাজার কাছে হাজিরা দিতে হইবে। আজ সমস্ত দিন কমলা ভিক্ষায় বাহির হয় নাই, কেবলই কাঁদিয়াছে। দুলাল কত সান্ত্বনার কথা, ভবিষ্যতের কত আনন্দের কথা কহিয়াছে, কিছুতেই তাহার অশ্রু থামে নাই। সন্ধ্যা তখন নিবিড় হইয়া আসিয়াছে, ঝিল্লীরবমুখর গৃহপ্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া দুটি প্রাণী। দু' জনেই কাঁদিতেছিল। আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। দুলাল কাতর দৃষ্টিতে কমলার দিকে চাহিল, কমলা আসিয়া নিতান্ত অসহায়ের মত দুলালের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। দুলালের আনন নত হইল, তারপর দুইটি ওষ্ঠাধর একত্র মিলিল, অশ্রুর অন্তরালে প্রণয়ীযুগলের বিদায়চুম্বন সমাপ্ত হইয়া গেল।

(৫)

দীর্ঘ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পরিবর্ত্তনই কালের প্রকৃতি, এই এক বৎসর সময়েও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সীতারামের উন্মুখ শক্তি নবাবের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার বিপুল সৈন্য-দল, অব্যর্থলক্ষ্য গোলন্দাজ-বাহিনী নবাবের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু নবাবও নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই, এই এক বৎসরে তিনি তিনবার সীতারামের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করিয়াছেন, কোন বারেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই, তিনবার পাঠানসেনা লগুড়াহত কুকুরের মত সীতারামের রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই চতুর্থ বার নবাব খাঁ মনসুরের অধীনে বিরাট বাহিনী পাঠাইয়াছেন। শক্তিমান পাঠানবাহিনী এবার সীতারামের বঙ্গভূমি অধিকার করিয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। সীতারামের গোলন্দাজবাহিনী তাহাদের বাধা দিতে আদিষ্ট হইয়াছে। দুলাল আজ বিখ্যাত গোলন্দাজ। সেও এই ফৌজের সঙ্গে আসিয়াছে। আজ শিবিরে সে একাকী বসিয়াছিল, তাহার কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে আজ সংবাদ পাইয়াছে, কমলার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। একলা সে আর থাকিতে পারে না। দুলালকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। কত কথা যেন পত্রে লেখা নাই—কত অব্যক্ত বেদনা-ব্যাকুল আহ্বান যেন ছত্রগুলির পশ্চাতে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুলাল পত্রের দিকে চাহিয়াছিল। কত বার সে এই ক্ষুদ্র লিপিখানি পড়িয়াছে, কত বার সে ইহাকে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করিয়াছে! আবার পড়িতেছিল, সহসা ও কি শব্দ, মেঘগর্জ্জন না তোপ! ত্রস্তপদে দুলাল বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পাঠানের তোপের শব্দ, পাঠান আসিতেছে,

"তোপ দাগ," পশ্চাৎ হইতে রাজা সীতারাম গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ দিলেন। দুলাল এক লম্ফে তোপের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তের অবকাশ! তারপর যুগপৎ এক সঙ্গে এক শত কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, যেন প্রলয়ান্তকালে মহাকালের গর্জ্জন। দুলালের বিশ্রাম নাই; হাত উঠিতেছে নামিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কামান মৃত্যুবহ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। সীতারাম নির্ব্বাক-বিস্ময়ে এই যুবকের পানে চাহিয়া ছিলেন। সহসা কহিয়া উঠিলেন, "ক্ষান্ত হও, আর প্রয়োজন নাই, তোমার নাম কি যুবক?" "দুলালচাঁদ"—দুলাল ধীর কণ্ঠে উত্তর করিল। "কি সুন্দর লক্ষ্য তোমার! ঐ আবার পাঠান আসিতেছে, অগ্রসর হও," সেনাদল ছুটিল। পশ্চাতে সীতারাম রায়। সম্মুখে অসংখ্য পাঠান। "এ যুদ্ধ জয় করা চাই, সৈন্যগণ! জন্মভূমির স্বাধীনতা বিপন্ন, বীরের মত যুদ্ধ কর"—এই বলিয়া সীতারাম দুলালের দিকে চাহিলেন, দুলালের হাতে কামান গর্জ্জিল। অবিশ্রান্ত কালানলবর্ষী কামানের সম্মুখে পাঠান সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। "চমৎকার! মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর"—রাজা আদেশ দিলেন। কামান নিস্তব্ধ হইল। ঐ যে ছত্রভঙ্গ পাঠান সেনা ছুটিতেছে। ঐ গ্রামে আশ্রয় লইতে চলিয়াছে। গ্রাম সুরক্ষিত, সেখানে আশ্রয় লইলে তাহারা আমাদের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবে! দ্রুত গতিতে পাঠান ছুটিতেছে, সহসা পুনরায় রাজার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ঐ কুটির ধ্বংস কর! অবিলম্বে কে ঐ কুটীর ধ্বংস করিতে পারে, কে আছ গোলন্দাজ?" কেউ উত্তর দিল না। দুলাল নীরবে আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, রণক্লান্তিতে দেহ কাঁপিতেছে, মুখ পাংশু। দুলাল জ্বলন্ত পলিতা হস্তে লইল। একবার মনে হইল একখানি পুষ্পিত দেহলতা, দুইটি ব্যাকুল নয়ন, দুইখানি

পল্লব-সম তরুণ কোমল ওষ্ঠাধর, চুম্বনে যাহা একদিন আগ্রহে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, যুগল বাহুর আকুল আলিঙ্গন। হস্ত হইতে পলিতা পড়িয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য, পরক্ষণেই মনে হইল বিপন্ন স্বদেশের দুর্দ্দশার কথা, পাঠানের অত্যাচারের কথা। সহসা তাহার চক্ষুতে জাগিয়া উঠিল তাহার জননীর কুটীরের শান্ত, সৌম্য প্রতিচ্ছবি, আর একখানি করুণাময়ী নারীমূর্ত্তি! পাঠান ভাবিতেই দুলালের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। আবার সীতারামের কণ্ঠরব, "স্বদেশ বিপন্ন—দুলালচাঁদ কাহার অপেক্ষা করিতেছ?" ক্ষিপ্রহস্তে দুলালচাঁদ পলিতা কুড়াইয়া লইল—একবার শুধু চক্ষু মুদ্রিত করিল, চীৎকার করিল, "আমার মরণ-চুম্বন গ্রহণ কর—আর শোনা গেল না, তোপ গর্জ্জিল, গুড়ুম্! মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র কুটীর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। কি অব্যর্থ লক্ষ্য! সীতারাম চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ধন্য দুলালচাঁদ।" কে শুনিবে সে স্তুতিবাণী। ধূম পরিষ্কার হইয়া গেল; দুলাল কামানের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। সীতারাম নিকটে আসিলেন, ডাকিলেন, "দুলাল!" কে উত্তর দিবে, হতভাগ্য অমৃত লোকে প্রস্থান করিয়াছে। সীতারাম কথা কহিলেন না, স্থিরনেত্রে পলায়মান বিধ্বস্ত পাঠান সেনা-দলের পানে চাহিয়া রহিলেন।

* * *

কুটীরের আঙ্গিনায় পাংশুবিবর্ণ মুখে কমলা বসিয়াছিল। শুনিয়াছিল পাঠান আসিতেছে—পল্লীর আর সকলেই নিজ নিজ দ্রব্যসম্ভার লইয়া গৃহ ত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছিল, শুধু সহায়বিহীন কমলা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ব্যাকুল বিহ্বল হইয়া বসিয়াছিল। আজ যদি দুলাল থাকিত! হয় তো সে ঐ দূরে বনশ্রেণীর অন্তরালে মহারাজ সীতারাম রায়ের সৈন্যবাহিনীতে শত্রু দলন করিতে কামানের উপর

দাঁড়াইয়া আছে! সামান্য ক্রোশমাত্র ব্যবধান! কমলা শুনিয়াছিল—দুলাল সীতারামের ফৌজে গোলন্দাজ হইয়াছে। শুনিয়া সে উল্লসিত হইয়াছিল। কবে দুলাল ফিরিবে দীর্ঘ দিন ধরিয়া কমলা কেবল তাহাই ভাবিয়াছে। আজও ভাবিতেছিল। দুলালের সেই মুখ—সেই স্নিগ্ধ মধুর সম্ভাষণ সমস্তই আজ অতি স্পষ্ট কমলার মনে পড়িতেছিল। দুলালের কথা ভাবিতে ভাবিতে বার বার তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় গ্রামে চীৎকার শোনা গেল—পাঠান! পাঠান! কমলা চমকিয়া চাহিয়া দেখিল সীতারামের বাহিনী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ছিন্নভিন্ন পাঠান সৈনিকেরা পল্লীর অরণ্য পথে আশ্রয় লইতে দ্রুতগতি আসিতেছে। আশঙ্কায় কমলার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। কমলার কুটীর গ্রামপ্রান্তে খর্জ্জুর গুবাকগুচ্ছের অন্তরালে সুরক্ষিত—পাঠানের গুপ্তচর সেইদিকে পলায়মান পাঠানসেনাদলের গতি নির্দ্দেশ করিল। ভয়ে মুহ্যমান হইয়া কমলা শিহরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"রক্ষা কর! দুলাল! দুলাল!"

মুহূর্ত্তের অবকাশমাত্র! পরক্ষণেই সঞ্চরণমান সূর্য্যের মত একটি অগ্নি-গোলক কমলার কুটীরের বৃক্ষরাজি-শীর্ষে সশব্দে ফাটিয়া গেল। 'দুলাল' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াই ভয়ে কমলা চক্ষু মুদিল। নিমেষের মধ্যেই পর পর দুইটি গোলা কমলার কুটীর-শীর্ষে বহ্নিতাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিল। পাঠান ফিরিল। জ্বলন্ত কুটীরের দিকে মৃত্যুকাতর নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কমলা একবার ডাকিল, দুলাল! তাহার পরই চিরকালের মত চক্ষু মুদ্রিত করিল।

* * *

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামবাসী বিজয়ী রাজার সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিল। রাজা তখন সমারোহে দুলালের শবের সৎকার করিতে আদেশ

দিতেছেন। লক্ষ্মীদাস প্রমুখ ধনীবৃন্দ মহারাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; লক্ষ্মীদাস দুলালকে দেখিয়াই চিনিলেন—তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একে চেন?" "হাঁ আমাদেরই প্রতিবেশী।" সীতারাম সকল কহিলেন, তারপর প্রশ্ন করিলেন, "ঐ কুটীরের অধিকারী কে? তাহাকে আমি প্রচুর অর্থ দিব।" লক্ষ্মীদাস কি বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা ভয়ে থামিয়া গেলেন; শুধু কিশোর দাস বলিলেন, "যাহার কুটীর, সে কামানের মুখে প্রাণ দিয়াছে—সে ঐ দুলালেরই প্রণয়িনী বৈষ্ণবী কমলা।" সীতারামের মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর সেই ছিন্ন বাস পরিহিত মলিন রক্তাপ্লুত শব দেহকে মহারাজ সীতারাম রায় বক্ষে তুলিয়া লইলেন।

দিদিমা

[রবীন্দ্রনাথ মৈত্র]

ভৃত্য হারাধন আসিয়া কহিল, "বাসুবাবু বড্ড কাঁদ্‌ছেন।"

বাসু কাঁদিতেছে! আজ সাত বৎসর তাহার সহিত আমার পরিচয়, ইহার মধ্যে ক্রন্দন করা দূরে থাক্ গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতে তাহাকে দেখি নাই। গত বৎসর মেসের গুণধর ঠাকুরের পা'খানি মোটর দুর্ঘটনার ফলে কাটিয়া ফেলিতে হয়। আমরা মেডিক্যাল কলেজে ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছিলাম—কি ভয়ানক দৃশ্য! কেহই

চোখ মেলিয়া চাহিতে পারি নাই, অথচ বাসু স্বচ্ছন্দে বলিয়া ফেলিল, "গুণধর ঠাকুর যদি পাঁঠা হ'ত তা হ'লে ওই একখানা ঠ্যাঙে মেসের সবার ভর পেট খাওয়া চল্‌ত।" এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পরিহাসে মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম, কেহ কেহ জন্মের মত মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই বাসু কাঁদিতেছে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"জানি নে বাবু। আপনি আসুন।"

হারাধন চলিয়া গেল। ফৌজদারী আইনখানা বন্ধ করিয়া বাসুদেবের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বালিশে মুখ গুঁজিয়া বাসু পড়িয়া ছিল, আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়া কহিল, "বোস।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাঁদ্‌ছ কেন?"

বাসু কথা না কহিয়া একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি আমার হাতের কাছে সরাইয়া দিল—পড়িলাম,

বাসুদা'

কাল রাত্রে দিদিমার ৺প্রাপ্তি হইয়াছে। এইমাত্র দাহ সম্পন্ন করিয়া ফিরিলাম।

তোমার

নিতাই

আরও আশ্চর্য্য হইলাম। বাসুর তিনকুলে কেহ ছিল না, অকস্মাৎ দিদিমা আসিলেন কোথা হইতে?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কার দিদিমা ইনি?"

বাসু মুখ তুলিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমার।"

"তোমার! তোমার তো কেউ ছিল না জানতাম, আজ হঠাৎ—"

বাসু উঠিয়া বসিল, "সব কথা জানতে না মনুদা, শুন্‌বে?"

যথেষ্ট অবসর ছিল, কহিলাম, "বল।"

বাসু খানিকক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর দুই হাতে চোখ মুছিয়া একটা বিড়ি ধরাইয়া কহিতে আরম্ভ করিল,—

"বিপিনকে জান্‌তে? সেই শিবনিবাসের বিপিন। বছর পাঁচেক আগেকার কথা, তার বিয়েতে বরযাত্রী হ'য়ে গিয়েছিলাম। পোড়াদায় নেমে ক'নের গাঁয়ে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন সময়টা প্রায় রাত এক প্রহরের কাছাকাছি। বিয়ে বাড়ীর বাইরের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়েছি এমন সময় কে পিছন থেকে এসে গলা জড়িয়ে ধরে ডাক্‌লে, "বাসুদা'।" মুখ ফিরিয়ে দেখি নিতাই। ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পড়তাম, পাশ ক'রে আমি ভর্ত্তি হ'লাম কলেজে সে ভর্ত্তি হ'ল বেলুড় মঠে। আমুদে, খামখেয়ালী, মামার বাড়ী থেকে মানুষ—জগতে আমারই মত কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না—সে সন্ন্যাসী হওয়াতে খুসীই হ'য়েছিলাম। অনেক দিন পর নিতাইকে দেখে বড় আনন্দ হ'ল। শুন্‌লাম সেই গ্রামটাকে কেন্দ্র ক'রে ডজন দুই কিশোর ব্রহ্মচারী জুটিয়ে সে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আর চাল ডাল বিতরণ কর্চ্ছে। কথা হচ্ছে—এমন সময় নিতাই আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্‌ল, "একটা কাজ কর্ত্তে হবে বাসুদা'! পার্‌বে?"

অকরণীয় কাজ কিছুই ছিল না তা তো জান। বল্লাম, "কর্‌ব। কি বল্ তো?"

নিতাই বল্‌ল, "বিশেষ কিছু নয়, একটু অভিনয় কর্ত্তে হবে। তবে থিয়েটারে নয়।"

একে তো আমি, তারপর বরযাত্রী—মনটা কৌতুক করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়েই ছিল, বল্লাম, "বেশ! কি ব্যাপার!"

নিতাই একরকম আমাকে টেনেই নিয়ে চল্‌ল। মিনিট দশেকের মধ্যে বাঁশঝাড়ে ঘেরা একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছের তলায় খড়ের একচালা ঘরের বারান্দায় এসে পৌঁছলাম। সেটা নিত্যানন্দ স্বামীর আশ্রম। কেরোসিনের ডিবেটা জ্বালিয়ে মাদুর বিছিয়ে নিতাই আমাকে বসিয়ে বল্‌ল, "একটু অন্যায়, একটু মিথ্যাচার 'লোক হিতায়' কর্ত্তে হয় বাসুদা'! আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু লোক পাই নি. তোমার কথা মনেই ছিল না—নৈলে" অসহিষ্ণু হ'য়ে বল্লাম, "কি কর্ত্তে হবে তাই বল্। তত্ত্বব্যাখ্যা পরে শুন্‌ব।"

নিতাই বল্‌ল, "ব্যাপারটা এই রকম। বামুনটুলী দেখেছ? ছোট্ট একটি গাঁ—ঘর দশেক লোক। ষ্টেশনের ঠিক বাঁয়ে। সেখানকার কথাই বল্‌ছি। সেখানে প্রায় সব বাড়ীতেই চাল দিতে হয় আমাকে। হপ্তায় একবার ক'রে যাই। সব দেখে শুনে আসি। মাস পাঁচেক আগে বামুনটুলী থেকে রাতে ডাক্‌তে এল। গেলাম। গিয়ে দেখি একটা বছর আঠারো বয়েসের বৌয়ের ফিট হচ্ছে। আর তার কাছে ব'সে সেই বাড়ীর বুড়ী মাটিতে মাথা খুঁড়ছে। বুড়ীকে জান্‌তাম, মাথা একটু বেঠিক—বড় ঘরের মেয়ে—যথাসর্ব্বস্ব আত্মীয়েরা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে—এখন পুঁজি হ'য়েছে ভিক্ষে। মেয়েটাকে দেখিনি কখনো। বুড়ী কানে শোনে না, চোখের দৃষ্টিও প্রায় নেই। আমি এসেছি শুনে বল্‌ল, "যার বৌ তার কাছে পাঠিয়ে দে দাদা, নৈলে চিঠি লিখে দে।' মেয়েটার কথা জিজ্ঞেস কর্ব্ব—এমন সময় একটা ছেলে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। গিয়ে যা বল্‌ল তাতে জান্‌লাম বুড়ীর সম্বল ছিল এক নাতি, সে কল্‌কাতায় টুইসনি ক'রে পড়ত। মেয়েটা তারই স্ত্রী। ছেলেটা হঠাৎ আজ ক'দিন মারা গেছে। বৌ ছিল তার ভায়ের বাড়ীতে—তারা শ্রাদ্ধশান্তির হাঙ্গামা দেখে আজ

বৌকে তার দিদিশাশুড়ীর কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছে। বুড়ীকে নিয়ে বিপদ হবে দেখে তাকে কিছু বলা হয় নি, এ দিকে বৌটার তো ফিট হচ্ছে। ছেলেটাকে বল্লাম যে বুড়ীকে কিছু ব'লে কাজ নেই। তার পর ঘরে গিয়ে বুড়ীকে তুলে অন্য ঘরে শুইয়ে রেখে মেয়েটার মাথার কাছে বস্‌লাম। মেয়েটার চৈতন্য হ'লে তাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে বল্লাম যে সে বিচলিত হ'লে বুড়ীটা শুদ্ধ মর্‌বে। মেয়েটা বুঝ্‌ল। গাঁয়ের লোকদের বল্লাম, তারাও সব কথা গোপন রাখাই সুযুক্তি মনে কর্‌ল। বুড়ী আর ক'দিন! এই নিয়ে তো সুরু হ'ল। এখন বুড়ী রোজ তাগিদ দিচ্ছে আমাকে—বাসুকে চিঠি লিখে আন্‌তে"

বল্লাম, "কে বাসু ?"

নিতাই বল্‌ল, "তার নাতি। তারও নাম ছিল বাসুদেব।"

বুঝ্‌লাম। "আমাকে নাতি সাজাতে চাইছিস্ ?"

নিতাই বল্‌ল, "হ'লে ভাল হয়, কারণ বুড়ী যদি বাঁচে তো বড় জোর মাস সাতেক। অন্ততঃ তার নাতি বেঁচে আছে—রোজগার ক'রে খাওয়াবে—আত্মীয়দের হাত থেকে সম্পত্তি উদ্ধার কর্ব্বে—শেষ বয়সে তার আশার এই শান্তিটুকু আর নষ্ট হ'তে দিতে চাই নে। কি বল ?"

বেশ কৌতুক বোধ কর্ল্লাম, বল্লাম, "আচ্ছা কাল সকালে।"

নিতাই বল্‌ল, "বাঁচালে বাসুদা'। আমি আবার আজই বুড়ীকে ব'লে এসেছি যে কলকাতায় চিঠি দিইছি—বাসু এল ব'লে।"

হেসে বল্লাম, "বেশ করেছিস্। কালই তো কল্‌কাতা থেকে এসে যাব।"

নিতাই বল্‌ল, "নৈলে উপায় নেই। বুড়ী আমায় দেখলে যা করে যদি দেখ্‌তে!"

—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বাসু চোখ বুঁজিল। কহিলাম, "তারপর ?"

"দাঁড়াও! বুড়ীর চেহারাটা আগে মনে এনে নিই!" বলিয়া বাসু বলিতে আরম্ভ করিল, "তারপর, ভোরে নিতাই আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। এক হাঁটু কাদা আর আশশ্যাওড়ার বন ভেঙ্গে বামুনটুলীতে গিয়ে পৌছলাম। নিতাই এতক্ষণ বেশ চল্‌ছিল হঠাৎ থেমে গেল। বল্লাম, "কি রে?" নিতাই আঙ্গুল তুলে বল্‌ল ঐ যে! দেখলাম শ' খানেক হাত দূরে একটা ভাঙ্গা বেড়ায় হেলান দিয়ে লাঠি হাতে এক বুড়ী ষ্টেশনের পথের দিকে তাকিয়ে আছে। নিতাই বল্‌ল "অম্‌নি রোজ সকাল সন্ধ্যা বুড়ী ঐখানটায় দাঁড়িয়ে থাকে। কলকাতার গাড়ী আসবার সময় কিনা।" আমি একবার বুড়ীকে দেখে নিলাম। বয়স আশী পঁচাশীর কম নয়, মাথার চুল ধব্‌ধবে সাদা, গায়ের রং এই বয়সেও যা আছে—থাক্‌গে। মুখ নড়া দেখে বুঝ্‌লাম বুড়ী আপন মনেই কথা বল্‌ছে। নিতাই বল্‌ল, "পার্ব্বে তো বাসু দা', বোঝ।" তখন মনে কি হ'য়েছিল জানিনে, নিতাইকে সাম্‌নে ঠেলে দিলাম। নিতাই বুঝ্‌ল, হাত যোড় ক'রে কাকে যেন নমস্কার কর্‌ল, তারপর বুড়ীর সামনে গিয়ে তাকে এক ঝাঁকানি দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল। আমি থম্‌কে দাঁড়ালাম। সে যা দেখেছি মন্টুদা, তা' আর ভোলবার নয়। আমাকে দেখে থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠে বুড়ী ছুটে আসবার চেষ্টা কর্চ্ছে—হাঁপাচ্ছে আর লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্‌ছে, "দাদু আয়।" কি মনে হ'ল দৌড়িয়ে গিয়ে বুড়ীকে জড়িয়ে ধ'রে ডাক্‌লাম, "দিদিমা!" বাসুর গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল, সে চুপ করিল। আমি কথা না কহিয়া বিড়ি টানিতে লাগিলাম।

"খান তিনেক একচালা খড়ের ঘর, ছোট্ট একটা আঙ্গিনা, তাই নিয়ে বাড়ী। একটা ঘরের রোয়াকে বুড়ী আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বস্‌ল। বুড়ী আপন মনেই সংসারের কথা বলে যাচ্ছে—

আমগাছটা বিক্রী ক'রে ক' টাকা পেয়েছিল, ছাগলটাকে শেয়ালে নিল কেমন ক'রে, সব নির্ব্বিকার ভাবে শুনে যাচ্ছি আর মাথা নাড়ছি। মাঝে মাঝে আমার গালে হাত দিয়ে বল্‌ছে, 'বড্ড বড় হয়েছিস্ দাদু !' বল্‌ছি, 'কলকাতায় লোনা জলে বেড়ে গেছি দিদিমা।' হঠাৎ বুড়ী বল্‌ল, 'তোর জন্যে কি রেখেছি বল্‌তো দাদু ?' বস্তুটা কি জিজ্ঞাসা কর্‌বার আগেই বুড়ী তারস্বরে ডাক্‌তে সুরু ক'রে দিল, "ও দিদি! শীগ্‌গির ছুটে আয়। দেখে যা—দাদুমণি এসেছে !"

বুড়ী কাকে ডাক্‌ছে বুঝে চম্‌কে উঠলাম। এ কথা তো মনে হয় নি! নিতাই নিমেষে একেবারে আঙ্গিনা থেকে বাইরে গিয়ে বেড়ার আড়ালে দাঁড়াল। আর সেই সময়ে বাড়ীর পিছনের দিক থেকে ভিজে কাপড়ে শশব্যস্তে ছুটে এসে বৌটা আঙ্গিনায় দাঁড়াল, তারপর আমাকে দেখে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। আমি একেবারে নিভে গেলাম। বুড়ী বল্‌ল, "লজ্জা দেখ ছুঁড়ীর !" এই সময় বৌটা মুখ থেকে হাত সরিয়ে আমার দিকে একবার চাইল। চোখ দুটা ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্বল্‌ছে। এমন দৃষ্টি আমি কখনও কারো চোখে দেখি নি মন্তুদা'। বাইরে এসে নিতাইকে ডাক্‌তেই সে হাত যোড় ক'রে বল্‌ল, "ক্ষমা কর বাসুদা', এ কথা মনেই হয় নি।" মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে মনে একটা ব্যবস্থা স্থির ক'রে ফেল্‌লাম। বুড়ী তখনও রোয়াকে ব'সে বধূর অকারণ লজ্জা সম্বন্ধে আপন মনেই বক্তৃতা কর্চ্ছে। বৌয়ের খোঁজে ঘরে ঢুক্‌লাম। মাটিতে উপুড় হ'য়ে পড়ে বৌটা তখনও কাঁদছিল তার মাথার কাছে ব'সে ডাক্‌লাম, "দিদি !" বৌ চম্‌কে উঠে মাথায় কাপড় টান্‌তে যাবে, আমি তার হাত ধর্‌লাম—বল্লাম, "আমি তোমার সত্যিকার ভাই হব।" বৌ ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর ঘণ্টাখানেক ধ'রে তাকে বোঝালাম,

কেন এখানে এলাম তাও বল্লাম। বৌ শুনে একবার হাস্‌বার চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু পার্‌ল না। চোখ মুছে চলে গেল।

তারপর? তারপর আর কি? সেদিন সেখানেই থেকে গেলাম। বুড়ী কায়েত আমি বামুন। অভিনয় পূরো কর্ব্বার জন্ত লুকিয়ে পৈতেটা ছিঁড়ে ফেলে—দিদিমার পাতে প্রসাদ পেলাম। দুপুরে বৌয়ের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক জীবনের সব কথা শুন্‌লাম। বুড়ীর নাতি উকীল হয়ে নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার কর্ব্বে এই সঙ্কল্প নিয়ে কল্‌কাতা গিয়েছিল তাও জেনে নিলাম।

পড়ার ক্ষতি হবে ব'লে পর দিন দিদিমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

কিন্তু মহুদা', বুড়ীকে ভুল্‌তে পার্‌লাম না। কলকাতায় ফিরে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে আইন পড়তে স্বরু কর্ল্লাম—সে তো জানই। নিতাইয়ের মারফতে বুড়ীকে চিঠি দিতাম, টাকা পাঠাতাম, ফল পাঠাতাম। মাঝে মাঝে কলকাতা ছেড়ে উধাও হ'তাম—তা নিয়ে অনেকে ঠাট্টাও করেছ। তখন বুড়ীর 'দাদু' ডাকটি শুন্‌তে যেতাম। অমন ক'রে জীবনে তো কেউ আমাকে ডাকে নি—বড় ভাল লাগ্‌ত।

বছরখানেক অভিনয় কর্ব্বার পর আমি সত্যিই যেন বুড়ীর নাতিই হ'য়ে গেলাম—ছুটি হ'লেই ছুট্‌তাম। প্রায়ই দেখ্‌তাম বুড়ী সেই ভাঙ্গা বেড়াটায় হেলান দিয়ে প্রথম দিনকার মত দাঁড়িয়ে আছে। বল্‌ত, "আজ তুমি আস্‌বে দাদু, আমার মন বল্‌ছিল।" মাঝে মাঝে মুস্কিল হ'ত—অনেক দিন দেখেছি রাত্রে এসে বুড়ী আমার বিছানা হাতড়াচ্ছে আর বিড় বিড় ক'রে বক্‌ছে—"ছুঁড়ীর লজ্জা দেখ! আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে দেখে লুকোনো কেন না?" যাকে উদ্দেশ ক'রে

বলা সে তখন আর একটা ঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কোনও দিন নিজেই তাকে হাত ধ'রে টেনে আনৃত, আর সে বেচারী চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে এসে দাঁড়াত—কাজটা যে ভাল করি নি তখন বুঝতে পার্ত্তাম।

যাক্ পাঁচ বছরের অভিনয় শেষ হ'য়েছে। কিন্তু মনুদা' মনে হচ্ছে—সে সত্যিই আমার দিদিমা ছিল—আমার সত্যি দিদিমাই আজ মরেছে!"

বাসুদেব চোখ মুছিল। আমি কহিলাম, "বুড়ী বেঁচেছে—তুমিও বেঁচেছ।"

বাসু এ কথার কোনও জবাব দিল না, হঠাৎ কহিয়া উঠিল, "আমার ফিসের টাকা ক'টা দিও তো মনুদা' ?"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ?"

"উকীল হবার আর দরকার নেই।" বলিয়াই বাসু বাহিরে চলিয়া গেল।

বোর্ড বিজয় কাব্য

[রবীন্দ্রনাথ মৈত্র]

[ছয় বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যখন রংপুরের "বার্ত্তা" নামক সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক ছিলেন সেই সময়ে স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ লইয়া রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও খাঁ সাহেব (বর্ত্তমানে খাঁ বাহাদুর) আসফ খাঁর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল এবং তদুপলক্ষে যে সমস্ত ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগকে লইয়া সেই সময় তিনি এই কাব্যটি রচনা করেন। ইহা ২০শে বৈশাখ সোমবার ১৩৩৩ তারিখের বার্ত্তা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল। কাব্যে উল্লিখিত ব্যক্তিদের বিস্তারিত পরিচয় ফুটনোটে দেওয়া হইল।—শ. চিঁ. স.]

উর কণ্ঠে বীণাপাণি ! আজিকে গাহিব
বোর্ড-রণ-রঙ্গ-গাথা ; ভোট-ডিম্ব ভেদি
মেম্বর মোরগগুলি সেই শীত কালে
যেমনে বাহির হ'ল বলেছি সে কথা
এককালে ; আজি কব কেমন করিয়া
চঞ্চু-নখ-দংষ্ট্রা-অস্ত্রে খুদ কণা আশে
বাছারা করিল যুদ্ধ ; শালিক, ময়না
কাক, দাঁড়কাক, ফিঙ্গে ছুটে গেল সাথে।
দলাদলি, গলাগলি আর ঠেলাঠেলি
সুরু হ'ল সহর জুড়িয়া, টানাটানি
কাণাকাণি জানাজানি কথা হানাহানি
গরম করিল জেলা কেমন করিয়া,
সে কথা কহিতে হবে উর মা ভারতী !

রবীন্দ্রনাথের শেষ ছবি (৬৮ বৎসর বয়সে)

পঁচিশে এপ্রিল শুভ মোদের প্রভুর
১৯২৬ বর্ষ। পর দিন হ'বে
মহা ভয়ঙ্কর রণ, বসেছে শিবির
সেনপাড়া, মুন্সীপাড়া, কামালকাচনা
আলমনগর মাঠে। রসদ বিস্তর
খাসী, পাঁঠা, সন্দেশ ইস্তক চিড়ামুড়ী
কসাই ময়রা মুদী সবার বেসাতি
এক সাথে (ক'রো ক্ষমা হে মাতা ভারতী
তোমার অধম দাসে, সিক্ত হ'য়ে ওঠে
দুরন্ত রসনা মম।) ক্রমে ফৌজদল
আগমন হৈল সুরু। কোথা গাইবাঁধা
কুড়িগাঁ নিলফামারী, কোথা সৈদপুর
কাকিনা গড্ডিমারী সব কেল্লা হ'তে
বীরদর্পে আসে সেনা, হায় রে যেমতি
শিয়ালদহায় আসে মেলগাড়ী কালে
ট্যাক্সি রিক্সা টম্‌টম্‌ চারিদিক হ'তে,
অথবা যেমতি আসে বিকাল বেলায়
হাঁকিলে 'ছত্রিশ ভাজা', পাততাড়ী ফেলি
তাড়াতাড়ি শিশুদল। এল বীরগণ।
আর্ত্তনাদিল মুর্গী মুন্সীপাড়ায়,
মুহূর্ত্তে নধর খাসী এক গণ্ডা খাঁটি
পেঁয়াজ রশুন সহ হৈল পরিণত
মোগলাই কাবাবে। অক্ষয়ের (১) গৃহে

১। অক্ষয়কুমার সেন, রংপুরের উকিল।

ছুটিল চায়ের স্রোত, ভাঙ্গিল পেয়ালা
দুই জোড়া, রায় বাহাদুর (২) গরজিল
কাঁপিল ঠাকুর ব্রজ, (৩) হ'ল দেউলিয়া
নিমেষে গোল্লার কড়া ; ডাক-বাঙ্গলায়
মবারক (৪) অপারগ যোগাতে রসদ
সেনাদের পক্ষীডিম্ব ফুরাল বাজারে।

অপরাহ্নে বসে সভা শিবিরে শিবিরে
রায় বাহাদুর গৃহে 'কাউচ' আসীন
প্রতাপ (৫) সতাপে কহে গুম্ফ উঁচাইয়া—
"একি কথা শুনি আজি গুপ্তচর মুখে
বাহাদুর, চলি গেল খৈমুদ্দীন (৬) নাকি
পথ ভুলি' মুন্সীপাড়া ? পারি না কি দিতে
মুর্গীর কাবাব তোরে আকণ্ঠ ভরিয়া
হে পেটুক ? কথা দিয়ে কথা না রাখিলি
পোড়া উদরের লাগি !" মুন্সীপাল-রাজ
যোগেন্দ্র (৭) বিরাট গুম্ফ দংশিয়া কহিল

২। রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চাটার্জ্জি, গবর্ণমেণ্ট-প্লীডার এবং রংপুর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান।

৩। ব্রজ—বিখ্যাত মিষ্টান্ন বিক্রেতা।

৪। ডাকবাংলোর চাপ্‌রাশি।

৫। প্রতাপ চন্দ্র রায়, কুড়িগ্রামের উকিল, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার।

৬। ডি, বি, মেম্বার, কুড়িগ্রাম।

৭। বাবু যোগেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি (বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর) রংপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

"ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা, পেট হ'ল বড়
প্রতিজ্ঞা পালন হ'তে! হে প্রতাপ রায়
দুর্জ্জয় প্রতাপ তব, দেখাও প্রতাপ
ধরি আনি চৌধুরীরে কর সমর্পণ
রায় বাহাদুর করে।" উঠিলা প্রতাপ ॥

আলমনগরে হোথা প্রতীক্ষায় চাহি
পথপানে, বসি আছে সুরেন্দ্র (৮) ধীমান্
আগ্রহ-স্পন্দিত-বক্ষে। সম্মুখে বসিয়া
ভগ্ন-দন্ত ক্ষেত্রনাথ (৯) সিংহকুল জাত
অধুনা মূষিক, রোগে। সুরেন্দ্র কহিলা
বাঙ্গালীর এই রীতি, কিছু নাহি বোঝে
সময়ের দাম, এবে শেষ হ'ল বেলা
তবু কেহ নাহি আসে।" কথা না ফুরাতে
বাইক বাহনে চাপি আসিলা যোগেশ (১০)
সাদা মার্কিনের জামা জড়াইয়া গায়ে
সাদা পাল তোলা পান্সী কালিন্দীর জলে।
পশ্চাতে শ্রীপ্রিয়নাথ (১১) যোগেশ-পিয়ারা
নব জলধরকান্তি, চশমিত আঁখি
আধখানা মুখে হাসি, বাকী আধ খানি

৮। বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, কুণ্ডির জমিদার ও ডি, বি, মেম্বার।

৯। ক্ষেত্রনাথ সিংহ (দন্তবিহীন), রংপুরের উকিল ও ডি, বি, মেম্বার।

১০। যোগেশচন্দ্র সরকার, রংপুরের উকিল, ডি, বি, মেম্বার (ঘোর কৃষ্ণবর্ণ)।

১১। প্রিয়নাথ লাহিড়ী, (ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার, কাকিনারাজ), ডি, বি, মেম্বার।

গম্ভীর ভবিষ্য ভাবি। তার পিছে পিছে
স্বরাজী বছার (১২) আসি গরজি কহিল,
"সব ঠিক! যা'ব আমি পাকড়াও করিতে
গড্ডিমারী সিংহরাজে! (১৩) নাহি কিছু ভয়
ক্ষণেক অপেক্ষা কর।" আসে গড্ডিমারী
অঙ্গ দোলাইয়া আর চরণ টানিয়া
বাঁ হাতে চুরুট ধরি, লাঠি ডান হাতে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু হায় যেন নব বধূ
বাসরে পশিতে যায়। "স্বাগত" "স্বাগত"
সুরেন্দ্র হাসিয়া কহে "আরম্ভ করহ
এবার মোদের কার্য্য।" কাজ আরম্ভিল
"শঠে শাঠ্যে বাগজালে কার্য্য হ'ল শেষ;
জয়তু মোদের পার্টি রায় বাহাদুর—
বিতাড়ন ক্রীড যার। মোরা পঞ্চ ভ্রাতা
জলে স্থলে সুখে দুঃখে রব এক প্রাণ,
এক সঙ্গে যাব আর একত্রে ভোটিব
এক জনে। লঙ্কা ভাগ হ'বে কালি প্রাতে।"
সবে সমস্বরে কহে। শুভ বার্ত্তা নিয়ে
আসিল পবনগতি যোগেশ নিমেষে
সেন-গৃহ সভাতলে, যার আধখানি
জুড়িয়া বসিয়াছিল বিরাট ডাক্তার

১২। বছার মহম্মদ, রংপুরের উকিল, ডি, বি, মেম্বার ও ভূতপূর্ব্ব এম্-এল্-সি।
১৩। যতীন্দ্রনাথ সিংহ, গড ডিমারীর জমিদার, ডি, বি, মেম্বার।

অতুল (১৪) অতুল খ্যাতি, বাকী আধখানা
পরিপূর্ণ শত জনে। বসিয়া করুণা (১৫)
অকালে ধবল কেশ মহা বিচক্ষণ,
ধীরবুদ্ধি অতি প্রাজ্ঞ অক্ষয় বসিয়া
কৃষ্ণচন্দ্র সভারাজ। চারি পাশে বসি'
কত গ্রহ উপগ্রহ না আসে বর্ণনা
ভাষা না জুয়ায় মোর। আনন্দ সংবাদে
সভা বিচঞ্চল হ'ল, বহিতে লাগিল
অবাধ চায়ের স্রোত—যেন ঐরাবত
সহসা উঠিল ত্যজি গঙ্গোত্রীর মুখ।

হোথা ডাক-বাঙ্গলায় ঘরে ঘরে ঘরে
চলে শলা পরামর্শ—টুপী তাজ হ্যাট
আচকান চাপকান ধুতি পায়জামা
প্যাৎলুন লুঙ্গীর খেলা—যেন যাদুঘর!
বাহিরে দাঁড়ায়ে গাড়ী জুড়ী হাওয়া হ'তে
ছক্কর যায় নি বাদ। হিন্দি বাঙ্গলায়
উর্দ্দু ও ইংরেজী বুলি—যেন হরিনাথ
নব জন্ম পরিগ্রহি বিচিত্র আকারে
আবার আসিল দেশে। কহে এক জন
হামিদের (১৬) কর ধরি—"চল বন্ধু মম

১৪। বাবু অতুলচন্দ্র সাহা, এম্-বি।
১৫। করুণা চন্দ্র দে, সৈদপুরের ডি, বি, মেম্বার।
১৬। মৌলভি হামিদ উদ্দিন, গাইবান্ধার ডি, বি, মেম্বার।

চল চল মোর গৃহে, শেজ বিছাইয়া
ফুলে ভরি ফুলদানী সরবতে পেয়ালা
আসকে ভরিয়া দিল্ ডেক্‌চি পোলাওয়ে
রেখেছি তোমার তরে।" কহিল সটান
হাসিয়া পাঠান বীর, "এ বারের মত
বেরাদর মাফ কর, গ্রীষ্মে নিদারুণ
পোলাও কাবাব কোর্ম্মা অসহ্য আমার।
যেথা আছি সেথা রব দু'টী ভাত ডাল
যাহা জোটে, দেব পেটে গণ্ডা দুই চারি
সন্দেশ মোণ্ডার সাথে।" নিশ্বসি ফিরিল
খান সাহেবের (১৭) দূত, যথা ফিরে যায়
মামলা হারিয়া হায় গরীব মক্কেল
উকিল সেরেস্তা হ'তে কাগজাত নিয়ে।
হেথায় দাঁড়ায়ে পথে যোগেন্দ্র চাহিয়া
যেথা ধন্বন্তরী-রাজ (১৮) কীর্ত্তন সায়রে
খাইতেছে হাবুডুবু, "কেমনে তুলিব
এ কালোমাণিক আমি ?" ভাবিছে কেবলি।
সহসা ডুবুরি (১৯) আসি' টানিয়া তুলিল
কৃষ্ণকান্ত মণিটীরে। রায় বাহাদুর
আদরে ধরিলা বুকে, হাস্য বিনিময়ে
সব কথা শেষ হ'ল। ফিরিলা উভয়ে।

১৭। মৌলভি আসফ খাঁ, খাঁ সাহেব, অন্যতম চেয়ারম্যান-পদপ্রার্থী।
১৮। সিভিল সার্জ্জন মিঃ অম্বিকা চরণ দত্ত, ডি, বি, মেম্বার।
১৯। কবি স্বয়ং।

"সারথি চালাও রথ!" যোগেন্দ্র হাঁকিলা,
মহারবে ভঙ্গ করি নৈশ নীরবতা,
বীর বর্ম্মণের (২০) নিদ্রা ছুটি, এল রথ।
সেথা হ'তে চলে ছুটে রাতি দ্বিপ্রহরে
আলমনগর ধামে, যেথায় নছর (২১)
চিড়ার সাহেব সম দীর্ঘ শ্মশ্রু নাড়ি
সুরেন্দ্রে বীজন করে। সেথা কি যে কথা
কেহ না জানিল কিছু—স্তব্ধ হ'ল রাতি।

সমর দিনের ঊষা ধীরে ধীরে ধীরে
মোরগ প্রভাতী গায়। হেন কালে আসি
দূত দুঃসংবাদ দিল। চমকি উঠিল
প্রতাপ খুলিয়া আঁখি, কাঁপিল হামিদ
শঙ্কাকণ্টকিত শ্মশ্রু, যোগেন্দ্র আসিয়া
কহিলা আবেগ ভরে, "একি শুনি কথা
এত আয়োজন সব করি দিবে ফাঁপা
'হলো', বুঝি শেষ কালে, বিকল বাহন
শিকল খসেছে তার! কি হ'বে উপায়?"
"ফণীন্দ্র (২২) মাতলী কোথা?" হাঁকে বাহাদুর
"চালাও স্যন্দন তব নিলফামারী পুরে

২০। রায় সাহেব পঞ্চানন বর্ম্মন, ক্ষত্রিয়সম্প্রদায়ের নেতা ও ডি, বি, মেম্বার।
২১। নসর উদ্দিন, ডি, বি, মেম্বার, জমিদার সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর প্রজা।
ণীন্দ্র রায়, রায় বাহাদুরের মোটর ড্রাইভার।

ব্রিটিশ নন্দন (২৩) যেথা রথ-ভঙ্গ হেতু
সময়ে আসিতে নারে।" চলিল স্যন্দন।

আজি লঙ্কা ভাগ হ'বে যোগেশ ভবনে
ভাগীদার মন্ত্রী সব জুটে গেল ক্রমে
আসেন কাকিনা-কান্ত বাইক্ বাহনে,
কুণ্ডীরাজ ছক্কর বিহারী ; তথৈবচ
গড্ডীমারী, স্বরাজীয়া আসে দ্রুতগতি
বছার দ্বিচক্রযানে, আসিল না শুধু
নসর নীরস বুড়া—রাণী মন্দোদরী
অথবা স্বর্ণলঙ্কা না লোভিল তারে।
স্বাগত-ভাষণ শেষে অংশ হ'ল স্থির।
কুণ্ডী অসম্মত তাহে, যতীন্দ্র রুখিয়া
কহিলা "হা দগ্ধ ভাল! এত করি শেষে
এই ফল হ'ল তার! দিলে বিসর্জ্জন
রুটির টুক্‌রার লোভে 'পার্টি'র সম্মান!
হেথা না রহিব আর!" চলিল ছুটিয়া
না টানিয়া সিগারেট, না খাইয়া পান
হতজ্ঞান অভিমানে। চশমার তলে
রক্তবর্ণ করি আঁখি উঠে কুণ্ডীনাথ
বছার ধরিয়া তারে কহে সবিনয়ে
"তুমিও হইলে বাম?" নাসিকা কুঞ্চিয়া

২৩। নিলফামারীর ইউরোপীয়ান এস, ডি, ও, ডি, বি, মেম্বার।

সুরেন্দ্র উঠিল রথে, যথা উঠে যায়
বিবাহ বাসর হ'তে কথার খেলাপে
বর সহ বরকর্ত্তা। চাহিয়া যোগেশে
অবশেষে প্রিয়নাথ কহিলা কাতরে
"সব ব্যর্থ হ'ল বন্ধু! আপনার কোলে
ঝোল টানিবারে গেলে রুখিবে বিড়াল
এ কথা নিশ্চিত জেনো! চলিলাম আমি।"
চলি গেল প্রিয়নাথ দারুণ হতাশে।
টঙ্কাকার শ্মশ্রুগুচ্ছ উদ্যত করিয়া
বছার যোগেশে কহে, "যাক্ দোস্ত, যাক্
মোরা দুই জন আছি, আমরা সাধিব
মোদের সঙ্কল্প স্থির! চল চল এবে
বিলম্ব না সহে আর!" আসফ-মঞ্জিলে
দুই বন্ধু চলি গেলা।

বেলা দ্বিপ্রহর

সম্মুখে আসন্ন রণ, শিবিরে শিবিরে
বীরবৃন্দ সাজে রণে। পথে পথে পথে
চাহিয়া সহস্র আঁখি, রথে রথে রথে
বীর আসে যাত্রী সম তীর্থের মেলায়।
পাণ্ডারা দাঁড়ায়ে দ্বারে—দীর্ঘায়ত বপু
প্যাণ্ট কোটে আবরিয়া রায় বাহাদুর,
আচকান চাপকান চাপদাড়ী সহ
অবিকম্প খাঁ সাহেব, জরদ গরদ

আলখাল্লা বছারের, কালো আলপাকা
যোগেশ-শ্রীঅঙ্গে শোভে—মেঘ-আড়ম্বর
অমানিশীথের রাতে ; সুরেন্দ্র কোটিয়া
খর্ব্ব তনু লম্বা কোটে। আসে বীরদল
প্রতাপ প্রবল-ভাষী স্থূল নাসাশিরে
কাচ চক্ষু, রুক্ষ কেশ। সূক্ষ্ম অগ্রভাগ
শত্রুরে বিঁধিবে যেন শ্মশ্রু হামিদের,
চক্‌চকে মাথা, (হায় কেশের সহিত
আড়ি পাতিয়াছে বুঝি) যেন ঘটি তেল মাখা
গোলাকার পিতলের, বুড়া পঞ্চানন
পাকা আমটির মত, দীর্ঘ কালীপদ (২৪)
হ্রস্ব ভাষী, স্মিত হাস্য-মিলিত করুণা।
আরো কত বীর রাজে নাহি লেখা জোখা
বর্ণনা সম্ভব নহে। দাঁড়াইয়া দ্বারে
রঙ্গ দরশন লোভে—নগেন্দ্র (২৫) সুধীর
তিলক চাপকানধারী, সুগোল নিষ্কেশ
উত্তমাঙ্গ শ্রীঅতুল (২৬)। সেনজা সুরেন (২৭)
নস্যপ্রিয় হাস্যময় পকেটে দু' হাত
পকেট কাটার ভয়ে—পাৎলুন নূতন।
তাম্বুলে আরক্ত ওষ্ঠ মহাকায় দ্বারী

২৪। ডি, বি, মেম্বার।
২৫। নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, উকিল, বৈষ্ণব।
২৬। অতুল চন্দ্র রায়, উকিল, (টাকপড়া মাথা)।
২৭। সুরেন্দ্রনাথ সেন, উকিল।

কভু হাওয়াগাড়ী কভু টম্‌টম্‌ বিহারী
অতুল ডাক্তার ভীম, পশ্চাতে যতীশ
অতল পাথারে মগ্ন লুপ্ত ধর্ম্মসভা
দংষ্ট্রামুখে তুলি যেবা ইত্যাদি ইত্যাদি
রণরঙ্গ আরম্ভিলা প্রতাপ উঠিয়া
সবারে ডাকিয়া কহে "দেহ জয়ধ্বনি
রায় বাহাদুর জয়!" কহিলা স্বরাজী
বছার গরজি এবে, "নহে নহে নহে
হেন কথা নাহি কহ। করহ স্মরণ"
না ফুরাতে কথা তার বীর পঞ্চানন
আসন ত্যজিয়া কহে, "ক্ষান্ত হও সব
এ ভাষা সহিতে নারি, ধর্ম্মযুদ্ধ হোক্‌
চীৎকারে কি কাজ কহ।" ওদিকে পশ্চাতে
বছারের কথা শুনি ধিক্কারি চলিল
রউফ নাসিকা কুঞ্চি। চমকি উঠিল
সভাতল, এল যবে কাগজ সম্ভার
ভাগ্য বিনির্ণয় লিপি। চলে খস্‌ খস্‌
পেন্সিল কলম আর—নিস্পন্দ নীরব
রায় বাহাদুর স্থির। নিঃশ্বসিছে হোথা'
আসফ নিমীল নেত্রে। লক্ষ্য উভয়ের
ভাগ্যপত্র-খণ্ড পানে; কাগজ টুক্‌রা
প্রাণ যেন তারি মাঝে, আছিল যেমন
ভ্রমর ভ্রমরী মাঝে জীবন দৈত্যের
উপকথিকার রাজ্যে। লিপি হ'ল লেখা,

বারেক যোগেশে চাহি বারেক শরতে
লাহিড়ীও দিল ঢেঁড়া, কাঁপিল যোগেশ।
অম্বিকা হাঁকিল, "জয়, জয় বাহাদুর!"
সমাপ্ত সমররঙ্গ—করতালি ধ্বনি
হাসি আর অশ্রু মাঝে! সবে ফিরে ঘরে
প্রতীক্ষা করিছে যেথা ধান দুর্ব্বা লয়ে
অন্তঃপুরিকার দল। রিপোর্ট ফুরাল।
গাহিয়া উঠিল দূরে এক কীর্ত্তনীয়া
না জানি কাহারে লক্ষ্যি চণ্ডিদাস পদ।

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমারি বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া॥
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
এমতি করল কে?
আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥

হেমন্তের রাত্রি শেষে

[রবীন্দ্রনাথ মৈত্র]

চলি পথে রাত্রি শেষে ; গ্রামান্তের আঁকা বাঁকা পথ
নিশির শিশিরে-স্নাত পড়ে আছে স্বপন আলসে ;
হোথা বাবলার সারি—স্পন্দহীন, চিত্রার্পিতবৎ—
তাহারি শাখার ফাঁকে নিশান্তের ক্ষীণ শশী হাসে।
কুলগাছে ঝরে পাতা—দহিয়াল ঝাপটিছে পাখা,
তাহারি আড়ালে হোথা পুষ্পশেষ শেফালি দাঁড়ায়ে
শিশির ঝরায়ে কাঁদে, ঘনশ্যাম পল্লবিত শাখা
রিক্ত কৃষ্ণচূড়া পানে বকুল সে রয়েছে বাড়ায়ে।
কুহেলি ছাড়িয়া পথ বেণুবনে করে যাই যাই,
আকাশ-প্রদীপ নিভে গেছে ওই গোপ-গৃহাঙ্গণে ;
এখনো ঘুমায়ে বধূ, আঙিনায় বাঁধা বুধী গাই
ব্যাকুল উৎসুক আঁখি দ্বারপানে চাহে ক্ষণে ক্ষণে।

আশ্বিন, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ

[শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়]

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া মহা ভুল করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার বুদ্ধি, জ্ঞান, উৎসাহ, দেশপ্রেম, ধর্ম্মোন্মাদনা, সাহিত্যানুরাগ ইত্যাদি সকল কিছুর মধ্যেই যে প্রখরতা দেখিয়াছি তাহার পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র ঠিক উদ্ভিদবহুল এই বাংলা দেশ নহে। যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক নিজ মতের প্রচার বা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিতে পারে, যে দেশে মানুষকে মতের জন্য আগুনে পুড়িয়া মরিতে হয়, যে দেশে লিখিত বা কথিত বাণীর প্রেরণায় সহস্রের প্রাণে বহ্নিশিখা তীব্র তেজে জ্বলিয়া উঠে, যে স্থানে প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধের কাহিনী রক্তের অক্ষরে লিখিত হয়, কথা যে দেশে উন্মাদনার অস্ত্র—আত্মপ্রবঞ্চনার নহে; এমনই কোনও দেশে রবির আবির্ভাব হইলে ভাল হইত। ভাতের হাঁড়িতে হাতাই শোভা পায়—খাঁড়া নয়; বল্লম দিয়া ঝুল ঝাড়া চলিতে পারে বটে, তথাপি ঝাঁটাই সে কার্য্যের পক্ষে আরও উপযুক্ত; তেমনি রবীন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁহার শাণিত সাহিত্য ও ভাষায় যে কার্য্য করিতেছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক দুর্দ্ধর্ষ কার্য্য যথাস্থানে জন্মাইলে তাঁহার দ্বারা হইতে পারিত। আজ রবি আমাদের কাছে নাই। দূরের চেয়ে হয় ত সে দূরে চলিয়া গিয়াছে, কিম্বা কে জানে, হয় ত বা কাছের থেকেও সে আরো কাছেই রহিয়াছে; তাই তাহার সম্বন্ধে অবান্তর আলোচনা করিতে মন চায় না। সে স্বর্গে গিয়া থাকিলে ফাঁকি দিয়া যে সকল জুয়াচোর স্বর্গে আস্তানা গাড়িয়াছে তাহাদের বড়ই বিপদ; কারণ তাহার পার্থিব প্রাণ কোন দিন মেকি সহ্য করিতে পারিত না; তাহার অমর আত্মা যে জাল সহ্য করিবে

না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তাহার সকল কার্য্যই যেমন ঝড়ের বেগে হইত, মৃত্যুও তেমনিই আকস্মিক। কখন কখন যেমন রবি হঠাৎ ধর্ম্মের টানে সাহিত্য, বন্ধুবান্ধব সব কিছু ছাড়িয়া উধাও হইয়া যাইত, দিনের পর দিন কেহ জানিত না যে সে কোথায় কি করিতেছে; তেমনই বুঝি আজ হঠাৎ কোন অজানা আবেগের টানে সে এ সংসার ত্যাগ করিয়া অনন্তের কোলে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। হয় ত বা সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে মৃত্যুর পরপারে আবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে—কে জানে? কিন্তু এ কথা ঠিক জানি যে তখনও দেখিব সে তীব্র, প্রখর আবেগে স্বর্গ, নরক, আত্মা, পুনর্জন্ম, ভগবান কিংবা চিত্রগুপ্তের হিসাবের খাতা কিছু না কিছু লইয়া ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত, ভাঙ্গিয়া গড়িতে দৃঢ় সঙ্কল্প। শান্তি বা পূর্ণ পরিতৃপ্তির অন্ধকার রবির আলোর সহিত মিশ খায় না। সেই আলোকের ভিতর রহিয়াছে, প্রাণ, পরিবর্ত্তন ও ক্রমাগত গঠনপ্রচেষ্টা। রবির আলো নিভিয়াছে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাঁহারা আকস্মিক শোকে মুহ্যমান হইয়া এই ধারণা করিতেছেন তাঁহাদের সে ভুল ভবিষ্যতে ভাঙ্গিবে।

রবির স্মৃতি কি করিয়া রক্ষা করা যায়? আমার মনে হয় রবির স্মৃতিরক্ষা যুগে যুগে নিজ হইতে হইতে থাকিবে। নিত্য নূতন ভাঙ্গা, গড়া, অভিযোগ ও যুদ্ধের ভিতর দিয়া সে স্মৃতি চিরজাগ্রত থাকিবে। যদি কপালে বার্দ্ধক্য লেখা থাকে, তাহা হইলে আজ হইতে ৫০ বৎসর পরেও যখন দেখিব যুবক ক্ষিপ্ত-গর্ব্বিত দৃপ্ত রোষে সমাজের কোন অনাচার লগুড়াঘাতে ভাঙ্গিতে দৃঢ়কল্প তখন মনে পড়িবে তারই কথা যে আমাদের যৌবনে এরূপ কার্য্যে আমাদের অগ্রগণ্য ছিল।

দেবদূত দিবাকর

[শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়]

(ছাত্র, প্রথম বার্ষিক শ্রেণী)

দুর্দ্দিনের সুনিবিড় তমিস্রা ভেদিয়া
কে তুমি গো দেখা দিলে, ক্ষণতরে ভাবের পূজারী,
চির আত্ম-ভোলা !
নিজ সুখে উদাসীন, পর দুঃখ লাগি'
দৈন্য মাঝে, দুঃখ মাঝে
সদা আপনারে দিয়েছ বিলায়ে
অম্লান সহাস্য মুখে।
কিন্তু একি অকস্মাৎ নিদারুণ কথা—
তুমি নাই !
এত শীঘ্র চলি' গেলে ওগো দেবদূত
অসমাপ্ত রাখি শত কাজ !
কত যে দিবার ছিল, কতটুকু দিয়ে
অস্তাচলে গেলে দিবাকর।
অফুরন্ত হাসির হিল্লোলে কে হাসাবে আর ?
আর্ত্তজনে কে দেখিবে সখা
পরম মিত্রের মত ?
ভারতের এ আঁধারে
ক্ষণিকের আলো ক্ষণেক জ্বলিয়া
আবার নিভিয়া গেল গভীর আঁধারে।

সবে কহে—
রবীন্দ্র মৈত্রেয় নাহি আর !
মোদের অন্তর মাঝে
যেই স্থান শূন্য করি গেলে,
অপূর্ণ রহিবে তাহা চিরদিন।
হে আত্মার আত্মীয়
অযোগ্যের আজিকার এ প্রণামখানি
করিয়ো গ্রহণ।

রবির জীবনী

[শ্রীসজ [illegible] কান্ত দাস]

সুখের বিষয় পৃথিবীর অধি [illegible]—শতকরা নিরানব্বই জনের জীবনী, 'জন্ম এত সালে এবং মৃত্যু এত সালে' এইটুকুতেই পরিসমাপ্ত অধিক সংখ্যক লোকের জীবনী লইয়া মানুষের স্মৃতি ভারাক্রান্ত হই বিপদের অন্ত থাকিত না; ইতিহাস বিষয়টাই শুষ্ক ও কঠোর হইত।

তেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, কাজের উন্মাদনায় সতত চলমান জী কোথায়? 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব'-দের মধ্যে তাহার দ বহু ভাগ্যে মেলে। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বাঁচিয়া থাকিলে অন্ততঃ কি কালের জন্য এই ক্ষোভ আমাদের মিটাইতে পারিত। তাহার অকা মৃত্যুতেও সে এমন জীবন পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে যাহার মধ্যে

অমর জীবনের আভাস আছে,—এই কথা বলিবার প্রয়াস আছে যে, **আমি আসিয়াছিলাম**। যাইবার সময় যদি সে বলিয়া যাইতে পারিত, তোমরা শোন, **আমি চলিয়া যাইতেছি**, তবেই আমাদের ক্ষোভের কারণ থাকিত না; জীবনীহীন দেশে এমন একজন কর্ম্মীর জীবনী লিখিতে বসিয়া উপাদানের জন্য হাতড়াইয়া মরিতে হইত না। এই দুঃখ আমাদিগকে পীড়া দিতেছে।

রবির কর্ম্মজীবন তাহার সাহিত্যিক মনের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল বলিয়াই ভরসা আছে সাহিত্যবিভাগে সে আমাদিগকে যাহা দান করিয়া গিয়াছে তাহার মধ্য হইতেই একদিন তাহার মৃত্যুহীন জীবনের সন্ধান মিলিবে। সে জীবনভোর যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছে এবং করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহার উদ্বোধনসূত্র, তাহার গল্প কবিতা নাটক রসরচনা ও প্রবন্ধাদির মধ্যেই কোথাও না কোথাও নিহিত আছে। যে-মন যে উদার প্রাণ সেই সকল কাজে হাত দিয়াছিল তাহাদের পরিচয় সে রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পরিচয় রহিল শুধু সাহিত্যমর্ম্মীদের জন্য, জনসাধারণের কাছে তাহার কর্ম্মময় জীবনের বহিঃ পরিচয় ধরিয়া দিতে না পারিলে অর্দ্ধব্যর্থ রবির জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে।

আমরা রবির ব্যক্তিত্বের সহিত পরিচিত, তাহার সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়া তাহাকে চিনিয়াছিলাম; তাহার কর্ম্মজীবনকে সে যতটা পারিত আমাদের নিকট হইতে আড়াল করিয়া রাখিত। তাহার কর্ম্মক্ষেত্রও ছিল দূরে কাটিহার পূর্ণিয়া অঞ্চলের ওঁরাও সাঁওতালদের মধ্যে, রঙ্গপুরের রাজবংশীয়দের ভিতরে এবং আসাম অঞ্চলের পার্ব্বত্য জাতিদের পর্ণকুটিরগুলিতে। এই সকল কাজের

সামান্য সামান্য সন্ধান তাহার অগ্রজেরা রাখিতেন। তাঁহারা আমাদিগকে যাহা জানাইয়াছেন তাহাই পাঠকের নিকট উপস্থিত করা ছাড়া আমরা রবির জীবন সম্বন্ধে নূতন কিছুই বলিতে পারিব না।

রবির মেজ দাদা শ্রীযুক্ত প্রবোধনাথ মৈত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—

আপনারা আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা জানিতে চাহিয়াছেন। আমাদের পরিবারের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় সমস্ত কথা গুছাইয়া বলা এক প্রকার অসম্ভব। যাহা মনে আসিতেছে সংক্ষেপে লিখিলাম। আমাদের আদি পৈত্রিক বাসস্থান ফরিদপুর জেলার নাছুরিয়া গ্রামে ছিল। আমাদের পিতামহ, আমাদের পিতার বয়স যখন আড়াই বৎসর তখন পরলোকগত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমাদের পিতামহী তাঁহার শিশুসন্তান সহ তাঁহার পিত্রালয়, জেলা যশোহর অন্তর্গত ঝিনাইদহ মহকুমার অধীন কাজিলপুর গ্রামে বাস করিতে থাকেন। সেইখানেই আমাদের পিতৃদেব ৺প্রিয়নাথ মৈত্র মহাশয় লালিত পালিত হইয়াছিলেন। কুলীনের ছেলে অল্প বয়সেই জেলা ফরিদপুরের রতনদিয়া গ্রামের ৺গণেশচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের কন্যা আমাদের মাতা শ্রীযুক্তা উমাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শ্বশুরের সাহায্যে তিনি স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজে এফ-এ পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হন। কিন্তু সংসারের অর্থকষ্ট নিবন্ধন তাঁহার লেখাপড়া আর অগ্রসর হয় নাই। তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া সরকারী চাকরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তিনি দিনাজপুরে প্রথম সরকারী কাজে প্রবেশ করেন। কয়েক বৎসর চাকরী করার পর তিনি রংপুর সদরে বদলী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পদোন্নতি হইয়া রংপুরে কালেক্টারের সেরেস্তাদার পদে অধিষ্ঠান থাকা কালীন চাকুরীর কার্য্যকাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পেন্সান

গ্রহণ করেন। রংপুরের কট্‌কীপাড়ায় তখন আমাদের বাস ছিল। ঐ স্থানেই ১৩০২ কি ১৩০৩ সালের চৈত্র মাসে আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রবিবারে জন্ম বলিয়া তাহার নাম রবীন্দ্রনাথ রাখা হইয়াছিল। অতি শৈশব অবস্থা হইতেই রবীন্দ্রনাথের পাঠানুরাগ ও মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। আমাদের মাতা সেকালের মেয়েদের তুলনায় সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তিনি বংশের একমাত্র কন্যা হইলেও তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাকে যথাসাধ্য লেখাপড়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমার মায়ের মুখে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিয়া শিশু রবীন্দ্রনাথের ঐ গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিবার জন্য আগ্রহ দেখা যাইত। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ শেষ করিয়াই দ্বিতীয় ভাগ পড়িবার অপেক্ষা না রাখিয়া সে রামায়ণ, মহাভারত ও বালক বালিকাদের জন্য প্রচলিত মুকুল ও সখাসাথী পাঠ আরম্ভ করিয়া দেয়। যুক্তাক্ষর বা ফলার ব্যবহার পাইলেই সে মাতা কিম্বা অপর কাহারও নিকট তাহার উচ্চারণ জানিয়া লইত। তাহার স্মরণশক্তি এতদূর তীক্ষ্ণ ছিল যে যাহা একবার শুনিত তাহা কখনও ভুলিত না। তাহার ৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাহাকে নর্ম্মাল স্কুলের সংলগ্ন হরিমোহন পণ্ডিতের শিশু পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। সেখান হইতে পাঠ শেষ করিয়া জেলা স্কুলে প্রবেশ করে। সেখানেও ক্লাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া সে পরিগণিত হইয়াছিল।

আমাদের অপর ভ্রাতা ৺প্রকাশচন্দ্র দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে পীড়িত হওয়ায় তাহার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনা হইলে রবীন্দ্রনাথও মাতার সঙ্গে কলিকাতায় আইসে। কলিকাতায় চিকিৎসার কোন সুফল না হওয়ায় তাহার জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বাসা ভাড়া করিয়া ৭ মাস কাল আমাদিগকে দেওঘরে থাকিতে হয়। ঐ সময়

ঐরূপ ভাবে দীর্ঘ কাল প্রবাসে থাকিতে বাধ্য হওয়ায় ছেলেপিলেদের পড়াশুনার বিঘ্ন হইবার আশঙ্কায় বাৎসরিক পরীক্ষার মাত্র দেড় মাস পূর্ব্বে পিতৃদেব পুত্র রবীন্দ্রনাথ ও পৌত্র ৺সরোজকুমারকে দেওঘর হাই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

অত্যল্প সময়ের মধ্যে বালকদ্বয় সম্পূর্ণ নূতন পাঠ্য পুস্তকগুলি আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষায় নিজ নিজ শ্রেণীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। আমাদের পিতৃদেব পরিবারস্থ ছেলেপিলের জন্য কখনও গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন নাই। গৃহকর্ত্তার তত্ত্বাবধানে ছেলেদের শিক্ষা যেরূপ হইবে মাসিক বেতনভোগী ব্যক্তির দ্বারা সেইরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে বরং অনুপযুক্ত শিক্ষকের হাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনা অধিক ইহাই পিতৃদেবের ধারণা ছিল। তিনি ছেলেপিলেদের স্বয়ং শিক্ষা দিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। এই বিষয়ে তিনি নিজ পরিবারের বা অপর ছেলেপিলেদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যের ভাব পোষণ করেন নাই। আত্মীয় ব্যতীত বহু অনাত্মীয় শিক্ষার্থী আমাদের বাটীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছে।

এইরূপ পরিবেষ্টনের মধ্যে ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দীক্ষা হইয়াছিল এবং সে নিজেও পিতার এই গুণের অধিকারী হইয়াছিল। স্বল্প জীবনকাল মধ্যে ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ বহু হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের শিক্ষাকল্পে বহু শ্রম স্বীকার করিয়া গিয়াছে। স্বভাবতঃ তেজস্বী ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ তাহাদের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

দেওঘরের বায়ু পরিবর্ত্তনেও কোনরূপ উপকার না হওয়ায় আমরা ইং ১৯০৫ সালের চৈত্রমাসে আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্ম্মস্থল সৈয়দপুরে ফিরিয়া আসি। সেইখানেই ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। পিতৃদেব

অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন এবং রাজকার্য্য হইতে পূর্ণ অবসর লইয়া সপরিবারে নিজ বাসস্থলী ফাজিলপুরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন, এবং ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে স্থানীয় শৈলকুপা হাই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই স্কুলে পাঠ কালীন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত ভাবে সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ হয়। সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী যুগে আবালবৃদ্ধ বনিতার মধ্যে এক বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল—সুরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দের তেজগর্ভবাণী এবং যুগান্তরের উদ্দীপনামূলক রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথের বাল-হৃদয়ে দেশানুরাগের অনুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল। বালক রবীন্দ্রনাথ সঙ্গী বালকগণকে লইয়া সভা-সমিতি ও বক্তৃতা করিয়া প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়া নিজ ও নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে দেশাত্মবোধের বাণী প্রচার করিতে থাকে। সেই সময় হইতে সরকারের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয় এবং আজীবন সে তাহা ভোগ করিয়া গিয়াছে।

তাহার মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এবং পল্লীনারী ও বালক ও যুবকগণের মানসিক উৎকর্ষের জন্য নিজ বাটীতে "উমা গ্রন্থশালা" নামে এক ক্ষুদ্র লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছিল। তাহার পাঠানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি প্রথম হইতেই তাহার আকর্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। স্কুল জীবনেই সে মেঘদূত, কুমারসম্ভব, গীতা ও রবি ঠাকুরের কাব্য ও গদ্য গ্রন্থ পাঠ সাঙ্গ করিয়া মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। পণ্ডিত হেমন্তকুমার তাঁহার এই ছাত্রের সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। উত্তর কালে তাহার সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি বহু পণ্ডিতগণের বিস্ময়ের কারণ হইয়া তাহাকে বিদ্বন সমাজে প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী করিয়াছিল।

শৈলকুপা হাই স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া সে কলিকাতায় আসে এবং রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হয়। পরে বঙ্গবাসী কলেজ হইতে ইং ১৯১৫ সালে প্রথম বিভাগে আই, এ, এবং ১৯১৭ সালে ঐ কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি, এ, পাশ করিয়া ইউনিভারসিটি কলেজে এম, এ এবং রিপণ কলেজে 'ল' পড়িতে থাকে। প্রিলিমিনারী 'ল' পরীক্ষায় পাশ করিবার পর তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষার পাঠ হইতে বিরত হয় এবং কায়মনো-বাক্যে ঐ আন্দোলনে যোগদান করে।

শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ রংপুরকে তাহার কার্য্যস্থল নিরূপণ করিয়া লয়। এই সময় হইতে তাহার প্রতিভার গতি বিশেষ ভাবে দেশের ও দশের জন্য চালিত হইয়াছিল। তাহার তৎকালীন কার্য্যবিধি এতই বহুমুখী ও বিস্তৃত যে এই সংক্ষিপ্ত জীবন-কথায় তাহার সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাহার প্রিয়-শিষ্য ও সহকর্ম্মী শ্রীমান প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী এই বিষয় পত্রিকায় বিশেষরূপে জানাইবে বলিয়াছে।

পাঁচ বৎসর বয়ক্রম কালে রবি মাসাধিক কাল ভীষণ রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত থাকিয়া কবিরাজি চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর মাতুলালয়ে তাহার নিউমোনিয়া হয় তাহাতে সে মরণাপন্ন হইয়া বহু দিন ভুগিয়াছিল। ৬২ নং হ্যারিসন রোড মেসে থাকা কালীন সে পুনরায় নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হয়। বক্ষের দুই ধারেই রোগ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তৎসঙ্গে দারুণ হিক্কা ও অন্যান্য উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছিল। বাঁচিবার আশা ছিল না। সুচিকিৎসা ও মাতৃদেবীর অক্লান্ত শুশ্রূষার ফলে সেবার সে আরোগ্য লাভ করে। বি-এ পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে মাহিগঞ্জে তাহার একবার টাইফয়েড হইয়াছিল যদিও সে সারিয়া উঠিল কিন্তু সংস্কৃতে

অনার্স পরীক্ষা দেওয়া তাহার হইয়া উঠিল না। ৫১ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে থাকিয়া যখন সে আই-এ পড়ে সেই সময় আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দুই পুত্রের পর পর দশ দিনের মধ্যে অকাল মৃত্যু হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ কোমল প্রাণে বড় আঘাত পায়। ঐ বালক দুইটি অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিল। উহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে আশা আমরা সকলে পোষণ করিয়াছিলাম তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া গেল। বি-এ পরীক্ষার পর ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ফরিদপুর জেলার ভীমনগর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হরিবালা দেবীর সহিত রাজবাড়ী মোকামে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১৯১৮ সালের মার্চ্চ মাসে পিতৃদেব হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ছাড়িয়া যান। রবি তখন কলিকাতায়। টেলিগ্রাম পাইয়া আসিয়াও পিতৃদেবকে সে জীবিত দেখিতে পায় নাই। পিতৃ-ভক্ত পুত্র এ আঘাত জীবনে ভুলিতে পারে নাই।

রবির পিতৃমাতৃ ভক্তি অসাধারণ ছিল। মাতা ও দাদাকে দেখিবার জন্য সে কলিকাতা হইতে এবার আসিয়াছিল। আসিয়াই সে মাতাকে সর্ব্বপ্রথম প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল, "মা তুমি আমার যশ চাও না টাকা চাও"—মা উত্তর করিলেন, "বাবা আমার টাকার দরকার কি তোমার যশ হোক।" পর দিন রাত্রে বৈষয়িক আলাপ প্রসঙ্গে বড় দাদাকে বলিয়াছিল যে শীঘ্রই সে সমস্ত সংসারের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অবসর দিবে। অদৃষ্টের পরিহাস!

কলিকাতায় প্রথম অবস্থান কালে রবি ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত পরিচিত হয় এবং তাঁহার স্নেহ ও উৎসাহ বিশেষ ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল। রবির 'হাম্বির ও গঙ্গরাও' নাটকে ডি-এল রায়ের

প্রভাব দৃষ্ট হয়। গজরাও নাটক সৈয়দপুরের স্থায়ী নাট্য সমাজ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। রবির 'বিজয় নগর' নামক পঞ্চাঙ্ক নাটকে তাহার প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ নাটকখানি বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করার তাহার ইচ্ছা ছিল। এতৎ ব্যতীত 'একরাত্রি' নামক একখানি রসনাট্য সে বহুকাল আগে লিখিয়াছিল। উক্ত বইখানি আমাদের আত্মীয় হাই কোর্টের অ্যাডভোকেট সুবোধচন্দ্র লাহিড়ী, এম-এ, বি-এল অভিনয় করাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন তাহা আর ফেরৎ পাওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া 'মাধবী' নামে একখানা কমেডি লিখিতে আরম্ভ করিয়া দুই অঙ্ক লিখিবার পর সে আর অগ্রসর হয় নাই। তাহার প্রথম গল্প 'বাসন্তী' লিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, তৎপর আমাদের অনুরোধে সম্পূর্ণ করে। 'অব্যয় প্রয়োগ' নামে একখানা সংস্কৃত বহি লিখিয়াছিল এবং Messrs. N. N. Choudhury and Co.কে প্রকাশের জন্য দিয়াছিল এইরূপ শুনিয়াছি। এতৎ ব্যতীত বহু রচনা সে অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছে। ইদানীং সে কলিকাতায় থাকিয়া যাহা লিখিয়াছে তাহার সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় নাই।

নিজ অধ্যাপকের প্রতি রবি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করিত। তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত ভব বিভূতি বিদ্যাভূষণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সর্ব্বদাই উঁহাদের নাম করিত। ডাঃ সুনীতিকুমারের নাম আমাদের নিকট 'মাষ্টার মহাশয়' বলিয়া পরিচিত। 'মাষ্টার মহাশয়' তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যের জন্য যে পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য আমাদের পরিবারবর্গ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবে। বলিতে গেলে তিনিই আমাদের রবিকে সাহিত্য জগতের রবি করিয়া তুলিয়াছিলেন॥

তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরমহিতৈষী হিসাবে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও তাহার সহপাঠী মুরারীমোহন বসু ও "সত্যেনদা" "প্রফুল্লদা" ও "মাখনদা"র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবি মাহিগঞ্জ থাকা কালীন 'হিন্দি' শিক্ষা করিয়াছিল এবং French ও Italian ভাষা আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ও তাহার প্রিয় শনিবারের চিঠি ও আনন্দবাজার পত্রিকায় এখান হইতে লিখিতে আরম্ভ করে। রবি রংপুরে তাহার সেবা ও পরপোকারিতার গুণে অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়াছিল। গরিবের সে মা বাপ ছিল। তাহার আকস্মিক পরলোক গমন সংবাদ শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছে। এখনও রাস্তাঘাটে বহুলোক তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে।

মাহিগঞ্জে থাকা কালীন ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে local politicsএর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। কয়েক বৎসরের জন্য রংপুর ম্যুনিসিপালিটির কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। তাহার অগ্রজপ্রতিম কুণ্ডির জমিদার সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও সরকারী উকিল ও জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের election উপলক্ষে একাধিকবার সে কর্ম্মকুশলতা ও শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।
ব্যাপার লইয়া তাহার প্রসিদ্ধ অভিনব ব্যঙ্গ কবিতা "বোর্ড বিজয় কাব্য" একরাত্রে রচিত হইয়া তাহারই সম্পাদিত "বার্ত্তা" নামক সাপ্তাহিক কাগজে বাহির হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত সুরেন্দ্রবাবুর আগ্রহে ও উদ্যোগে "বার্ত্তা" প্রকাশিত হয় এবং রবি তাহার উদ্দেশ্য প্রচার ও সাধন মানসে সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়া "বার্ত্তা"র প্রথম সংখ্যায় তাহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য লোক সমাজে উপস্থিত করে।

শ্রীমান রবি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তাহা জার্নালিজ্‌মই হউক কি বীমার কাজই হউক তৎসম্পর্কে বিশিষ্টজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করিয়া কখনও নিরস্ত হয় নাই। এইরূপে সংস্কৃত ও বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যেও সে প্রভূত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিল।

হিন্দুজাতি ও ধর্ম্মের জন্য তাহার ঐকান্তিক দরদ ছিল। নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা তাহার অপরিসীম ছিল। তাহাদিগকে অসম্মান ও লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিতে সে দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। বহু নির্য্যাতিতা ললনাকে সে রক্ষা করিয়াছে—আশ্রয় দিয়াছে—ভবিষ্যতের উপায় করিয়া দিয়াছে। তজ্জন্য পাষণ্ডের দল তাহাকে অপমানের এমন কি মৃত্যুভয় দেখাইয়াছে। সে কোনদিন তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে নাই। সে নিজে ছিল অভয় মন্ত্রের উপাসক এবং তাহার শিষ্যবর্গও দেশকে সেই মন্ত্রদান করিয়া গিয়াছে। পরোপকার ও সেবা ধর্ম্ম তাহার প্রকৃতিগত ছিল। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সে তাহা পালন করিয়া গিয়াছে। কলিকাতার দাঙ্গার পর হইতে হিন্দু সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং সেই সময় হইতে অনুন্নত সম্প্রদায়কে উন্নীত ও একত্র করিয়া সে হিন্দুশক্তিবৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার magnetic ও dynamic personalityর প্রভাবে এই দুরূহ কার্য্য সরল হইয়া আসিয়াছিল। দূর—আসাম ও ছোটনাগপুর হইতে যখন আহ্বান আসিতেছিল তখনই পরলোক হইতে তাহার ডাক আসিয়া পৌঁছিল—আর আরব্ধ কার্য্য পূর্ণ হইয়া উঠিল না।

এই সেবাব্রত পাইয়া তাহাকে অনেক সময় বিব্রত হইতে হইয়াছে। স্বার্থান্বেষী লোকেরা তাহার স্বভাবের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে; একথা

তাহাকে বুঝাইয়া দিলেও সে তাহাতে কর্ণপাত করিতে চাহে নাই।

রবির নিজ শক্তির উপর পূর্ণ আস্থা ছিল—বহুবিঘ্ন বিপত্তির সম্মুখীন হইতে তাহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু কোনদিন বিচলিত হইতে দেখি নাই। রবির সামাজিক সেবা ও সংস্কার কার্য্য সম্পর্কে বিদ্রূপ উপহাস লোকে পরোক্ষে করিয়াছে। কিন্তু সম্মুখে কাহারও কোন কথা বলিতে সাহসে কুলায় নাই এমনই ছিল তাহার ব্যক্তিত্ব। অধিকাংশ নবীন যুবক তাহার দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একজন সাধারণ অর্থহীন মধ্যবিৎ ব্রাহ্মণ যুবকের পক্ষে সমাজ সংস্কার ও আশ্রিত প্রতিপালন করা কতদূর দুরূহ তাহা সহজে অনুমেয়। কিন্তু কোন বাধা বা বিঘ্ন তাহাকে টলাইতে পারে নাই, অর্থাভাব হেতু সে অনেক সময়ে বহু অসুবিধা ভোগ করিয়াছে। অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর পূর্ণতা সাধন করিবার মানসে সে কলিকাতা তাহার কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিল।

গ্রন্থ সংগ্রহ করা রবির hobby ছিল। মুসলমান বটতলা সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট পর্য্যন্ত তাহার পাঠাগারে স্থান পাইয়াছে। বহু পুরাতন হস্তলিখিত শাস্ত্র ও বৈষ্ণবগ্রন্থ সে সংগ্রহ করিয়াছিল।

পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি অচলা ভক্তি, ভ্রাতৃভগ্নিপ্রীতি, নিজ শক্তির প্রতি অবিচল বিশ্বাস, নির্ভীকতা, দেশধর্ম্মানুরাগ, সহৃদয়তা, আশ্রিতবাৎসল্য, buoyant optimisim পরিপূর্ণভাবে তাহার মধ্যে ছিল। অপরিণামদর্শিতা ও অমিতব্যয়িতা তাহার ছিল বটে কিন্তু তাহা অনেকটা বংশগত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

৺মথুরানাথ মৈত্র=৺বিশ্বেশ্বরী দেবী
৺প্রিয়নাথ মৈত্র=উমা দেবী
প্রমথনাথ
প্রমদা দেবী
প্রবোধনাথ
প্রফুল্লনাথ
৺প্রতিভা দেবী
৺প্রকাশচন্দ্র
৺রবীন্দ্রনাথ
প্রীতিকুসুম দেবী
পারুল
৺সরোজকুমার
৺জগদীশকুমার
ভবানী শিবানী সুবোধ বলাই শঙ্কর বুড়ী মণি নন্দদুলাল
ইন্দিরা রথী মুক্তি কার্ত্তিক গৌরী কালু নতি
দেবব্রত টুলী শান্তি ৺সীতা শক্তি ভক্তি মায়া লালা মতি

রবির জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মৈত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—রবির সম্বন্ধে একটা বিষয় আমি জানি যাহা বোধ হয় আর কেহ সেরূপ ভাবে জানে না। অন্য কোন বিষয় সে আমার সহিত সেরূপ আলোচনা করিত না। আমার সহিত তাহার আলাপ আলোচনার বিষয় ছিল "ওঁরাওন্ মিশন"। তাহার মত শক্তিশালী এবং নিঃস্বার্থ আত্মভোলা এবং এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার মত লোক বর্ত্তমানে আমাদের বংশের মধ্যে দেখি না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর রবির খেয়াল হয় যে হিন্দুদের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তি সম্পন্ন এক দল গঠিত হওয়া উচিত যাহাদের দ্বারা হিন্দু ও হিন্দুর মন্দির রক্ষা করা যাইতে পারে।

এটা রবির খেয়াল বলিয়া প্রথম মনে হইয়াছিল। প্রথম সে কল্পনা করে যে হিন্দুমিশনের দ্বারা এই ওঁরাওনদের একটি কলোনী কোন স্থানে সৃষ্টি করিবে। সেই জন্য সে আমাকে কিছু জমি বন্দোবস্ত করিতে বলে। এই প্রস্তাবটি আমি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জির বাড়ীতে মৈমনসিংহের জমিদার শ্রীহরকান্ত ঘোষ ও দুর্গাকান্ত ঘোষের নিকট তাঁহাদের ফকিরগঞ্জের জমির বন্দোবস্ত লইবার প্রস্তাব করি। জমির পরিমাণ প্রায় আড়াই হাজার বিঘা। তাঁহারা এই জমি দিতে স্বীকৃত হন। হিন্দুমিশনের আর্থিক অবস্থা জানিতাম না, এখনও জানি না। রবির তখনকার আর্থিক অবস্থায় এত বড় একটা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব ছিল। বোধ হয় সেই জন্য হিন্দুমিশন বা রবি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে নাই। কয়েক মাস পরে হরকান্ত ঘোষ মহাশয় আমাকে বলেন, যদি এই জমি কোন firmকে দেওয়া যায় তাহাতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি না? আমি তাহাতে বলি যে যাহাদের জন্য এই জমি লইবার প্রস্তাব

করিয়াছি তাহাদের যখন কোন আগ্রহ নাই তখন এ জমি কোন firmকে দিলে আমার কোনরূপ আপত্তি নাই।

তাহার পর হঠাৎ একদিন শুনিলাম যে রবি কতকগুলি খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বী ওঁরাওন্‌কে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। তাহার পর ক্রমেই দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এ সমস্তই রবির একার শক্তি এবং অর্থ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। যখন বড় একটি সঙ্ঘ গঠিত হইল সেই সময় রবি Krukh dialect শিখিতে আরম্ভ করে। তখন তাহার কল্পনা হয় যে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করার পর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি রকম প্রাথমিক পুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে। ইহারা Animist. ইহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার উপলব্ধি করাইতে কিরূপ উপদেশাবলী প্রস্তুত করিতে হইবে। তৎপরে ওঁরাওনদের সঙ্গীত, তাহাদের প্রচলিত কাহিনী প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার একটা স্কীম প্রস্তুত করে। গত পূজার সময় যখন সে এখানে আসে তখন আমাকে বলে যে Krukh সে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহার অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চাটার্জ্জি (ইহার সহিত আমি পরিচিত নহি) মহাশয়ের নিকট গিয়া উপদেশ লইবে।

কি characterএ ইহাদের পুস্তকাবলী লেখা হইবে সে সম্বন্ধে কতকগুলি কাগজে তাহার বিচার লেখা ছিল। কাগজগুলি তাহার ওখানে আছে কি না সজনীবাবু চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। একটা কথা আমার মনে আছে, সে আমাকে বলিয়াছিল যে ওঁরাওনরা তীর, ধনুক, খাঁড়া, বল্লম প্রভৃতির সঙ্গে সুপরিচিত। যে characterএ এই সমস্ত জিনিষ চিহ্নিত থাকিবে সেই characterএর পুস্তক লিখিলে তাহাদের সহজবোধ্য হইবে। তাহাতে আমি বলি যে তাহা হইলে উর্দ্দু characterএ হওয়া উচিত। তাহাতে সে বলে যে উর্দ্দুতে হিন্দুর

সংস্কার রাখা যায় না। বোধ হয় শেষে বিচার করিয়া বাংলা characterএর পুস্তক ছাপানর কল্পনা করে। ওঁরাওনদের মধ্যে একটি কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে সেই কেন্দ্রে সমিতির memberদের ভবিষ্যতে যেরূপ তালিকা-বই রাখিতে হইবে তাহার একটা খসড়া প্রস্তুত করে। নিম্নে তাহার আভাষ দেওয়া গেল—

(১) সমিতির Memberএর নাম ও ঠিকানা।

(২) লোক সংখ্যা।

(৩) পূর্ণ বয়স্ক লোকের সংখ্যা। স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকার সংখ্যা।

(৪) যে পরিমাণে বৎসরে ধানের আবশ্যক।

(৫) কতখানি জমি আবাদ করে।

(৬) জমি নিজের কি না।

(৭) যাহার জমি নাই তাহার জমির কোন বন্দোবস্ত হইতে পারে কি না।

(৮) ঋণ আছে কি না। যদি থাকে তাহার পরিমাণ কত।

(৯) মহাজনের নাম কি।

(১০) মহাজনের সহিত এরূপ কোন বন্দোবস্ত হইতে পারে কি না যাহাদ্বারা সহজে ঋণ পরিশোধ হইতে পারে।

(১১) কুটীর শিল্প কেহ করে কি না।

(১২) নূতন কোন কুটীর শিল্প প্রবর্ত্তন করিতে পারা যায় কি না।

(১৩) সমিতির Memberদের ও তাহাদের পরিবারদের মধ্যে কত লোক কি রোগে ভুগিয়াছে। নিকটে কোন হাসপাতাল আছে কি না।

তার পরের কলম্ সমস্ত ফাঁক ছিল। ঐ স্কীমের নীচে লেখা ছিল

যে প্রতি কেন্দ্রে হাসপাতাল, পাঠশালা এবং অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। তারপরে ছিল কিরূপ লোক তাহাদের পুরোহিত হওয়া উচিত।

গত পূজার সময় সে আমাকে বলিয়াছিল যে ওঁরাওনদের জন্য একটি *শিবমন্দির* ও উৎসবের স্থান করা উচিত এবং এইবারই শিবরাত্রের সময় ওঁরাওনদের লইয়া একটি উৎসব করিবার মনস্থ করিয়াছিল। পূজার সময় সে যখন আমাকে এই সমস্ত কথা বলে আমি তখন বলিয়াছিলাম ইহার জন্ত টাকা কোথা হইতে আসিবে। তাহাতে সে আমাকে বলিয়াছিল, এমন একখানা বই লিখিব যাহার আয় হইতে ওঁরাওন্ মিশন চলিবে। ভাওয়ালের গোবিন্দ দাসের অবস্থাদৃষ্টে তুই কি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের অবস্থা বুঝিতে পারিস্ না? সে আমাকে বলে বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার যেরূপ আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের অর্থকষ্ট থাকিবে না। এইটিকে আব্দারে রবির খেয়াল বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এই ওঁরাওন মিশন সম্বন্ধে আপনারা আর কিছু জানেন কিনা জানি না। আমি যতটুকু জানি লিখিলাম। আপনাদের কোন কাজে লাগিলে ব্যবহার করিবেন।

ভ্রম সংশোধন

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা যে চিঠিখানি প্রকাশিত হইয়াছে, উহার লেখক শ্রীগোপাল হালদার,—ভুল বশত শ্রীগোপাললাল হালদার ছাপা হইয়াছে।

চলচ্চিত্র

দোলসংখ্যা শনিবারের চিঠিতে নানা রকম দোলের কার্টুন ছবি দিতে হইবে ৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের এইরূপ ইচ্ছা ছিল। তাঁহার কল্পিত দোলসংখ্যা যে তাঁহার স্মৃতি-সংখ্যা হইবে তাহা কে জানিত! তবু তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী সুনিপুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দত্ত মহাশয়ের অঙ্কিত কয়েকটি ছবি দেওয়া গেল।—শ. চি. স।

বসন্ত উৎসব

মধু কালে এল হো—লি

মধুর হোলি

বসন্ত উৎসব
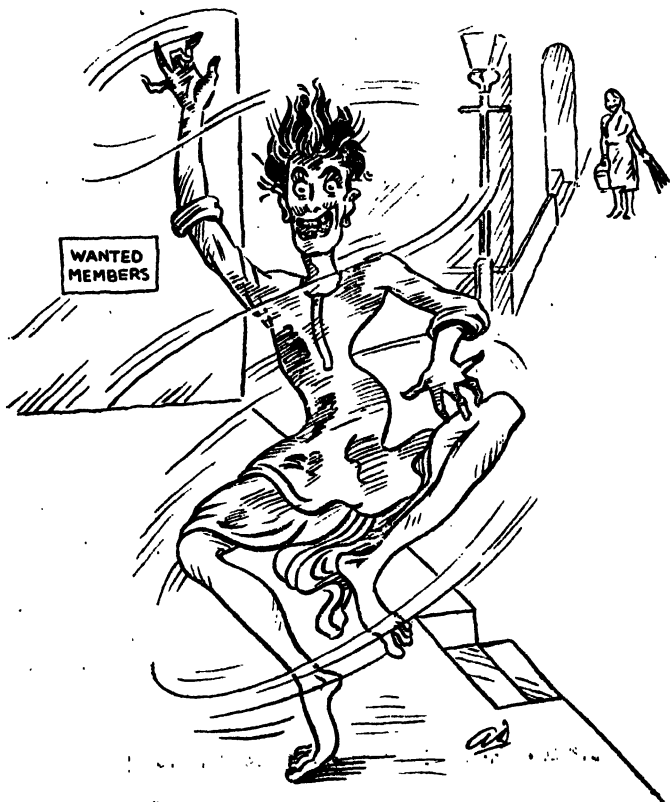
একবার নাচিয়ে নাচিয়ে আয়রে নীলমণি—
গোপাল রে—
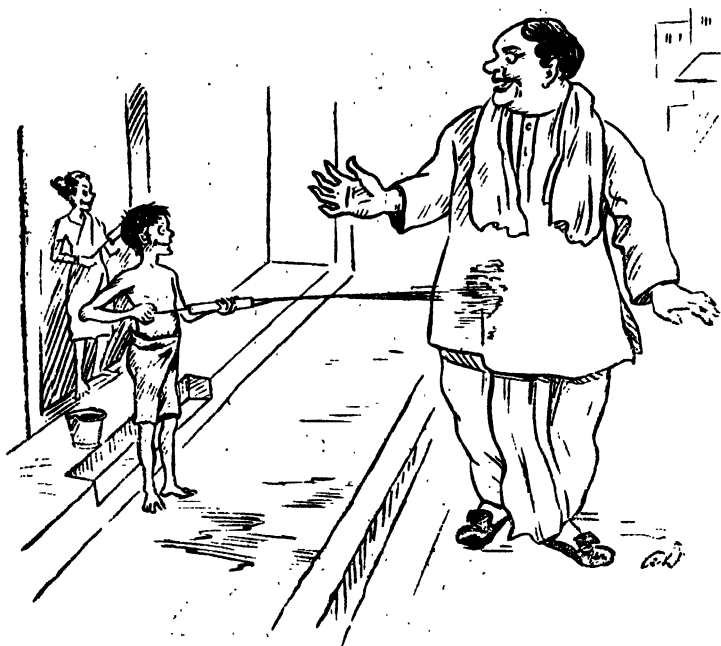
বসন্ত উৎসব

ত্যাখ্‌ছেন হালায়, পোলাপানের কাণ্ডডা ত্যাখ্‌ছেন!

বসন্ত উৎসব

সাহেবের সঙ্গে এন্গেজ্‌মেণ্ট মাইরি—
ভাল হবে না বল্‌ছি—

বসন্ত উৎসব

-আমি ঢের সয়েছি আর ত সব না—

বাবা, জীবনের অর্থ কি ?

রবীন্দ্র-স্মৃতি

[শ্রীপরিমল গোস্বামী]

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমার আত্মীয়। বাল্যকালের কয়েক বৎসর আমাদের একই পল্লীতে কাটিয়াছে—ফরিদপুর জেলার রতনদিয়া গ্রামে তিনি অনেকদিন ছিলেন। সে সময়ে আমি পঞ্চম কিম্বা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি।

তখনকার কথা মনে পড়ে। রবিমামা দুরন্ত বালক—তাঁহার কথাবার্ত্তা চালচলন একটা বিস্ময়কর আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া তুলিত — দল বাঁধিয়া চলাফেরা করিতেন—অনুচরবৃন্দ তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। তিনি কবিতা রচনা করিতেন, নাটকও লিখিয়াছিলেন সেই বয়সে—যতদূর মনে পড়ে তিনি তখন ম্যাট্রিকুলেশন পড়েন। প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় (ইনি বর্ত্তমানে ঝাঁসি ম্যাকডোনেল হাইস্কুলের হেডমাষ্টার)দের বাড়িতে রবিমামার আড্ডা জমিত।—সেখানে তিনি কখনো নিজের রচনা আবৃত্তি করিতেন কখনো বা কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের কবিতা, অথবা গীতা আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার মুখস্থ করিবার ক্ষমতায় আমরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম।

আমরা তাঁহার সঙ্গে মিশিতে সাহস করিতাম না—বয়স এবং বিদ্যা অনুযায়ী আমাদের পৃথক পৃথক দল ছিল। আমার পিতার (৺বিহারীলাল গোস্বামী) সঙ্গে রবিমামার ঘনিষ্ঠতা হইল। তাঁহার কুমারসম্ভবের পদ্যানুবাদ কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—এবং সেই সময়ে

তিনি শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার অনুবাদে নিযুক্ত—রবিবামা সেই সব বিষয়ে আমার পিতার সঙ্গে আলাপ করিতেন—কাজেই তাঁহাকে আমাদের চেয়ে অনেক বড় এবং সুদূর বলিয়া মনে হইত।

একদিন দেখি রবিমামা একখানা ফোটো লইয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়াইতেছেন। প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় বন্ধু, তাঁহাকে ডাকিয়া দেখাইলেন—আমিও সেই সঙ্গে দেখিলাম। ফোটোখানা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের—নীচে লেখা আছে To my young friend Rabindranath Maitra.—D. L. Roy. তারিখ মনে নাই। এই ব্যাপারে রবিমামা সম্বন্ধে আমাদের বিস্ময় বাড়িয়া গেল। তিনি তখন হইতেই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া ঘনিষ্ঠতা করিতেছেন, এইরূপ অসামান্য ঘটনা আমাদের মত বালকের মনে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করিত।

ইহার পরে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণে তিনি যে একটি নাটক লিখিতেছিলেন তাহা এই সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে প্রকাশ করা গেল।

তারপর অনেকদিন তাঁহাকে নিয়মিতরূপে দেখি নাই—মাঝে মাঝে কলিকাতায়—কখনো বা রতনদিয়াতে দেখা হইয়াছে—সঙ্গে একদল অনুচর বা শিষ্য। পরণে মোটা কাপড়—মাথায় প্রকাণ্ড শিখা। আমি তখন কলেজে পড়ি—কিন্তু তখনো আমি তাঁহার কাছে শিশু। তিনি এমন ভঙ্গিতে কথা কহিতেন যে তাঁহাকে কোনো কারণে আঘাত দেওয়া বা তাঁহার সঙ্গে সাময়িক কোনো বিষয় লইয়া তর্ক আলোচনা করিবার কল্পনাও মনে আসিত না। তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাঁহার প্রাণ-খোলা তরল হাসির মধ্যে এমন একটি গভীর আন্তরিকতা ধ্বনিত হইয়া উঠিত যে তাঁহাকে বাল্যকালে যে শ্রদ্ধা-বিস্ময়ের চোখে

দেখিয়াছিলাম—তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে সাধারণ লোকের পর্য্যায়ে স্থাপন করিতে পারি নাই। বাল্যকালে যে সমস্ত রহস্য এবং বিস্ময় মনকে অধিকার করে, বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার মতই হাওয়ায় মিশিয়া যায়। কিন্তু রবিমামা সম্বন্ধে আমার সেই মনোভাব শেষ পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল।

তারপর অনেকদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। গত পূর্ব্ব বৎসরে আমার পিতার মৃত্যু হয়—সেই সময়ে আমি ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএ থাকিতাম। হঠাৎ একদিন দেখি তিনি কোথা হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারই উৎসাহে পিতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রবাসীতে সজনীবাবুর কাছে পৌঁছাইয়া দিতে যাই। রবিমামা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। সেই সময় এক মাস ধরিয়া তিনি প্রায় প্রতিদিন সকালে আমার সঙ্গে দেখা করিয়া আমাকে নানারূপ সান্ত্বনা দিয়াছেন। তাঁহার অসামান্য স্নেহের পরিচয় যিনি পাইয়াছেন তাঁহার বুকে তাঁহার মৃত্যুশোক নির্ম্মম হইয়াই বাজিবে। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ হইতে মানুষ রবীন্দ্রনাথ এত বড় এত মহৎ এবং ব্যাপক ছিল যে তাঁহার সঙ্গে পরিচিত আমরা তাঁহাকে হারাইয়া আজ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি।

তাঁহার সম্বন্ধে যিনিই কিছু লিখিবেন তাহাই ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ে মুখর হইবে—কিন্তু লেখা আজ মূল্যহীন মনে হইতেছে—রবীন্দ্রনাথ আজ কেন এমন আকস্মিকভাবে আমাদের ত্যাগ করিয়া গেলেন—এই কথাটাই নির্ম্মম নিয়তির কাছে চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—কিন্তু ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে না—কোনোদিন কেহ পায় নাই।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া কলম নামাইয়াছি—মনে অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু সংসারের দাবী বিচিত্র। জনৈক এম-এ উপাধিধারী প্যারডি আর্টিষ্ট অকস্মাৎ আপিস ঘরে প্রবেশ করিয়াই অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান ধরিয়া দিলেন। তিন চার মিনিট গাহিয়া বলিলেন, শনিবারের চিঠিতে চল্‌বে ?

বলিলাম—লিখে রেখে যান।

তিনি চট্ করিয়া কলম লইয়া গানটি লিখিয়া রাখিয়া গেলেন।

রবিমামার কথা বেশি করিয়া মনে পড়িল। মনে হইল যেন তাঁহার "বাস্তবিকা" হইতে কোনো চরিত্র হঠাৎ জীবন্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

আজি তিনি জীবিত থাকিলে এই উপলক্ষে আর একটি গল্প রচিত হইতে পারিত।

— —

৺রবীন্দ্রনাথ কি কি পুস্তক লিখিয়াছেন

১। মেবার কাহিনী (গল্পের বই)
২। সিন্ধুসরিৎ (কবিতা)
৩। মায়াজাল (উপন্যাস)
৪। থার্ডক্লাস্ (ছোট গল্প)
৫। উদাসীর মাঠ (ঐ)
৬। দিবাকরী (ব্যঙ্গ গল্প)
৭। বাস্তবিকা (ঐ)
৮। ত্রিলোচন কবিরাজ (ঐ)
৯। মানময়ী গার্ল‍্স্ স্কুল (ব্যঙ্গনাট্য)
১০। ঘৃতকুম্ভ (এই উপন্যাস অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে)

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

[শ্রীকৃষ্ণধন দে]

রবির সহিত প্রথম দেখা হয় প্রবাসীর কার্য্যালয়ে। অশোকবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন,—ইনিই রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ওরফে দিবাকর শর্ম্মা। প্রথম দর্শনেই কেমন মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মাথায় বড় বড় চুল, উজ্জ্বল চোখ, প্রতিভামণ্ডিত মুখশ্রী। শনিবারের চিঠির প্রায় প্রতি সংখ্যায় দিবাকরের রসরচনার সহিত পরিচিত ছিলাম, কিন্তু লেখককে কোনদিন দেখি নাই। সজনীবাবু একদিন রবিকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু ঠিক যোগাযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। তখন শনিবারের চিঠিতে আমি ব্যঙ্গ-গল্প ও কবিতা বেনামীতে লিখিতেছি। কথাটা রবির কাছে সজনীবাবুই পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমিয়া উঠিল।

যে-কয়জন সাহিত্যিক বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সাহিত্য ছাড়িয়া আলোচনা ক্রমে নারীনির্য্যাতনের অধ্যায়ে আনিয়া ফেলিলেন। অধ্যাপক সুনীতিবাবু কি একটা কথা বলিতেই তাহা সমর্থন করিয়া রবি উত্তেজনায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর বাঙ্গলার নারীনির্য্যাতনের কত বিষাদময় কাহিনী সজলনেত্রে বেদনাপ্লুত ভাষায় বলিতে লাগিল। অগ্নি-গিরির অগ্ন্যুৎসব কোনদিন দেখি নাই, শৈলশিখরের সদ্যবাধামুক্ত বিপুল জলপ্রবাহের ক্ষুব্ধ গর্জ্জন কোনদিন শুনি নাই, কিন্তু সেদিন উপলব্ধি করিলাম। উত্তেজনায় রবি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। রবিকে চিনিলাম, মুগ্ধ হইলাম।

দিন দুই পরে হঠাৎ সকালবেলায় আমাদের বাড়ীতে রবি আসিয়া উপস্থিত। অভ্যর্থনার পালা শেষ হইলে রবি অসঙ্কোচে আমার নিকট আমার "ব্যথার পরাগ" দুই কপি চাহিয়া বসিল। বলিল, "জানেন ত কৃষ্ণধনবাবু, পাড়ার গরীবদের জন্যে একটা নৈশ স্কুল করেছি। লেখকবন্ধুদের কাছে চেয়ে চেয়ে কিছু বই যোগাড় করে' একটা ছোট লাইব্রেরীও করেছি। একদিন যাবেন।" কথাগুলি রবি এমন আন্তরিকতার সহিত বলিল যে এই পরদুঃখকাতর তরুণ বন্ধুটিকে মনে মনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আর একদিনের কথা ভুলিতে পারিব না। সারাদিন বৃষ্টি হইবার পর সন্ধ্যার কিছু আগে বৃষ্টি ছাড়িয়া গিয়াছিল। ভাবিলাম একটু বেড়াইয়া আসি। যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি এমন সময় ঔপন্যাসিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া হাজির। বলিলাম, "ভালই হোল,— চলুন একটু ঘুরে আসা যাক্।" দুইজনে হ্যারিসন রোড দিয়া অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের পথ ধরিলাম। হেদুয়ার কাছাকাছি একটা জায়গায় দেখিলাম অন্যদিকের ফুটপাথ ধরিয়া রবি হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। চিৎকার করিয়া ডাকিতেই সে প্রায় ছুটিয়া আসিল, বলিল, "বড় বিপদে পড়ে গেছি ভাই,—আজই রাত্রির ট্রেনে বাইরে যাচ্ছি। ওখানকার ওঁরাওদের মধ্যে কলেরা আরম্ভ হয়েছে, কিছু ওষুধপত্র যোগাড় করছি,—ওখানে আবার ডাক্তার নেই।" বুঝিলাম বৃষ্টিধারা অগ্রাহ্য করিয়া রবি সারাদিন পথে পথেই ঘুরিয়াছে। তেমনি উৎসাহ লইয়া রবি হাসিমুখে দ্রুত চলিয়া গেল।

সাহিত্যক্ষেত্রে রবির স্থান নির্দ্দেশের সময় এখনও আসে নাই। দেশকে সে সমগ্র প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। অনাচার, কুসংস্কার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে রবি মধ্যাহ্ন-রবির মতই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

নির্ভীক ভাবে সে সমাজের বেদনাময় ইতিহাস বলিয়া যাইত, সুদূর পল্লীর অশিক্ষিত উৎপীড়িত নরনারীর ব্যর্থ জীবনকাহিনী সে জলন্ত ভাষায় শুনাইতে চাহিত। যদি সহৃদয়তার মাপকাঠিতে সাহিত্য-বিচার চলে তবে রবির "থার্ডক্লাস" ও "উদাসীর মাঠে"র স্থান নির্দ্দেশ বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে অনেক দিন পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। অসাধারণ লিপিকৌশল ও সূক্ষ্ম রসবোধ থাকিলে ছোটগল্প সাহিত্যের কোন্ উন্নত পর্য্যায়ে গিয়া পৌছায় রবিই তাহার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে। রবির কবিতাও এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। "সিন্ধু-সরিতের" ভিতর দিয়া আমরা একটা সুস্থ, সবল ও তেজস্বী অন্তঃকরণের পরিচয় পাই। রবির "কঙ্কাল-মঙ্গল" ও "স্বপ্ন" জাতীয়-কবিতা হিসাবে চিরদিন বাঙ্গলার কাব্যসাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। কিন্তু রবি কোন দিন যশোলাভের আগ্রহে একান্ত ভাবে সাহিত্যচর্চ্চা করে নাই। কর্ম্মের অবসরে যেটুকু সময় পাইত তাহাই ভারতীপূজায় নিয়োজিত করিত।

শনিবারের চিঠির আপিসে বসিয়া যেদিন রবি "মানময়ী গার্ল্স্ স্কুলের" পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইল, সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম রবির প্রতিভা প্রকৃত পথের সন্ধান পাইয়াছে। শেষ দৃশ্য পড়িতে পড়িতে রবি নিজেই কাঁদিয়া ফেলিল। "মানময়ী গার্ল্স্ স্কুল" ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, হাস্যমুখর রঙ্গালয়ে রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া সগৌরবে অভিনীত হইতেছে, কিন্তু সেদিনের রবির অশ্রুসজল চক্ষুদুটি আজিও ভুলিতে পারি নাই। রবির প্রত্যেক রচনার মধ্যে নাটকীয় উপাদান অত্যন্ত বেশী ছিল। "বাস্তবিকা" ও "দিবাকরীর" প্রত্যেক পরিচ্ছেদ লইয়া উৎকৃষ্ট প্রহসন রচিত হইতে পারে। রস-রচনার দিক দিয়া বাঙ্গালাসাহিত্য নিতান্ত দরিদ্র নহে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, বীরবল, পরশুরাম প্রভৃতি অনেকেরই নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু ইঁহাদের রসরচনা হইতে রবির রসরচনার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তাহার সৃষ্ট হাস্যোদ্দীপক চরিত্রগুলির উপর অলক্ষ্যে একটা বেদনাময় সহানুভূতির ছায়া আসিয়া পড়ে। তরুণদলের মুখপাত্র বাস্তবিকার হরিকুমারের ন্যাকামি অসহ্য বোধ হইলেও কোন দিন তাহাকে নির্ম্মম হস্তে কশাঘাত করিতে ইচ্ছা হয় না। বাড়ীরই একটা অবুঝ ছেলের মত তাহার আব্দার সহ্য করিয়া আমরা আমোদ অনুভব করি।

অল্প দিন পূর্ব্বেও রবি "আনন্দবাজার পত্রিকার" জন্য আমার লেখা চাহিতে আসিয়াছিল। তারপর শেষ দেখা হয় "বঙ্গশ্রী" আপিসে। তারপর আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তাহার নূতন লেখা শুনাইতে প্রদীপ্ত চক্ষু ও এক মুখ হাসি লইয়া অতর্কিত বসন্তবাতাসের মত সে আর ছুটিয়া আসিবে না।

রবির অকাল মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষতি যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যেখানে সাহিত্যের কোন বার্ত্তা কোন কোলাহলই পৌঁছায় না, সেই সুদূর পল্লীপ্রান্তে অসহায় অস্পৃশ্যদের পর্ণকুটীরতলে কত নিপীড়িত জীবনের নৈরাশ্যময় মুহূর্ত্তগুলি আজ অসহ মৌন বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে! বনপ্রান্তের দীর্ঘপথ বাহিয়া, রৌদ্রঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত উপেক্ষা করিয়া দ্বিধাহীন নির্ভীক স্নেহব্যাকুলহৃদয়ে কেহ আর তাহাদের নিগূঢ় দুঃখ-বেদনার সন্ধান লইতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইবে না। রুগ্ন ও শীর্ণ হস্তে নিষ্প্রভ চক্ষুর রক্তাশ্রুধারা মুছিয়া আজ তাহারা অবিচারী ভগবানকে অভিসম্পাত দিতেছে। হে রবি, সে অভিসম্পাতে বিচলিত ভগবান্ কি তোমারই বিচ্ছেদকাতর শোকার্ত্ত বাঙ্গালার বুকে আবার তোমাকে ফিরাইয়া আনিবেন না?

অসমাপ্ত-(নাটিকা)

[রবীন্দ্রনাথ মৈত্র]

প্রথম দৃশ্য

(উদ্যান)

(করিমা, সঙ্গিনিগণ ও ফতেমা)

১ম সঙ্গিনী। আমরা তো গাইলাম এখন তুমি একটা গাও বিবি সাহেব।

করিমা। আমি কি গাইব ভাই? আমি তো গাইতে জানিনে। আর যা জান্‌তাম তা তোমাদের দেশে এসে সব ভুলেছি। মাঝে মাঝে গাইতে যাই, সুর ফোটে না।

১ম। এই তো সেদিন দেখ্‌লাম এস্রাজ নিয়ে ব'সেছ।

করিমা। হ্যাঁ, চেষ্টা কর্চ্ছিলাম তা' পার্ল্লাম না। পূরবীর কড়ি মধ্যমে যেয়ে আঙ্গুল আর চলেনা—সব ভুলে গেছি। রেখাবের কোমল টান্‌তে গিয়ে দেখি আওয়াজ ওঠে না। গমক তুল্‌তে গেলে আঙ্গুল অবশ হ'য়ে পড়ে, সব গুলিয়ে যায়। মনের সুখ থাক্‌লে এসব আসে, মনে দিনরাত জ্বল্‌ছে আগুন, গান আসে কোত্থেকে ভাই?

১ম। সবই বুঝি বিবি সাহেব, কিন্তু কি কর্ব্বে বল? আর তো দিন ফির্‌বে না। এখন যে অবস্থাতে আছ তাতেই সুখী হ'তে চেষ্টা কর। অভাব কিসের তোমার? এত গয়নাগাঁঠি, এমন বাড়ীঘর, এমন বাগান, সবই তো তোমার। শুধু গলদ এক উজীর সাহেবের বয়স একটু বেশী।

২য়। তাই বা এমন বেশী কি? তিন কুড়ি চার কুড়ি হবে বৈতো নয়? তা ওরকম বয়েসে অমন বড় মানুষের হারেম মেয়ে-মানুষে বোঝাই থাকে।

৩য়। হাতের সোনা পায়ে ঠেলোনা বিবি সাহেব, পায়ে ঠেলো না। খোদা এমন ধনদৌলত দিয়েছেন মাথায় ক'রে নাও। সুখে থাকবে।

১ম। আর যদি ব'য়েসের কথাই ধর, তা ভালোবাসাতেই পুষিয়ে যাবে। তিনি তোমাকে কত ভালোবাসেন বল দেখি!

করিমা। ছাই ভালোবাসা। যাক্‌ আর তোমাদের কথা কিছু শুন্‌তে চাইনে; এক কথা শুন্‌তে শুন্‌তে অরুচি ধ'রে গেছে। একটা গান শুন্‌বি, শোন—

গোরী ধীরে চলো গগরী ছল্‌কি না যায়।
শিরপর গগরী গগরী পর গেড়ুয়া,।
পতরী কমর কহুঁ লচ্‌কি না যায়॥

(গানের সহিত সঙ্গিনিগণের নৃত্য)

১ম স। এ কোন্‌ দেশী গান বিবি সাহেব?

করিমা। এ হিন্দুস্থানী গান। আমি যখন হিন্দুস্থানে ছিলাম তখন শিখেছি।

২য়। ভারি মিঠে গান, কিন্তু কিছু বোঝা যায়না।

(দূরে বাদ্যরব)

৩য়। ও আওয়াজ কিসের?

১ম। তাইতো' কাউকে বুঝি কোতল কর্ব্বে তাই নিয়ে যাচ্ছে।

সঙ্গিনিগণ। চল দেখে আসি, বিবি সাহেব।

করিমা। তোমরা যাও ভাই। আমি একটু বসি।

(সঙ্গিনিগণের উদ্যানপ্রান্তে গমন)

ফাতেমা। করিমা।

করিমা। কেন বোন্‌?

ফতেমা। আর কত দিন এমন ক'রে থাক্‌বে ?

করিমা। যতদিন খোদা রাখেন আর যতদিন মনের মানুষ না পাই।

ফতেমা। তোমার মনের মানুষের অভাব কি ? যে রূপ! কত বাদ্‌শাজাদা এসে পায়ে লুটিয়ে পড়্‌বে।

করিমা। বাদ্‌শাজাদা চাইনে ফতেমা, দুঃখিনী আমি, আমার মত দুঃখী একটা চাই।

ফতেমা। সত্যি করিমা, আমি বুঝ্‌তে পারিনে তোমার দুঃখ কি ? এরা সবাই বলে কিসের দুঃখ ? আমিও তাই ভাবি। উজীর সাহেব কত ভালবাসেন—

করিমা। আমি তো ভালবাসিনে ফতেমা, আর তাঁর ভালবাসা! তিনি কি ভালবাসেন আমাকে ? না। তিনি ভালবাসেন আমার এই রূপকে। দু'দিন এই রূপের আদর, তারপর এদের যে দশা আমারও তাই হবে। আমাকে ভালবাস্‌লে তিনি আমার মনে কষ্ট দিয়ে আমাকে সাদি কর্ত্তে চাইতেন না। দেখ্‌ছ ফতেমা এই যারা আমার সঙ্গে র'য়েছে সবাই উজীরের গোয়েন্দা, সবাই আমাকে তাদের দলে ভর্ত্তি কর্ত্তে চায়।

ফতেমা। কিন্তু আমি তো চাইনে করিমা।

করিমা। খোদার কৃপায় তোমাকে পেয়েছি তা' নৈলে বিষ খেয়ে মর্‌তাম। সত্যি ফতেমা এখন ভাব্‌ছি আগে মরিনি কেন ? মা কবে মরেছে মনে নেই। বাপের সঙ্গে হিন্দুস্থানে ছিলাম। মক্কার পথে বাবাকে খুন ক'রে যখন বেদুইনরা আমাকে কেড়ে নিয়ে বিক্রি কর্লে, তখন যদি মর্‌তাম তা' হ'লে আর উজীরের হাতে পড়তাম না। এখানে এই এক বৎসর যে আমার কেমন ক'রে কেটেছে খোদা জানেন। কবে যে এ দিনের শেষ হবে, মালিক জানেন।

ফতেমা। ভয় কোরো না করিমা বিবি আমি থাকতে উজীর তোমার কিছু অনিষ্ট কর্ত্তে পার্ব্বে না। এই উজীরের সংসারে আমি ছেলেবেলা থেকে র'য়েছি, উজীরের হাত থেকে কত মেয়েকে বাঁচিয়েছি আর তোমাকে বাঁচাতে পার্ব্ব না ?

করিমা। খোদা তোর ভাল কর্ব্বেন ফতেমা।

(সঙ্গিণিগণের নিকটে আগমন)

করিমা। খবর কি ?

১ম। বাদ্‌শার হুকুম, যত জোয়ান মরদ আছে সবাইকে হাতিয়ার ধর্ত্তে হবে। তারই ইস্তাহার জারী হচ্ছে।

করিমা। এত ফৌজ কেন ?

২য়। শোননি বুঝি ? বাদ্‌শা লড়াই কর্ব্বেন ইস্তাম্বুলের বাদ্‌শা-জাদার সঙ্গে, তারি আয়োজন হচ্ছে।

করিমা। কেন, লড়াই কেন ?

১ম। অনেকে অনেক কথা ব'লে বিবি সাহেব। কেউ বলে বাদ্‌শার বড় বেগমকে বাদ্‌শাজাদা চুরি করে নিয়েছেন। কেউ বলে বেগমের পোষা চিড়িয়ার ঠোঁট কেটে দিয়েছেন ইস্তাম্বুলের বাদ্‌শাজাদা।

২য়। কি আস্পর্দ্ধা! আমাদের বেগমের চিড়িয়া, তার ঠোঁট, তাই কিনা কাটলে ? কম্‌বক্তের এবার আর নিস্তার নাই।

ফতেমা। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে, তুমি বাদ্‌শাজাদাকে জান ?

৩য়। শুনেছি, সে নাকি সয়তানের চেলা। লড়াইয়ে তার সঙ্গে কেউ পারে না।

১ম। কেউ পারে না ব'লে কি ইস্পাহানের বাদ্‌শাও পার্ব্বে না নাকি ? আমাদের বাদ্‌শা কি যে সে লোক !

ফতেমা। কে বল্‌লে? বাদ্‌শা তোদের মস্ত লোক! শুধু একটু কুঁজো এই যা, আর একটু খোঁড়া, আর একটু বেকুব।

১ম। তুমি বাদ্‌শার নিন্দা কর্চ্ছ ফতেমা বিবি?

ফতেমা। হ্যাঁ গো কর্চ্ছি, কচ্ছি, কর্চ্ছি! তোমাদের কাজ তোমরা কর, তকরার কোরো না—একটু নাচ গাও।

১ম। কি কর্ব্ব, যা বল্‌বে তাই কর্ত্তে হবে—বাঁদী আমরা—এসো ভাই—

(নৃত্য গীত)

(ইয়াকুবের প্রবেশ)

ইয়াকুব। এ হঠ্‌ যাও, হঠ্‌ যাও, উজীর সাহেব আস্‌ছেন, হঠ্‌ যাও।

ফতেমা। আজ যে অসময়ে?

ইয়াকুব। উজীরের আবার সময় অসময় আছে নাকি ফতেমা বিবি? হঠ, হঠ বিবি সাহেব সেলাম। উজীর সাহেব আস্‌ছেন, কুর্ণিশ করুন, কুর্ণিশ করুন। এই এই বাঁদী সব কুর্ণিশ কর্‌ কুর্ণিশ কর্‌। উজীরের আর্দ্দালী ইয়াকুব আলী এসেছেন কুর্ণিশ কর্‌ সব—এই ইস্‌মাফিক—(অঙ্গভঙ্গী সহকারে কুর্ণিশ শিক্ষাদান) হ্যাঁ তালিম হ'য়েছে। হুজুর সব তৈরী—

(উজীরের প্রবেশ)

সকলের কুর্ণিশ।

উজীর। মেজাজ সরিফ্‌ সব?

১ম। হাঁ জনাবের দৌলতে সব ভাল।

উজীর। বস্‌, ইয়াকুব এদের সব নিয়ে যাও। করিমা বিবির সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।

য়াকুব। হাঁ, আও সব, জল্‌দি চলে এস—দিব্যি জাজিম পাতা আছে

বস্বে একটু। তারপর একটু খুনো বেদানার সরবৎ খেয়ে বস্ ঠাণ্ডা হ'য়ে—চ'লে এস বিবিজানেরা। (স্বগত) বুড়ো বেটার কি সখ ! এবার ম'রে উজীর হব।

(সঙ্গিনিগণকে লইয়া প্রস্থান)

করিমা। ফতেমা তুই থাক্।

ফতেমা। না বিবি সাহেব। (মৃদু স্বরে) ওই ফোয়ারার ধারে থাক্ব, ভয় নেই।

উজীর। তারপর করিমা বিবি, কি স্থির কর্‌লে ?

করিমা। কি স্থির কর্ব্ব উজীর সাহেব ? আমার মনের কথা সব তো আমি খুলেই বলেছি, সেই আমার শেষ কথা, আর নতুন কিছু বল্‌বার নেই।

উজীর। দেখ, ভেবে দেখ, এই ধন দৌলত বান্দা বাঁদী সব তোমার হবে। গোলাপজলে স্নান কর্ব্বে। আতর মেখে পালঙ্কে শুয়ে থাক্‌বে, হাজার বাঁদী সেবা কর্ব্বে। এসব ভেবেছ ?

করিমা। সব ভেবেছি হজরৎ। আপনি আমাকে গ্রহণ কর্ব্বেন এ তো আপনার করুণা, কিন্তু জনাব সে করুণার যোগ্য আমি নই। আমি দরিদ্রের কন্যা, চিরকাল দরিদ্রই থাকতে চাই। আমার এসব কেন ? তার চেয়ে আমাকে মুক্তি দিন চিরকাল আপনার জন্তে খোদার কাছে প্রার্থনা কর্ব্ব, আর বাঁদীগিরি ক'রে আপনার ঋণ শোধের চেষ্টা কর্ব্ব।

উজীর। ঋণ শোধ কর্ব্বে ! হাজার আস্‌রফি দিয়ে তোমায় কিনেছি। তোমায় ফিরে বেচ্‌লেও তো দু' আস্‌রফি হবে না। দেখ্‌লাম অনাথা তাই কিন্‌লাম, নৈলে বকাউল্লা উজীরের স্ত্রীলোকের অভাব কি ? হুশো ওমরার বেগম যার একটা মিষ্টি কথার জন্তে হাঁপিয়ে

মরেছে সে কি একটা বাঁদীর জন্যে লালায়িত ? তবে ভেবেছিলাম আমার বেগম হ'লে ভবিষ্যতে তোমার একটা গতি হবে তাই, নৈলে আমার আর কোন গরজ নেই। বুড়ো হয়েছি স্ত্রীলোকের প্রতি কোন আসক্তি নেই, তবে কিনা তোমায় দেখ্‌লাম অনাথা তাই একটু মমতা হ'ল !

করিমা। হজরৎ পরম দয়ালু !

উজীর। দয়ার জন্যেই আমার সব গেল ! তা যাক্—সর্ব্বস্ব যেয়েও যদি তুমি খুসী থাক, তা হ'লেই আমি খুসী। ওই দেখ্‌ছি ফতেমা আস্‌ছে—তা, একটু নিরিবিলি কথাবার্ত্তা হবে—এখন একবার দরবার ঘুরে আসি। কি বল, যাই ?

করিমা। আসুন, বন্দেগি।

উজীর। (স্বগত) সয়তানের লেড়্‌কী ! থাক্‌তেও বল্লে না ! জোর জবরদস্তি ক'র্‌লে আবার বাদ্‌শার কানে উঠ্‌বে ! সব শালা ওমরাও কড়া নজর রেখেছে ! (প্রস্থান)

(ফতেমার প্রবেশ)

ফতেমা। বুড়ো কি বল্লে ?

করিমা। ওই এক কথা, আর কি বল্‌বে ? ফতেমা একটু জহর এনে দিবি ?

ফতেমা। জহর কেন বিবি সাহেব ?

করিমা। খেয়ে মরি। আর সহ্য হয় না।

ফতেমা। মর্‌বে কেন করিমা ? এ রূপ যৌবন কি কেউ স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দেয় ?

করিমা। সেও ভাল ফতেমা, সয়তানের ভোগে লাগার চেয়ে মাটিতে মিশিয়ে যায় সেও ভাল।

ফতেমা। অত নিরাশ না হ'য়ে সয়তানকে কেমন করে ভোগে লাগান যায় তাই ভাবিগে চল।

করিমা। চল যাই। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

(মালেক ও বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহাদুর। না মালেক, এ জায়গা বড় সুবিধের নয়। একে তো শত্রুর দেশ তারপর স্ত্রীলোকের যে উৎপাত দেখ্‌ছি—না চল কাবুল পানে যাওয়া যাক্।

মালেক। তোমার যেখানে খুসী যেতে পার, আমি একবার বাদ্‌শার অন্দর না দেখে যাচ্ছিনে। অত সাধু হ'তে হয়, ফকিরী নাও গে। পঁচিশ বছরের জোয়ান, আওরৎ দেখে ভয়? তোমার ঠাকুর্দ্দা ষাটবছর বয়েসে এক সঙ্গে তিনটি নিকা আর এগারোটা সাদি করেছিলেন খবর রাখ?

বাহাদুর। আর তোমার বাবা যে বেগম সাহেব ম'রে যাবার পর মেয়েমানুষের মুখ দেখেন নি, খবর রাখ?

মালেক। বাবা দেখেন নি কাজেই আমিও দেখব না, যুক্তির বাহাদুরী আছে। শোন বাহাদুর, যে মৎলবে বেরিয়েছি—হাসিল না হওয়া পর্য্যন্ত ইস্পাহান ছেড়ে কোথাও যাওয়া নয়, বুঝ্‌লে? ঢেঁড়্‌রা দিচ্ছে শুনেছ তো? সব মরদকে ফৌজে টান্‌ছে। কেন বুঝ্‌তে পাচ্ছ?

বাহাদুর। জানিগো জানি। তাতে আমাদের ভারি ভয়।

মালেক। আরে ভয় নেই ব'লেই তো দেশ ছেড়ে বেরিয়েছি। কুছ্ পরোয়া নেই তোমার। কাজটা হাসিল হ'লে, এই বল্‌ছি তোমাকে, আমার যত কস্‌বী বাঁদী আছে—সব বিদায় দিয়ে একদম্ ফকির ফকিরদ্দোলা হ'য়ে বস্‌ব। কোন শালা আর স্ত্রীলোক

নিয়ে কারবার করে। অতি পাজী জাত—অতি পাজী, কেবল ফাঁকি আর মুখে ভালবাসা। দাঁড়াও, আগে ফিরে যাই, তারপর সব বেটিকে তাড়াচ্ছি।

বাহাদুর। বা দোস্ত বড় খুসী হলাম, তবে কি জান যতক্ষণ চোখে না দেখ্‌ছি ততক্ষণ বিশ্বাস নেই।

মালেক। কেন? কেন?

বাহাদুর। আরে তোমাকে তো ছেলেবেলা থেকে দেখ্‌ছি, বল্লে "খাব কাবাব," কাবাব তৈরী হ'ল, অম্‌নি বল্লে "উঁহুঃ ওটা নয় কোর্ম্মা খাব"। এই তো বরাবর চল্‌ছে, ঘর থেকে বেরুলে, যাবে মদিনা, রাস্তায় এসে মৎলব বদ্‌লিয়ে ইস্পাহানে এসে হাজির।

মালেক। না বাহাদুর এবারকার মৎলব আমার ঠিক—তুমি দেখে নিও। আচ্ছা বাহাদুর তুমি সাদি কর।

বাহাদুর। আর তুমি?

মালেক। তোমার দেখে কর্ব্ব। দেখি সাদি ক'রে তুমি কেমন থাক, কি জান ওটাকে আমি একটু ভয় করি।

বাহাদুর। পঁচিশ বছরের জোয়ান, আওরৎ দেখে ভয়? আরে ছ্যাঃ।

মালেক। ঠাট্টা কর্চ্ছ! কর। কিন্তু পরের স্ত্রী আর নিজের স্ত্রীতে একটু তফাৎ আছে। তারপর যদি একটু দেখ্‌তে ভাল হ'লেন তা হ'লেই আর কি? "ওরে বাঁদী" "ওরে বান্দা" "ফুলের পাখা" "গোলাপ জল"—কি ওকম ক'রে তাকাচ্ছ যে! ভয় নেই—ভয় নেই সাদি করা খুব ভাল, ভারি ফুর্ত্তি—তুমি সাদি কর বাহাদুর, সাদি কর! ভারি আরাম পাবে।

বাহাদুর। আচ্ছা ভেবে চিন্তে করা যাবে। আপাততঃ একটা সরাই টরাই খুঁজে না নিলে তো চল্‌ছে না। পেটের নাড়ীসুদ্ধ হজম হ'য়ে যাবার মতন!

মালেক। দাঁড়াও, কতকগুলো স্ত্রীলোক আসছে না? এদের কাছে জিজ্ঞাসা করি।

বাহাদুর। না মালেক, দরকার নেই, দরকার নেই—আমিই খুঁজে নেব—এদের দলে পড়লে—তুমি আহার নিদ্রা ভুলে যাবে।

মালেক। সত্যি বাহাদুর, এরা বড় সুন্দর। হবে না? বেদানা খায় কত!

(ওম্‌রাহ বনিতাগণের প্রবেশ)

১ম ওম্‌রাহ বনিতা। কে গো তোমরা?

মালেক। দুটি নির্জ্জীব প্রাণী, ইস্পাহান দেখ্‌তে এসে পথ ভুলেছি।

১ম ওম্‌রাহ বনিতা। কোথায় যাবে?

মালেক। সে আর আপন মুখে কেমন ক'রে বলি বিবিসাহেব? মেহেরবানী ক'রে যেখানে নিয়ে যাও।

১ম ওম্‌রাহ বনিতা। রসিক দেখ্‌ছি যে। আমার ঘরে যাবে? আমি আমীর আলী ওম্‌রার স্ত্রী।

মালেক। তিনি বেঁচে নেই তো।

২য় ওমরাহ বনিতা। না গো সেখানে যেও না। ও দুষমনের ঘর, আজ গেলে কাল আর মাথা নিয়ে বেরুতে পার্ব্বে না। এ আমি হল্‌প ক'রে বল্‌তে পারি।

মালেক। বটে! বটে! তবে মাফ্‌ কর সুন্দরী, তোমার মত রূপসী মিল্‌বে ঢের, কিন্তু এ মাথা একবার গেলে আর মিল্‌বে না। তুমি বরং আমার এই সঙ্গীটিকে নিয়ে যাও, দিব্যি রসিক লোক—দেখ্‌ছ না গোঁফ্‌ (গুম্ফ টানিলেন)

বাহাদুর। উঃ লাগে! লাগে!

মালেক। আর উচুঁদরের প্রেমিক—কোরাণ সরিফ্‌ আগাগোড়া মুখস্থ।

১ম ওমরাহ বনিতা। তাই নাকি সাহেব? তুমি কে?

বাহাদুর। এই রে! কেউ নই বিবিজান! কেউ নই—পথে ঘাটে থাকি—কারো বাড়ী যাওয়া নিষেধ।

৩য় ওমরাহ বনিতা। তবে বন্ধু আমার সাথে চল—আমি গাছতলায় থাকি—ছুটিতে বেশ থাকব—আমার খসমও ঘরে নেই, যাবে বন্ধু?

বাহাদুর। ওরে বাবা! তাকি হয়? তোমার খসম থাকলে যেতাম, আলাপ পরিচয় ক'রে আসতাম। উহুঃ হুঃ পায়ের ব্যাথায় গেলাম! উহু!

৩য় ওমরাহ বনিতা। কি হ'ল জান্?

বাহাদুর। আর বিবিজান, জান্ গেল। স'রে যাও স'রে যাও—কুষ্ঠব্যাধি হ'য়েছে।

১ওমরাহ বনিতা। তাই নাকি, ছিঃ ছিঃ! তবে এস আমরা যাই। (মালেকের হস্তধারণ)

মালেক—মাইরি বিবিজান, তোমার স্পর্শ কি মধুর!

২য় ওমরাহ বনিতা। আর আমার! (হস্তধারণ) এস জান্, আসবে না?

মালেক। আহা অভিমান কোরো না, যাব, একটু বিলম্ব কর। আচ্ছা দেখ বিবিজানেরা, শিকার ধরা শিখলে কোথেকে বল। রাস্তা ঘাটে—বিদেশী মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছি, কথা নেই বার্ত্তা নেই গায়ে প'ড়ে প্রেম করা আরম্ভ করলে? বলি গোড়ার খবর কিছু রাখ?

সকলে। কি? কি?

মালেক। আমরা দুটি ডাকাত। শুনছ?

১ম ওমরাহ বনিতা। আর কি ডাকাতি কর্ব্বে চাঁদ, জানতো নিয়েছ ডাকাতি ক'রে—আর কি নেবে?

মালেক—প্রেম কাকে বলে দেখছিস্ বাহাদুর? কিন্তু পিয়ার

সোজা কথা বলে রাখ্ছি—ইউক্রেতিস্ ঘাঁটলে তুই এক পাই পেতে পার, কিন্তু তোমার এই পিয়ারের আব্জরাখা ঢুঁড়্লে এক কানা কড়িও বেরুবে না। দু'দিন সবুর কর কিছু বাগিয়ে নিই, তারপর তোমরা দল বেঁধে এস কাউকে নিরাশ কর্ব্ব না, বুঝ্লে?

২য় ওমরাহ বনিতা। আমরা কি পয়সার ভিখিরী?

৩য় ওমরাহ বনিতা। তাই গো, এরা আমাদের তাই ভাব্ছে। চল যাই।

মালেক। তবে চল্লে চাঁদ? বলি দেখা সাক্ষাত কি আবার হবে?

১ম ওম্রাহ বনিতা। হবে বৈকি বন্ধু—শোন—(কর্ণে) শুন্লে?

মালেক। বস্ রাজী। বলি পিয়ার তোমার কিছু আছে নাকি?

২য় ওমরাহ বনিতা। আর তুমি ভাই আমাদের সঙ্গে কথাই ক' না। আমরা কুৎসিত।

মালেক। কে বল্লে বন্ধু? কুৎসিত! বাবা! ইস্পাহানকে তোমরা বেহেস্ত ক'রে রেখেছ—দুনিয়ার লোককে মধু বিলুচ্ছ। কত হাজী ফকির মক্কার পথ ভুলে এখানে এসে হাজির হচ্ছে ঠিকানা নেই, আর তোমরা কুৎসিত!

২য় ওম্রাহ বনিতা। তবে অবহেলা কর্চ্ছ না?

মালেক। আরে ছিঃ, সে কি একটা কথা!

২য় ওম্রাহ বনিতা। জুম্মারোজে—(কর্ণে)

মালেক। রাজী—তুমি?

৩য় ওম্রাহ বনিতা। আমি অত বেহায়া নই, কাউকে অত সাধিনে।

মালেক। ভালই। বিবিজান তবে তোমায় সেলাম?

৩য় ওম্রাহ বনিতা। সেলাম আমি চাইনে, যাদের সঙ্গে পীরিত তাদের সেলাম কর, আমি কে?

মালেক। তুমি সব বিবিজান, তুমিই দেখছি সব, বড় শিকারী। এক লহমায় যেমন অভিমান করা আরম্ভ করেছ দশ বছরের সাদির স্ত্রীও তেমন করে না, ব্যবসাটা শিখেছ ভাল। যাক্ আর কেন ব'লে ফেল, তোমার আর্জ্জীটাও শুনি, নৈলে আবার রাত্তিরে ঘুম হবে না।

৩য় ওম্‌রাহ বনিতা। (কর্ণে) ইচ্ছে হয় যেও, আমি কাউকে সাধিনে।

বাহাদুর। (উঠিয়া) মালেক! পালাও, পালাও। আরো আস্‌ছে, এবার ঠিক খাবে। (প্রস্থানোদ্যম)

মালেক! আরে ভয় কি? আমি আছি।

বাহাদুর। তোমার জন্যেই তো ভয়—এ তুষমণ চেহারার কাছে কেউ ঘেঁস্‌বেনা দোস্ত, তোমাকেই খাবে, পালাও।

১ম ওমরাহ বনিতা। ওরে সব চ'লে আয়, চ'লে আয়, কুঁদুলী ফতেমা আস্‌ছে।

১ম ওম্‌রাহ বনিতা। তাই তো! ভুলনা বন্ধু—দু'দণ্ড কথা কইতে পার্ল্লাম না।

মালেক। ওতেই হ'য়েছে!

১ম ওম্‌রাহ বনিতা। তবে দোস্ত—(ইঙ্গিত)

মালেক। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক্, নামাজ ভুল্‌বো তো তোমায় ভুল্‌ব না।

৩য় ওম্‌রাহ বনিতা। আমি কাউকে সাধিনে।

মালেক। আমি সেধেই যাই, এস তবে, সেলাম।

(ওমরাহ বনিতাগণের প্রস্থান)

(ফতেমার প্রবেশ)

বাহাদুর। (ভীতস্বরে) মালেক?

মালেক। আরে থাম। বিবিজান সেলাম।

ফতেমা। বন্দেগি। আপনারা কোথা থেকে আস্‌ছেন?

মালেক। ভয় নেই বাহাদুর, এ স্ত্রীলোকটা ভাল—হ্যাঁ কি বল্লে?

ফতেমা। কোথা থেকে আস্‌ছেন আপনারা?

মালেক। ঐটি জিজ্ঞাসা কোরো না সুন্দরী, বল্‌তে পার্ব্বনা, বরং কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পার।

ফতেমা। বলুন।

মালেক। অনেক দূর থেকে আস্‌ছি, যাব ইস্পাহান। শুনেছি বাদ্‌শার নূতন ফৌজ তৈয়ার হচ্ছে, দেখি যদি সেখানে ঢুকতে পারি। আমার সঙ্গীটিও সেপাই।

ফতেমা। সেপাই! তা' আপনার পিছনে ওরকম জড়সড় হ'য়ে র'য়েছেন কেন?

বাহাদুর। কি জান বিবিজান? মরদের সঙ্গে লড়াই করাই অভ্যেস, কিন্তু এখানে দেখ্‌ছি পথে ঘাটে স্ত্রীলোকের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে হয়।

ফতেমা। এগিয়ে আসুন ভয় কি? আমি লড়াই কর্ত্তে আসিনি— হাতিয়ারও নেই।

মালেক। ঐটি বোলো না বিবিজান, তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে হাতিয়ার, চোখে বাণ, মুখে তলোয়ার, বুকে বর্শা, যাকে বিঁধ্‌বে তার নির্ঘাত মৃত্যু। তোমাদের চলন দেখ্‌লে বুক কাঁপে—সঙ্গে সঙ্গে পায়জরের রুণুঝুনু শুন্‌লে মনে হয় আরব ঘোড়সওয়ার আস্‌ছে। তোমাদের যে দেশ দেখ্‌ছি—তাতে তোমাদের বাদ্‌শার ফৌজের অভাব হবে না, মরদের বদলে গুটিকয়েক তোমাদের দলের নিয়ে যদি ফৌজ গড়া যায়—তা হ'লে কাবুল তো ভাল চীন সুদ্ধ জয় ক'রে আস্‌বে তার আর এদিক্ ওদিক্ নেই।

ফতেমা। (স্বগত) বেশ কথাগুলি! (প্রকাশ্যে) হজরৎ, যদি কষ্ট না হন তবে একটা আর্জ্জী কর্‌তে পারি, গরীবখানা নিকটেই, যদি আতিথ্য গ্রহণ করেন তবে কৃতার্থ হই!

বাহাদুর। এ অতিথিতে বিশেষ লাভ হবে না, কেটে টুকুরো কর্লে'ও তামার টুকুরো মিল্‌বে না।

ফতেমা। জনাব ভুল বুঝেছেন, আমরা অতিথিকে অর্থের লোভে স্থান দিইনে।

মালেক। ঠিক্! ঠিক্! কিন্তু সুন্দরী, তোমাদের ওম্‌রার স্ত্রীদের দেখে আমার ধারণা উল্‌টে গেছে!

ফতেমা। ওমরার স্ত্রী! যাদের সঙ্গে কথা কইছিলেন, তারাই বুঝি!

ওদের কথা বিশ্বাস করেছেন? ওরা তো কস্‌বী সব—এ দেশের ওম্‌রাদের সাদি কর্ব্বার হুকুম নেই—তাদেরই সব—

মালেক। শুন্‌লে বাহাদুর?

বাহাদুর। ঠক্‌বে। মালেক ঠক্‌বে। বিশ্বাস কোরো না, বিশ্বাস কোরো না।

মালেক। তোমার নিমন্ত্রণ নিতে পার্ল্লাম না বিবিজান মাফ্ কোরো—এইখানেই আবার সাক্ষাৎ হবে।

ফতেমা। ঠিক্ যেন থাকে বিদেশী—ঠিক্ আস্‌বে?

মালেক। ঠিক্ আস্‌ব।

ফতেমা। (স্বগত) করিমা বিবির নজর আছে বটে! খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলেন, খোঁজ পেলাম না কিন্তু প্রাণের পরিচয় পেলাম। দোহাই খোদা মনের ইচ্ছাটা যেন পূর্ণ হয়। (প্রস্থান)

(উজীর ও ইয়াকুবের প্রবেশ)

ইয়াকুব। তারপর জনাবালি, এই পর্য্যন্তই হ'য়ে রৈল তাহ'লে!

উজীর। কাজেই। আমি তো চেষ্টার ক্রটি কর্চ্ছিনে। পয়সার লোভ, বান্দা বাঁদীর লোভ, কিছুতেই বাগে আস্‌বে না। কি করি?

ইয়াকুব। তাহ'লে ছেড়ে দিন্, বেটী পথে গিয়ে দাঁড়াক্!

উজীর। ইয়াকুব!

ইয়াকুব। হুজুর!

উজীর। বুকে ছুরি মার্, বুকে ছুরি মার্!

ইয়াকুব। কেন হুজুর?

উজীর। ও কথা মুখ দিয়ে বল্‌তে আছে? জানিস্ ইয়াকুব, করিম বিবির বদলে আমি উজীরী ছাড়্‌তে পারি।

ইয়াকুব। না তা জানিনে, তবে আমি আর্দ্দালীগিরি ছাড়তে পারি।

উজীর। ইয়াকুব আর কিছু ফন্দী দেখ।

ইয়াকুব। আজ্ঞে দেখ্ছি। আচ্ছা—জোর ক'রে মোল্লা ডেকে সাদি ক'রে ফেল্লে হয় না?

উজীর। হয়। কিন্তু এ বাদ্শা থাকৃতে তো হবে না। বাদ্শার কানে উঠলে জান তো? পুরাণো বাদ্শার আমলে কোনও ভাবনা ছিল না। পথ দিয়ে খুবসুরৎ ইরাণী চলেছে, নিমন্ত্রণ ক'রে ঘরে নিয়ে গেলাম, ইসারায় মোল্লা এল, খানা শেষ হ'তে না হ'তেই বস্, সাদি খতম! আর এ বেটা যদি শুন্লে কেউ কোনও স্ত্রীলোকের অমতে তাকে সাদি করেছে অম্নি নাও গর্দ্দান! গর্দ্দান তো সস্তা নয় ইয়াকুব। (১)

১। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভঙ্গিতে লেখা—১৯।২০ বৎসর পূর্ব্বের রচনা।

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৫-সি, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।